মুসলিমবঙ্গ

দ্বীন, কওম, যমীন



আসিফ আদনান

মুসলিমবঙ্গ

দ্বীন, কওম, যমীন

আসিফ আদনান

Ilmhouse

মুসলিমবঙ্গ

প্রথম সংস্করণ
রমাদান ১৪৪৭; মার্চ ২০২৬

Ilmhouse

প্রকাশক
ইলমহাউস পাবলিকেশন
www.facebook.com/IlmhouseBD

প্রচ্ছদ: ওমর ইবনে সাদিক
প্রচ্ছদ ক্যালিগ্রাফি: ওমর আল আতিয়াহ
বানান নিরীক্ষণ ও পৃষ্ঠাসজ্জা: আসাদুল্লাহ আল গালিব

মূল্য: ৪৮০ টাকা

Muslimbongo, by Asif Adnan, published by Ilmhouse Publication. First Edition, March 2026.

রাহমাতুল্লিল 'আলামীন
খাতামুন নাবীয়্যীন
নাবীয়্যুর রাহমাহ
নাবীয়্যুল মালহামাহ
সাইয়্যিদুল মুরসালীন

প্রিয় নবীজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি

আল্লাহ তাঁর ওপর অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর।

যেকোনো চিন্তার ভেতরে তার অনিবার্য উপসংহার খোদাই করা থাকে। তবে চিন্তাকে তার শেষবিন্দু পর্যন্ত অনুসরণের বুদ্ধিবৃত্তিক সৎসাহস আমাদের প্রায়ই হয়ে ওঠে না।

আমরা চিন্তাগুলোকে সাধারণত এক ধরনের বায়বীয়, অসমাপ্ত ও আবেগতাড়িত আবহে আটকে রাখি। ধাপে ধাপে তাদের চূড়ান্ত যৌক্তিক গন্তব্যে টেনে নেওয়ার দৃঢ়তা দেখাই না। এর মধ্যে এক ধরনের আরামদায়ক নিরাপত্তাবোধ আছে; এতে এমন অনেক উপসংহার এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, যেগুলো অবধারিত কিন্তু অস্বস্তিকর।

এই বই একটা সুনির্দিষ্ট চিন্তারেখাকে কোনো পাশকাটানো ছাড়াই তার শেষবিন্দু পর্যন্ত টেনে নেওয়ার প্রয়াস। ইতিহাসের যে মোড়ে আজ আমরা দাঁড়িয়ে, এই কাল ও পরিসরে জাতি হিসেবে এবং মুসলিম হিসেবে আমাদের করণীয় কী, কেন এবং তা কীভাবে; এই বই মূলত সেই প্রশ্নগুলোর এক নির্মোহ অনুসন্ধান।

যারা বিদ্যমানতা মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চান না, বরং বাস্তবতাকে বদলে দিতে চান; যারা স্বপ্ন দেখেন এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সাহস রাখেন; যারা অভ্যস্ত ছক আর অন্ধ অনুসরণের স্রোত ছাপিয়ে ওঠতে পারেন—ইনশাআল্লাহ এই প্রচেষ্টা তাঁদের উপকারে আসবে।

এই বই এক দীর্ঘ সফরের ফসল। মূল পাণ্ডুলিপির পেছনে এক বছরের কিছু বেশি সময় লাগলেও, এর পেছনের চিন্তাগুলো দানা বাঁধতে শুরু করেছিল ২০২১-এ। চিন্তার এই সফরে অনেকেই তথ্য দিয়ে, খসড়া পড়ে এবং ভাবনার নানা সূত্র ধরিয়ে দিয়ে এই পাণ্ডুলিপিকে পূর্ণতা দিতে সহায়তা করেছেন। সবার নাম উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; আল্লাহ তাঁদের উত্তম প্রতিদান দিন।

কৃতজ্ঞতা আমার পরিবারের প্রতি; যারা এমনিতেই আমার সময় কম পায়, এই বইয়ের কারণে সেই সময়টুকু আরও সংকুচিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদের নিয়্যাত, প্রচেষ্টা ও কুরবানি কবুল করুন।

যদি এই বইয়ের মাঝে কল্যাণকর কিছু থাকে, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা কিছু ভুলত্রুটি, তা একান্তই আমার।

হে আল্লাহ, নিয়্যাত, ইখলাস ও সামর্থ্যের সব ত্রুটি দূর করে আপনার দুর্বল বান্দার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে নিন একমাত্র আপনারই সন্তুষ্টির জন্য। এতে বারাকাহ এবং সাফল্য দান করুন।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর।

আসিফ আদনান
রমাদান, ১৪৪৭

সূচিপত্র

অধ্যায় ১

যুগসন্ধির দায়

রাতের নগরীতে রাস্তাগুলো ফাঁকা। বাতাসে ধুলোর গন্ধ।

আবছা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদেহী পথিক। ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাচ্ছে প্রধান রাস্তাগুলো। এই শহরের মানুষ তার চেহারা খুব ভালো করে চেনে। কোথায় যাচ্ছে, তা কারও চোখে পড়লে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

কিন্তু উপায় নেই। আজ তাকে যেতেই হবে।

বহু বছর ধরে সে যা কিছুর জন্য কাজ করেছে, যা কিছু গড়ে তুলেছে তিলে তিলে, সব আজ ধূলিসাৎ হবার উপক্রম। কেবল একজন মানুষের কারণে। এই লোকের ভেতরে আসলে কী আছে, আজ সেটা জানতেই হবে। তারপর নিতে হবে সিদ্ধান্ত।

সেজন্যেই আরামের বিছানা আর পছন্দের নারীর উষ্ণতা ফেলে রাস্তায় বেরিয়েছে পথিক। আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে অন্ধকারকে।

পথিক নিয়মিত গতিতে এগিয়ে চলে।

বলতে বাধা নেই, মানুষটাকে সে পছন্দ করে না। হয়তো ঘৃণাও করে। তবে এসব ছাপিয়ে মানুষটার ব্যাপারে আরেকটা অনুভূতি কাজ করে—সমীহ। ব্যাপারটা তার পছন্দ না, কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও এই অনুভূতি ঝেড়ে ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে সে।

একসময় তার মনে হতো মানুষটা বোকা। অতি সুবোধ, নিরীহ। প্রথম যখন সে তার বিচিত্র দাবি নিয়ে হাজির হলো, মনে হতো লোকটা উন্মাদ। কিন্তু এখন প্রায়ই মনে হয়, সে আসলে ধুরন্ধর।

কিন্তু পথিক নিশ্চিত হতে পারে না।

ছোটবেলা থেকেই লোকটার নাড়িনক্ষত্র এ শহরের সবার জানা। তবু মাঝেমাঝে তাকে খুব অচেনা মনে হয়। মানুষটার চোখ, চাহনি, চেহারা, কথা, আচরণ—সব কিছুর মধ্যে কী যেন আছে। যেন অন্য কোনো জগতের সাথে জুড়ে আছে সে।

কখনো কখনো তাকে খুব বেপরোয়া, খুব সাহসী মনে হয়। পুরো পৃথিবী যেন তার চোখে তুচ্ছ। আবার কখনো তার দিকে তাকালে মনে হয়, পুরো দুনিয়ার ওজন চেপে বসেছে তার দুই কাঁধে। চোখে কখনো বিষাদ, কখনো আনন্দ, কখনো ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা, কখন শান্ত সমুদ্রের গভীরতা।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় লোকটার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় পথিক। ছায়ার মতো নিঃশব্দে পৌঁছে যায় একেবারে কাছে। শুনতে পায় ভেতর থেকে ভেসে আসা মৃদু শব্দ।

কবিতা?

পথিক নিজেকে প্রশ্ন করে।

গভীর রাতে ঘরে বসে কবিতা পড়ছে সে? মুহূর্তের জন্য এক চিলতে বাঁকা হাসি ফুটে উঠে তার মুখে। আরও মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করে। তারপর ভেতর থেকে ভেসে আসা শব্দগুলো শুনতে শুনতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

জীবনে অনেক কবিতা শুনেছে পথিক। কবিতার সমঝদারির জন্য বিখ্যাত এই নগরী। দূরদূরান্ত থেকে কবিরা এখানে আসে। তাই কবিতা নিয়ে তার জ্ঞান একেবারে কম না। কিন্তু বাড়ির ভেতর থেকে আসা শব্দগুলোর মতো কোনো কিছু এর আগে সে শোনেনি।

পথিক নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে মূর্তির মতো। যখন সম্বিৎ ফেরে, ততক্ষণে কেটে গেছে বেশ অনেকটা সময়। নিজের অজান্তেই কখন যে চোখের কোণ ভিজে উঠেছে, টেরই পায়নি সে।

এতদিন ধরে মনের ভেতর উঁকিঝুঁকি দেওয়া চিন্তা আর শত চেষ্টায় আড়াল করে রাখা শঙ্কা এড়িয়ে যাবার উপায় থাকে না তার আর। তীব্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজেকে সত্যটা স্বীকার করার অনুমতি দেয় সে...

মানুষটা সত্য বলছে। এগুলো কোনো কবির কথা না। এগুলো কোনো মানুষেরও কথা না। হতে পারে না।

হতবিহ্বল হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

অন্ধকারে নিজেকে আড়াল করে রাখা এই লোককে দেখে এখন কে বলবে, সে এই নগরীর অবিসংবাদিত নেতা? পুরো গোত্রের মধ্যে যে তার ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত? কে বুঝবে তার নাম আমর ইবনু হিশাম, কুরাইশ যাকে সম্মান করে ডাকে আবুল হাকাম, প্রজ্ঞার পিতা?

ইতিহাস অবশ্য এই পথিককে চিনবে অন্য এক নামে—আবু জাহল; অজ্ঞানতার পিতা। আর যে মানুষটা তাকে এই নামে পরিচিত করাবেন, সে রাতে তাঁর বাড়ির কাছেই গিয়েছিল আবু জাহল।

***

আবু জাহল কীভাবে হাটছিল, তার মনের ভেতরে কী চলছিল; ঐতিহাসিক সূত্র থেকে তা জানা যায় না। ওপরে যা লিখলাম, তার অনেকটাই আমার কল্পনা। তবে রাতের অন্ধকারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আবু জাহলের আড়ি পেতে কুরআন শোনার ঘটনা সত্য। ঐতিহাসিক সূত্রে এ ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়।

সীরাত ইবনু হিশাম থেকে জানা যায়, মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা তাঁর ঘরে সালাত আদায় করতেন। এক রাতে কুরাইশের কিছু নেতা তাঁর বাসার কাছে এসে গোপনে কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল। এই তিন নেতা ছিল আবু সুফিয়ান, আখনাস আস-সাকাফী এবং আবু জাহল।

তিনজন এসেছিল আলাদা আলাদাভাবে, কেউ কারও ব্যাপারে জানতো না। কিন্তু ভোরবেলা ফেরার সময় দেখা হয়ে গেল তাদের। বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ল কুরাইশ নেতারা। নিজেদের মধ্যে খানিকটা চোটপাটও হয়ে গেল। একে অন্যকে শাঁসালো, এমন যেন আর না হয়।

কিন্তু একই ঘটনা ঘটল পর দিন, আর তার পরের দিন আবারও।

প্রতিবারই ভোরবেলা বাড়ি ফেরার সময় তিনজনের দেখা হয়। প্রতিবারই তিনজন লজ্জা পায়, তারপর লজ্জা ঢাকতে হাকডাক করে একে অন্যের সাথে। শেষমেষ

তৃতীয় দিন তারা কসম করল, আর কখনো এমন করা যাবে না।

পর দিন সকালে আলাদাভাবে আবু সুফিয়ান আর আবু জাহলের কাছে গেল আখনাস। প্রশ্ন করল,

> ‘মুহাম্মাদের কাছে যা শুনলে, তা নিয়ে তোমার কী মত?’

আবু জাহলের উত্তর থেকে কুরআন এবং রিসালাত নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে ধারণা পাওয়া যায়। সে বলল,

> ‘আমরা (বানু মাখযুম গোত্র) আর বানু আব্‌দ মানাফ (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোত্র) দীর্ঘদিন ধরে মর্যাদা আর শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতা করছি। তারা মানুষকে খাইয়েছে, আমরাও খাইয়েছি। তারা বোঝা টেনেছে, আমরাও টেনেছি। তারা দান করেছে, আমরাও দিয়েছি। তারা যা করেছে সেটাতে পাল্লা দিয়েছি আমরা। আমরা ছুটছিলাম সমান তালে, যেন পাশাপাশি ছুটতে থাকে দুটো ঘোড়া।
>
> হঠাৎ তারা বলে বসল, ‘আমাদের মধ্যে এমন এক নবী এসেছেন, যার কাছে আসমান থেকে ওহি আসে।’
>
> এখন আমরা কীভাবে তাদের সমান হব?
>
> আল্লাহর কসম! আমরা কখনোই তাঁর ওপর ঈমান আনব না; কখনোই তাঁকে সত্য বলে মেনে নেবো না।’[১]

লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ, তাঁর কাছে মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসমানি বার্তা বা ওহি আসছে, এ কথার সত্যমিথ্যা নিয়ে আবু জাহল কিছু বলেনি। তার চিন্তা ছিল দুই গোত্রের মধ্যকার ক্ষমতা আর প্রভাবের রাজনীতি নিয়ে।

আরেকটা ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় সাহাবী মুগীরাহ ইবনু শুবা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছ থেকে। ঘটনাটা তাঁর ইসলাম গ্রহণের আগের, আর এটা উল্লেখ করেছেন ইমাম আল-বায়হাকি। মুগীরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বক্তব্য অনেকটা এরকম:

> রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে প্রথম যখন আমার পরিচয় হয়, সেই দিন আবু জাহল আর আমি মক্কার এক ছোট গলি দিয়ে হাঁটছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমাদের দেখা হলো।

---

[১] ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ (১ম খণ্ড), ইবনু কাসীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ (১ম খণ্ড)

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু জাহলকে বললেন: 'হে আবুল হাকাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে এসো। আমি তোমাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি।'

আবু জাহল বলল: 'হে মুহাম্মাদ! তুমি কি আমাদের ইলাহদের নিন্দা করা বন্ধ করবে না? তুমি কি শুধু এটুকুই চাও যে আমরা সাক্ষ্য দিই, তুমি তোমার বার্তা পৌঁছে দিয়েছ? বেশ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমার যা জানানোর ছিল তুমি জানিয়েছ। তুমি পৌঁছে দিয়েছ। আল্লাহর কসম! আমি যদি জানতাম তোমার কথা সত্য, তাহলে তো আমি তোমাকে অনুসরণই করতাম।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলেন। আবু জাহল তখন আমার দিকে ফিরল এবং বলল: "আল্লাহর কসম! আমি জানি, মুহাম্মাদ যা বলে তা সত্য। কিন্তু একটা জিনিস আমাকে আটকে রেখেছে।

বানু কুসাই (নবী ﷺ–এর গোত্র) দাবি করল, 'কা'বার চাবি ও রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের।' আমরা বললাম: হ্যাঁ।

তারা বলল: 'যমযম এবং হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব আমাদের।' আমরা বললাম: হ্যাঁ।

তারা বলল: 'পরামর্শ সভার দায়িত্ব আমাদের।' আমরা বললাম: হ্যাঁ।

তারপর তারা বলল: 'যুদ্ধের পতাকা আমাদের।' আমরা বললাম: হ্যাঁ।

সব কিছু আমরা তাদের জন্য ছেড়ে দিলাম। তারপর আমরা ধীরে ধীরে এগোলাম, তাদের সাথে পাল্লা দিতে শুরু করলাম। (প্রতিযোগিতায় চলতে চলতে) যখন আমাদের দুই পক্ষের হাঁটুতে হাঁটু ঘঁষাঘঁষি লাগল এবং আমরা দুটো রেসের ঘোড়ার মতো (সমানে-সমান) হয়ে গেলাম, তখন তারা বলা শুরু করেছে, 'আমাদের মধ্যে নবী আছে!'

এর সাথে তো পাল্লা দেওয়া সম্ভব না।

আল্লাহর কসম! এই জিনিস তো আমরা কখনোই অর্জন করতে পারব না। তাই আমরা কখনোই এটা (নুবুওয়াত) মেনে নেবো না।"[২]

কথাগুলো লক্ষ্য করুন।

[২] ইমাম বায়হাকি, দালায়িলুন নুবুওয়্যাহ। অধ্যায়: আবু জাহল এবং অন্যদের দ্বারা নবী (সা.)-কে কষ্ট দেওয়া।

আবু জাহল জানতো মুহাম্মাদ ﷺ সত্য বলছেন। কিন্তু গোত্রীয় মর্যাদাবোধ, আর ক্ষমতার হিসেবনিকেশের কারণে এ সত্যকে সে অস্বীকার করল। কারণ মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী হিসেবে মেনে নিলে তার গোত্র প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে। হারাবে আধিপত্য।

সত্য জেনেও নবী-রাসূলদের প্রত্যাখ্যানের এই প্রবণতা অনেক পুরোনো। বিশেষ করে কুরআনে যাদেরকে 'আল-মালা' বলা হয়েছে—অর্থাৎ যারা সমাজের নেতা বা এলিট—তাদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি থাকে।[৩]

যুগে যুগে সামাজিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ব্যবসায়িক এবং ধর্মীয় এলিটরাই নবী-রাসূলদের (আলাইহিমুস সালাম) বিরোধিতা করে গেছে। আল-মালা বা এলিটদের এই ভূমিকার কথা বারবার এসেছে কুরআনের সূরা আ'রাফে।

এলিটরা বুঝত নবীদের দাওয়াহ তাদের গড়ে তোলা আধিপত্যের কলুষিত কাঠামোর জন্য হুমকি। তাই নবী-রাসূলদের বিরোধিতায় তারা থাকত সবার আগে।

হারানো সুযোগ

সেই রাতগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনে আবু জাহলের চোখের কোণায় আসলেই পানি জমেছিল কি না, তা আমরা জানি না। তবে ব্যাপারটা আবু জাহলকে নাড়া দিয়েছিল, এটুকু মনে হয় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। তা না হলে বারবার ধরা পড়ার পরও কেন তিনদিন লুকিয়ে আসা?

আসলে ঐ মুহূর্তে চোখ ভিজে ওঠা অস্বাভাবিক কিছু না। পুরো প্রেক্ষাপট একবার চিন্তা করে দেখুন। একজন মানুষ নুবুওয়াত দাবি করছেন। বলছেন, সাত আসমানের ওপর থেকে জিবরীল আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহর বাণী নিয়ে আসছেন তাঁর কাছে। দাবি করছেন, তিনি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। আর গভীর

---

[৩] **আল-মালা (ٱلْمَلَأ)**: শাব্দিক অর্থ 'পূর্ণ করা' বা ভরাট করা। পারিভাষিক অর্থ, কোনো সমাজের প্রভাবশালী শাসকচক্র, নীতিনির্ধারক বা 'এলিট এস্টাবলিশমেন্ট'; যারা ক্ষমতা, সম্পদ ও আভিজাত্যের জোরে জনমত নিয়ন্ত্রণ করে। ইমাম আত-তাবারী তাঁর *'জামিউল বায়ান'* তাফসীরে বলেছেন, আল-মালা হলো কওমের 'আশরাফ' (সম্ভ্রান্ত) ও 'রুয়াসা' (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ), যাদের পরামর্শ ছাড়া সমাজে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। ইমাম আল-কুরতুবির মতে, এরা এমন প্রভাবশালী গোষ্ঠী, যারা মজলিস 'পূর্ণ' করে রাখে এবং সংকটে তাদের দিকেই সবাই তাকিয়ে থাকে। কুরআনে এদের নবীদের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কারণ নবীদের দাওয়াত তাদের কায়েমি স্বার্থ ও সামাজিক আধিপত্যের জন্য সরাসরি হুমকি। আল-মালা সম্পর্কে সূরা আ'রাফ-এর প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহ: ৭:৬০, ৭:৬৬, ৭:৭৫, ৭:৮৮, ৭:১০৯, ৭:১২৭

রাতে তাঁর মুখে উচ্চারিত কুরআন শুনতে শুনতে আবু জাহল উপলব্ধি করছে, এই ব্যক্তি (ﷺ) সত্য বলছেন। তাঁর মুখে উচ্চারিত কুরআন কোনো মানুষের বানানো না। কোনো সৃষ্টির তৈরি না। এই কুরআন এসেছে আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র অধিপতির কাছ থেকে।

আবু জাহল বুদ্ধিমান মানুষ ছিল। এই ঘটনার তাৎপর্য্য না বোঝার কোনো কারণ তার নেই। এই উপলব্ধির ভার, আর ঐ মুহূর্তে একজন মানুষের অনুভূতির তীব্রতাটুকু একবার চোখ বন্ধ করে কল্পনা করার চেষ্টা করুন। এমন অবস্থায় চোখে পানি না আসাটাই আসলে অস্বাভাবিক।

তবে এই উপলব্ধি শেষ পর্যন্ত আবু জাহলের কাজে লাগেনি। সত্য জেনেও আবু জাহল তা অস্বীকার করেছিল। ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

আবু জাহলের সামনে সুযোগ ছিল মহান হবার। সুযোগ ছিল স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা অতিক্রম করে মহাকাব্যিক ইতিহাসের নির্মাতা হিসেবে নিজের নাম লেখাবার।

নবীজি ﷺ কুরাইশের দুই ব্যক্তির হিদায়াতের জন্য বিশেষভাবে দুআ করেছিলেন। একজন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু), আরেকজন আমর ইবনু হিশাম ওরফে আবু জাহল।[৪]

প্রথমজন ইসলাম গ্রহণের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহাবিদের একজনে পরিণত হন। অর্জন করেন মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় খলীফা হবার মর্যাদা। তাঁর শাসনামলে ইসলামী খিলাফতের অধীনে চলে আসে অর্ধেক পৃথিবী। তাঁর হাতেই আসে বাইতিল মাকদিস, তথা পবিত্র জেরুসালেম শহরের চাবি। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

অন্যদিকে আবু জাহল পরিচিত হয় ইসলামের সবচেয়ে কঠোর বিরোধী হিসেবে। নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে শত্রুতায় সবচেয়ে তীব্র ভূমিকা নেয় সে। সব শেষে তার ছিন্নবিচ্ছিন্ন লাশ পড়ে থাকে বদর প্রান্তরের কালিব নামের কুয়াতে।[৫]

আজ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সমাদৃত। শুধু মুসলিমদের কাছে না, পুরো বিশ্বের কাছে। মার্কিন গবেষক মাইকেল সি হার্ট ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী ১০০ মানুষের তালিকায় প্রথমে রেখেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে। এ কথা অনেকেরই জানা। কিন্তু যে তথ্যটা অনেকে জানেন না, তা হলো এ তালিকায়

---

[৪] আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন: *"হে আল্লাহ! আমর ইবনু হিশাম অথবা উমার ইবনুল খাত্তাব, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যে তোমার কাছে বেশি প্রিয়, তাকে দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করো।"* জামি আত-তিরমিজি, হাদীস: ৩৬৮১।

[৫] সহীহ বুখারি: ৩৯৮০, ৩৯৮১। আবু জাহলের লাশসহ অন্যান্য মুশরিক নেতাদের লাশ বদরের একটি পুরোনো ও পরিত্যক্ত কূপে ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

মুসলিম উম্মাহর কেবল আরেকজনের নাম আছে, আর তিনি হলেন; আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নাম।

অন্যদিকে আবু জাহল আজ পরিচিত এই উম্মাহর ফিরআউন হিসেবে; যার গল্প বদরের দিনই শেষ। একজন বদরের কুয়ার নিচে হারিয়ে গেল। আরেকজন জেরুসালেমের দরজায় দাঁড়িয়ে ইতিহাস বদলে দিলেন।

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আবু জাহলের সামসময়িক আবু বাকর, উমার, উসমান, আলী, সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মতো মানুষরা অল্প কিছু বছরের ব্যবধানে বিস্তীর্ণ ভূমির শাসক হয়েছিলেন। বিশ্বজুড়ে এমন সম্মান, মর্যাদা, ক্ষমতা আর নেতৃত্ব পেয়েছিলেন, যা জাহিলিয়্যাহর যুগে কুরাইশের পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব ছিল।

আবু জাহল যোগ্য লোক ছিল। ইসলাম গ্রহণ করে দুনিয়াতে এই সম্মান ও মর্যাদার ভাগীদার হতে পারত সে। আখিরাতে পেতে পারত জান্নাত। কিন্তু তাওহীদকে অস্বীকার করে দুনিয়া আর আখিরাত সবই সে হারাল। আজ তার একমাত্র স্মারক তার একসময়কার বাড়ির জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল এক টয়লেট।

আবু জাহলের ভুল

আবু জাহলের ভুল কোথায় ছিল?

তার যুক্তিগুলো দেখা যাক।

আবু জাহলের কাছে তার গোত্র বানু মাখযুমের স্বার্থ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পুরো বিষয়টাকে সে দেখছিল গোত্রীয় প্রতিযোগিতার জায়গা থেকে।

বহু বছর ধরে, মক্কাতে সবচেয়ে প্রভাবশালী অবস্থানে ছিল মুহাম্মাদ ﷺ-এর গোত্র। কিন্তু ধীরে ধীরে বানু মাখযুম তাদের সাথে পাল্লা দিতে শুরু করে। মক্কা, কা'বা এবং হিজাযের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হয় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে।

আবু জাহলের দৃষ্টিতে, এ অবস্থায় মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবী হিসেবে মেনে নেওয়ার অর্থ ছিল তাঁর গোত্রের আধিপত্য মেনে নেওয়া। হার মেনে নেওয়া। আবু জাহল হার মানতে রাজি ছিল না।

নবীজি ﷺ যা বলছেন, তা সত্য নাকি মিথ্যা, তার ভিত্তিতে আবু জাহল সিদ্ধান্ত নেয়নি। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সময়কার ক্ষমতার সমীকরণ আর রাজনীতির

জায়গা থেকে। তখনকার বাস্তবতার আলোকে আবু জাহলের এই অবস্থান যৌক্তিক, বাস্তবসম্মত। একজন বৈষয়িক, ঝানু রাজনীতিবিদ বা গোত্রপ্রধান যেভাবে চিন্তা করার কথা, আবু জাহল সেভাবেই ভেবেছিল।

আবু জাহল একা না। আরও অনেকে এভাবে চিন্তা করেছিল। কুরাইশের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলিমদের দ্বন্দ্বের ব্যাপারে আরবের অধিকাংশ গোত্রের পলিসি ছিল: *ওয়েট অ্যান্ড সি; অপেক্ষা করো, দেখা যাক কে জেতে।* কুরাইশ যদি মুহাম্মাদ ﷺ-কে পরাজিত করে, তাহলে তো হলোই। আর যদি তিনি (ﷺ) বিজয়ী হন, তাহলে তখন তাঁর সাথে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। এমনটাই ছিল বেশির ভাগ গোত্রের অবস্থান।

হজের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন গোত্রের কাছে দাওয়াহ নিয়ে যেতেন। বানু শাইবান নামের গোত্রের কাছে যখন গেলেন, তখন তারা বলল, 'আপনি তো এমন কথা বলছেন যা রাজাবাদশাদের অপছন্দ। আরবরা আপনাকে আক্রমণ করলে আমরা সমর্থন দেবো, কিন্তু আযমীরা (পারসীয় কিংবা রোমানরা) আক্রমণ করলে আমরা সাহায্য করতে পারব না।'[৬]

আরেক গোত্র বলল, 'এই যুবক সাথে থাকলে পুরো আরবের ওপর আমরা রাজত্ব করতে পারব।' কিন্তু তারা যখন জানতে চাইল, বিজয়ের পর ক্ষমতা তাদের হাতে থাকবে কি না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, 'কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।' এ কথা শুনে তারা পিছিয়ে গেল।[৭]

ভণ্ড নবী মুসাইলামা আল কাযযাবের যখন আবির্ভাব হলো, তখন তার গোত্র বানু হানিফা তাকে অনুসরণ করল। তাদের অনেকেই জানত মুসাইলামা ভণ্ড। তবু তারা তাকে মেনে নিল।

কেন?

বানু হানিফার এক বৃদ্ধ মুসাইলামার কাছে গিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। সে বলেছিল:

> 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি একজন মিথ্যাবাদী এবং মুহাম্মাদ সত্যবাদী। কিন্তু মুদার গোত্রের সত্যবাদীর চেয়ে আমাদের রাবিয়া (বানু হানিফা) গোত্রের মিথ্যাবাদী আমাদের কাছে বেশি প্রিয়।'[৮]

---

[৬] আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ (ইবনু হিশাম), ১ম খণ্ড। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইবনু কাসীর), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭২-১৭৪।

[৭] পূর্বোক্ত

[৮] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনু কাসীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড

আবু জাহলের মতোই এরা সবাই চিন্তা করছিল সেই সময়কার সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর আলোকে। আপাতদৃষ্টিতে তাদের অবস্থান ছিল যথেষ্ট যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত। কিন্তু দুই থেকে তিন দশকের মধ্যে, তারা সবাই ভুল প্রমাণিত হলো। শুধু তাই না, ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কারণে তাদের উল্লেখযোগ্য অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর যারা পরে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করল, শুরুর দিকের মুসলিমরা যে সম্মান ও মর্যাদা পেয়েছিল, তা থেকে তারা বঞ্চিত হলো।

কীভাবে হলো এত বড় মিসক্যালকুলেশন?

আবু জাহল চিন্তা করেছিল বিদ্যমান কাঠামোর ভেতরে। সেই কাঠামোর নিয়ম অনুযায়ী তার চিন্তা সঠিক ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দাওয়াহ এনেছিলেন, তা সব কিছু ভেঙ্গেচুড়ে গুড়িয়ে দিল।

সমাজ ও রাজনীতির যেসব হিসেবনিকেশ আগে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো, অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সেগুলো হয়ে গেল গৌণ কিংবা অপ্রাসঙ্গিক। মক্কাতে কুরাইশ গোত্রগুলোর ছোটখাটো প্রতিযোগিতার সীমানা ছাড়িয়ে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বজুড়ে। মুসলিমদের হাতে পরাজিত হলো সেই সময়কার দুই পরাশক্তি—রোম ও পারস্য। গড়ে উঠল হাজার বছরের এক অবিস্মরণীয় সভ্যতা।

আবু জাহল ছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের এক সাক্ষী। কিন্তু সেই সময়কে চিনতে সে ব্যর্থ হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মহান আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন জাহিলি বিশ্বব্যবস্থা উৎখাতের জন্য। কিন্তু আবু জাহল সেই ব্যবস্থার মধ্যেই চিন্তা করছিল। খেলার নিয়ম বদলে যাচ্ছিল, কিন্তু আবু জাহলরা সেটা বুঝতে পারেনি। তারা খেলছিল পুরোনো নিয়মে।

আজ আমরাও ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করছি। আগের কিংবা পরের কোনো ঘটনাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নুবুওয়াতের সাথে তুলনা করার মতো না। তবে ইতিহাসের যে বাঁকে দাঁড়িয়ে আবু জাহলরা তাদের ‘বাস্তবসম্মত’ রাজনীতির হিসেব কষেছিল, আজ আমরাও দাঁড়িয়ে আছি অনেকটা একই রকমের এক বাঁকে। আর ভয়ের ব্যাপার হলো, আমরাও ঠিক একই ধরনের ভুল করার ঝুঁকিতে আছি।

যুগসন্ধি

ইতিহাসে দুর্লভ কিছু সময় থাকে, যখন এক সাম্রাজ্যের পতন হয় আর নতুন সাম্রাজ্যের উত্থানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। যখন এক সভ্যতার অবসান ঘটে আর দেখা দেয় নতুন কোনো সভ্যতার সম্ভাবনা। পালাবদলের এই সময়কে বোঝানোর জন্য ইংরেজিতে সুন্দর একটা শব্দ আছে, Interregnum।[৯] বাংলায় একে বলা যায় যুগসন্ধি।

রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞানে যুগসন্ধি বলতে সংকট এবং গভীর রূপান্তরের সময়কে বোঝায়। যখন পুরোনো ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, আগেকার নিয়ম অকেজো হয়ে যায়। যেসব ধ্যানধারণা এক সময় বিনা প্রশ্নে সবাই মেনে নিত, উবে যায় সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা।

যুগসন্ধি তৈরি করে বিপজ্জনক শূন্যতা। কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার কারণে পুরোনো পদ্ধতিতে আর সমস্যাগুলোর সমাধান করা যায় না। কিন্তু নতুন নিয়মগুলো তখনও লেখা হয় না, লেখা হলেও স্পষ্ট থাকে না। যুগসন্ধি সেই সময় যখন পুরোনো মারা যায়, আর নতুন জন্ম নেওয়ার জন্যে সংগ্রাম করে।

আবু জাহল যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াহ অস্বীকার করছিল, তখন যুগসন্ধির সময় চলছিল। এমন সময়ে চিন্তার কাঠামো বদলাতে হয়। কিন্তু আবু জাহল গোত্রীয় রাজনীতির হিসেবের বাইরে চিন্তা করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

যুগসন্ধি সবসময় কিছু বিষয় সাথে করে নিয়ে আসে—

অনিশ্চয়তা: পালাবদলের এই সময়ে থাকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সভ্যতাগত নানা ধরনের অনিশ্চয়তা।

অস্থিতিশীলতা: গভীর রূপান্তরের কারণে পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়। কোনো সাম্রাজ্য বা সভ্যতার পতনের পর একই মাপের অন্য কোনো শক্তির উত্থানের আগ পর্যন্ত বিরাজ করে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও সহিংসতা।

সুযোগ: অনিশ্চয়তা আর অস্থিতিশীলতার পাশাপাশি যুগসন্ধি আসে সুযোগ নিয়ে। নতুন চিন্তা, দর্শন, সাম্রাজ্য এমনকি সভ্যতা গড়ে তোলার

---

[৯] **ইন্টাররেগনাম (Interregnum):** দুই রাজত্বের মধ্যবর্তী কাল (between reigns)। এমন এক আইনি বা রাজনৈতিক শূন্যতা, যখন রাষ্ট্রের স্বাভাবিক শাসনকর্তৃত্ব স্থগিত থাকে।

> সুযোগ। এটাই পুরোনোকে ভেঙ্গে নতুন কিছু গড়ার সেরা সময়।
>
> **দায়িত্ব:** সাথে সাথে আসে যুগসন্ধির দায়। এই সময়ে যারা বেঁচে থাকে, বিশেষ করে এ সময়কে যারা চিনতে পারে, তাদের ঘাড়ে চেপে বসে সংকটকে অতিক্রম করে সম্ভাবনাকে বাস্তবায়নের গুরুদায়িত্ব।

কিন্তু পুরোনো কাঠামোর ভেতরে বসে, পুরোনো ছাঁচে চিন্তা করে যুগসন্ধির সংকটকে অতিক্রম করা যায় না। কাজে লাগানো যায় না নতুন সম্ভাবনাকেও। এর জন্য দরকার হয় চিন্তার আমূল পরিবর্তন। প্যারাডাইম শিফট।

প্যারাডাইম শিফট

প্যারাডাইম শিফট বলতে বোঝায় কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা বা কাজের চিরাচরিত পদ্ধতিতে বড়সড় ওলটপালট। কেতাবি চালে বলা যায়, প্যারাডাইম শিফট হলো জ্ঞানের কোনো শাখার একেবারে গোড়ার দিকের ধারণা আর কর্মপ্রক্রিয়ার মৌলিক পরিবর্তন। বাংলায় প্যারাডাইম শিফটের অনুবাদ করা হয় পাটাতন বদল। অর্থাৎ চিন্তা অথবা কাজের যে সমতলে মানুষ আগে দাঁড়িয়ে ছিল, তা পালটে ফেলা।

প্যারাডাইম শিফটের এই ধারণা জনপ্রিয় করে তোলেন অ্যামেরিকান পদার্থবিদ ও দার্শনিক থমাস কুন। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত তার বিখ্যাত বই 'দ্য স্ট্রাকচার অফ সায়েন্টিফিক রেভোলিউশনস'-এ তিনি এই ধারণার কথা বলেন।[১০]

এ ধারণাকে খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বেস্টসেলার মার্কিন লেখক স্টিফেন কোভি। প্যারাডাইম শিফটের ব্যাপারে তার ব্যাখ্যা অনেকটা এরকম:

> ধরুন, আপনি ঢাকা শহরের কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় যেতে চান। এর আগে কখনো সেখানে যাননি, জায়গাটার নামও হয়তো শোনেননি। ঠিকানা খুঁজে বের করা বেশ কঠিন হবে। তাই না?

---

[১০] কুনের এই বই বিজ্ঞানের দর্শনের খোলনলচে বদলে দিয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, বিজ্ঞান সরলরেখায় এগোয় না। বরং এটা চলে গতানুগতিক বিজ্ঞান (Normal Science) আর বৈজ্ঞানিক বিপ্লব (Scientific Revolutions)-এর চক্রে। একটা প্যারাডাইম বা কাঠামো ততদিনই টিকে থাকে, যতদিন তা সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর যোগাতে পারে। কিন্তু যখন এমন সব অসংগতি বা 'অ্যানোমলি' সামনে আসে, যার ব্যাখ্যা বিদ্যমান কাঠামো দিতে পারে না, তখনই ঘটায় সংকট। অসংগতি বাড়তে বাড়তে একসময় পুরো ক্ষেত্রে স্থবিরতা বা সংকট তৈরি হয়। সেই সংকট থেকেই পুরোনো ভিত্তি ভেঙে জন্ম নেয় নতুন প্যারাডাইম। এই আমূল পরিবর্তনই 'প্যারাডাইম শিফট'। দেখুন, Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: University of Chicago Press, 1962).

তবে আপনার হাতে যদি শহরের একটা ম্যাপ থাকে, তাহলে সেটা দেখে আপনি মোটামুটি সহজেই গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন।

কিন্তু আপনার হাতে থাকা মানচিত্র যদি ভুল হয়?

ধরুন, ছাপার ভুলের কারণে গায়ে ঢাকা লেখা থাকলেও, সেটা আসলে চট্টগ্রামের মানচিত্র। চিন্তা করুন, ঐ মানচিত্র দেখে ঢাকার ঠিকানা খুঁজে বের করার কাজটা কেমন হবে?

যতক্ষণ ঐ ভুল মানচিত্র অনুসরণ করবেন, ততক্ষণ যতই বুদ্ধি খাটান, যতই বাস্তবসম্মত চিন্তা করুন, গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন না।[১১]

চারপাশের দুনিয়াকে বোঝার জন্য আমাদের মাথার ভেতরে চিন্তার একটা নির্দিষ্ট ধরনের কাঠামো বা মেন্টাল মডেল থাকে। একে চিন্তার মানচিত্র হিসেবে ভাবা যায়। আমাদের প্রত্যেকের মাথার ভেতরেই এমন মানচিত্র আছে। এ মানচিত্র দিয়েই সব অভিজ্ঞতাকে আমরা ব্যাখ্যা করি। মানচিত্রের শুদ্ধতা নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলি না। আসলে আমরা টেরই পাই না যে, আমাদের মাথায় এমন কিছু আছে। আমরা স্রেফ ধরে নিই, আমরা যেভাবে সব কিছু দেখি, সেটাই সঠিক, সেটাই চূড়ান্ত এবং এমনটাই হওয়ার কথা।

প্যারাডাইম শিফট হলো চিন্তার এই মানচিত্র আমূল বদলে যাওয়া।

আর যখনই এ মানচিত্র বদলে যায়, তখন পালটে যায় মানুষের চিন্তা ও আচরণও। সহজভাবে বললে, প্যারাডাইম শিফট মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে গোড়া থেকে বদলে দেয়।

পাটাতন বদল

প্যারাডাইম শিফটের কিছু উদাহরণ দেখা যাক:

- গ্রিক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি মনে করতেন, পৃথিবী স্থির এবং সৌরজগতের কেন্দ্র। শত শত বছর ধরে এ কথাকে সত্য ধরে নিয়ে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগও করেছিল মানুষ। কিন্তু কোপার্নিকাস এসে পুরো ভিত্তিটা উলটে দিলেন। বললেন—পৃথিবী না, সূর্যই হলো কেন্দ্র। ফলে হঠাৎ করেই সব কিছুকে একেবারে অন্যভাবে দেখা শুরু হলো। কেবল পৃথিবী না, পালটে গেল মহাবিশ্বকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও।

---

[১১] Covey, Stephen R. *The seven habits of highly effective people.* Provo, UT: Covey Leadership Center, 1991.

- বিজ্ঞানী নিউটনের প্রস্তাব করা পদার্থবিজ্ঞানের মডেলটা ছিল ঘড়ির কাঁটার মতো নিখুঁত। এ মডেল আমরা আজও ব্যবহার করি। নিউটনিয়ান পদার্থবিজ্ঞানই আধুনিক প্রকৌশলবিদ্যার ভিত্তি। কিন্তু এই মডেল ছিল আংশিক, অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণতা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আইনস্টাইন নিয়ে আসলেন আপেক্ষিকতার তত্ত্ব (relativity paradigm), যা শুধু পদার্থবিজ্ঞান না, পুরো বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব ঘটিয়ে দিল।

এগুলো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্যারাডাইম শিফটের উদাহরণ।

তবে প্যারাডাইম শিফট শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘটে না। এ-ধরনের পরিবর্তন আসে আরও অনেক ক্ষেত্রে। যখনই প্রতিষ্ঠিত কোনো চিন্তাভাবনা বা কাজের পদ্ধতিতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আসে, তখন সেটাকে প্যারাডাইম শিফট বলা হয়। যেমন:

- একসময় গান শোনা বা সিনেমা দেখার জন্য মানুষ ক্যাসেট বা সিডি-ডিভিডি কিনত। এখন মানুষ ব্যবহার করে স্পটিফাই, ইউটিউব বা অ্যাপল মিউজিকের মতো ডিজিটাল স্ট্রিমিং সার্ভিস। এটা শুধু গান শোনা বা সিনেমা দেখার পদ্ধতি বদলায়নি, পুরো বিনোদন জগত আর তার ব্যবসার মডেলকে ওলটপালট করে দিয়েছে। এটা এক ধরনের প্যারাডাইম শিফট।

- শত শত বছর ধরে ইউরোপের দেশগুলোতে শাসন চলত রাজতন্ত্রের মাধ্যমে। রাজার ছেলেই রাজা হতো। কিন্তু ইউরোপ থেকে অ্যামেরিকাতে পাড়ি জমানো কিছু মানুষের উত্তরসূরিরা একেবারে ভিন্ন ধরনের এক শাসন ব্যবস্থার কথা ভাবল; রিপাবলিক বা সাধারণতন্ত্র। এটা ছিল শাসনকাঠামোর ক্ষেত্রে একটা বিশাল প্যারাডাইম শিফট।

প্যারাডাইম শিফটের এই ধারণাটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যুগসন্ধির এই সময়ে আমাদের সামনে দুটো পথ খোলা:

এক: আবু জাহলের পথ। যে পথ পুরোনো মানচিত্র আঁকড়ে ধরে থাকার। যে পথে হাঁটলে চোখের সামনে সত্য দেখার পরও মানুষ পুরোনো অহমিকা আর ক্ষমতার সমীকরণ দিয়ে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে যায়। ফলে নতুন বাস্তবতার সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে হারিয়ে যায়।

দুই: উমার ইবনুল খাত্তাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পথ। সাহসের সাথে পুরোনো চিন্তার পাটাতন বা প্যারাডাইম ভেঙ্গে ফেলার পথ। যে পথ হলো নতুন সত্য আর বাস্তবতাকে আলিঙ্গন করে নতুন পৃথিবীর নির্মাতা হবার।

যারা উমারের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মতো সত্যকে গ্রহণ করতে চান, যারা আবু জাহলের মতো অপ্রাসঙ্গিকতার পরিণতি এড়াতে চান, যারা আসন্ন পরিবর্তনকে বুঝতে চান, এই বই তাদের জন্য।

তবে এই পথে হাঁটার আগে আমাদের জানতে হবে, এই পথের পাশে ছড়িয়ে থাকা খাদের কিনারাগুলো কোথায়। বুঝতে হবে কেন আবু জাহলের মতো পুরোদস্তুর বাস্তববাদী এবং বৈষয়িক মানুষেরাও সময়ের দাবিকে বুঝতে না পেরে ধ্বংস হয়ে যায়। কেন দরজায় কড়া নাড়তে থাকা ঝড়ের অস্তিত্বই বেশির ভাগ মানুষ টের পায় না। কেন অধিকাংশ মানুষ বুঝতেই পারে না, তারা যুগসন্ধির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে মানুষের এই অন্ধত্বের এক ধ্রুপদী উদাহরণ পাওয়া যায় রোমান সাম্রাজ্যের পতনের অধ্যায়ে।

অলক্ষ্যে পতন

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে, রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল ৪৭৬ সালে। ৪৭৫ সালেও কিন্তু রোমের অধিবাসীরা মনে করেনি যে, ঠিক পরের বছর 'মহান রোমান সাম্রাজ্যের' পতন ঘটবে। এমনকি ৪৭৬ কিংবা '৭৭ সালেও তারা মনে করেনি সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে। তারা নিশ্চিন্ত মনে, এবং গর্বের সাথে ধরে নিয়েছে রোমান সাম্রাজ্য টিকে থাকবে আরও অনেক শত বছর।

সাম্রাজ্য, সভ্যতা কিংবা বিশ্বব্যবস্থার পতন রাতারাতি হয় না। কেটে ফেলার পর একটা বড় গাছ পড়তেও কিছুটা সময় লাগে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে লেগে গিয়েছিল প্রায় দুই শতাব্দী। পতনের প্রক্রিয়া চলার সময়টাতে যারা বসবাস করেন, তারা শুরুতে বিষয়টা বুঝতে পারেন না।

কেন? এর দুটো কারণ আছে।

নৈকট্য

প্রথম কারণ হলো, আমরা সব কিছু খুব কাছ থেকে দেখি।

মানুষ নিজে যে সময়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেই সময়কে বিচার করা সহজ না। পৃথিবীতে মানুষ দেখে তার নিজের অবস্থান, পরিবেশ, সম্পর্ক আর অভিজ্ঞতার আলোকে। এটা খুব ছোট্ট একটা পরিসর। ক্ষুদ্র এই পরিসর থেকে পুরো পৃথিবী, মানবজাতি এমনকি পুরো সমাজের গতিপথের ব্যাপারে ধারণা করা কঠিন।

মনে করুন, চোখ বেঁধে বিশাল এক দেয়ালের সামনে আনা হলো আপনাকে। দেয়ালের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হাজার ফিটের ওপরে। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন দেয়াল থেকে ঠিক আধা ফিট দূরত্বে। আপনাকে বলা হলো, প্রকাণ্ড এই দেয়ালজুড়ে একটা ছবি আঁকা আছে। চোখের বাঁধন খুলে দিলে আপনি কি বলতে পারবেন, দেয়ালে আঁকা ছবিটা কীসের?

পারবেন না।

কারণ, আপনি খুব বড় একটা বাস্তবতা খুব কাছ থেকে দেখছেন। আপনার চোখের সীমানার ভেতরে আছে পুরো ছবির একটা ছোট্ট টুকরো। পুরোটা ছবি দেখতে হলে নিজের অবস্থান থেকে আপনাকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে আসতে হবে। নিজের সময়কে দেখতে হবে ঐতিহাসিক দূরত্ব থেকে। এই কাজটা বেশিরভাগ মানুষ করে না। করার চিন্তাও করে না।

এটা যুগসন্ধিকে চিনতে না পারার প্রথম কারণ।

ধারাবাহিকতার ভ্রম

মানুষ সাধারণত মনে করে, সব কিছু এখন যেমন আছে, ভবিষ্যতেও তেমনই থাকবে। ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক দৃশ্যপট; এসব আজ যেভাবে চলছে, আগামী কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত কমবেশি সেভাবেই চলবে। এমন চিন্তার ওপর ভর করেই আমরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কৌশল চিন্তা করি। আবু জাহল ঠিক এ কাজটাই করেছিল।

কিন্তু বর্তমান যেভাবে চলছে, সেভাবেই ভবিষ্যতে সবকিছু চলবে; এটা একটা ভ্রম।

ধরুন, কেউ বলল:

- অমুক দেশের জিডিপি গত এক দশকে বছরে ৫% হারে বেড়েছে, তাই আগামী দশকেও একই হারে বাড়বে।
- তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো গত ৫০ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা থেকে বের হয়ে আসছে। তার মানে আগামী ৩০-৫০ বছরের মধ্যে এই সমাজগুলো সত্যিকারের প্রগতিশীল সমাজ হয়ে উঠবে।

ওপরের দুটো ধারণাই ভুল।

হ্যাঁ, এমন হবার *সম্ভাবনা* আছে, কিন্তু এমনটাই হবে, তা বলার সুযোগ নেই। কেবল অতীতে হয়েছে বলে আগামীতেও একই জিনিস ঘটবে, অথবা অতীতে হয়নি তাই আগামীতেও হবে না; এমন ধারণা ভুল।

সমাজ, শাসন, সভ্যতাসহ যেকোনো ক্ষেত্রে আগে থেকে চলে আসা প্রবণতায় ছেদ পড়তে পারে, এবং পড়েও।

সমাজবিজ্ঞানে এই ভ্রান্তির খুব বিখ্যাত একটা উদাহরণ আছে।

১৯৫০ এর দশকে পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, কোনো সমাজে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব যত বাড়ে, সেই সমাজে ধর্মের প্রভাব তত কমে। গত দেড়-দুইশো বছর ধরে এমনটাই ঘটেছে। কাজেই মোটাদাগে আগামী একশো বছরের বিভিন্ন সমাজের সেক্যুলারাইযেইশান আরও বাড়বে। পশ্চিমা দেশগুলোতে ধর্মের প্রভাব প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এই চিন্তার নাম ছিল সেক্যুলারাইযেইশান থিসিস বা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠার তত্ত্ব। এই অবস্থান যারা গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতদের একজন ড. পিটার বার্গার। ১৯৬০-এর দশকে তিনি এই তত্ত্বের সবচেয়ে সুপরিচিত প্রবক্তা হয়ে ওঠেন।

কিন্তু এই তত্ত্বের মূল ভিত্তি ছিল ধারাবাহিকতার ভ্রম: যেহেতু গত কয়েক দশক বা শতাব্দী যাবৎ এমন হয়ে আসছে, অতএব আগামীতেও এমনটাই ঘটবে। কয়েক দশক পর দেখা গেল, সেক্যুলারাইযেইশান তত্ত্ব বাস্তবের সাথে মিলছে না। তিলে তিলে মারা যাবার বদলে অনেক জায়গায় ধর্মের প্রভাব বাড়ছে। ৮০ এবং ৯০-এর দশক নাগাদ দেখা গেল, বিশ্ব রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব স্পষ্টতই বেড়ে গেছে। অ্যাকাডেমিক জগতে চলছে ধর্মীয় সংগঠন, ধর্মীয় গোষ্ঠী নিয়ে নানা গবেষণা। অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্বে 'নিউ এইজ' নামে ৬০-এর দশকে শুরু

হওয়া এক আন্দোলনের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, এই আন্দোলন অনেক দিক থেকেই ধর্মের মতো। যদিও এই 'ধর্মের' বিশ্বাসগুলো 'আধুনিক' এবং 'সংকরধর্মী'।

এক পর্যায়ে ড. বার্গার স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, তিনি ভুল ছিলেন। বিখ্যাত হয়ে ওঠার প্রায় তিন দশক পর, ৯০-এর দশকের শেষ দিকে তিনি লিখলেন:

> 'আধুনিকতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেক্যুলারাইযেইশান বাড়াচ্ছে, এ ধারণা ভুল। বরং পৃথিবীর বহু অঞ্চলে ধর্মের প্রভাবের পুনঃজাগরণ ঘটেছে। ব্যতিক্রম কেবল পশ্চিম ইউরোপ এবং গ্লোবাল এলিট গোষ্ঠী। হ্যাঁ, আধুনিকতার প্রভাবে ধর্মীয় আচরণ, এবং ধর্মের প্রকাশভঙ্গি বদলেছে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম সামাজিক অঙ্গন থেকে সরে ব্যক্তিগত হয়ে ওঠেছে। কিন্তু ধর্মের সামগ্রিক উপস্থিতি বা প্রভাব কমেনি।'[১২]

এই ফ্যালাসির উদাহরণ আছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও।

১৭শ থেকে ২০শ শতকের শুরু পর্যন্ত প্রায় প্রতি শতাব্দীতে বিজ্ঞানের জগতে বিশাল বিশাল পরিবর্তন হয়েছে। তাই ১৯৪০ থেকে ৫০ এর দশকে অনেকেই ধরে নিয়েছিল, একবিংশ শতাব্দী নাগাদ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এমনসব পরিবর্তন আসবে, যার ফলে মানুষের জীবন আমূল বদলে যাবে। সে সময়কার সায়েন্স ফিকশন লেখক থেকে শুরু করে অনেক বুদ্ধিজীবীও কল্পনা করতেন, ২০০০ বা ২০৩০ নাগাদ সবার নিজের উড়ন্ত গাড়ি থাকবে, মঙ্গলগ্রহে স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে উঠবে, মানুষ সৌরজগতের বাইরেও পাড়ি জমাবে, কিংবা প্রযুক্তির মাধ্যমে অমর বা অন্তত 'অতিমানব' হয়ে ওঠবে।

বাস্তবে এর অনেক কিছুই কিন্তু ঘটেনি। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঠিক সেই পথে এগোয়নি, যেমনটা আশা করা হয়েছিল। উড়ন্ত গাড়ি, মহাকাশ উপনিবেশ আর প্রযুক্তিগত অমরত্বের বদলে বড় বড় অগ্রগতিগুলো এসেছে কম্পিউটিং, তথ্যপ্রযুক্তি, নেটওয়ার্ক আর বায়োটেকনোলজির জগতে।

---

[১২] Berger, Peter L. "Secularism in Retreat." The National Interest 46 (Winter 1996–97): 3–12; Berger, Peter L., ed. The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans; Washington, DC: Ethics and Public Policy Center, 1999;

ভুলের মাশুল

অতীত আর বর্তমানের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ভবিষ্যৎ চলবে—এই ধারণাটাই যুগসন্ধির সময়ে সবচেয়ে বড় ভুল হিসেবে দেখা দেয়।

ধারাবাহিকতার এই ভ্রমের কারণে মানুষ পরিবর্তনের ধরন আর দিক বুঝতে ভুল করে। ফলে তারা কখনোই প্রো-অ্যাক্টিভ বা উদ্যোগী হতে পারে না; বরং রি-অ্যাক্টিভ বা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। ইতিহাসের প্রবাহ কোন দিকে মোড় নিচ্ছে, তা আগেভাগে বুঝে উঠতে না পারার কারণে সম্ভব হয় না সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার। পরিস্থিতি বদলানোর পর তারা নড়েচড়ে বসে, কিন্তু ততক্ষণে হাতছাড়া হয়ে যায় নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি।

সময়ের আগে আগামীর ধরন চিনতে পারলে, তা এনে দিতে পারে অভাবনীয় সাফল্য। অন্যদিকে সময়ের প্রবণতাকে চিনতে ভুল করলে দিতে হয় চড়া মাশুল। এজন্যই ব্যবসা, প্রযুক্তি বা যুদ্ধক্ষেত্রের মতো জায়গাগুলোতে ফোরকাস্টিং বা পূর্বাভাসকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়।

নোকিয়ার পতনের কথা চিন্তা করুন।

একসময়ের মোবাইল দুনিয়ার এই একচ্ছত্র অধিপতি মনে করেছিল, ফোনের হার্ডওয়্যার বা বিল্ড কোয়ালিটিই শেষ কথা। কিন্তু ২০০৭ সালে আইফোন এসে যখন খেলার নিয়মটাই বদলে দিল; ফোনকে বানিয়ে ফেলল পকেটে থাকা কম্পিউটার, তখন নোকিয়া সেই প্যারাডাইম শিফট ধরতে পারল না। পুরোনো মডেলে আটকে থাকার খেসারত হিসেবে মোবাইল জগতের একসময়কার এই রাজা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল।

ব্যবসায় ভুল করার সর্বোচ্চ শাস্তি দেউলিয়াত্ব। কিন্তু যুগসন্ধির ক্রান্তিকালে ভুলের মাশুল আরও ভয়াবহ। এটা নিছক আর্থিক ক্ষতির মধ্যে সীমিত থাকে না, বরং পরিণত হয় অস্তিত্বের সংকটে। সমস্যা হলো, আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যখন পুরোনো সব হিসেব পালটে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা এখনো আঁকড়ে আছি পুরোনো প্যারাডাইম।

আবু জাহল ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও অন্ধ হয়ে ছিল, আমরা যুগসন্ধির সময়ে দাঁড়িয়েও আসন্ন প্রলয়কে দেখতে পাচ্ছি না।

গোধূলিবেলা

আজ বিশ্ব প্রগাঢ় পরিবর্তনের মুখোমুখি। পুরোনো যে পৃথিবীতে আমরা বড় হয়েছি, যে জগতটা আমাদের চেনা, তা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। গোধূলির ধূপছায়াতে আলো-আঁধারির যেমন খেলা চলে, ঠিক তেমনি আগামী আর অতীতের এক তীব্র টানাপোড়েন চলছে এই মুহূর্তে। কিন্তু প্রতিদিনকার জীবনের ব্যস্ততা আর ঘটনাপ্রবাহের তুলনায় বৈশ্বিক এই পরিবর্তন ঘটছে খুব ধীরে। তাই ঐতিহাসিক এই পালাবদল আমাদের চোখে প্রায় অলক্ষণীয় রয়ে যাচ্ছে। দেয়ালে আঁকা সেই ছবির মতোই আমরা এই বাস্তবতার খুব বেশি কাছে দাঁড়িয়ে আছি বলে তা দেখতে পাচ্ছি না।

বিশ্ব যে বড় ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এ কথা এখন আর নতুন না। অ্যাকাডেমিক আলোচনা থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবীদের বিশ্লেষণ, পত্রিকার কলাম থেকে শুরু করে সাহিত্য কিংবা সিনেমার প্লটেও উঠে আসছে পতনের আলাপ।

কেউ বলছেন স্নায়ু যুদ্ধের পর এককেন্দ্রিক যে বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, এখন সেটার পতন ঘটেছে। কেউ আরেকটু পিছিয়ে গিয়ে বলছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৈরি হওয়া আন্তর্জাতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে। অনেকে আবার বর্তমান সময়টাকে দেখছেন মার্কিন সাম্রাজ্যের অন্তিম পর্যায় হিসেবে।

এ-ধরনের চিন্তায় শঙ্কার দিকটা বেশি।

আরেকদল আছেন যারা এর উল্টো। তারা প্রচণ্ড আশাবাদী। পুরোনো কাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে এটা এরাও মানে, তবে এদের কল্পনায় আগামীর সময়টা অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর। এরা বিশ্বাস করে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রযুক্তির জ্যামিতিক হারের উন্নতির ফলে আগামী ২০-২৫ বছরের মধ্যে পৃথিবী আমূল পালটে যাবে। বদলে যাবে অর্থনীতি, চাকরির বাজার, এমনকি 'মানুষ' হবার অর্থও। এমন এক নতুন বিশ্ব তৈরি হবে, যা আজ আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব না।

এই ব্যাখ্যা আর পূর্বাভাসগুলোর মধ্যে কোনটা কতটুকু সঠিক আর কোনটা ভুল, তা নিয়ে তর্ক হতে পারে। তবে দু পক্ষই একটা বিষয়ে একমত: এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে।

পালাবদলের এই প্রেক্ষাপট আমাদের কওম ও যমীনের জন্য তীব্রভাবে প্রাসঙ্গিক। এই সময় আমাদের সামনে আসছে শঙ্কা আর সম্ভাবনা নিয়ে। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং স্থানীয়—প্রতিটি পর্যায়ে আমাদের চারদিকে জড়ো হচ্ছে একের

পর এক সংকট। সেই সাথে দিগন্তে দেখা দিচ্ছে নতুন বিনির্মাণের সম্ভাবনা। তাই যুগসন্ধিক্ষণ এবং এর দায়কে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

অনেকে অবশ্য মনে করতে পারেন, এগুলো স্রেফ তাত্ত্বিক আলোচনা, কিংবা দার্শনিক চিন্তাবিলাস। তাই চলুন, বাস্তবতার সাথে ব্যাপারটা আগে মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন।

আমরা যে আসলেই যুগসন্ধিক্ষণ অতিক্রম করছি, তা বোঝার জন্য ঘটনাপ্রবাহকে বিচার করতে হবে সামগ্রিকভাবে। আপাতদৃষ্টিতে এলোমেলো মনে হওয়া বিন্দুগুলোকে সাজিয়ে নিতে হবে আসল ছবিটা দেখার জন্যে। এ লক্ষ্যে এ আলোচনাকে আমরা তিন স্তরে ভাগ করব:

- বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট
- আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট
- স্থানীয় বা জাতীয় প্রেক্ষাপট

চলুন, ওপর থেকেই শুরু করা যাক। নজর দেওয়া যাক বিশ্বমঞ্চের দিকে।

সব কিছু ভেঙে পড়ে

আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে আমরা কী দেখি?

অ্যামেরিকা, চীন আর রাশিয়ার ঠান্ডা লড়াই, ইউরোপের বুকে যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে জেনোসাইড আর আগ্রাসন, আফ্রিকায় আগুন, এশিয়ায় অস্থিরতা। জলবায়ু বিপর্যয়, পারিবারিক ও নৈতিক ভাঙন। একদিকে অর্থনীতির পালাবদল ও পশ্চিমে উগ্রবাদের পুনরুত্থান, অন্যদিকে উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদের হুমকি। খোদ আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের গভীর অস্থিরতা—তালিকাটা অনেক লম্বা।

এগুলোকে আমরা সচরাচর বিচ্ছিন্ন অঘটন হিসেবে দেখি। কিন্তু একটু দূর থেকে দেখলে বোঝা যায়, এগুলো একেবারে বিচ্ছিন্ন না; বরং বিশাল ক্যানভাসে আঁকা প্রলয়ের একেক অংশের খণ্ড চিত্র। প্রচুর বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটা জায়গাতে গিয়ে বর্তমান বিশ্বের পরিবর্তন আর সংকটের স্রোতগুলো মিলে যায়। প্রতিটি সংকট আমাদের দেখিয়ে দেয়, পুরোনো কাঠামো দিয়ে আর কাজ হচ্ছে না। ক্রমশ অচল হয়ে যাচ্ছে বিদ্যমান ব্যবস্থা।

বহুকেন্দ্রিক বিশ্ব

বর্তমানের পালাবদলগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো বিশ্ব এককেন্দ্রিক থেকে বহুকেন্দ্রিক হয়ে ওঠা।

মনে করুন, কোনো এলাকায় সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ আছে কেবল একজন। সে একাই প্রভাব খাটায়, একাই চাঁদা তোলে সবার কাছ থেকে। এলাকায় তার কথাই চলে। এটাকে এককেন্দ্রিক কাঠামোর উদাহরণ হিসেবে ধরতে পারেন। আর ঐ এলাকায় যদি মোটামুটি কাছাকাছি ক্ষমতার কয়েকজন সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ থাকে, যাদের মধ্যে চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে ফুটপাথ দখলের মতো নানা কিছু নিয়ে সারাক্ষণ রেষারেষি লেগেই আছে, তাহলে সেটা বহুকেন্দ্রিক কাঠামো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে পরাশক্তি ছিল দুটো: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত ইউনিয়ন। দশকের পর দশক ঠান্ডা লড়াই চলেছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের শুরুতে অনেকটা হঠাৎ করেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটল। অ্যামেরিকা হয়ে গেল বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি। এটাকে বলা হতো এককেন্দ্রিক মুহূর্ত (The unipolar moment)।

কিছু সময়ের জন্য চারদিকে মার্কিন মডেলের জয়জয়কার শোনা গেল। যেন অ্যামেরিকার কথাই শেষ কথা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ফুকোইয়ামা রীতিমতো ইতিহাসের সমাপ্তি ঘোষণা করে ফেললেন। বললেন, পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থাই সামাজিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষের চূড়া। মানবজাতির অগ্রগতির একমাত্র পথ ও আদর্শ হলো উদারনৈতিক গণতন্ত্র, সর্বজনীন মানবাধিকার আর পুঁজিবাদী মুক্তবাজার অর্থনীতির সমন্বয়ে গঠিত বিশ্বব্যবস্থা। এ দাবি অনেকেই মেনে নিলেন স্ব-প্রমাণিত সত্য হিসেবে।[১৩]

কিন্তু সেই এককেন্দ্রিক দুনিয়া এখন আর নেই। রাশিয়া, চীন, এমনকি মাঝারি সাইজের বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তিও এখন অ্যামেরিকার মোড়লগিরির বাইরে গিয়ে নিজেদের চাওয়াটা প্রতিষ্ঠা করছে।

অ্যামেরিকাকে পেছনে ফেলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অর্থনীতির জায়গা দখল করেছে চীন। পরিণত হয়েছে বিশ্বে উৎপাদনের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রে। প্লাস্টিকের খেলনা থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, সবকিছুতে ছাড়িয়ে যাচ্ছে পশ্চিমকে। অন্যদিকে অ্যামেরিকা সীমিত হয়ে যাচ্ছে ওয়ালস্ট্রিট আর সিলিকন ভ্যালিতে। একসময়ের ম্যানুফ্যাকচারিং হাব মার্কিন অর্থনীতি এখন আবর্তিত হচ্ছে শেয়ার বাজারের ফটকাবাজি আর টেক কোম্পানিগুলোকে কেন্দ্র করে।

দীর্ঘদিন ধরে বৈশ্বিক বাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম ছিল মার্কিন ডলার। দেশগুলো তাদের বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ করত ডলারে। কিন্তু বেশ ক'বছর ধরে আন্তর্জাতিক লেনদেনে ডলার থেকে সরে আসার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সামনে এটা আরও বাড়বে।

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক জোট ন্যাটো'র কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে পশ্চিমেই। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ন্যাটোকে নিয়ে সন্দিহান। পশ্চিমা বিশ্ব এক জোট হবার পরও ইউক্রেনের প্রক্সি যুদ্ধে হারাতে পারেনি রাশিয়াকে। বিশ্ব দারোগা হিসেবে অ্যামেরিকার সেই দাপট আর নেই।

অনিশ্চয়তা আর অস্থিতিশীলতা

এককেন্দ্রিকতা থেকে বহুকেন্দ্রিকতায় পরিবর্তন অনিশ্চয়তা আর অস্থিতিশীলতা তৈরি করবে।

এলাকায় গডফাদার যখন একজন, তখন এক ধরনের 'শান্তি', বা বলা ভালো স্থিতিশীলতা থাকে। একজনই চাঁদা তোলে, একজনকেই তোয়াজ করতে হয়,

[১৩] Fukuyama, Francis. *"The end of history and the last."* Man (London: Hamish (1992).

একজনই 'শৃঙ্খলা' বজায় রাখে। কিন্তু এলাকায় যদি তিন চারজন গডফাদার তৈরি হয়, তখন তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার, টাকার ভাগ আর জবরদখলের লড়াই চলতে থাকে। বেড়ে যায় মারামারি আর খুনোখুনি।

১৯৪৭ থেকে ১৯৯০ এর সময়টার কথা ভাবুন, যখন দুটো পরাশক্তি ছিল। এই সময়টাতে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় রাজনৈতিক ওলটপালট হয়েছে। অসংখ্য ক্যু আর বিপ্লব হয়েছে। হয়েছে ছায়া যুদ্ধ।

- রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোনাথন পাওয়েল এবং ক্লেটন থাইনের বিখ্যাত গবেষণা অনুযায়ী, ঠান্ডা যুদ্ধের সময়টা ছিল ক্যু'র স্বর্ণযুগ।[১৪] এ সময়ে ঘটা মোট সামরিক অভ্যুত্থান চেষ্টার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ, প্রায় ৩০ শতাংশ, হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার দেশগুলোতে, যে অঞ্চলগুলোতে বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের অবস্থান।
- এই সময়টাতে ঘটেছে একাধিক বিপ্লব। উদাহরণ: চীন, কিউবা, ইরান, নিকারাগুয়া ইত্যাদি।
- এমনকি ৭১ সালে বাংলাদেশের জন্মটাও কিন্তু এই প্রেক্ষাপটে। অ্যামেরিকা আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেকার ঠান্ডা লড়াই না থাকলে, ৭১ এর ঘটনাপ্রবাহ হয়তো অন্যরকম হতো।

কেন এই সময়টাতেই এত বড় বড় পালাবদল ঘটল?

কারণ, কাছাকাছি শক্তির দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তারা একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করত নানাভাবে। তাদের মধ্যে চলত নানা ধরনের ছায়া-যুদ্ধ বা প্রক্সি ওয়ার।

ধরুন, কোনো অঞ্চল বা দেশে অ্যামেরিকা একটা গ্রুপ/দলকে সমর্থন দিল। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার উল্টো দলকে সমর্থন দেওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি হতো। এদের মাধ্যমে পরাশক্তিগুলো নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করত। সরকার যদি মার্কিনপন্থী হতো, তাহলে সরকারবিরোধী সেনা অফিসার বা রাজনৈতিক দলগুলো জানত যে, সরকারের পতন ঘটানোর ক্ষেত্রে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন পাবে। একইভাবে সরকার যদি সোভিয়েতপন্থী হতো, তাহলে বিরোধীরা জানত, পশ্চিমা বিশ্ব তাদের সমর্থন দেবে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটিয়ে ফেলত উচ্চাভিলাষী, সুযোগসন্ধানী নেতা, বা রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো।

---

[১৪] Powell, Jonathan M., and Clayton L. Thyne. "Global Instances of Coups from 1950 to Present." Journal of Peace Research 48, no. 2 (March 2011): 249–59.

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, অ্যামেরিকার একক মোড়লগিরির সময়টাতে এ-ধরনের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের হার অনেক কমে গেল। '৯০ এর পর এ-ধরনের বেশিরভাগ পালাবদল হয়েছে মার্কিন পরিকল্পনা মাফিক। কিন্তু বহুকেন্দ্রিক বিশ্বে আগের এই সমীকরণ আবার ফিরে আসবে। বাড়বে ছায়া-যুদ্ধ আর 'সামরিক হস্তক্ষেপের' প্রবণতা। ছোট কিন্তু ভূরাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোতে পরাশক্তিগুলো হাত ঢোকাবে নানা ভাবে। প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করবে আঞ্চলিক শক্তিগুলোও।

আগামী দিনগুলোতে পশ্চিমের ফেরি করা উদারনৈতিক আদর্শের একরৈখিক পথ থেকে ক্রমশ সরতে থাকবে বিশ্ব। দেশগুলো আর গণতন্ত্র বা মানবাধিকারের মতো আদর্শিক বয়ানের ভিত্তিতে শিবির বাছাই করবে না। তাদের সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে পরিচয়, স্বার্থ আর বাস্তব প্রয়োজনের ওপর। হয়তো প্রাধান্য পাবে সভ্যতাগত পরিচয় আর বিভাজনও।

নতুন এই বাস্তবতায় বিশ্বরাজনীতিকে চালিত করবে একাধিক শক্তির পারস্পরিক রেষারেষি। প্রশ্ন উঠবে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের 'নিয়মতান্ত্রিক' প্রক্রিয়াগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে। এই সুযোগে, 'নিয়মতান্ত্রিকতা'র বাইরে থাকা এবং বিদ্যমান ব্যবস্থা-বিরোধী (anti-systemic) রাজনৈতিক শক্তিগুলো (উগ্র ডান-বাম, স্বাধীনতাকামী কিংবা ইসলামপন্থী) উচ্চাভিলাসী নানা প্রকল্প হাতে নিতে উৎসাহিত হবে।

সামনের দিনগুলোতে সুযোগসন্ধানী আর বেপরোয়া রাজনৈতিক খেলোয়াড়রা সাহসী সব পদক্ষেপ নেওয়ার অনেক সুযোগ পাবে। বাড়বে এ-ধরনের পদক্ষেপ সফল হওয়ার সম্ভাবনাও।

তবে স্নায়ু যুদ্ধের সময় পরাশক্তি ছিল দুটো। এখন অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাব খাটাতে চাওয়া শক্তির সংখ্যা দুইয়ের চেয়ে বেশি। তাই হিসেবনিকেশ হবে আরও জটিল। এককেন্দ্রিকতা থেকে বহুকেন্দ্রিকতার দিকে যাত্রা অনিশ্চয়তা এবং অস্থিতিশীলতা নিয়ে আসবে। যার কিছু চিহ্ন আমরা এরই মধ্যে দেখছি।

বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্র বদলে যাবার পাশাপাশি আরও একটা ব্যাপার ঘটছে। আন্তর্জাতিক যে ব্যবস্থা, মানে যে নিয়মকানুনের ওপর পৃথিবীটা গত প্রায় আট দশক ধরে চলছিল, সেটা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে।

গণহত্যা, মানবাধিকার আর আন্তর্জাতিক আইন

আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে শাম (লেভান্ট)[১৫] অঞ্চলের গোত্রগুলো এক বিচিত্র মূর্তির ইবাদাত করত। শরীরটা মানুষের, মাথা ষাঁড়ের। নাম, মলোখ। অভিশপ্ত ইহুদি জাতি মিশর থেকে বের হয়ে এই অঞ্চলে থিতু হবার পর প্রতিবেশীদের দেখাদেখি একসময় এই শিরকে মেতে ওঠে। এ-ধরনের শিরকে লিপ্ত হবার কথা আছে তাদের নিজেদের কিতাবাদিতেই।

ষাঁড়মুখো মলোখ দেবতার পূজার বিশেষ রীতি ছিল। মূর্তি বানানো হতো ব্রোঞ্জ দিয়ে, ভেতরে থাকত ফাঁকা জায়গা বা চেম্বার। নিচে বিশেষ কায়দায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হতো। তারপর সেই উত্তপ্ত মূর্তির হাত বা বুকের খোলা জায়গা দিয়ে দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হতো জীবন্ত শিশু। সাফল্য, বিপদ থেকে মুক্তি, কিংবা স্রেফ মলোখকে খুশি রাখার জন্য এই শিশু বলি চলত নিয়মিত।

মানব ইতিহাসে নরবলির এমন দুর্ভাগ্যজনক উদাহরণ আছে অনেক।

অ্যাযটেক সভ্যতার মানুষেরা যুদ্ধের আগে জনসমক্ষে বন্দিদের বলি দিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এমন মন্দিরও পাওয়া গেছে, যেখানে সাজানো হাজার হাজার মানুষের মাথার খুলি। ফিনিশিয়রা, বিশেষ করে প্রাচীন কার্থেজের অধিবাসীদের বিরুদ্ধেও শিশু বলিদানের অভিযোগ ছিল। রোমানরা বড় কোনো যুদ্ধে জেতার পর পরাজিত বাহিনীর নেতাদের দড়ি বেঁধে রাস্তায় হাঁটিয়ে নিয়ে যেত দেবতা জুপিটারের মন্দিরে। সবার সামনে শ্বাসরোধ করে তাদের হত্যা করত। তারা একে 'নরবলি' বলত না, কিন্তু মৌলিকভাবে ব্যাপারটা তাই ছিল।

আজ অভিশপ্ত ইহুদি জাতি সেই একই কাজ করে যাচ্ছে।

গাযা গণহত্যার মাধ্যমে যায়োনিস্ট রাষ্ট্র যেন পুরো বিশ্বের সামনে এক 'আচারিক বলিদান' (Ritual Sacrifice) পালন করেছে। তাদের প্রকল্প টিকিয়ে রাখার জন্য, দখলদার রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ আর আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণের জন্য, গায়রুল্লাহর বেদিতে তারা শিশুদের বলি দিয়ে চলছে।

পৃথিবীর শীর্ষ মেডিকেল জার্নাল দা ল্যান্সেট এবং মানবাধিকার সংস্থা ইউরো-মেড মনিটরের হিসেবে গাযা গণহত্যায় হত্যা করা হয়েছে প্রায় দুই লক্ষ মানুষকে।[১৬]

---

[১৫] শাম: বর্তমান সিরিয়া, ফিলিস্তিন, লেবানন এবং জর্ডান; এই পুরো অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবে 'শাম' নামে পরিচিত। ইংরেজিতে বলা হয় 'লেভান্ট' (Levant)।

[১৬] Khatib, R., et al. (2024), "Counting the dead in Gaza," The Lancet, 404(10449); Euro-Med Human Rights Monitor, Humanitarian Reports (2025). যেকোনো যুদ্ধে সরাসরি বোমা বা গুলিতে যত মানুষ মারা যায়, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি মানুষ মারা যায় দুর্ভিক্ষ, মহামারি এবং চিকিৎসাসেবা ভেঙে পড়ার মতো যুদ্ধ-পরবর্তী প্রভাবের কারণে। ল্যান্সেট এবং ইউরো-মেডের হিসেব করা যুদ্ধের কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মৃত্যুকে ধরে।

গাযার প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর বয়স আঠারোর নিচে। তার মানে যারা মারা গেছেন, তাদের বড় একটা অংশ শিশু।

এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সবার চোখের সামনে। গাযাকে বলা হয়েছে 'world's most televised genocide'। স্কুল, হাসপাতাল, বাসাবাড়িতে বোমা ফেলা, শিশুদের পুড়িয়ে মারা, এক মুঠো খাবার নিতে জড়ো হওয়া অনাহারী মানুষের ওপর ঠান্ডা মাথার ম্যাসাকার, অ্যানেস্থেশিয়া ছাড়া শিশুদের অপারেশন; গাযায় সবকিছু হয়েছে পুরো বিশ্বের সামনে।

কিন্তু এই প্রকাশ্য পৈশাচিকতা দেখার পরও কেউ কিছু করেনি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কিংবা জাতিসংঘ, কেউই না। পশ্চিমা বিশ্ব কেবল নীরবই থাকেনি, বরং সক্রিয়ভাবে গণহত্যায় মদদ দিয়েছে। ইসরায়েলকে অস্ত্র দিয়েছে, আর্থিক সহায়তা করেছে, সাহায্য করেছে কূটনৈতিকভাবে। মধ্যস্থতার নামে করেছে গণহত্যা আর দখলদারিত্বের সহযোগিতা।

অথচ এরাই আমাদেরকে মানবাধিকার নিয়ে সবক দেয়। এরা শিশু অধিকারের কথা বলতে বলতে মুখে ফেনা তোলে, নারী অধিকারের বয়ান করে, ব্যক্তি স্বাধীনতার আলাপ টানে। এরা ইসলামের বিধানের সমালোচনা করে, আর মানবাধিকারের নামে এলজিবিটি'র মতো বিকৃতিকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু যখন আক্ষরিক অর্থেই হাজার হাজার নারী-শিশু-বৃদ্ধ মারা যায়, যখন জাতিগত নিধন চলে, তখন এরা হত্যাকারীকে সাহায্য করে। আর আমাদের বলে—

> *Israel has the right to defend itself. We must condemn Hamas!*

এই হলো মানবাধিকারের অবস্থা।

এই হলো আন্তর্জাতিক আইনের অবস্থা।

ইসরায়েল যখন একের পর এক আন্তর্জাতিক আইন ভাঙে, চারটা দেশে আক্রমণ চালায়,[১৭] তখন তথাকথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নীরব থাকে। গাযার শিশুরা যখন ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে মারা যায়, ঠিক সেই সময়েই পশ্চিমা বিশ্বের রাজধানী আর সংসদগুলোতে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় গণহত্যার নায়ক নেতানিয়াহু। দশকের পর দশক কোনো জবাবদিহি ছাড়াই এভাবে আন্তর্জাতিক আইন ভেঙে যাচ্ছে যায়নবাদীরা।

---

[১৭] সিরিয়া, লেবানন, ইয়েমেন ও ইরান

অ্যামেরিকা ইরাক আর আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালিয়েছে। নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা করেছে ইয়েমেন থেকে ওয়াযিরিস্তান পর্যন্ত। ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপ্রধানকে রাতের অন্ধকারে অপহরণ করেছে। ফ্রান্স এখনো আফ্রিকাতে তার উপনিবেশ আমলের আধিপত্য বজায় রেখেছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী সুদান, হাইতি, লাইবেরিয়া আর কঙ্গোর মতো দেশগুলোতে সাহায্যের নামে নারী ও শিশুদের ধর্ষণ করেছে।[১৮]

এগুলো সবই আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন। এ-ধরনের আইন লঙ্ঘনের তালিকা অনেক দীর্ঘ। অথচ কোনো কিছুরই কোনো সুরাহা হয়নি। হবেও না।

এই দ্বিমুখী নীতিই হলো আসল বাস্তবতা।

আন্তর্জাতিক আইন অর্থহীন। অর্থহীন তথাকথিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও। এসব আইন আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক, কিন্তু ওদের জন্য ঐচ্ছিক। সংস্থাগুলো নামে 'আন্তর্জাতিক' হলেও, আদতে এগুলো পশ্চিমের স্বার্থে কাজ করে।

এগুলোর বাইরে গিয়ে এখন অনেকেই বিকল্প কাঠামো বা জোটের কথা চিন্তা করতে শুরু করেছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার স্বীকৃতি এসেছে পশ্চিমের রাজনৈতিক নেতাদের মুখ থেকেই।[১৯]

মিথ্যা প্রতিশ্রুতি

আধুনিক পশ্চিমে ধর্মের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যাবার পর, সেই জায়গাটা দখল করেছিল বিভিন্ন মতাদর্শ বা আইডিওলজি। জীবনের উদ্দেশ্য দেওয়া, আচরণের নিয়ম ঠিক করা, সমাজকে নৈতিক কাঠামোর ভেতরে রাখার মতো যে ভূমিকাগুলো একসময় ধর্ম পালন করত, আধুনিক যুগে সেই একই ভূমিকা পালন করতে শুরু করে এই মতাদর্শগুলো।

এর ব্যাখ্যায় আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম স্থপতি এমিল ডুর্খেইম বলেছিলেন, 'সমাজে ধর্মের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়লেও সমাজকে এক সাথে ধরে রাখার জন্য 'পবিত্রতা'-র চাহিদা থেকেই যায়। কারণ মানুষ তার নিজের চেয়ে বড় কিছুর

---

[১৮] Wheeler, Skye. "UN Peacekeeping has a Sexual Abuse Problem." *Human Rights Watch.* January 11, 2020; Associated Press. "Sexual misconduct allegations in UN missions topped 100 in 2024, UN says." March 18, 2025.

[১৯] BBC News. "World's rules-based order 'no longer exists', Germany's Merz warns." *BBC News.* Accessed February 15, 2026; Carney, Mark. "Davos 2026: Special address by Mark Carney, PM of Canada." World Economic Forum. January 20, 2026.

আনুগত্য না করে বাঁচতে পারে না।'[২০]

রাজনৈতিক দার্শনিক এরিক ভ্যোগেলিনসহ আরও অনেকের মতে, পশ্চিমে ধর্মের প্রভাব কমার পর ডুর্খেইমের বলা এই 'পবিত্রতার শূন্যস্থান' পূরণ করেছে সেক্যুলার মতাদর্শগুলো।

এজন্যেই ভয়েগেলিন গত শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী মতাদর্শগুলোর নাম দিয়েছিলেন রাজনৈতিক ধর্ম (Political Religion)। তার মতে, লিবারেলিসম, জাতীয়তাবাদ, কমিউনিসম, ফ্যাসিবাদের মতো সেক্যুলার মতাদর্শগুলো কার্যত ধর্মের বিকল্প হিসেবেই কাজ করে।[২১] এগুলোরও আছে নিজস্ব নৈতিক বিধিবিধান (কী সঠিক, কী ভুল), প্রতিশ্রুত ভবিষ্যৎ (কল্পরাজ্যের প্রতিশ্রুতি), শত্রুর সংজ্ঞা, পবিত্র বয়ান এবং শহীদের ধারণা।

সহজ ভাষায়, ধর্ম দুর্বল হলে মানুষ ধর্মহীন হয় না; মানুষ তখন নিজে নতুন ধর্ম বানিয়ে নেয়।

প্রশ্ন হলো, মানুষের বানানো আধুনিক ধর্মগুলো আমাদের কী দিয়েছে?

সেক্যুলার শান্তির জান্তব রূপ

ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল শান্তির। বলেছিল ধর্মের নামে শাসন হলে যুদ্ধবিভেদ হয়, হয় হানাহানি আর কাটাকাটি। ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা এই সমস্যার সমাধান করবে। ধর্মীয় সহিংসতার দাওয়াই হলো সেক্যুলার মতাদর্শ, সেক্যুলার শাসন, সেক্যুলার সমাজ।

কিন্তু সেক্যুলার ব্যবস্থা কি পেরেছে প্রতিশ্রুত সেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে?

সংখ্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রার বিচারে গত দুই হাজার বছরের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী ছিল সবচেয়ে সহিংস। লেখিকা মার্গারেট ড্রাবল একে বলেছেন, 'এক

---

[২০] Durkheim, Émile. The Elementary Forms of Religious Life. Translated by Karen E. Fields. New York: The Free Press, 1995.

[২১] Voegelin, Eric. "The Political Religions." In Modernity Without Restraint: The Collected Works of Eric Voegelin, Volume 5, edited by Manfred Henningsen, 17–74. Columbia, MO: University of Missouri Press, 2000.

ভয়েগেলিনের মতে, গত শতাব্দীর টোটালিটারিয়ান (Totalitarian) বা সর্বগ্রাসী মতাদর্শগুলো (বিশেষ করে নাৎসিবাদ ও কমিউনিজম) কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না। এগুলো মানুষের ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষাকে (যেমন—পৃথিবীতে স্বর্গ প্রতিষ্ঠা, পরম মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ) সেক্যুলার বা ইহজাগতিক কাঠামোর মধ্যে প্রতিস্থাপন করেছিল। এই মতবাদগুলো প্রথাগত ধর্মের মতোই নিজস্ব 'পবিত্র গ্রন্থ', 'নবী' (যেমন মার্ক্স বা হিটলার), 'শহীদ' এবং 'চূড়ান্ত সত্যের' দাবি করত।

জান্তব শতাব্দী'।[২২] তবে এটা একেবারেই মানবীয় কৃতিত্ব। মানুষ এবং মানুষের বানানো নানা আদর্শই এই অবিশ্বাস্য মাত্রার ধ্বংসের নির্মাতা।

সেক্যুলার বিশ্ব আমাদের দিয়েছে দুই বিশ্বযুদ্ধ, যেখানে জাতীয়তাবাদ আর ফ্যাসিবাদের বেদিতে বলি হয়েছে প্রায় ৮ কোটি মানুষ।[২৩] দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর মাওবাদী চীনের মতো রাষ্ট্রব্যবস্থা, যেখানে 'সাম্যবাদ' বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে হত্যা করা হয়েছে আরও প্রায় ১০ কোটি মানুষ।[২৪] ক্যাম্বোডিয়ার কিলিং ফিল্ড থেকে শুরু করে লাইবেরিয়া, ভিয়েতনাম থেকে ইরাক—আধুনিক মতাদর্শের নামে সারা বিশ্বে চলেছে পাইকারি হত্যাকাণ্ড।

বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা যবিগনিউ ব্রেযেযিনস্কির হিসাবমতে, বিংশ শতাব্দীতে কেবল রাজনৈতিক সংঘাত আর সেক্যুলার মতাদর্শের কারণে মারা গেছে প্রায় ১৭ কোটি মানুষ।[২৫]

কিন্তু এই হিসাবকেও ছাড়িয়ে গেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আর. জে. রুমেল-এর দেওয়া তথ্য। তিনি দেখিয়েছেন, বিংশ শতাব্দীতে সেক্যুলার রাষ্ট্রগুলো অন্য দেশের যত মানুষ মেরেছে, তার চেয়ে নিজ নাগরিকদের মেরেছে অনেক বেশি। তার হিসাব অনুযায়ী, এই সময়ে রাষ্ট্রগুলো নিজেদেরই প্রায় ২৬ কোটি মানুষকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছে। রুমেল এই রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ডের নাম দিয়েছেন ডেমোসাইড (Democide)।[২৬]

যে সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থা শান্তি আর নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়ার শপথ নিয়ে তৈরি হয়েছিল, সেই রাষ্ট্রযন্ত্রই গত ১০০ বছরে ২৬ কোটি মানুষকে মেরে ফেলেছে।

আর এই সবকিছু হয়েছে সেক্যুলার মতাদর্শগুলোর নামে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, উদারনৈতিক গণতন্ত্র; প্রত্যেকেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের

---

[২২] Drabble, M. (2001). A Beastly Century. *American Scholar*, 70(1).

[২৩] *Encyclopaedia Britannica Online*, s.v. "World War I; *Encyclopaedia Britannica Online*, s.v. "World War II. হতাহতের বিপুল ব্যাপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, Martin Gilbert, *The Second World War: A Complete History* [New York: Henry Holt, 1989]।

[২৪] Stéphane Courtois et al., The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression, trans. Jonathan Murphy and Mark Kramer (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).

[২৫] Zbigniew Brzezinski, *Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century* (1993).

[২৬] R. J. Rummel, Death by Government (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1994). For the revised estimate of 262 million, see R. J. Rummel, "20th Century Democide," University of Hawaii, https://web.archive.org/web/20260102222917/https://www.hawaii.edu/powerkills/20TH.HTM

এক জান্তব দৌড়ে নেমেছিল। প্রত্যেকেই কোটি কোটি নিরীহ মানুষের জীবনকে বলি দিয়েছে সেক্যুলার শান্তির বেদিতে।

ইতিহাসের অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে গত দেড়শো বছরে মানবাধিকার, শান্তি আর ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে সবচেয়ে বেশি। একই সাথে, ধর্মকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টাও চলেছে পুরোদমে। আর ঠিক এই সময়টাতেই সেক্যুলার মতাদর্শ আর সেক্যুলার রাষ্ট্রের নামে পৃথিবী দেখেছে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ, সবচেয়ে অবিশ্বাস্য মাত্রার সহিংসতা।

লিবারেল দ্বিচারিতা ও গণতন্ত্রের সংকট

লিবারেলিসম মানবাধিকার আর স্বাধীনতার মতো সুন্দর সুন্দর আলাপ ফেরি করে। কিন্তু অনেক ভোগান্তির পর বিশ্ব আজ উপলব্ধি করছে, অধিকার আর স্বাধীনতার এই বয়ানগুলো পশ্চিমের হাতিয়ার কেবল। একদিকে এসব বয়ানের নামে তারা আমাদের মতো দেশগুলোকে চাপ দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে, অন্যদিকে নিজেদের বেলায় খেয়ালখুশিমতো নীতি পালটায়।

তাদের মুখের বুলি আর বাস্তবতার মধ্যেকার ফারাক বিশাল। জার্মানির ড্রেসডেনের ফায়ারবম্বিং, হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ, ভিয়েতনামে আগ্রাসন, বাগদাদের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে শুরু করে আজকের গাযা, কাশ্মীর বা উইঘুর—প্রতিটি ঘটনাই এই দ্বিমুখীতার প্রমাণ।

লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি অধিকারের নামে চরম সব যৌনবিকৃতির সামাজিকীকরণ করছে। তিলে তিলে ধ্বংস করছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও সভ্যতাকে।

অন্যদিকে আধুনিকতার সবচেয়ে প্রিয় মূর্তি গণতন্ত্রের সত্যিকারের চেহারাটাও স্পষ্ট হয়ে গেছে গাযা গণহত্যার মধ্য দিয়ে। পশ্চিমা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ যখন এই গণহত্যা বন্ধের জন্য রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছে, ঠিক তখনই তাদের নির্বাচিত সরকারগুলো; যে দলেরই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত যায়োনিস্টদেরই সমর্থন দিয়ে গেছে। অ্যামেরিকাতে ডেমোক্রেট সরকারের আমলে শুরু হওয়া গণহত্যা রিপাবলিকানদের আমলে নতুন মাত্রা পেয়েছে। একই বাস্তবতা দেখা গেছে ইংল্যান্ড, ফ্রান্সসহ বেশিরভাগ পশ্চিমা দেশে।

জনগণের শাসন কিংবা জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দূরের কথা, সাধারণ মানুষ চাইলেও তাদের সরকারকে গণহত্যায় অংশ নেওয়া থেকে থামাতে পারছে না। যে দেশগুলোকে গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়, খোদ সেখানেই ঠিকমতো কাজ করছে না এই ব্যবস্থা।

আধুনিকতার বিশ্বাসগুলো একে একে সব মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

দিনবদলের মরীচিকা

কেবল আদর্শগুলোই মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি, ব্যর্থ হয়েছে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও। অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট (Occupy Wall Street) আন্দোলনের কথা ভাবুন।[২৭] মার্কিন সমাজের গভীর বৈষম্যের বিরুদ্ধে তরুণরা রাস্তায় নেমে এসেছিল। এই প্রেক্ষাপটেই আবির্ভাব হয়েছিল বারাক ওবামার। একজন ক্যারিশম্যাটিক, অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতা, যার পুরো নির্বাচনী প্রচারণার ভিত্তিই ছিল 'পরিবর্তন'-এর প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু তার শাসনামলে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আসেনি। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে শুরু করে নব্য-উদারনৈতিক (neoliberal) শোষণ, সবকিছুই চলেছে আগের মতোই। উল্টো, ওবামার পরিবর্তনের ফাঁপা বুলির ব্যর্থতা এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্টকে নিয়ে সাদা চামড়ার বর্ণবাদী অ্যামেরিকানদের আশঙ্কার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো লোক প্রেসিডেন্ট বনে গেছে।

মজার ব্যাপার হলো, ট্রাম্পের প্রচারণার ভিত্তিও ছিল সেই একই 'পরিবর্তন'-এর স্বপ্ন। বিদ্যমান ব্যবস্থাকে বদলে দিয়ে অ্যামেরিকাকে আবার 'মহান' বানানোর প্রতিশ্রুতি। বলাবাহুল্য, ট্রাম্পও কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারেনি।

পশ্চিমা সমাজ তাদের গতিপথ বদলানোর ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে।

পোস্ট-আইডিওলজি

পশ্চিমা মতাদর্শগুলোর ব্যর্থতা প্রকট হবার পর নতুন এক গালভরা পরিভাষা হাজির করা হয়েছে, পোস্ট-আইডিওলজি। এই ধারণার প্রবক্তারা বোঝাতে চান, বিশ্ব এখন কমিউনিসম, ফ্যাসিবাদ বা লিবারেলিসমের মতো বড় বড় মতাদর্শের যুগ পেরিয়ে এসেছে। পুঁজিবাদ বনাম সাম্যবাদের মতো আদর্শিক সংঘাতের সময় শেষ। আগামীতে শাসন চলবে বাস্তবমুখী সমাধান আর দক্ষ ব্যবস্থাপনার (technocracy) ভিত্তিতে। আদর্শের এখন আর কোনো গুরুত্ব নেই, জরুরি কেবল দক্ষতা আর ফলাফল।

কিন্তু 'আদর্শ-পরবর্তী' সমাজ বা ব্যবস্থা বলে আসলে কিছু নেই।

---

[২৭] **অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট:** ২০১১ সালে নিউ ইয়র্কের বাণিজ্যপাড়া ওয়ালস্ট্রিট-এ শুরু হওয়া আন্দোলন। 'আমরা ৯৯%' (We are the 99%) স্লোগান নিয়ে এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল মার্কিন সমাজে ধনী-দরিদ্রের চরম বৈষম্য আর বড় বড় কর্পোরেশনগুলোর রাজনৈতিক প্রভাবের বিরুদ্ধে।

প্রতিটি আইনই কোনো-না-কোনো বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর তৈরি হয়। নৈতিকতা ছাড়া আইন হয় না। মৌলিক বিশ্বাসের পার্থক্য থাকলে ফারাক হয় কল্যাণ আর স্বার্থের সংজ্ঞা ও অগ্রাধিকারেও। আসে অধিকারের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা আর সীমানা। আইন, রাষ্ট্র এবং শাসন কখনো নিরপেক্ষ হতে পারে না।

আদর্শনিরপেক্ষ হবার দাবি আসলে চতুর মার্কেটিং।

পোস্ট-আইডিওলজি তার আসল মতাদর্শকে প্রগতি, দক্ষতা, বা উন্নয়ন-এর মতো শব্দের আড়ালে লুকিয়ে রাখে। যেসব শব্দ শুনতে ভালো, এবং আপাত নিরপেক্ষ। কিন্তু নিরপেক্ষতার দাবি করলেও পোস্ট-আইডিওলজি সেক্যুলার হিউম্যানিসম এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মৌলিক অবস্থানগুলোকে মেনে নিয়েই কাজ করে।

- ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব
- ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ
- রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ মীমাংসাকারী হিসেবে দেখা
- নির্বাচন কিংবা জনমতকে বৈধতার চূড়ান্ত উৎস মনে করা
- মানবাধিকারের পশ্চিমা ফ্রেইমওয়ার্ক

এ সবকিছুকে পোস্ট-আইডিওলজি শুরুতেই প্রশ্নাতীত সত্য হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। অথচ এর কোনোটাই নিরপেক্ষ অবস্থান না। কোনোটাই সর্বজনীন নৈর্ব্যক্তিক সত্য না। এ অবস্থানগুলো এসেছে সেক্যুলার হিউম্যানিসম ও লিবারেলিসমের দর্শন থেকে।

এমনকি এরা যখন বলে, ‘আমরা মতাদর্শ চাই না, উন্নয়ন চাই, প্রগতি চাই’ তখন সেই ‘উন্নয়ন’ বা ‘প্রগতি’-র ধারণাটাও তারা কিন্তু নেয় সেক্যুলার-লিবারেল ফ্রেইমওয়ার্ক থেকে। কাজেই এটা আসলে উদারনৈতিক মতাদর্শেরই ছদ্মবেশী রূপ। পোস্ট-আইডিওলজি হলো এমন লিবারেলিসম, যা নিজের পরিচয় লুকানোর চেষ্টা করছে। এমন মতাদর্শ, যা নিরপেক্ষ হবার ভান করছে।

উত্তর-আধুনিকতাবাদ (Post-Modernism) যেমন আধুনিকতাকে অতিক্রম করা না, বরং আধুনিকতারই আরেকটি পর্যায় বা সংস্করণ, ঠিক তেমনি পোস্ট-আইডিওলজি-ও পশ্চিমা আইডিওলজির খপ্পর থেকে বের হতে পারেনি।

বুড়ো হয়ে যাওয়া হলিউড তারকারা যেমন প্লাস্টিক সার্জারি করে মুখের বলিরেখা ঢাকতে চায়, তেমনি ব্যর্থ পশ্চিমা লিবারেলিসম এখন পোস্ট-আইডিওলজির মুখোশ পরে নিজের জীর্ণ দশা আড়াল করার চেষ্টা করছে।

সাম্য আর বৈষম্যহীনতা

আধুনিক রাজনৈতিক আদর্শগুলো মানুষকে সাম্য আর বৈষম্যহীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে ঠিক এর উল্টোটা।

১৯৬০-এর দশকে একজন সিইও (CEO) বা বড় কোম্পানির প্রধান কর্মকর্তা সাধারণ একজন শ্রমিকের চেয়ে প্রায় বিশ গুণ বেশি আয় করত। আজ, সেই একই সিইও তার শ্রমিকের বেতনের তিনশো গুণেরও বেশি আয় করে।[২৮] বৈষম্য কমেনি, বরং আক্ষরিক অর্থেই বিস্ফোরিত হয়েছে এবং সেটা কেবল সিইও-দের মধ্যেই সীমিত নেই।

ইয়েইল ইউনিভার্সিটির ড্যানিয়েল মার্কোভিটস আর হার্ভার্ডের মাইকেল স্যান্ডেলের মতো চিন্তাবিদরা দেখিয়েছেন, একই ধরনের ছবি দেখা যাচ্ছে অন্যান্য পেশাগুলোতেও।

মার্কোভিটসের মতে, অ্যামেরিকাতে ডাক্তাররা একসময় নার্সদের চার গুণ আয় করলেও, এখন তারা আট গুণ পর্যন্ত বেশি আয় করেন। আইন পেশায়, ল ফার্মের সিনিয়র পার্টনাররা একসময় তাদের সেক্রেটারির চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি আয় করতেন; এখন সেই ব্যবধান পৌঁছেছে চল্লিশ গুণে। ব্যাংকিং খাতে এই বৈষম্য আরও চরম, সেখানে সিনিয়র এক্সিকিউটিভরা একজন এন্ট্রি-লেভেল টেলারের চেয়ে এক হাজার গুণ পর্যন্ত বেশি আয় করতে পারে।[২৯]

এখানে মূল বিষয় নির্দিষ্ট সংখ্যা না, বরং অর্থনীতিগুলোর দীর্ঘমেয়াদি গতিপথ। পশ্চিমে শ্রমবাজারের মাঝখানটা ভেঙে পড়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির চাকরিগুলো; একসময় যেগুলো ছিল অর্থনীতির মূল শক্তি, হারিয়ে যাচ্ছে। বাজারের নিচের তলায় আছে কম বেতনের, অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা। আর একদম ওপরের তলায় বসে আছে সব সম্পদ আর ক্ষমতা হাতের মুঠোয় নেওয়া অল্প কিছু মানুষ। মাঝখানের মধ্যবিত্ত শ্রেণি হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।[৩০]

---

[২৮] Josh Bivens and Jori Kandra, "CEO Pay Has Skyrocketed 1,460% since 1978," Economic Policy Institute, October 4, 2022.

[২৯] Daniel Markovits, The Meritocracy Trap: How America's Foundational Myth Feeds Inequality, Dismantles the Middle Class, and Devours the Elite (New York: Penguin Press, 2019), 11-15. Also see: Michael J. Sandel, The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good? (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2020).

[৩০] David Autor and David Dorn, "The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market," American Economic Review 103, no. 5 (2013): 1553–97. OECD, Under Pressure: The Squeezed Middle Class (Paris: OECD Publishing, 2019). OECD, International Migration Outlook 2025 (Paris: OECD Publishing, 2025)

ভেঙে পড়া এই কাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে, সস্তা শ্রমের প্রয়োজন মেটাতে পশ্চিমা সরকারগুলো অভিবাসীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। কিন্তু এর ফলে তৈরি হচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন।

মধ্যবিত্ত যতই সংকুচিত হচ্ছে, ততই বাড়ছে রাজনীতির মেরুকরণ। পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে উত্থান হচ্ছে পপুলিস্ট বা জনতুষ্টিমূলক রাজনীতির। অভিবাসন বা ইমিগ্রেশনবিরোধী আবেগপূর্ণ বয়ান মানুষের সমর্থন পাচ্ছে। আর ক্ষমতাসীন শ্রেণি অভিবাসীদের নিয়ে বিতর্ককে কাজে লাগিয়ে মূল কাঠামোগত সংকট থেকে মনোযোগ সরিয়ে রাখছে সবার।

তবে বেতনের এই বৈষম্য তো কেবল সমস্যার উপরিতলে। গভীরে তাকালে দেখা যায়, আসল সমস্যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই। পুরো বিশ্বের অর্থনীতিটাই গুটিকয় প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে গেছে। পৃথিবীর শীর্ষ ১% ধনীর কাছে যে সম্পদ আছে, তা বাকি ৯৯% মানুষের সম্পদের চেয়ে বেশি।[৩১] পুরো পশ্চিমা দুনিয়ার বেশিরভাগ মিডিয়ার মালিক মাত্র পাঁচটি বড় কর্পোরেশন।[৩২]

অর্থনীতির মূল নিয়ন্ত্রক হয়ে আবির্ভূত হয়েছে তিনটি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি; ব্ল্যাকরক (BlackRock), ভ্যানগার্ড (Vanguard) আর স্টেইট স্ট্রিট (State Street)। এই তিন প্রতিষ্ঠান মিলে নিয়ন্ত্রণ করছে প্রায় ২২ ট্রিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ। অ্যাপল, মাইক্রোসফট, অ্যামাযন বা ফেসবুকের মতো দানবীয় কোম্পানিগুলোর শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা খুললে দেখা যায়, এই নামগুলোই ঘুরেফিরে শীর্ষে।[৩৩]

হাতেগোনা কয়েকটি কোম্পানির হাতে পুরো কর্পোরেট বিশ্ব, অর্থনীতি, শেয়ার বাজার এবং মিডিয়া বন্দি। তারাই নির্বাচনের প্রার্থী ঠিক করে, তারাই ফান্ড সংগ্রহ করে, তারাই লবিং করে এবং তারাই মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করে।

---

[৩১] ২০১৭ সালে অক্সফাম জানিয়েছিল, *'পৃথিবীর মাত্র আটজন বিলিয়নেয়ারের কাছে যে সম্পদ আছে, তা পৃথিবীর দরিদ্রতম অর্ধেক বা প্রায় ৩৬০ কোটি মানুষের মোট সম্পদের সমান।'* ২০২৪ সালের রিপোর্টে তারা জানিয়েছে, *'২০২০ সাল থেকে পৃথিবীর শীর্ষ পাঁচজন বিলিয়নেয়ারের সম্পদ দ্বিগুণ হয়েছে, অথচ একই সময়ে বিশ্বের প্রায় পাঁচ বিলিয়ন মানুষ আরও দরিদ্র হয়েছে।'* বিস্তারিত উৎসের জন্য দেখুন: Deborah Hardoon, *An Economy for the 99%* (Oxford: Oxfam International, January 2017), 2; এবং Nabil Ahmed et al., *Inequality Inc.* (Oxford: Oxfam International, January 2024), 9.

[৩২] Benson, Rodney, Mattias Hessérus, Timothy Neff, and Julie Sedel. *How media ownership matters.* Oxford University Press, 2025.

[৩৩] Jan Fichtner, Eelke M. Heemskerk, and Javier Garcia-Bernardo, "Hidden Power of the Big Three? Passive Index Funds, Re-concentration of Corporate Ownership, and New Financial Risk," Business and Politics 19, no. 2 (2017): 298–326.

এমন অবস্থায় সাম্য আর বৈষম্যহীনতার আলাপের কী অর্থ?

খোদ পশ্চিমেও এই আদর্শ আর বুলিগুলো তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। মানুষ এখন আর পুরোনো স্লোগানগুলোতে বিশ্বাস রাখতে পারছে না।

ভোক্তা

সাধারণ মানুষের কী অবস্থা? আদর্শের মৃত্যু এবং প্রকট বৈষম্যের এই যুগে তাদের জন্য কী বাকি রইল?

আগামীর পৃথিবী কেমন হবে, তা নিয়ে গত শতাব্দীতে অনেক জল্পনাকল্পনা হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষের কল্পনার ভবিষ্যত ছিল স্বপ্নের মতো। তবে কারও কারও ভাবনার জগতে ভবিষ্যত হাজির হয়েছিল দুঃস্বপ্নের চেহারা নিয়ে।

ব্রিটিশ লেখক জর্জ অরওয়েল তার বিখ্যাত উপন্যাস '১৯৮৪'-এ এমন পৃথিবীর ছবি এঁকেছিলেন, যেখানে রাষ্ট্র এক সর্বগ্রাসী দানব। নাগরিকদের ওপর সে প্রতিটি মুহূর্তে নজরদারি করে, তাদের ছোট-বড় প্রত্যেক সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করে। এক অমানবিক কাঠামোর মধ্যে পিষে ফেলে সবাইকে।

বিপরীতে আরেক ধরনের দুঃস্বপ্নের ভবিষ্যত কল্পনা করেছিলেন অ্যালডাস হাক্সলি। অরওয়েলের পৃথিবী ছিল নজরদারি, কঠোর নিয়মকানুন আর ভয়ের। হাক্সলি তার বই 'ব্রেইভ নিউ ওয়ার্ল্ড'-এ এমন এক পৃথিবীর ছবি আঁকলেন, যা আনন্দে ভরপুর। যেখানে শিশুদের জন্ম হয় ল্যাবরেটরিতে, বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী তাদের ভাগ করা হয় নানা শ্রেণিতে। তারপর সেই মানুষের সময় কাটে মদ, মাংস আর বিনোদনের আরামদায়ক আলস্যে। জীবন কেটে যায় নিরন্তর, নিয়মিত আনন্দের চক্রে। এখানে মানুষ দাসত্বকে বরণ করে নেয় হাসতে হাসতে, স্বেচ্ছায়।

আজকের বিশ্বকে এই দুই দুঃস্বপ্নের অদ্ভুত মিশ্রণ বলা যায়। যেখানে পাল্লাটা হাক্সলির 'ব্রেইভ নিউ ওয়ার্ল্ড'-এর দিকে হেলে আছে। আধুনিক মানুষ আরাম, আনন্দ, আর হাজারো বিনোদনে এমনভাবে অবশ হয়ে গেছে, জীবন তার আসল অর্থই হারিয়ে ফেলেছে।

তবে কোভিডের সময় আমরা খুব ভালোভাবে দেখেছি, ব্রেইভ নিউ ওয়ার্ল্ড-এর আরামের দুনিয়াটা কত সহজে ১৯৮৪-এর পৃথিবীতে পাল্টে যেতে পারে। এক মুহূর্তেই আরামের খাঁচাটা পরিণত হতে পারে নিরেট লোহার খাঁচায়; যেখানে আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপ, প্রতিটা নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রিত।

কেউ বলতে পারে, বৈশ্বিক পুঁজিবাদের কারণে কোটি কোটি মানুষের জীবন আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। পৃথিবীতে এখন কোটি কোটি মানুষের হাতে স্মার্টফোন আছে, ইন্টারনেট আছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের পাশাপাশি বিনোদনও এখন মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে গেছে। এগুলো তো উন্নতিই।

সত্য। তবে এটা মুদ্রার এক পিঠ। অন্য পিঠে কী?

সপ্তাহে ৬ দিন, দিনে ১০ ঘণ্টা কেবল বেঁচে থাকার জন্য জীবিকার পেছনে দৌড়ানো। বছরের পর বছর, নিরন্তর—এটা কি স্বাধীনতা? নাকি বেতনভুক্ত দাসের জীবন?

যে জীবনে মানুষ ক্রমাগত কোনো-না-কোনো অতিকায় কর্পোরেশন বা রাষ্ট্রের জন্য খেটে যায়। বিনিময়ে পায় কাজের বাইরের অল্প সময়টুকুতে সুলভ মূল্যে নাচ, গান, সিনেমা, সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রলিং, পর্ন, ড্রাগস, খাওয়াদাওয়া আর ভ্রমণের নিশ্চয়তা। আর এসবের পেছনে যে টাকাটা সে খরচ করে, সেটাও ঘুরেফিরে গিয়ে জমা হয় কোনো-না-কোনো কর্পোরেশন আর রাষ্ট্রের ভান্ডারে। অল্প কিছু মানুষের হাতে।

এ কেমন স্বাধীনতা?

পুরোনো দিনের দাসত্বে মানুষ জানত যে, তারা পরাধীন, তাদের পায়ে শেকল ছিল। তাই তারা বিদ্রোহ করত। কিন্তু ভোগবাদের এই নতুন দাসত্বে, মানুষ স্বেচ্ছায়, হাসিমুখে দাসত্বের শেকল পরে নেয়। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, আরও বেশি জিনিস কিনলেই তারা সুখী হবে। তারা নিজেদেরকে দাস হিসেবেও দেখে না। আর যেহেতু তারা নিজেরাই এই ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছে, তাই এর বিরুদ্ধে তারা কখনো বিদ্রোহও করে না।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নাকি নব্য-দাসত্বের ইশতেহার?

আধুনিক মানুষ যদি কোনো কিছুর ওপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, তবে তা হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। কিন্তু এখানেও আধুনিকতার মনস্তত্ত্ব আর পুঁজিবাদ মিলে তৈরি করেছে ভয়ঙ্কর সংকট।

অসীম প্রবৃদ্ধির মরীচিকা: হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ সমুদ্র উপকূল থেকে মাছ ধরেছে, গাছ কেটেছে বন থেকে। কিন্তু সমুদ্রের মাছ ফুরিয়ে যায়নি বা বন উজাড় হয়ে যায়নি। কারণ মানুষ নিজেকে প্রকৃতির জীবনচক্রের অংশ মনে করেছে, সে একবারে সবটুকু শুষে নিতে চায়নি।

তখন অর্থনীতি ছিল প্রয়োজনের, আর এখন অর্থনীতি লোভের।

আধুনিক পুঁজিবাদ ভুলে গেছে একটা সসীম গ্রহে অসীম প্রবৃদ্ধি অসম্ভব। তাই সে প্রকৃতিকে আমানত হিসেবে সম্মান না করে দেখেছে কেবল কাঁচামালের খনি হিসেবে। আধুনিকতার প্রতিশ্রুতি ছিল—সবার উন্নয়ন হবে, সমৃদ্ধি আসবে। বাস্তবে আধুনিক মানুষ প্রকৃতির ওপর চূড়ান্ত শোষণ চালিয়ে পরিবেশকে ধ্বংস করেছে।

সহাবস্থানের বদলে, আধুনিক মানুষ চেষ্টা করেছে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে। জন্ম দিয়েছে আজকের এই বিপর্যয়ের। নিখুঁত শোষণযন্ত্রের সুবাদে আজ আমরা প্রকৃতির সহনসীমা অতিক্রম করেছি, যার অনিবার্য ফল হিসেবে জলবায়ুর ভারসাম্য আজ ধ্বংসের মুখে।

উন্নত দেশগুলো নিজেদের মুনাফার জন্য দশকের পর দশক ধরে পরিবেশ ধ্বংস করেছে। সম্পদ জমা করেছে নিজেরা। তারাই এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ কমানোর উপদেশ দিচ্ছে। আবার একইসাথে তাদের ধনকুবেররা দেদারসে হাকাচ্ছে ব্যক্তিগত জেট বিমান।

অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে যে মানবিক বিপর্যয় তৈরি হচ্ছে—ভয়াবহ বন্যা, খরা, ফসলহানি—তাতে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হচ্ছে দরিদ্র দেশগুলোর সাধারণ মানুষ।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-পর্ন, প্রফিট ও প্রোপাগান্ডা: এর সাথে যোগ হয়েছে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি বনি আদমের অসামান্য প্রতিভার প্রমাণ। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের সবচেয়ে খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রচণ্ডরকমের তীব্রতা দেবে, এমন আশঙ্কাও দিন দিন বাড়ছে।

এআই নিয়ে এরই মধ্যে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটে ব্যাপক ফটকাবাজি (speculative trading) চলছে, যা ২০০০ সালের ডট-কম মার্কেট কিংবা ০৭-০৮ এর হাউসিং মার্কেটের মতো বা তার চেয়েও বড় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি করেছে। পাশাপাশি এআই-এর চকচকে ডেমো আর জাদুকরি সব ভিডিওর আড়ালে ঘটে যাচ্ছে শ্রমবাজার আর শ্রেণি কাঠামোর এক নির্মম পুনর্গঠন। বিশ্বজুড়ে কাস্টমার সার্ভিস, অনুবাদ বা কোডিং থেকে শুরু করে অফিসের সাধারণ কাজের মতো অনেক কিছুই অটোমেশনের পেটে চলে যাচ্ছে। ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে শ্রমিক ও চাকরিজীবীদের দর কষাকষির ক্ষমতা।

এআই সংক্রান্ত গবেষণার প্রভাব পড়ছে সমাজ, অর্থনীতি, পরিবেশ; সব দিকে। এক হিসেবে দেখা গেছে এআই অবকাঠামোর প্রসারের জন্য বছরে যে পরিমাণ

বাড়তি বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে, তা ক্যালিফোর্নিয়ার মতো প্রায় চার কোটি মানুষের একটা জনপদের বার্ষিক মোট ব্যবহারের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি। এই বিপুল চাহিদা মেটাতে গিয়ে কয়লা আর তেলের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। পরিবেশের কথা ভেবে যেসব কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার কথা ছিল, সেগুলো এখন আবার চালু করা হচ্ছে।[৩৪]

শুধু বিদ্যুৎ না, ডেইটা সেন্টারগুলোকে ঠান্ডা রাখতে প্রচুর পরিষ্কার পানির প্রয়োজন হয়। লবণাক্ত বা ময়লা পানি ব্যবহার করলে দামি যন্ত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে বলে সরাসরি সুপেয় পানি এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু বেশিরভাগ ডেইটা সেন্টার এমন সব জায়গায় তৈরি হয়েছে, যেখানে এমনিতেই পানির তীব্র সংকট। তৃষ্ণার্ত মানুষের পানি এখন খরচ হচ্ছে যন্ত্রপাতি ঠান্ডা রাখতে।[৩৫]

অন্যদিকে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে অবধারিতভাবে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এক অনিশ্চিত, 'গিগ-ইকোনমি' নির্ভর টিকে থাকার লড়াইয়ে। দক্ষতার দোহাই দিয়ে মানুষের শ্রমকে স্রেফ সস্তা পণ্যে নামিয়ে আনা হয়েছে। আসল ক্ষমতা আর মুনাফা গিয়ে জমা হচ্ছে তাদের হাতেই, যারা এই এআই অবকাঠামোর চাবি নিয়ন্ত্রণ করে।

যে অ্যালগরিদম আপনাকে সুন্দর ছবি বানিয়ে দিচ্ছে বা মজার মজার আলাপ করছে, সেই একই সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে পুরো জনগোষ্ঠীর ওপর নজরদারি আর শাসনের কাজে। ফেসিয়াল রিকগনিশন দিয়ে আন্দোলনকারী চেনা, কিংবা অ্যালগরিদম দিয়ে ঋণ বা ভিসা আটকে দেওয়া; সবই আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে এআই-এর হাতে। 'ওয়ার অন টেরর' একসময় শুরু হয়েছিল বন্দুক দিয়ে, এখন সেটা চলছে ক্যামেরা আর ডেইটাবেস দিয়ে।

তার সাথে যুক্ত হয়েছে সিন্থেটিক বা জাল ছবি আর ডিপফেইক ভিডিওর বন্যা। এমন এক পৃথিবী তৈরি হচ্ছে, যেখানে কোনো ফুটেজ বা কণ্ঠস্বর বিশ্বাস করার উপায় নেই। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এআই-এর বানানো ভুয়া ছবি দিয়ে প্রোপাগান্ডা আর ব্ল্যাকমেইলিং।

ওদিকে সবচাইতে বড় এআই কোম্পানি ঘোষণা দিয়েছে, তারা মানুষকে পছন্দমতো পর্নোগ্রাফি বানানোর সুযোগ দেওয়ার কথা ভাবছে![৩৬] কিছু কোম্পানি কোমর বেঁধে নেমে গেছে মানুষের মতো দেখতে রোবট বানাতে, যারা নিঃসঙ্গ মানুষের 'গার্লফ্রেন্ড' বা 'বয়ফ্রেন্ড'-এর ভূমিকায় অভিনয় করবে।

---

[৩৪] Hao, Karen. Empire of AI: Dreams and nightmares in Sam Altman's OpenAI. Penguin Group, 2025.

[৩৫] প্রাগুক্ত

[৩৬] Dan Milmo, "OpenAI considers allowing users to create AI-generated pornography," *The Guardian*, May 9, 2024, accessed December 21, 2025.

অভূতপূর্ব এই আবিষ্কারকে আধুনিক মানুষ কাজে লাগাচ্ছে পর্ন, প্রফিট, প্রোপাগান্ডা আর আলস্যের জন্য।

মানুষ থেকে উত্তর-মানুষ: আর এরই মধ্যে কিছু কিছু মানুষ স্বপ্ন দেখছে মানুষ হবার অর্থই বদলে ফেলার। ট্র্যান্সহিউম্যানিসম (Transhumanism) নামের দর্শনের অনুসারীরা বলছে, এতদিন বিবর্তন হয়েছে প্রকৃতির খেয়ালে, এখন বিবর্তন হবে মানুষের ইচ্ছেমাফিক। মানুষের ঠুনকো দেহকে বদলে ফেলা হবে জিনোমিকস, বায়োটেকনোলজি আর ন্যানোটেকনোলজির মাধ্যমে। অস্থিতিশীল মস্তিষ্ক যুক্ত করা হবে সর্বাধুনিক এআই-এর সাথে। প্রযুক্তির সাথে মানুষের মিশেলে তৈরি হবে নতুন এক প্রজাতি। যে প্রজাতি অতিমানবীয় জ্ঞান, শক্তি আর আয়ুর অধিকারী।

হিউম্যান থেকে পোস্ট-হিউম্যান। মানুষ থেকে উত্তর-মানুষ।

মানুষের তৈরি প্রযুক্তি এখন মানুষকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে খোদ মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করার।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী আর ক্ষমতাধর মানুষেরা বিচিত্র এবং ভয়ংকর এক ভবিষ্যতের ছবি আঁকছে। ওয়ার্ল্ড একোনমিক ফোরাম-এর মতো প্ল্যাটফর্ম থেকে বলা হচ্ছে, আগামীর পৃথিবীকে টেকসই করতে হলে সাধারণ মানুষকে আক্ষরিক অর্থেই পোকামাকড় আর ল্যাবে তৈরি মাংস খেতে হবে। তারা এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলছে, যেখানে—

> You will own nothing, and be happy.
>
> 'আপনার কোনো মালিকানা থাকবে না, এবং তাতেই আপনি খুশি থাকবেন।'[৩৭]

তাদের স্বপ্ন এমন এক ভবিষ্যত, যেখানে সাধারণ মানুষ প্রোটিনের জন্য পোকামাকড় খায়, সস্তা বিনোদনে মজে থাকে। অন্যদিকে সব সম্পদ, প্রযুক্তি আর উৎপাদনের চাবিকাঠি কুক্ষিগত থাকে হাতেগোনা কয়েকজনের কাছে। সাধারণ মানুষের মালিকানা বলে আর কিছু থাকে না, সবকিছু চলে ভাড়া বা সাবস্ক্রিপশন মাফিক।

---

[৩৭] Ida Auken, "Welcome to 2030: I Own Nothing, Have No Privacy and Life Has Never Been Better," World Economic Forum, November 11, 2016. World Economic Forum. "8 Predictions for the World in 2030." Facebook video. Posted 2016. https://tinyurl.com/cp9m3w3m

Antoine Hubert, "5 Reasons Why Eating Insects Could Reduce Climate Change," World Economic Forum, February 9, 2022; see also: "Good Grub: Why We Might Be Eating Insects Soon," World Economic Forum, July 16, 2018. মাংসের 'টেকসই বিকল্প' হিসেবে পোকামাকড়জাত প্রোটিনের পক্ষে WEF ক্রমাগত ওকালতি করে আসছে।

এই ভয়ংকর স্বপ্নকে তারা জায়েজ করতে চাইছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব-এর মতো গালভরা বুলি দিয়ে। কিন্তু বাস্তবে এটা জর্জ ওরওয়েলের '১৯৮৪' আর অ্যালডাস হাক্সলির 'ব্রেইভ নিউ ওয়ার্ল্ড'-এর আরও ভয়ংকর এক মিশ্রণ।

যখন একটা সভ্যতা মরে যায়

গত তিনশ বছর ধরে পৃথিবী চলেছে পশ্চিমাদের তৈরি ছকে। তাদের আদর্শ, তাদের কাঠামোই সারা বিশ্বে রাজত্ব করেছে। প্রকাশ্য উপনিবেশবাদের যুগ শেষ হবার পর আমরা পশ্চিমের কবল থেকে বাহ্যিকভাবে ছাড়া পেয়েছি, কিন্তু তারপরও আমরা তাদের চোখ দিয়েই পৃথিবীকে দেখেছি, তাদের চাপিয়ে দেওয়া আদর্শগুলোকেই আঁকড়ে ধরেছি।

কিন্তু আজ সেই দাপট, সেই জাঁকজমক, আর সেই 'অজেয়' সভ্যতা পতনের দ্বারপ্রান্তে।

আজ থেকে শত শত বছর আগে, সভ্যতার জীবনচক্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনু খালদুন বলেছিলেন, প্রত্যেক সভ্যতারই উত্থান হয়, আবার পতনও হয়। আর পতনের ঠিক আগেই আসে অবক্ষয়ের কাল। আজ পশ্চিমের দিকে তাকালে আমরা ইবনু খালদুনের সেই অবক্ষয়কালের চিত্রই দেখতে পাই।

সবগুলো প্রবণতা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, আগামীতে পশ্চিমা বিশ্বে গণতন্ত্র আর নাগরিক স্বাধীনতা আরও সংকুচিত হবে। রাষ্ট্র ধীরে ধীরে হয়ে ওঠবে আরও বেশি দমনমূলক আর স্বৈরাচারী। আরও বেশি মাত্রায় মিলেমিশে একাকার হবে রাষ্ট্রযন্ত্র এবং মেগা-কর্পোরেশনগুলো। সেই সাথে অর্থনৈতিক পতনের আশঙ্কাও বাড়বে।

অভিবাসনের ওপর সরকারগুলোর নির্ভরশীলতার কারণে বাড়বে সামাজিক অস্থিরতা আর সংঘাত। ক্রমশ শক্তিশালী হবে উগ্র-ডান ও উগ্র-বাম রাজনীতি। দেশের ভেতরের এই গন্ডগোল থেকে মানুষের মনোযোগ সরাতে রাজনৈতিক নেতারা দুটো কাজ করার চেষ্টা করবে।

প্রথমত, তারা সস্তা বিনোদন, ভার্চুয়াল জগতের আফিম আর আরামদায়ক আলস্যের যোগান বাড়িয়ে দেবে; সেই 'You will own nothing, and be happy'-এর পৃথিবী।

দ্বিতীয়ত, তারা দেশের বাইরে নতুন সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে। ইতিহাস বলে, যখনই কোনো সাম্রাজ্য ভেতর থেকে ভেঙে পড়ে, তখন শাসকরা জনগণের ক্ষোভকে প্রশমিত করতে এবং জাতীয়তাবাদকে উসকে দিতে 'বাইরের শত্রু' বা যুদ্ধকে ব্যবহার করে।

পশ্চিম নিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্যবস্থার এই পতন কেবল তাদের সীমান্তের ভেতরেই সীমিত থাকবে না। আগুনের আঁচ এসে লাগবে আমাদের গায়েও। এরইমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বব্যবস্থার এই বিশাল ফাটলগুলোর প্রভাব সরাসরি পড়ছে আমাদের আঞ্চলিক ভূরাজনীতিতে।

তাই যুগসন্ধির সংকটের আন্তর্জাতিক ক্যানভাস থেকে এবার নজর ফেরানো যাক আমাদের নিজেদের অঞ্চলে। দেখা যাক, বৈশ্বিক এই প্রলয়ের প্রেক্ষাপটে কী ঘটছে আমাদের আশেপাশে।

আগুনের বৃত্ত

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নাকি একবার বলেছিলেন,

'একটি দেশের ভূগোলই তার ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়।'[৩৮]

বাংলাদেশের জন্য এই কথাটা একই সাথে চরম সত্য এবং সতর্কবার্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ আমরা কার্যত এক ভূরাজনৈতিক 'রিং অফ ফায়ার' বা আগুনের বলয়ের মাঝখানে আটকা পড়ে আছি। যুগসন্ধির পালাবদলের প্রকম্পন আমাদের চারপাশে তৈরি করেছে ভয়ংকর সব ফাটল।

পানির যুদ্ধ

বলা হয়ে থাকে, বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধগুলো হয়েছিল তেলের জন্য, কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ হবে পানির জন্য। উপমহাদেশের ক্ষেত্রে এটা নিষ্ঠুর বাস্তবতা।

ভারতীয় উপমহাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর একটা, এবং একই সাথে সবচেয়ে পানিসংকটপূর্ণ এলাকা। হিমালয় থেকে আসা প্রধান নদীগুলো—সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, সবই—বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে ভারত হয়ে। ভূরাজনীতিতে, উজানে থাকার এই সুবিধাকে বলে হাইড্রো-হেজেমনি (hydro-hegemony); নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে ভাটির দেশকে চাপে ফেলার ক্ষমতা। আর এ ক্ষমতা পুরোদমে ব্যবহার করছে ভারত।

নদীর পানির ওপর ভারতের নিয়ন্ত্রণকে পাকিস্তান দেখে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন হিসেবে। সিন্ধু চুক্তি থাকার পরও পানি নিয়ে বারবার ভারতের সাথে বিরোধ হয়েছে পাকিস্তানের। নদী আর বাঁধ নিয়ে ভারতের আচরণকে নেপাল মনে করে 'জলবিদ্যুৎ উপনিবেশবাদ'। ভুটান বলতে গেলে পানি আর বিদ্যুতের জন্য ভারতের কাছে জিম্মি। ভারতের আধিপত্যবাদী আচরণ সব প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেই এক।[৩৯]

---

[৩৮] Veit Valentin, *The German People*, trans. Olga Marx (New York: Alfred A. Knopf, 1946), 2.

[৩৯] Hanifeh Rigi and Jeroen F. Warner, "Pakistan's Representation of Transboundary Water as a Security Issue," *International Journal of Water Resources Development* 39, no. 6 (2023): 939–962; World Bank, "Fact Sheet: The Indus Waters Treaty 1960 and the Role of the World Bank,"; Promod Tandan, "Challenging hydro-hegemony of India: resistance of Nepal in the Upper Karnali and Saptakoshi dam project," *Sustainable Water Resources Management* 7 (2021): Article 106; World Bank, *Bhutan Hydropower Sector Study: Opportunities and Strategic Options* (Washington, DC: World Bank, 2008).

কিন্তু পানি নিয়ে ভারতীয় আধিপত্যের নোংরা লড়াইয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশ। এই বদ্বীপের মানুষ পানির জন্য নদীর ওপর নির্ভরশীল। নদীর পানি সরাসরি আমাদের টিকে থাকার সংগ্রামের সাথে জড়িত।

এখানে ভারত বাংলাদেশের ওপর প্রথম আঘাত করে ১৯৭৫ সালে, ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে। কাগজে-কলমে এর উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা বন্দরকে পলিমাটি থেকে মুক্ত করা। কিন্তু এর প্রভাবে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে তৈরি হয় মানবসৃষ্ট খরা। ফারাক্কার কারণে শুকনো মৌসুমে গঙ্গার প্রবাহ নাটকীয়ভাবে কমে যায়, ভেতরে ঢুকে পড়ে বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ততা। ধ্বংস হয়ে যায় ফসল, পানীয় জল এবং মৎস্য সম্পদ। গত পাঁচ দশকে ফারাক্কার প্রভাবে ভেঙে পড়েছে পাবনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহীর কৃষিব্যবস্থা। ফারাক্কার মাধ্যমে নদীর পানিকে সুচারুভাবে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে ভারত।

তার চেয়েও বড় সংকট তৈরি হয়েছে তিস্তাকে কেন্দ্র করে। ফারাক্কা যদি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে পঙ্গু করে থাকে, তবে গজলডোবা ব্যারেজ ধ্বংস করছে উত্তরাঞ্চলকে। রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রামের সেচব্যবস্থা তিস্তার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু গজলডোবা বাঁধ দিয়ে শুকনো মৌসুমে ভারত একতরফাভাবে বেশিরভাগ পানি সরিয়ে নেয়। আমাদের নদীগুলো তখন হয়ে যায় ধু-ধু মরুভূমি। আর বর্ষায় অতিরিক্ত পানি ছেড়ে দিয়ে ভারত ভাসিয়ে দেয় আমাদের ঘরবাড়ি।

পানি নিয়ে জটিল এই সমীকরণে এখন ঢুকে পড়েছে চীনও। ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি তিব্বতে, যা সেখানে পরিচিত ইয়ারলুং সাংপো নামে। সেখানে বড় বড় বাঁধ তৈরি করছে চীন। ফলে ভারতে আসা ব্রহ্মপুত্রের পানি নিয়ন্ত্রণ করছে চীন, আর ভারত নিয়ন্ত্রণ করছে বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র আর তিস্তার পানি। কিন্তু সবচেয়ে ভাটির দেশ হওয়ায় সবচাইতে বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে বাংলাদেশকে।

সংকট হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। পর্যাপ্ত পানি ছাড়া উন্নয়ন বা বিকাশ দূরের কথা, একটা দেশ টিকেও থাকতে পারে না। কিন্তু সংকট এখানেই শেষ না। এর সাথে যোগ হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন। এই সবগুলো নদীর উৎস হিমালয়ের বরফ। আর প্রতি বছর এই বরফ গলে যাচ্ছে ভয়াবহ দ্রুততায়।

বরফ কম, বাঁধ বেশি, জনসংখ্যা বেশি। তিনে মিলে তৈরি হওয়া সংকটে ২০৫০ সাল নাগাদ দক্ষিণ এশিয়ায় পানির চাহিদা ও বিদ্যমান সরবরাহের মধ্যে ৩০–৫০% ঘাটতি তৈরি হতে পারে।[৪০]

---

[৪০] 2030 Water Resources Group, *Charting Our Water Future: Economic Frameworks to Inform Decision-Making* (2009)

এভাবে চলতে থাকলে পানিসংকট উত্তরাঞ্চলের গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্নে পরিণত হবে। বিদ্যমান কাঠামো কোনোভাবেই আর টেকসই না। আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে, এই কাঠামো বদলাতেই হবে।

ভারতীয় আধিপত্যবাদ

পানি নিয়ে ভারতের এই আধিপত্যবাদী আচরণের পেছনে মূল চালিকাশক্তি হলো ভারতের আঞ্চলিক মোড়ল হবার স্বপ্ন। ভারত পরাশক্তি হতে চায়। দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়াকে তারা দেখে নিজেদের প্রভাববলয় হিসেবে। ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে উপমহাদেশের মানচিত্র বদলে দিতে চায় তারা।

হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন এ কথা খোলাখুলি বলে, অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার নামে। কাছাকাছি ধরনের সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্ক্ষা রাখে অন্যান্য রাজনীতিক শক্তি এবং ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ। তারা হয়তো আরএসএস এর মতো একই ভাষা ব্যবহার করে না, হয়তো একই আদর্শে বিশ্বাসও করে না, কিন্তু উপমহাদেশে আধিপত্য কায়েমের ব্যাপারে একই ধরনের সম্প্রসারণবাদী নীতিই চর্চা করে। তাদের ভাষা ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য এক। উপমহাদেশে দিল্লির একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম রাখা।

এই নীতির কারণে, ভারতের কাছে বাংলাদেশ বরাবরই একটা জটিল প্রশ্ন। মুসলিম প্রধান বাংলাদেশ কার্যত ভারতের দুটো অংশকে আলাদা করে রেখেছে। ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশের একদিকে আছে ভারতের অস্থিতিশীল উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলো। যেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদ পুরোনো সমস্যা।

অন্যদিকে আছে পশ্চিমবঙ্গ, যার সাথে বাংলাদেশের আছে গভীর ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক সম্পর্ক। সবচাইতে বড় কথা, পশ্চিমবঙ্গের সীমানা জুড়ে আছে এক বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠী। সীমান্তের দুই দিকে এই বিপুল সংখ্যক বাঙালি মুসলিমের উপস্থিতি দিল্লির জন্য এক চিরস্থায়ী অস্বস্তির কারণ।

দিল্লির ভয় হলো, শক্তিশালী বাংলাদেশ ভবিষ্যতে এই জনতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক সমীকরণগুলোকে ব্যবহার করে ভারতের অখণ্ডতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। তাই ভারতের নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের চোখে বাংলাদেশের স্বাধীন ও শক্তিশালী অস্তিত্ব সব সময়ই একটা নিরাপত্তার সংকট।

এ-কারণে দল-মত নির্বিশেষে সব ভারতীয় সরকারই বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চালিয়েছে। আধিপত্য ধরে রাখার জন্য দশকের পর দশক ধরে

বাংলাদেশে তারা গড়ে তুলেছে শক্তিশালী গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক। সহায়তা দিয়েছে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে। সেই সাথে চালিয়েছে নানা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড।

এর সবচেয়ে জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলন আর পিলখানা হত্যাকাণ্ড।

১৯৭৩ সালে, ভারতের মদদে স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৬টি জেলাকে বাংলাদেশ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে আলাদা 'হিন্দু প্রজাতন্ত্র' বা 'বীরবঙ্গ' তৈরি করা।

বাংলাদেশকে দু' টুকরো করার এই চক্রান্ত চালানো হয় ভারতের প্রত্যক্ষ মদদে এবং তাদের মাটি ব্যবহার করে। কলকাতা ও বনগাঁ থেকে পরিচালিত এই আন্দোলনের সশস্ত্র শাখা 'বঙ্গসেনা' প্রকাশ্যে বাংলাদেশের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিত।[৪১]

তারচেয়েও ভয়াবহ আঘাত ছিল ২০০৯ সালের পিলখানা হত্যাকাণ্ড। মাত্র দু দিনের এই হত্যাযজ্ঞে প্রাণ হারায় সেনাবাহিনীর ৫৭ জন অফিসার। ১৯৭১ সালের পুরো নয় মাসের যুদ্ধে সব পক্ষ মিলিয়ে যতজন সেনা অফিসার মারা গেছে, পিলখানায় হত্যা করা হয়েছে তার চেয়েও বেশি অফিসারকে। এই ঘটনার মাধ্যমে কার্যত বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কার্যকারিতাকে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রচলিত সামরিক লজিক অনুযায়ী, ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের 'ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স' বা প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যূহ হলো সীমান্তরক্ষী বাহিনী আর সেনাবাহিনী। পিলখানার মাধ্যমে এই ব্যূহকে ধসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতের আধিপত্যবাদী নকশা বাস্তবায়নের পথ নিরঙ্কুশ করতেই যে এই ম্যাসাকার চালানো হয়েছিল, তা আজ স্পষ্ট।

আগামীতে ভারত এ-ধরনের আরও নানা প্রকল্প চালিয়ে যাবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এছাড়া আওয়ামী লীগের মতো রাজনৈতিক দল, এখানকার সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া অভিজাতদের সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশ, এবং ব্যবসায়ীদের একটি

[৪১] ১৯৭৩ সাল থেকে এই আন্দোলনের শুরু হলেও ১৯৮২ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি'র তথাকথিত প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়। এই আন্দোলনের প্রধান তাত্ত্বিক কালিদাস বৈদ্য, আর 'রাষ্ট্রপতি' ছিলেন পার্থ সংহতি। তারা বাংলাদেশের বৃহত্তর ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালী—এই ৬টি জেলা নিয়ে 'হিন্দুস্থান' বা 'বঙ্গভূমি' নামের আলাদা রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দেন। তাদের সশস্ত্র সংগঠন 'বঙ্গসেনা' ও 'মুক্তি পরিষদ' বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাশকতার পরিকল্পনা করত এবং ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে প্রকাশ্যে তাদের কার্যক্রম চালাত। কোনো প্রতিবেশী দেশের মাটিতে বসে এমন সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যক্রম চালানো সেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রশ্রয় ছাড়া সম্ভব নয়।

মহলও ভারতের এই আধিপত্যবাদী প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। ভারতের শক্তিশালী গুপ্তচর নেটওয়ার্ক বাংলাদেশে সক্রিয় বিভিন্ন স্তরে।

ওপরের সবকিছু এই কওম ও যমীনের অস্তিত্বের জন্য হুমকি।

বাংলাদেশ যেমন ভারতের জন্য চিরস্থায়ী মাথাব্যথার কারণ, ঠিক তেমনি ভারতীয় আধিপত্যবাদও বাংলাদেশের জন্য এক নিরন্তর অস্তিত্বের সংকট।

বার্মা এবং দ্যা গ্রেট গেইম

ভূরাজনীতি নিয়ে চিন্তার সময় আমাদের মনোযোগ থাকে ভারতের দিকে। পূর্ব সীমান্তে তৈরি হওয়া সংকট অনেক ক্ষেত্রেই আমরা খেয়াল করি না। ভারতের হুমকির পাশাপাশি, বার্মা এবং বঙ্গোপসাগর ঘিরে তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু আরও জটিল এক সংকট। বার্মার গৃহযুদ্ধ পরিণত হয়েছে এক জটিল ভূরাজনৈতিক দাবার বোর্ডে। গৃহযুদ্ধের পাশাপাশি এখানে চলছে বিভিন্ন শক্তির স্বার্থের প্রতিযোগিতা।

খেলাটাকে বুঝতে হলে আমাদের তাকাতে হবে হাজার মাইল দূরের এক সরু সামুদ্রিক পথের দিকে, যার নাম মালাক্কা প্রণালি। চীনের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে যে বিপুল পরিমাণ তেল লাগে, তার প্রায় ৬০-৮০ শতাংশের মতো আসে এই মালাক্কা প্রণালি দিয়ে। এই মেরিটাইম চোকপয়েন্ট চীনের জন্য একটি সাংঘাতিক দুর্বলতা।[৪২] বেইজিং খুব ভালো করে জানে, অ্যামেরিকার সাথে যদি কখনো কোনো সংঘাত বাধে, তবে মার্কিন নৌবাহিনী খুব সহজেই এই সরু পথ বন্ধ করে চীনের অর্থনীতিতে ধস নামাবে।

এ মরণফাঁদ থেকে বাঁচতে চীনের দরকার বিকল্প রাস্তা। আর ঠিক এই কারণেই চীনের কাছে আরাকান গুরুত্বপূর্ণ। আরাকানের কিয়াকফিউ-তে চীন গভীর সমুদ্রবন্দর আর বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বানাচ্ছে। সেখান থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল চলে যাচ্ছে সোজা চীনের ইউনান প্রদেশে, মালাক্কা প্রণালিকে বাইপাস করে।

ওদিকে চীনের পরিকল্পনা উল্টে দিতে কোমর বেঁধে নেমেছে অ্যামেরিকা। তারা এনেছে 'ফ্রি অ্যান্ড ওপেন ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি' আর 'বার্মা অ্যাক্ট'।[৪৩]

---

[৪২] **মেরিটাইম চোকপয়েন্ট:** সমুদ্রের এমন এক সরু পথ বা মোহনা, যা দিয়ে প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করে। যুদ্ধের সময় এখানে সহজেই অবরোধ সৃষ্টি করে প্রতিপক্ষের চলাচল ও বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া যায় বলে একে 'চোকপয়েন্ট' বা শ্বাসরোধকারী পয়েন্ট বলা হয়।

[৪৩] National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023, Pub. L. No. 117-263, §

এই অ্যাক্টের আড়ালে বার্মার জান্তাবিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে অ্যামেরিকা।

হিসাবটা সহজ: জান্তা সরকার যেহেতু চীনের মেগা প্রকল্পগুলো পাহারা দিচ্ছে, তাই চীনের বিনিয়োগকে হুমকিতে ফেলতে হলে শক্তিশালী করতে হবে জান্তা-বিরোধীদের। অ্যামেরিকা চায় আরাকানের নিয়ন্ত্রণ এমন কারও হাতে থাকুক, যারা বেইজিংয়ের বদলে ওয়াশিংটনের কথা শুনবে।

আরাকান নিয়ে আছে ভারতেরও নিজস্ব পরিকল্পনা। কালাদান মাল্টি-মোডাল ট্রানজিট প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে ভারত তার উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোকে (সেভেন সিস্টার্স) সমুদ্রপথে মূল ভূখণ্ডের সাথে জুড়ে দিতে চায়। এতে করে 'চিকেনস নেক' বা শিলিগুড়ি করিডোরের ওপর তাদের নির্ভরতা অনেকটাই কমে আসবে।

তিন শক্তির এই কাড়াকাড়ির মাঝখানে বাংলাদেশ পড়েছে বিপজ্জনক অবস্থায়। আরাকানে বিদ্রোহীদের রসদপত্র বা জ্বালানি সরবরাহের জন্য কক্সবাজার আর চট্টগ্রাম বন্দর সবচেয়ে সুবিধাজনক রুট। অন্যদিকে সেইন্ট মার্টিনস দ্বীপের কৌশলগত অবস্থান এই গ্রেট গেইমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

আধিপত্যের এই টানাপোড়েন পুরো অঞ্চলকে ছায়া যুদ্ধের ময়দান বানিয়ে ফেলেছে, যা সরাসরি হুমকির মুখে ফেলছে আমাদের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে।

সবমিলিয়ে আরাকান এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। খেলছে পরাশক্তিগুলো, কিন্তু সেই খেলার মাশুল গুনতে হচ্ছে আমাদের। বার্মার এই আগুন আমাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে বাস্তুচ্যুত মানুষের এক বিশাল স্রোত, যাকে আমরা বলছি রোহিঙ্গা সংকট।

আকিয়াবের প্রাচীর

বছরের পর বছর রোহিঙ্গা সংকটকে আমরা স্রেফ একটা মানবিক বিপর্যয় হিসেবে দেখে এসেছি। কিন্তু নাফ নদীর ওপারে যা হচ্ছে, তা কেবল শরণার্থী সমস্যা না। এই নদী দুই সভ্যতার মাঝখানে গভীর এক বিভাজন রেখা।

ঐতিহাসিকভাবে এর একপাশে থেকেছে মুসলিম সভ্যতা, অন্যপাশে চৈনিক-বৌদ্ধ সভ্যতা। তাই এ নদীর চারপাশের দ্বন্দ্বটা এক অর্থে সভ্যতার সংঘাতের অংশ। ইতিহাস বলে, এ-ধরনের সংঘাত কখনো শান্তিপূর্ণভাবে মেটে না। সভ্যতার সংঘাত ত্রাণ দিয়ে মেটানো যায় না, মেটাতে হয় শক্তি দিয়ে।

5569 (2022). Murphy, Erin. *Burmese Haze: US Policy and Myanmar's Opening—and Closing*. Ann Arbor, MI: Association for Asian Studies, 2022.

রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া বার্মার রাষ্ট্রযন্ত্রের এক দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের অংশ। রোহিঙ্গাদের উচ্ছেদ করে তারা তাদের মাটিকে জাতিগতভাবে 'বিশুদ্ধ' করতে চায়।[৪৪] আর সেই ছক বাস্তবায়নে 'অবাঞ্ছিত' মানুষ ফেলার ভাগাড় হিসেবে তারা বেছে নিয়েছে বাংলাদেশকে।

১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার মাধ্যমে বার্মা কার্যত তার সীমান্তকে বাড়িয়ে নিয়েছে। বাংলাদেশের নিরাপত্তার সীমানা আজ আর নাফ নদীতে নেই, তা ২০ কিলোমিটার ভেতরে সরে এসে ঢুকে গেছে টেকনাফ-উখিয়ায়। আমাদের ভূখণ্ডের ভেতরে কার্যত বার্মার সুরক্ষার জন্য তৈরি হয়ে গেছে একটা 'বাফার যোন'।

এই সংকটে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, অ্যামেরিকা, চীন কিংবা ভারতের কাছে সাহায্য আশা করাটা বোকামি। চীন এবং অ্যামেরিকা, দুজনেরই ভারত মহাসাগরের ওপর নিয়ন্ত্রণ দরকার। ভারতের দরকার সেভেন সিস্টার্স-এর সাথে যোগাযোগের বিকল্প পথ। পরাশক্তিগুলোর স্বার্থের এই সমীকরণে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কান্না কিংবা আমাদের নিরাপত্তার কানাকড়ি মূল্য নেই। যতক্ষণ তাদের স্বার্থে আঘাত না লাগছে, ততক্ষণ তারা কোনো সমাধান হতে দেবে না। আর তথাকথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বা জাতিসংঘের কাছে এটা একটি এনজিও প্রজেক্ট, যা জিইয়ে রেখে তারা এ অঞ্চলে প্রভাব বজায় রাখতে চায়।

জান্তাবিরোধী শক্তিগুলোও আমাদের মিত্র না। বরং অনেক ক্ষেত্রে আরও বড় মাথাব্যথার কারণ। আরাকান রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া আরাকান আর্মিকে আমাদের দেশে অনেকেই নিছক স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা মনে করেন। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক দর্শন আর ইতিহাসের দিকে তাকালে ফুটে ওঠে আরেক ছবি।

উগ্র জাতিবাদী এই গোষ্ঠীর ইতিহাসের বয়ানে আছে 'গ্রেটার আরাকান' বা বৃহত্তর আরাকানের ধারণা। যেখানে চট্টগ্রামকে আরাকানের ঐতিহাসিক পরিসরের অংশ হিসেবে কল্পনা করা হয়, যা ১৬৬৬ সালে মুঘলরা দখল করে নিয়েছিল।[৪৫]

---

[৪৪] Francis Wade, Myanmar's Enemy Within: Buddhist Violence and the Making of a Muslim 'Other' (London: Zed Books, 2017).

[৪৫] বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে আরাকান আর্মির শীর্ষনেতারা ঐতিহাসিক 'ম্রাউক উ' সাম্রাজ্যকে তাদের রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। "Arakan Army Commander-in-Chief Twan Mrat Naing on the Future of Rakhine State," The Diplomat, September 6, 2024। আরও দেখুন: Transnational Institute (TNI). *Arakan (Rakhine State): A Land in Conflict on Myanmar's Western Frontier.* Amsterdam: Transnational Institute, 2020; Leider, Jacques P. "What Is Arakan? Territory, Historical Geography and the Ethno-National Dissent in Myanmar's Rakhine State." *Publications Series.* Oslo: Torkel Opsahl Academic EPublisher, February 20, 2025.

এই বয়ানের তাৎপর্য হলো, নাফ নদী থেকে কর্ণফুলী পর্যন্ত এলাকাটা ওরা ওদের হারানো ভূমি হিসেবে কল্পনা করে। ওরা যখন সাগরে আমাদের জেলেদের ওপর গুলি চালায়, তখন সেটা করে বঙ্গোপসাগরকে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে।

আরাকান আর্মির এই আগ্রাসন কেবল সাগর বা নাফ নদীতে সীমিত না। তাদের উচ্চাভিলাষ আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে তৈরি করেছে আরেক জটিল সমীকরণ। উগ্র জাতিবাদী এই আন্দোলন যত শক্তিশালী হচ্ছে, ততই হুমকির মুখে পড়ছে বাংলাদেশের অখণ্ডতা। আরাকানের নিয়ন্ত্রণ স্থায়ীভাবে আরাকান আর্মির হাতে চলে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জন্য তৈরি হবে এক স্থায়ী ও নিরাপদ ঘাঁটি। যেখান থেকে তারা পাবে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধ চালানোর রসদ। এরইমধ্যে আরাকান আর্মি বাংলাদেশের ভেতরে থাকা বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী দলকে সহায়তা করছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।[৪৬]

কাজেই সামরিক জান্তা আর আরাকান আর্মি, দুটোই আমাদের জন্য হুমকি। দুটোই আমাদের অস্তিত্বের জন্য সংকট তৈরি করেছে। কিন্তু এত বছর পরও আমরা স্রেফ হাত গুটিয়ে বসে আছি।

মুখে যতই মানবাধিকার বা আন্তর্জাতিক আইনের বুলি আওড়ানো হোক না কেন, বাস্তবতা হলো, দুর্বলকে কেউ দয়া করে না। যে প্রতিপক্ষ কোনো ধরনের মাশুল না গুনেই লাখ লাখ মানুষকে আমাদের সীমান্তের ভেতর পাঠিয়ে দিতে পারে, তারা কোনোদিনও স্বেচ্ছায় তাদের ফেরত নেবে না। জান্তা আর আরাকান আর্মি, দুটোই আরাকানকে কেবল নিজেদের জন্য চায়।

তাই অন্যের দয়ার আশায় বসে না থেকে নিজেদের নিরাপত্তা নিজেদেরই নিশ্চিত করতে হবে। আরাকানের আগুনের আঁচ যেন আমাদের সীমান্ত পুড়িয়ে না দেয়, তা নিশ্চিত করতে হলে মগদের তৈরি এই বাফার যোন ঠেলে পাঠিয়ে দিতে হবে ওদের সীমান্তের ভেতরে বহু দূর। যতক্ষণ না আরাকানে তাদের শান্তি বিঘ্নিত হবে, ততক্ষণ টেকনাফে শান্তি ফিরবে না।

তাই শত্রু সীমান্তের ভেতরেই গড়ে তুলতে হবে মিত্রবাহিনীর দুর্গ।

আর তা করার একমাত্র উপায় হলো রোহিঙ্গা মুসলিম কওমকে কাজে লাগিয়ে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলা। তবে এই প্রতিরোধ হতে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন;

---

[৪৬] দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবেদন এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছে। কেএনএফ-কে (KNF) লজিস্টিক সহায়তা আর সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে আরাকান আর্মি। বিনিময়ে তারা দুর্গম সীমান্ত অঞ্চলকে ব্যবহার করছে নিজেদের নিরাপদ ঘাঁটি বা 'রিয়ার বেস' হিসেবে। "The Kuki-Chin National Front: A New Security Challenge for Bangladesh," Jane's Intelligence Review, June 2023.

অ্যামেরিকা বা অন্য কোনো রাষ্ট্রের এজেন্ডার বাইরে, তাওহীদি চেতনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক দীর্ঘমেয়াদি সভ্যতাগত প্রকল্পকে সামনে রেখে।

আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদ

বার্মার অস্থিরতা আর আরাকান আর্মির উত্থানের প্রেক্ষাপটকে কাজে লাগিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আরেক আন্তঃসীমান্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। এ আন্দোলনের কেন্দ্রে আছে 'জো' বা কুকি-চিন জনগোষ্ঠী। তাদের অবস্থান ভারত (বিশেষত মণিপুর ও মিজোরাম), বার্মা (চিন রাজ্য) এবং বাংলাদেশ (পার্বত্য চট্টগ্রাম); তিন দেশজুড়ে। সংখ্যায় ২০-২৫ লাখের মতো, যাদের অধিকাংশই খ্রিষ্টান।

তিন দেশেই এই জনগোষ্ঠীর সশস্ত্র দলের উপস্থিতি আছে নানা মাত্রায়। বাংলাদেশে এই আন্দোলন সক্রিয় কুকি-চীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা কেএনএফ (KNF) নামে। আরাকান আর্মির কাছ থেকে অস্ত্র আর ট্রেনিং নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী এই সংগঠন বান্দরবনের গহীন জঙ্গলকে রীতিমতো অশান্ত করে তুলেছে। এদের লক্ষ্য তিন দেশের সীমান্ত মুছে আলাদা রাষ্ট্র বানানো, যার নাম তারা দিয়েছে 'যোগাম' (Zogam, জো জনগোষ্ঠীর ভূমি) বা 'যালেঙ্গাম' (Zalengam, স্বাধীনতার ভূমি)।

তবে এই সংকটের সবচাইতে চমকপ্রদ আর বিপজ্জনক দিক ভূরাজনৈতিক আর ধর্মীয়।

কুকি-চিন জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ নিজেদেরকে বনী ইসরাইলের হারিয়ে যাওয়া দশ গোত্রের একটা, 'বনি মেনাশে' (Bnei Menashe) হিসেবে দাবি করে। অনেকে কাছে হাস্যকর শোনালেও ইসরায়েলের প্রধান র‍্যাবিনেট ২০০৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এবং শর্তসাপেক্ষে এই দাবির স্বীকৃতি দিয়েছে।[৪৭] এমনকি এদের কয়েক হাজার মানুষকে ইসরায়েলে নিয়ে গিয়ে নাগরিকত্বও দেওয়া হয়েছে।

এ দাবির সত্যতা কতটুকু, তার চেয়ে বড় কথা হলো এর ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব। কারণ এ সব কিছুর অর্থ দাঁড়ায়; উপমহাদেশে এমন এক রাষ্ট্র বানানোর স্বপ্ন দেখা হচ্ছে, যেখানকার অধিকাংশ মানুষ ধর্মে খ্রিষ্টান আর জাতিগত পরিচয়ের সুবাদে ইসরায়েলের স্বাভাবিক মিত্র।

আর এ সব কিছুই ঘটছে আমাদের দুর্বল সীমান্ত ঘেঁষে।

---

[৪৭] Chief Rabbi Recognizes Bnei Menashe as Lost Tribe," *Haaretz*, March 31, 2005.

বহু বছর ধরে আমাদের আলিম সমাজ আর নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা পার্বত্য চট্টগ্রামে একটা 'খ্রিষ্টান রাষ্ট্র' বানানোর ষড়যন্ত্রের কথা বলে আসছেন। বরাবরই এই আলোচনাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব বলে। কিন্তু কুকি-জো কাউন্সিল এরই মধ্যে জাতিসংঘের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে আলাদা দেশ দাবি করেছে।[৪৮]

সোজা বাংলায়, তারা বিষয়টাকে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত করতে চাইছে। যেভাবে ইন্দোনেশিয়া ভেঙে পূর্ব তিমুর হয়েছিল, আর সুদান ভেঙে দক্ষিণ সুদান, এরাও হাঁটছে সেই একই পথে।

প্রশ্ন আসতে পারে, পশ্চিমারা কেন এদের মদদ দেবে?

উত্তরটা সহজ।

বঙ্গোপসাগরের কিনারায় একটা খ্রিষ্টান রাষ্ট্র হলে এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ রাখা তাদের জন্য অনেক সহজ হবে। আর কুকি-চীন জনগোষ্ঠীকে এর জন্য প্রায় নিখুঁত গুটি বলা যায়। তাদের ভৌগোলিক অবস্থান তিন দেশের সীমান্তে, ধর্মে তারা খ্রিষ্টান, আবার তারা নিজেদের বনী ইসরাইলের হারিয়ে যাওয়া বংশধর মনে করে।

এই সমীকরণটা মাথায় রাখলে আমাদের পাহাড়ের আনাচেকানাচে পশ্চিমা এনজিও আর মিশনারিদের তোড়জোড় আর হাজার কোটি টাকার তৎপরতার আসল কারণটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সব কিছু মিলিয়ে যে ছবিটা ফুটে উঠে, তা রীতিমতো আতঙ্কের। পাহাড়ের গভীরে এই বিশাল আয়োজনের সাথে জড়িত দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক নীল নকশা। আমরা এগুলোকে এখনো অনেক দূরের ব্যাপার মনে করছি, কিন্তু বাস্তবতা হলো এ অঞ্চলের মানচিত্রগুলো বদলানোর সব আয়োজন প্রায় শেষের দিকে।

[৪৮] Kuki-Zo Council Memo to UN Seeks Kuki 'Country'," *Chronicle News Service*, July 13, 2023

আমাদের প্রকল্প কী?

পানির যুদ্ধ, বার্মা ও বঙ্গোপসাগর ঘিরে পরাশক্তিদের গ্রেট গেইম, রোহিঙ্গাদের ওপর চালানো জাতিগত নিপীড়ন, আরাকান আর্মির আগ্রাসী উত্থান আর সীমান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদী খ্রিষ্টান-যায়নবাদী রাষ্ট্রের গুঞ্জন—আমাদের চারপাশের আগুনের বৃত্তটা এখন সম্পূর্ণ। প্রতিটা সংকটই অন্য সংকটকে তীব্রতর করছে।

এই খেলায় প্রত্যেকেই যার যার স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। ভারত চায় এই অঞ্চলে তার একচ্ছত্র আধিপত্য। চীন চায় জ্বালানি নিরাপত্তা আর ভারতকে চাপে রাখতে। অ্যামেরিকা চায় চীনকে ঘেরাও করতে। আলাদা দেশ চায় কুকি-চিনরা, আর আরাকান আর্মি চায় তাদের সেই বৃহত্তর আরাকান।

এই আঞ্চলিক আকাঙ্ক্ষা আর পরাশক্তিদের পরিকল্পনার ভিড়ে আমাদের ভূমিকাটা আসলে কী? আমাদের নিজস্ব প্রকল্প কী? নিরাপদ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠবার জন্য কী পরিকল্পনা আমাদের?

আমরা কি কেবলই অন্যের দাবার গুটি হয়ে থাকব? অথবা তেলাপোকার মতো কোনোমতে জীবন কাটিয়ে দেওয়াকেই ভাবব সফলতা? নাকি আমাদেরও থাকবে ইতিহাসের গতিপথ পালটে দেওয়ার মতো কোনো প্রকল্প?

আজ থেকে ২০ বা ৩০ বছর পর এই অঞ্চলের চেহারা কেমন দাঁড়াবে, তা নির্ভর করছে এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের ওপর।

বাইরের শত্রু তখনই একটা জাতিকে ধ্বংস করতে পারে, যখন ভেতর থেকে সেই জাতির ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়। একইভাবে কোনো কওম তখনই বিশ্বমঞ্চে সভ্যতা হিসেবে দাঁড়াতে পারে, যখন তার ভিত্তিটা হয় ইস্পাতের মতো শক্ত আর মানুষের মধ্যে থাকে অটুট ঐক্য।

যুগসন্ধির দায় মেটানোর প্রস্তুতি কি আমাদের আছে?

বৈশ্বিক আর আঞ্চলিক রাজনীতির এই বিশাল ক্যানভাস থেকে এবার চলুন দৃষ্টি ফেরাই নিজের ঘরের দিকে।

জীবনযমীনের সংকট

অস্তিত্ব রক্ষার এই লড়াইয়ে আমাদের পায়ের তলার মাটি আসলে কতটা শক্ত?

বাস্তবতা হলো, যে খুঁটিগুলোর ওপর একটা সমাজ ও রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে থাকে, আমাদের এখানে সেগুলো ক্ষয়ে গেছে বহু আগেই। বাইরে যখন আগুনের বৃত্ত ছোট হয়ে আসছে, তখন ভেতর থেকে ধসে পড়ছে আমাদের ভিত।

বৈশ্বিক আর আঞ্চলিক পর্যায়ের মতো, দেশের ভেতরেও আমরা মুখোমুখি বহুমুখী সংকটের। এমন সব সংকট, যেগুলোর মোকাবিলার সাধ্য বিদ্যমান ব্যবস্থার নেই।

কৃষি

১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে অ্যামেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের লড়াই চলছিল। এই লড়াইয়ের মূল ক্ষেত্র ছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন অ্যামেরিকার সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশগুলো। যেগুলোকে তৃতীয় বিশ্ব বলা হতো। কমিউনিস্টরা দরিদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের সামনে ভূমি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই দাবি খুব দ্রুত ভিয়েতনাম, চীন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এসব অঞ্চলে কমিউনিস্টদের বাড়তে থাকা জনপ্রিয়তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল অ্যামেরিকা।

অ্যামেরিকানদের মতে, এশিয়ায় কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তার পেছনে মূল কারণ ছিল দারিদ্র্য, ক্ষুধা আর দুর্ভিক্ষ। এসব সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের বদলে অ্যামেরিকা একটা প্রযুক্তিগত সমাধানের ওপর গুরুত্ব দিল; রাসায়নিক সার ও সেচ-নির্ভর পদ্ধতিতে দ্রুত খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর প্রকল্প। নাম দিল সবুজ বিপ্লব (Green Revolution)।

এর দুটো লক্ষ্য ছিল:

- খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে কমিউনিসমের বিস্তার ঠেকানো।
- এশিয়ার কৃষিকে পশ্চিমা পুঁজিবাদী বাজারের সাথে আটকে ফেলা।[৪৯]

[৪৯] Nick Cullather, *The Hungry World: America's Cold War Battle against Poverty in Asia* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010). John H. Perkins, *Geopolitics and the Green Revolution: Wheat, Genes, and the Cold War* (New York: Oxford University Press, 1997).

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নেই ফোর্ড ফাউন্ডেশন ও রকাফেলার ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে IRRI-এর মতো প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়, যারা তৃতীয় বিশ্বে নিয়ে আসে উচ্চ ফলনশীল বীজ (HYV)। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে 'উচ্চ ফলনশীল' ধানের ব্যাপক চাষের পেছনে সম্ভবত এ প্রতিষ্ঠানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

এই বীজ ক্ষুধার্ত। মাটির প্রাকৃতিক শক্তিতে এর ফলন হতো না, প্রয়োজন হতো বাজার থেকে কেনা রাসায়নিক সারের। এই বীজ তৃষ্ণার্ত। তার জন্য প্রয়োজন হতো গভীর নলকূপের নিয়ন্ত্রিত সেচ, যেখানে পাম্প ও জ্বালানি (ডিজেল বা বিদ্যুৎ) অপরিহার্য। এই 'অতিথি' জাত স্থানীয় রোগবালাই প্রতিরোধ করতে পারত না, প্রয়োজন হতো বাজার থেকে কেনা কীটনাশকের।

ফলে, কৃষক তার বীজ, সার, কীটনাশক এবং সেচ—প্রতিটি উপকরণের জন্য অনেকাংশে বাজারের অধীনস্ত হয়ে পড়ল। আবহমান কাল ধরে চলে আসা কৃষি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ; বীজ থাকত কৃষকের ঘরে, সার আসত গোবর থেকে। কিন্তু সবুজ বিপ্লবের উফশী বীজের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ফলনের জন্য কৃষককে একটা পুরো প্যাকেজ কিনতে হতো। এই 'বিপ্লব' কৃষিকে বাজার-নির্ভর শিল্প বানিয়ে ফেলল। বাহ্যিকভাবে উন্নয়ন মনে হলেও, এটা ছিল কৃষকের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভেঙে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রকল্প।

আজ উফশী বীজ থেকে এক কেজি চাল উৎপাদনে ৩,০০০ থেকে ৩,৫০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয়, যার বড় অংশই আসে মাটির নিচ থেকে। অথচ আমাদের দেশেই ধানের এমন সব জাত ছিল, যেগুলো বন্যার পানির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ত, যেমন ভাসমান আমন বা জলিধান। এমন জাত ছিল, যা অনেক কম পানিতেই হতো, যেমন আউশ।

কিন্তু আমরা এই জাতগুলোকে উন্নত করার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিইনি, আমাদের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের সদিচ্ছা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরেই USAID-এর মতো পশ্চিমা দাতা সংস্থাগুলোর দর্শন ও অর্থায়ন আমাদের সরকারের পলিসিকে প্রভাবিত করে আসছে।

এই পানিখেকো, ঋণ ও বাজারনির্ভর সবুজ বিপ্লবের মডেল বাংলাদেশের জন্য বহুমুখী সংকট তৈরি করেছে। এর ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দ্রুত নেমে যাচ্ছে, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। সার, কীটনাশক ও সেচের খরচ বাড়লেও ধানের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না কৃষক। ফলে ছোট কৃষকরা ক্রমশ ঋণনির্ভর হয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে হাজারো দেশি ধানের জায়গায় হাতেগোনা কয়েকটা উফশী জাতের ওপর নির্ভরশীলতা আমাদের পুরো খাদ্য-সুরক্ষার ব্যবস্থাকে ভঙ্গুর করে তুলেছে। তৈরি করছে ভবিষ্যতে বহুজাতিক কর্পোরেশনের মালিকানাধীন GMO ও হাইব্রিড বীজের দিকে আরও বড় নির্ভরতার পথ।

যদি এভাবেই চলতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে আমরা তিনটা ফ্রন্টে একসাথে ধাক্কা খাবার আশংকা থাকে—

- ভূগর্ভস্থ পানির মারাত্মক ঘাটতি,
- কৃষকের বড় অংশের আর্থিক পতন এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের সময়ে খাদ্য-সুরক্ষার ভাঙন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই বাংলা ছিল গোটা উপমহাদেশের ব্রেড বাস্কেট বা শস্যভাণ্ডার। মহান আল্লাহর রহমতে এই জনপদ নিজের চাহিদা মিটিয়ে বাকি ভারতেরও ভাতের যোগান দিত। কিন্তু ফিরিঙ্গিরা আসার পর উর্বর বদ্বীপ পরিচিত হয় একের পর এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সাথে।

আজ ফিরিঙ্গিরা নেই, কিন্তু টিকে আছে তাদের বাণিজ্যিক কাঠামো। যে বাংলা একসময় বিশ্বকে খাওয়াত, কর্পোরেট ও রাসায়নিক আগ্রাসনে সেই বাংলার কৃষি আজ তলিয়ে যাচ্ছে গভীর অনিশ্চয়তার গহ্বরে।

অর্থনীতি

আমাদের জনসংখ্যার প্রায় ৬২ শতাংশের বয়স ৪০-এর নিচে। বিশাল সংখ্যক এই তরুণদের কাজে লাগানোর মতো অর্থনৈতিক কাঠামো আমাদের নেই। সরকারি হিসেবে বেকারত্বের হার ৫% এর নিচে হলেও, কেতাবি সংজ্ঞার বাইরে থাকা ছদ্মবেকার আর মানসম্মত কাজ না-পাওয়া তরুণের সংখ্যা সোয়া এক কোটির কাছাকাছি।[৫০]

অল্প কিছু অফিসিয়াল বেকার-এর আড়ালে এক বিশাল নিষ্ক্রিয় তরুণ শ্রেণি জমে আছে, যাদের শক্তি ও সম্ভাবনা এই কাঠামো ব্যবহার করতে পারছে না।

আমাদের অর্থনীতি এখনো গার্মেন্টস আর রেমিটেন্সের ওপর নির্ভর করে। আশির দশকে তৈরি হওয়া এ দুই খাতের কোনো বিকল্প গত চল্লিশ বছরে দাঁড়ায়নি। তৈরি হয়নি বলার মতো তেমন কোনো রফতানি খাত।

[৫০] “দেশের ১ কোটি ২৯ লাখ তরুণ নিষ্ক্রিয়: বিবিএস,” দেশ রূপান্তর, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪।

আমাদের জনমিতি ২১শ শতকে এসে পড়েছে অপ্রস্তুত অবস্থায়। অর্থনীতির কাঠামো এখনো আটকে আছে আশি–নব্বইয়ের দশকের ছকে। বিশ্ব যত অটোমেশন, এআই, আর রোবটিক্সের দিকে যাচ্ছে, ততই আমাদের সস্তা শ্রম-এর মডেল অচল হয়ে পড়ছে।

তার সাথে যোগ হয়েছে 'এলিট ওভারপ্রোডাকশন' বা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি উচ্চশিক্ষিত তৈরি হওয়া।[৫১] উচ্চশিক্ষা লাভজনক ব্যবসা হওয়াতে মুড়িমুড়কির মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলো থেকে বের হওয়া লক্ষ লক্ষ সনদধারীর জন্য পর্যাপ্ত কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয়নি।

রাষ্ট্র ও পরিবার মিলে উচ্চশিক্ষায় যে বিনিয়োগ করছে, বিদ্যমান অর্থনীতি তার একটা ছোট অংশও ফিরিয়ে দিতে পারছে না। লো-এন্ড সার্ভিস সেক্টর আর সামান্য কিছু সরকারি চাকরি ছাড়া তেমন বিকল্প দেখাতে পারছে না এই অর্থনীতি। ফলে শিক্ষিত তরুণ আর তাদের পরিবারগুলোর প্রথম পছন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে 'বিদেশে সেটেল হওয়া'।

আজ থেকে ১৫-২০ বছর পর এ সমস্যা আরও প্রকট হবে। জনসংখ্যার বিশাল একটা অংশের বয়স তখন হবে ২০-৪৫ এর মধ্যে।[৫২] অর্থনীতি এদের উপযুক্ত কাজ দিতে পারবে না। যোগ্য তরুণ বেশি, সম্মানজনক কাজ কম; এই সমীকরণ আরও তীব্র আকার নেবে।

তখন আমাদের সামনে দাঁড়াবে দুই ধরনের মানুষ; একদিকে হতাশ, বেকার তরুণ–মধ্যবিত্ত, অন্যদিকে কমদামি শ্রমে ঝুলে থাকা অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রেণি। সমাজে তৈরি হবে তীব্র অসন্তোষ।

গরিব যখন কাজের সুযোগ পায় না, সে হয়তো নীরবে মেনে নেয়। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যখন কাজ পায় না, তখন তাদের অধিকারবোধ জেগে ওঠে। ইতিহাস বলে, এই শ্রেণির জমে থাকা হতাশা, অপমান আর ক্ষোভই তীব্র সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা আর নৈরাজ্যের জন্ম দেয়। নিজেদের বেকারত্ব আর অপমান থেকে জন্ম নেওয়া ক্রোধ দিয়ে তারা স্লোগান বানায়, পথ দেখায়, নেতৃত্ব দেয়। নিম্নবিত্তের জমে থাকা ক্ষোভকে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করে। মধ্যবিত্তের এই অংশ, যাদেরকে বিদ্যমান কাঠামো ধারণ করতে পারছে না, একসময় পুরো ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

---

[৫১] সমাজে যখন পদ বা সুযোগের তুলনায় উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যায়, তখন এই বঞ্চিত গোষ্ঠীই একসময় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এলিট ওভারপ্রোডাকশনের ধারণা নিয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, Peter Turchin, *End Times* (New York: Penguin Press, 2023).

[৫২] General Economics Division (GED), *Bangladesh Perspective Plan 2041: Making Vision 2021 a Reality* (Dhaka: Bangladesh Planning Commission, 2020).

এই চাপকে উপেক্ষা করার মতো বিলাসিতার সুযোগ আমাদের নেই। বিদ্যমান কাঠামোতে এই সংকট এড়ানোরও কোনো পথ দেখা যায় না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের মানচিত্রের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের যে পাহাড়ি এলাকা, যেটাকে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম বলি, সেটা দেশের মোট আয়তনের দশ ভাগের এক ভাগ। প্রায় ১৩,০০০ বর্গকিলোমিটার। আমাদের মতো ছোট ভূখণ্ডের জন্য বিশাল জায়গা।

পাশাপাশি এই অঞ্চলে আছে গ্যাস ও খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা। বাপেক্স এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার জরিপ অনুযায়ী, পাহাড়ে আছে গ্যাসের মজুদ। সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র তার একটা উদাহরণ।[৫৩] বিভিন্ন সময় আলোচনা হয়েছে ইউরেনিয়ামের সম্ভাব্য উপস্থিতি নিয়েও।[৫৪]

পাশাপাশি চট্টগ্রাম–কক্সবাজার করিডরের ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এই পাহাড় সমতল বাংলাদেশের জন্য এক ধরনের কৌশলগত হাই গ্রাউন্ড। যে শক্তি এই পাহাড়ে স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে, সে সরাসরি বন্দর দখল না করেও কার্যত বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফলাইন বা বঙ্গোপসাগরের প্রবেশপথকে জিম্মি করে রাখতে পারবে।

আফসোসের ব্যাপার হলো, আজ এই অতি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা হুমকির মুখে। শুধু তাই না, এ অঞ্চল বর্তমানে এখন আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সবচাইতে বড় কৌশলগত দুর্বলতা।

গত ৫০ বছর ধরে পাহাড়কে ঘিরে চলছে নোংরা ষড়যন্ত্র। বিদেশি অস্ত্র আর মিথ্যে বয়ান দিয়ে পাহাড়কে পরিণত করা হয়েছে বারুদের স্তূপে।

১৯৭০-এর দশক থেকেই ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরাম সীমান্ত ব্যবহার করে শান্তিবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। পরের ৫০ বছরে পাহাড়ে সশস্ত্র গোষ্ঠীর নাম বদলেছে। একসময়ের শান্তিবাহিনী ভেঙে ইউপিডিএফ (UPDF) হয়েছে। কিন্তু তাদের অস্ত্রের যোগানদাতা এবং সীমান্তের ওপারের আশ্রয়স্থল বদলায়নি।

---

[৫৩] Chittagong Hill Tracts," in *Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh*; "Semutang Gas Field," Hydrocarbon Unit, Energy and Mineral Resources Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources. See also: "BAPEX to dig new wells in Semutang," The Daily Star, December 4, 2009.

[৫৪] Uranium exploration status in Bangladesh," paper presented at an IAEA meeting (International Atomic Energy Agency, 2014), PDF, https://conferences.iaea.org/event/44/contributions/7889/contribution.pdf

পাহাড়ের এই অস্থিরতা ভারতের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত বিনিয়োগের অংশ।[৫৫]

নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, ভারত এই অঞ্চলকে চাপ প্রয়োগের সুইচের মতো ব্যবহার করে। ঢাকা যখনই দিল্লির সব কথা 'জি হুজুর' বলে মেনে নেয় না, তখনই পাহাড়ে অস্থিরতার মাত্রা বাড়িয়ে দেয় ওরা। উদ্দেশ্য একটাই। পাহাড়কে অস্থিতিশীল রেখে ঢাকাকে তটস্থ রাখা।

আদিবাসী বনাম সেটলার মিথ: অস্ত্রের চেয়েও বড় যুদ্ধটা চলছে বয়ান বা ন্যারেটিভের ময়দানে। পশ্চিমা এনজিও আর ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিক ইন্ধনে এখানে 'আদিবাসী বনাম সেটলার' নামে এক বিষাক্ত বয়ান দাঁড় করানো হয়েছে। প্রচার করা হচ্ছে, পাহাড়ি জনগোষ্ঠীরা এখানের ভূমিপুত্র আর বাঙালিরা হলো বহিরাগত জবরদখলকারী।

অথচ ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্ব ভিন্ন কথা বলে। দক্ষিণ এশিয়ায় অস্ট্রেলিয়া বা অ্যামেরিকার মতো 'আদিবাসী-সেটলার' তত্ত্ব খাটে না।[৫৬] এই বদ্বীপে বাঙালিদের শেকড় হাজার বছরের। অন্যদিকে অনেক পাহাড়ি জনগোষ্ঠী বার্মা ও আরাকান থেকে এখানে এসে বসতি গেড়েছে সপ্তদশ শতক বা তারও পরে।[৫৭]

১৯০০ সালে ব্রিটিশরা তাদের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির অংশ হিসেবে *CHT Regulation 1900* জারি করে পাহাড়কে সমতল থেকে আলাদা করেছিল।[৫৮] আজ সেই ব্রিটিশ আমলের বিভাজন নীতিকে পুঁজি করেই বাঙালিদের বহিরাগত বানানোর নোংরা খেলা চলছে। ভারত এই সেন্টিমেন্টকে উসকে দিয়ে পাহাড়কে বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে।

ভুল রাষ্ট্রদর্শন: পাহাড়ে আজ যে আগুন জ্বলছে তার মূল কারণ লুকিয়ে আছে আমাদের ভুল রাষ্ট্রদর্শনে। গত ৫০ বছরে আমরা দুটো সেক্যুলার মডেল চেষ্টা করেছি। দুটোই পাহাড়ের মানুষকে আপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

---

[৫৫] Arun Kumar Nayak, "Ethnonationalism in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh and India's Security Concerns in Northeast India," Jadavpur Journal of International Relations 27, no. 1 (2023): 70–71; Amnesty International, Bangladesh: Human Rights in the Chittagong Hill Tracts (London: Amnesty International, 2000), 12,

[৫৬] Andre Béteille, "The Idea of Indigenous People," Current Anthropology 39, no. 2 (April 1998); Willem van Schendel, *The Bengal Borderland: Beyond State and Nation in South Asia* (London: Anthem Press, 2005); Lorenzo Veracini, *Settler Colonialism: A Theoretical Overview* (New York: Palgrave Macmillan, 2010)

[৫৭] BGMS Hossain, "Chittagong Hill Tracts (CHT) Land Issue: Challenges and Way Ahead," NDC Journal (2015): 2; Kyaw Minn Htin, "The Marma from Bangladesh: A 'de-Arakanized' Community in Chittagong Hill Tracts," Suvannabhumi: The Journal of Southeast Asian Studies 7, no. 2 (December 2015): 135, 144.

[৫৮] The Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 (Regulation I of 1900)," Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Government of Bangladesh.

১৯৭২ সালে পাহাড়ি প্রতিনিধিদল যখন স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে যায়, তখন শেখ মুজিব তাদের বলেছিল, 'তোরা সব বাঙালি হয়ে যা।'[৫৯] এই বাক্য পাহাড়িদের বার্তা দিয়েছিল, এই নতুন দেশে তাদের নিজস্ব পরিচয়ের বুঝি কোনো জায়গা নেই।

পরে জিয়াউর রহমান 'বাঙালি'র বদলে 'বাংলাদেশি' জাতীয়তাবাদের ধারণা নিয়ে আসেন। কিন্তু এই ধারণা অস্পষ্ট। এর পেছনে এমন কোনো শক্তিশালী মতাদর্শিক ভিত্তি নেই, যা পাহাড়ি ও বাঙালিকে এক করতে পারে।

জিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় হাজার হাজার ভূমিহীন বাঙালিকে পাহাড়ে পাঠালেন।[৬০] কৌশলগতভাবে এতে পাহাড়ের মাটির ওপর সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণ কিছুটা বেড়েছে সত্য, কিন্তু আরও তিক্ত হয়েছে পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে সংঘাত। দুর্বল আদর্শিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে কেবল সংখ্যা দিয়ে স্থিতিশীলতা আনা যায় না।

ইতিহাস আমাদের একটা বিকল্প মডেল দেখায়। প্রায় তেরো শতাব্দী ধরে ইসলামী খিলাফাহর অধীনে কুর্দি, তুর্কি, আরব বা কপ্টিক খ্রিষ্টানরা তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি বজায় রেখেই বসবাস করেছে। মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া, আন্দালুস থেকে সিন্ধু; ইসলামী শাসনব্যবস্থা কখনোই মানুষের জাতিসত্তা মুছে ফেলার চেষ্টা করেনি। ইসলামী ব্যবস্থা কখনো কাউকে বলেনি 'তোমরা সব আরব হয়ে যাও।' বরং শরীয়াহর অধীনে মুসলিম ও অমুসলিম সবার জন্য নিশ্চিত করেছে হক এবং ইনসাফ।

বর্তমান সেক্যুলার জাতিরাষ্ট্রের সংকীর্ণ খাঁচায় এই ইনসাফ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। হবেও না। আদর্শিক দেউলিয়াত্ব এবং ভুল রাষ্ট্রদর্শন আজ আমাদের ভূখণ্ডের এক-দশমাংশকে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্য উর্বর করে তুলেছে। পেছনের এই দরজা দিয়ে যদি একবার আধিপত্যবাদীরা ঢুকে পড়ে, তবে সেটা আমাদের ভূখণ্ডের অস্তিত্বের জন্যই কাল হয়ে দাঁড়াবে।

---

[৫৯] Hossain, Md Anwar. "The Bengali Settlement and Minority Groups Integration in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh: An Anthropological Understanding." *Jagannath University Journal of Social Sciences* 3, no. 1-2 (2015): 97-110.

[৬০] Ibid

জীবনযমীন

এই ভূখণ্ডের আরেকটা মৌলিক সংকট আছে। এখানে বিশাল এক জনগোষ্ঠী আটকে আছে খুব অল্প জায়গার মধ্যে।

ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম-বাঙালি জনগোষ্ঠী শুধু এই বদ্বীপে সীমাবদ্ধ ছিল না। পানি যেমন ফাঁকা জায়গা পূরণ করে, তেমনি এই জনপদের মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই চারপাশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, যেমন আসাম, ত্রিপুরা এবং আরাকানে, ছড়িয়ে পড়েছে। এই অঞ্চলগুলো মূল বদ্বীপের জনসংখ্যাগত চাপকে ধারণ করত। এ-ধরনের ডেমোগ্রাফিক স্পিলওভার পৃথিবীর অনেক নদীবাহিত সমভূমি ও সীমান্তাঞ্চলে দেখা যায়। এটা বাংলার কোনো ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য না।

বাঙালিরাই জঙ্গল পরিষ্কার করে, খাল কেটে, আর নদীর অববাহিকায় বসতি গড়ে বসতি ও চাষাবাদের উপযোগী করে তুলেছিল। এসব ভূমিকে পরিণত করেছিল উৎপাদনশীল অঞ্চলে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রেকর্ড ও পরবর্তী গবেষণা থেকে দেখা যায়, পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম কৃষকদের বসতি ও আবাদ সম্প্রসারণ আসামের চাষযোগ্য জমি ও ভূমি-রাজস্বের পরিধি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিল।[৬১]

পোকায় খাওয়া মানচিত্র: ১৯৪৭ সালে দেশভাগের আগে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই বাস্তবতা বুঝেই অখণ্ড বাংলার প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভয়ে বাঙালি হিন্দু অভিজাতরা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তারপর ইংরেজরা র‍্যাডক্লিফ লাইন নামের কৃত্রিম সীমানা দিয়ে বাংলাকে তার প্রাকৃতিক সীমান্ত (আসাম, ত্রিপুরা, আরাকান) থেকে আক্ষরিক অর্থেই কেটে আলাদা করে।

আমরা পাই জিন্নাহর ভাষায় 'পোকায় খাওয়া' এক মানচিত্র, যেখানে বিশাল এক জনগোষ্ঠী ভারতের পেটের ভেতর এক চিলতে বাক্সে বন্দি। যে সভ্যতা ঐতিহাসিকভাবে সম্প্রসারণের মাধ্যমে টিকে থাকত, তাকে হঠাৎ করেই আটকে ফেলা হলো কৃত্রিম সীমান্তের ভেতর। র‍্যাডক্লিফ নামের যে লোকটা এই অঞ্চল কখনো ভালোমতো চোখেও দেখেনি, তার কয়েক সপ্তাহে টানা আঁকিবুঁকি থামিয়ে দিল হাজার বছরের প্রাকৃতিক জনস্রোতকে।

---

[৬১] Amalendu Guha, *Planter-Raj to Swaraj: Freedom Struggle and Electoral Politics in Assam, 1826–1947* (New Delhi: Indian Council of Historical Research, 1977)

ভৌগলিক এই সীমাবদ্ধতাই প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান আর তারপর বাংলাদেশের ভবিষ্যত দুর্বলতার ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে। আমরা আজ সম্প্রসারণবাদী ভারতের দ্বারা ৯৫ শতাংশ পরিবেষ্টিত; আমাদের কোনো কৌশলগত গভীরতা (strategic depth) নেই। নেই জনসংখ্যা ধারণ করার মতো কোনো বাড়তি যমীনও।

ভূরাজনৈতিক সংকট আজ জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে অস্তিত্বের সংকট হয়ে ওঠেছে। আমাদের পোকায় খাওয়া মানচিত্রকে এখন পানিও খেয়ে ফেলতে শুরু করেছে। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের হুঁশিয়ারি অনুযায়ী, সমুদ্রপৃষ্ঠ এক মিটার উঁচু হলেই ২১টি উপকূলীয় জেলা পানির নিচে চলে যাবে, ভিটেবাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্তু হবে প্রায় এক কোটি মানুষ। এমন ঘটার আশঙ্কা আছে ২০৫০ সালের মধ্যে।[৬২]

যে জাতিকে কৃত্রিম সীমান্ত দিয়ে আগেই আটকে ফেলা হয়েছিল, সে এখন সমুদ্রের কাছেও ভূমি হারাচ্ছে।

এর সাথে যোগ করুন ভূরাজনৈতিক আগ্রাসনের বাস্তবতা। আমরা এরই মধ্যে বার্মার আগ্রাসন, বাংলাদেশের মাটি নিয়ে খ্রিষ্টান-যায়নবাদী রাষ্ট্রের প্রকল্প, আর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতবাদের কথা বলেছি। আমাদের সীমানা নাফ নদী থেকে ক্রমশ ভেতরের দিকে সরে আসছে। ভারত অতীতেও এই জনপদকে ভাগ করার চেষ্টা করেছে, আর আজ তারা খোলাখুলি 'অখণ্ড ভারত' এর কথা বলছে। বঙ্গোপসাগরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শুরু হয়েছে পরাশক্তিগুলোর কাড়াকাড়ি। চারদিকে চলছে আমাদের মানচিত্রকে সংকুচিত করার গভীর চক্রান্ত।

জাতির টিকে থাকার জন্য শ্বাস নেওয়ার মতো যমীন নিশ্চিত করতে না পারলে, জীবন টিকবে না। ক্রমশ ক্ষয়ে যাবে এই জনপদ, এক সময়কার চোখ ধাঁধানো সভ্যতার ঠিকানা। এক পর্যায়ে নড়বড়ে হয়ে যাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ন্যূনতম ভৌগলিক ভিত্তিটাই। সেই সময় খুব একটা দূরে না।

অবক্ষয়

অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সমান্তরালে তৈরি হয়েছে আরও গভীর এক পচন; তীব্র সামাজিক অবক্ষয়।

ব্যক্তিগত জীবনে মাদক, পর্নোগ্রাফি, অবাধ যৌনতা ও ভাঙা পরিবার, আর সামষ্টিক জীবনে ঘুষ-দুর্নীতি, লোভ, প্রতারণা ও ক্ষমতার অপব্যবহার—সব

[৬২] 'জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের মানচিত্র বদলে যেতে পারে,' *বনিক বার্তা*, ৭ এপ্রিল, ২০২৫

মিলে সমাজের ভেতরকার নৈতিক কেন্দ্রটা ধীরে ধীরে ধসে পড়েছে। মানুষের চারপাশে পরিবার, মহল্লা, আত্মীয়তার যে জাল একসময় তাকে ধরে রাখত, সেই জাল ছিঁড়ে গিয়ে প্রত্যেকেই একেকটা একা, বিচ্ছিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে।

সমাজ এমন মানুষ তৈরি করছে, যার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু নিজের নফস, ডিভাইসের স্ক্রিন আর বাজারের অফার। যে নিজের ইচ্ছা, ভালো লাগা আর অনুভূতিকেই চূড়ান্ত মানদণ্ড বলে মনে করে। নিজেকে আল্লাহর বান্দা ভাবার বদলে, স্বাধীনতার নামে সে নফসের পূজা করে। এর ফল হলো ডিপ্রেশন, একাকিত্ব, মানসিক রোগ, অপরাধপ্রবণতা, অস্থিরতা আর নানা ধরনের বিকৃতি।

ভেতর থেকে ফাঁপা হয়ে যাচ্ছে মানুষ ও সমাজ দুটোই। এগুলো এক গভীরতর আধ্যাত্মিক শূন্যতার প্রকাশ।

সমাজবিজ্ঞানীরা একে বলেন অ্যানোমি (anomie) বা লক্ষ্যহীনতার সংকট। এমন এক পরিস্থিতি, যখন সমাজের নৈতিক ও ধর্মীয় বন্ধনগুলো (পরিবার, সম্প্রদায়, বিশ্বাস) দুর্বল হয়ে যায়, কিন্তু সেই জায়গা নেওয়ার মতো নতুন কোনো স্থিতিশীল মূল্যবোধ থাকে না।

গতানুগতিক ধর্মীয় শিক্ষাও এই অ্যানোমিকে রুখতে পারছে না। এক শ্রেণির ওয়াজের বক্তার কথা শুনলেই বোঝা যায় ঈমান বা রুহানিয়াতের বদলে শীতল পুঁজিবাদী তাড়না তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। তাদের কথা ও কাজের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে ফেসবুক অ্যালগরিদম, ইউটিউব-টিকটকের ভিউ, লাইক আর ব্র্যান্ডিং। ইহসান বা ইখলাসের বদলে 'লাইক' আর 'ভিউ' এর নেশা ধর্ম নিয়ে আলোচনাকেও পণ্য বানিয়ে ছেড়েছে।

পাশাপাশি পশ্চিমা শক্তি, দেশি-বিদেশি এনজিও আর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো *সহায়তা* আর *মানবাধিকার*-এর নামে এলজিবিটিসহ বিভিন্ন সমাজবিধ্বংসী এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছে। ভাষা, পাঠ্যপুস্তক, মিডিয়া, নীতি; সবখানেই ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে এই বিষগুলো।

বাইরে যখন আগুনের বৃত্ত, তখন ভেতর থেকে ফাঁপা হয়ে গেছে সমাজ। তৈরি হয়েছে চূড়ান্ত পতনের আদর্শ পরিবেশ।

পতনের চেনা ছক

লিও তলস্তয় তার কালজয়ী বই *আন্না কারেনিনা* শুরু করেছিলেন এক বিখ্যাত লাইন দিয়ে:

> 'সব সুখী পরিবার দেখতে এক রকম; কিন্তু প্রতিটি অসুখী পরিবার তার নিজের মতো করে অসুখী।'

এর সাথে সেক্যুলার সমাজের একটা মিল আছে, তবে উল্টো দিক থেকে।

প্রাক-আধুনিক সমাজগুলোর মধ্যে হাজারো বৈচিত্র্য ছিল। তারা ছিল নিজের মতো করে সুখী। কিন্তু সেক্যুলার সমাজগুলো দিনশেষে দেখতে মৌলিকভাবে একই রকম। বিচ্ছিন্ন মানুষ, ভাঙা পরিবার, যৌনতাকেন্দ্রিক সংস্কৃতি, সার্বভৌমত্ব ও চূড়ান্ত আনুগত্যের দাবিদার শক্তিশালী রাষ্ট্র, আর বাজারের আধিপত্য। একই অসুখ, একই অবক্ষয়, একই পচন।

অবক্ষয় আর ধ্বংসের যে রাস্তায় আমরা হাঁটছি, তার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এমন এক সমাজ, যেখানে মানুষ অনেক কিছু ভোগ করবে, কিন্তু শান্তি পাবে না। তথ্য পাবে, কিন্তু হিদায়াহ পাবে না।

বহু দশক যাবৎ আমাদের সমাজে এই প্রক্রিয়া চলেছে, আর এখন তা এগোচ্ছে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে।

রাজনৈতিক গন্তব্যহীনতা

আমরা যে সংকটগুলো নিয়ে কথা বলেছি, সেগুলো যথেষ্ট ভয়ংকর। কিন্তু সবচাইতে ভয়াবহ হলো আমাদের রাজনৈতিক সংকট। কারণ অন্য বিপদগুলো আমরা সামলাতে পারব কি না, সেটা নির্ভর করে রাজনীতির ওপর।

বাংলাদেশের রাজনীতির সমস্যা হলো, এদেশের মানুষ এখনো তার হক আর হিস্যা বুঝে পায়নি। কেতাবি ভাষায় বললে তাকে নাগরিক হতে দেওয়া হয়নি। সে এখনো স্রেফ প্রজা।

ফিরিঙ্গিরা আমাদের প্রজা হিসেবে দেখত। আসলে ঠিক প্রজা না, তার চেয়েও নীচু কিছু হিসেবে। ইউরোপের সাধারণ মানুষ ছিল সেখানকার রাজাদের প্রজা। আর আমরা তার চেয়েও নিচে, নেইটিভ। প্রজাদেরও প্রজা। ফিরিঙ্গিরা চলে গেলেও তাদের তৈরি দানবীয় রাষ্ট্র রেখে গেছে। রেখে গেছে ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্ব। তাই তাদের পরে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক এলিটরাও সেভাবেই

আমাদের দেখেছে। ৭১-এর পর এদেশি এলিটরাও বজায় রেখেছে সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি।

তাই এত বছরেও এই রাষ্ট্র জনবান্ধব হয়নি। গণতন্ত্র, মানবিক মর্যাদা আর সাম্যের এত এত বুলি আওড়ানোর পরও কৃষক, শ্রমিক, মজদুর, মাদরাসার ছাত্রশিক্ষক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ; বুঝে পায়নি তাদের হক ও হিস্যা।

আমাদের দেশে একটা অদৃশ্য কিন্তু খুব গভীর সাংস্কৃতিক দেয়াল আছে। যার একপাশে আছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামরিক এলিট শ্রেণি, আর অন্যপাশে সাধারণ মানুষ।

এলিটরা দুনিয়াকে দেখে দিল্লি অথবা পশ্চিমের চোখে। এদের শরীরটা এখানে, মনটা অন্য কোথাও। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস আর মূল্যবোধকে তারা মনে করে 'অসভ্য', 'বর্বর' আর 'মধ্যযুগীয়'। এই এলিটরা সবাই যে জন্মসূত্রে এমন, তা না। বরং এদের অধিকাংশের জন্মই 'নেইটিভ বর্বর'দের কাতারে। কিন্তু দুনিয়াকে বিদেশি লেন্সে এভাবে দেখতে শেখা এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আনুগত্যের কারণেই তারা এলিটদের কাতারে জায়গা পেয়েছে।

শাসক শ্রেণি নিজের দেশের মানুষকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে, আর জনগণও তাদের অবিশ্বাস করে।

তাহলে সম্পর্কটা টেকে কীভাবে?

সম্পর্ক টেকে লেনদেনের কারণে। রাজনীতিবিদদের কাছে জনগণ হলো ক্ষমতার সিঁড়ি। আর জনগণের কাছে রাজনীতিবিদরা হলো দানবীয় রাষ্ট্রের সাথে দরকষাকষি করে বাঁচার জন্য ধরা ব্রোকার, সোজা বাংলায় দালাল। অপছন্দ সত্ত্বেও এরা একে অপরকে সহ্য করে।

তবে এভাবে ধুকে ধুকে টিকে থাকা সম্ভব হলেও জাতি গঠন সম্ভব না। ফলে রাষ্ট্রের সাথে জনগণের সবসময় এক নীরব মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চলতে থাকে। পুলিশ, প্রশাসন আর বিচার ব্যবস্থা নিজেদের দেখে শাসক আর মানুষকে দেখে প্রজা হিসেবে। এলিট নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে জনগণকে 'সভ্য' বানাতে। কখনো দাড়ি-টুপি ছেটে, কখনো তাদের সংস্কৃতি বদলে দিয়ে।

যেহেতু এই শাসকদের সাথে মানুষের নাড়ির টান নেই, গণমানুষের কাছে তাদের বৈধতা নেই, তাই টিকে থাকার জন্য এদের সবসময় বাইরের মুরুব্বি লাগে। বৈধতার সংকট থেকে জন্ম নেয় নতজানু পররাষ্ট্রনীতি। রাজনীতিবিদরা দেশের মানুষের দিকে না তাকিয়ে বিদেশি প্রভুদের তোষামোদ করাকে উপকারী মনে করে। ক্ষমতার জন্য কওম ও যমীনের স্বার্থ, নদী বা বন্দর বিকিয়ে দেয় নির্দ্বিধায়।

এই কম্প্রেডর বা দালাল শ্রেণি কাজ করে ঔপনিবেশিক প্রভুদের রেখে যাওয়া গদির লোকাল ম্যানেজার হয়ে।

রাজনীতি তাই এদেশে টাকা কামানোর সবচেয়ে লাভজনক পথ। এমপি বা মন্ত্রী হওয়া মানে লুটের লাইসেন্স পাওয়া। ক্ষমতা আর সম্পদের মালিক হওয়ার জন্য দলে দলে মানুষ এখানে ভিড় করে।

কিন্তু রাষ্ট্রের সম্পদ সীমিত, আর লুটেরার সংখ্যা অগণিত। ফলে শুরু হয় এক সর্বগ্রাসী কামড়াকামড়ি। সম্পদ তৈরি না করে কেবল চুষে খাওয়ার এই ব্যবস্থা পুরো সমাজটাকে ধসিয়ে দেয়।

আজ আমাদের বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় কাঠামো আর রাজনীতি এতটাই ত্রুটিপূর্ণ, এতটাই জনবিরোধী, এতটাই নষ্ট, বিশ্বাসের দিক থেকে এতটাই ফাঁপা যে, একে দিয়ে আমাদের সামনে থাকা অস্তিত্বের সংকট মোকাবিলা করা অসম্ভব।

এই সংকটগুলো মোকাবিলা করার মতো সামর্থ্য এই রাজনীতির নেই। তেমন সদিচ্ছা আর যোগ্যতাও রাজনীতিবিদদের নেই। এই নষ্ট রাষ্ট্র আর রাজনীতি আমাদের বাঁচাতে পারবে না। বরং এরাই অনেকাংশে এই সংকটগুলোর উৎস।

যদি এভাবেই সব চলতে থাকে, তাহলে আমাদের ভবিষ্যত হবে আমাদের অতীতের চেয়েও করুণ। আমাদের কওম ও যমীনের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা এবং ধারাবাহিকতা আজ আক্ষরিক অর্থেই হুমকির মুখে।

করণীয় কী?

কল্পনা করুন, আপনি এক বিশাল বহুতল দালানের ভেতরে বসে আছেন। বাইরে থেকে দেখতে মনে হয় আলিশান এবং মজবুত। কিন্তু এই দালান তৈরি হয়েছে এমন এক জলাভূমির ওপর, যার নিচে কোনো শক্ত মাটি নেই। এর ভিতের মধ্যেই গলদ।

ফলে নিয়মিত বিরতিতে দালানটা কেঁপে ওঠে। পলেস্তারা খসে পড়ে, দেয়ালে ফাটল ধরে। আপনিসহ দালানের বাসিন্দারা হন্তদন্ত হয়ে তখন ফাটল মেরামত করেন, দেয়ালে নতুন রঙের প্রলেপ লাগান। কিন্তু দালানের নিচের ত্রুটিপূর্ণ ভিতের কথা ভাবেন না।

এই অবস্থা কতটুকু টেকসই?

বাস্তবতা হলো, এই দালান ধসে পড়া কেবল সময়ের ব্যাপার। ভিত্তিই যদি মজবুত না হয়, তাহলে দেয়ালে চুনকাম করে, কিংবা কিছু ফাটল মেরামত করে এই ধস ঠেকানো যাবে না।

আমাদের জাতীয় জীবনের অবস্থা ঠিক তাই। এই রাষ্ট্র, রাজনীতি এবং বিদ্যমান কাঠামোর ভিত্তিটাই ফাঁপা। সাময়িক সংস্কার বা জোড়াতালিতে এর সমাধান হবে না। এই কাঠামোর ওপর যতই প্রলেপ লাগান না কেন, টেকানো যাবে না। আমাদের টিকে থাকার একমাত্র পথ হলো; মজবুত, সঠিক ভিত্তির ওপর জাতীয় জীবনকে নতুন করে গড়া। কেতাবি ভাষায় যাকে বলে refounding the nation বা জাতীয় জীবনের বিনির্মাণ।

ঝড়ের কবলে পড়লে মানুষকে যেমন শক্ত কোনো খুঁটি আঁকড়ে ধরতে হয়, জাতিকেও তেমনি প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য দাঁড়াতে হয় শক্ত 'সিভিলাইযেশনাল গ্রাউন্ড' বা সভ্যতাগত ভিত্তির ওপর। এখানে স্রেফ দেশপ্রেম বা দেশের মানুষকে ভালোবাসা যথেষ্ট না। টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন একটা বিশ্বাস, একটা সুনির্দিষ্ট ওয়ার্ল্ডভিউ এবং মৌলিক কিছু বিষয়ে কওমের ইস্পাতকঠিন ঐকমত্য।

অস্তিত্বের বুনিয়াদ

কোনো জনগোষ্ঠী যদি পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়, তবে তাদের প্রয়োজন একটা শক্তিশালী সামষ্টিক পরিচয় বা গ্রুপ আইডেন্টিটি। তাদের মধ্যে প্রয়োজন সামাজিক সংহতি। সবাই মিলে এক হয়ে থাকার এই সামষ্টিক প্রাণশক্তিই একটি জাতিকে বিচ্ছিন্ন জমায়েত থেকে সংগঠিত শক্তিতে রূপান্তর করে।

বহু শতাব্দী আগে ইতিহাসের দার্শনিক ইবনু খালদুন এই শক্তির নাম দিয়েছিলেন *আসাবিয়্যাহ*৷ আধুনিক সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনেও এই একই সত্য ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষায় ফিরে এসেছে। এমিল ডুর্খেইম একে বলেছেন কালেক্টিভ কনশাসনেস (Collective Consciousness); সেই অভিন্ন বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, যা আঠার মতো সমাজকে জুড়ে রাখে। হেগেল এর নাম দিয়েছেন 'স্পিরিট অফ দ্য পিপল' (Volkgeist)। ঐ কেন্দ্র, যা একটা জাতির রুহানি ও সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্ধারণ করে। যা ঠিক করে দেয় সেই সমাজের আইন, প্রথা আর ঐতিহাসিক পথচলার গতিপথ।

নাম যা-ই হোক, মূল সুর এখানে এক: টিকে থাকা এবং সভ্যতা গড়ার জন্য শক্তিশালী 'শেয়ারড আইডেন্টিটি' বা সাধারণ পরিচয়ের বিকল্প নেই। এই সংহতি ছাড়া একটা জাতি হয়তো ধুকে ধুকে কোনোমতে টিকে থাকতে পারবে, কিন্তু কখনো কোনো শক্তিশালী সভ্যতা তৈরি করতে পারবে না।

আল-গাযযালি এই পুরো ব্যাপারটা মাত্র দুটো লাইনে তুলে ধরেছেন এভাবে:

> 'সমাজের ভিত্তি হলো দ্বীন, আর অভিভাবক হলো শাসক। যার কোনো ভিত্তি নেই, তাকে ধসে পড়তে হবে; যার কোনো পাহারাদার নেই, তাকে হারিয়ে যেতে হবে।'[৬৩]

ভুল ভিত

বাংলাদেশের সংকট হলো, কোন দ্বীন আমাদের ভিত্তি হবে, সেটা আমরা সঠিকভাবে বেছে নিতে পারিনি। এই ভিত্তি নির্বাচনে আমরা ভুল করেছি। বারবার আমরা সুশাসন আর শাসক বদলানোর কথা ভেবেছি, কিন্তু যে ভিত্তির ওপর সুশাসনকে দাঁড়াতে হবে, তা নিয়ে চিন্তা করিনি।

---

[৬৩] আবু হামিদ আল-গাযযালি, *আল-ইকতিসাদ ফি আল-ই'তিকাদ* (মাকতাবাতুশ শামেলা)।

গত আট দশকে আমরা বিভিন্ন বাদ-মতবাদ দিয়ে চেষ্টা করেছি—কখনো আঁকড়ে ধরেছি ইসলামের রূহকে বাদ দিয়ে পরিচয়বাদী মুসলিম জাতীয়তাবাদ, কখনো কলকাতাকে কেন্দ্র ধরে তৈরি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, কখনো মাত্র কয়েক দশকের পুরোনো সীমান্তকেন্দ্রিক বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ। কিন্তু কোনোটাই আমাদের স্থিতিশীল কেন্দ্র দিতে পারেনি।

কওম ও যমীনকে জোড়া লাগানোর বদলে এগুলো উল্টো আমাদের বিভক্ত করেছে। মুসলিম জাতীয়তাবাদ কিছু ইসলামী শব্দের মোড়কে আমাদের ওপর আঞ্চলিক এলিটদের শ্রেষ্ঠত্ব আর সেক্যুলার শোষণ চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ ভাষা ও জাতিগত পরিচয়কে মুসলিম পরিচয়ের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ চেষ্টা করেছে অস্পষ্টতার প্রলেপ দিয়ে জাতীয় জীবনের প্রগাঢ় বিভাজন ঢাকতে।

কিন্তু দালানের নিচের সেই শূন্যতা দূর হয়নি। ফলে নিয়মিত বিরতিতে বারবার এই কাঠামো কেঁপে ওঠছে। আমাদের জাতীয় জীবন প্রকম্পিত হয়েছে, হয়েছে বিপর্যস্ত।

তাই ইবনু খালদুনের আসাবিয়্যাহ কিংবা আধুনিক ঢঙ্গে জাতীয় জীবনের বিনির্মাণ—যে নামেই ডাকি না কেন, এই কওম ও যমীনকে টিকিয়ে রাখতে হলে এমন কোনো ভিত্তি প্রয়োজন, যা মৌলিকভাবে চারটি কাজ করতে পারবে:

কম্পাস: সেই ভিত্তিকে হতে হবে এক নির্ভুল কম্পাস। মাঝসমুদ্রে পথ হারানো জাহাজের যেমন দিকনির্ণয় যন্ত্র লাগে, জাতির জন্যও তাই। গন্তব্য ঠিক না থাকলে জাতি কেবল গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে থাকে। তবে এই কম্পাস শুধু দিক চেনার জন্য না। একে হতে হবে সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি; 'ফুরকান'।

নৈতিক ব্যবস্থা: শুধু আইন দিয়ে মানুষকে বাধ্য করা যায়, কিন্তু সমাজকে ধরে রাখা যায় না। সমাজ টিকে থাকে পারস্পরিক বিশ্বাস, নীতি, মূল্যবোধ এবং ন্যায় ও কল্যাণের শেয়ারড আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ওপর। সেই ভিত্তিকে তাই যোগান দিতে হয় একটি শক্তিশালী নৈতিক ব্যবস্থা। যেখানে ন্যায়বিচারের মানদণ্ড হবে সুনির্দিষ্ট ও প্রশ্নাতীত।

ভবিষ্যতের স্বপ্ন: হাতে সঠিক কম্পাস এবং পায়ের নিচে শক্ত নৈতিক যমীনের পর প্রয়োজন ভবিষ্যতের একটি স্পষ্ট ছবি বা 'ভিশন'। আগামী পঞ্চাশ বছর পর আমাদের সমাজটা দেখতে কেমন হবে? সেখানে মানুষের হক, হিস্যা, নিরাপত্তা, ইনসাফ আর সম্মানের স্বরূপটা কী হবে?

> কোনো জাতির লক্ষ্য যদি হয় শুধু 'কোনোমতে টিকে থাকা', তাহলে তারা কখনোই মহান কিছু তৈরি করতে পারে না। সমাজের সামনে এমন কোনো গন্তব্য, এমন কোনো স্বপ্ন, এমন কোনো প্রকল্প রাখতে হবে, যার জন্য মানুষ হাসিমুখে নিজেকে উজাড় করে দিতে প্রস্তুত থাকবে। মানুষের মনে স্বপ্নের স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দিতে হবে।
>
> **সভ্যতা নির্মাণের প্রকল্প:** সবশেষে, এই ভিত্তির থাকতে হবে সভ্যতা নির্মাণের সক্ষমতা। জাতি তখনই সভ্যতা হয়ে ওঠে, যখন সে অন্যের সংস্কৃতির ভোক্তা না থেকে নিজেই জ্ঞান ও সংস্কৃতির উৎপাদক হয়ে ওঠে। আমাদের এমন এক ভিত্তি প্রয়োজন, যা আমাদের মনের ভেতরকার হীনম্মন্যতা দূর করে দেবে, আমাদের শেখাবে নিজেদের চশমা দিয়ে দুনিয়াকে দেখতে। যা কেবল আমাদের সংকটই মেটাবে না, বরং অসুস্থ পৃথিবীকেও দেখাবে নতুন আলোর দিশা।

প্রশ্ন হলো কোন দ্বীন, কোন জীবনব্যবস্থা এই কাজগুলো করতে সক্ষম? আমাদের বিনির্মাণের সেই ভিত্তি কী হবে?

অভ্যস্ত ভুল উত্তর

আমাদের সমাজে যারা রাজনীতি করে, অথবা যাদেরকে বুদ্ধিজীবী বলা হয়, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে তারা সাধারণত আলাপ করেন না। তবে এ প্রশ্ন যদি তাদের করা হয়, তাহলে তারা নিশ্চিতভাবেই পশ্চিমা লিবারেল ডেমোক্রেসি বা সেক্যুলার হিউম্যানিসমের কথা বলবেন।

এটা তাদের কলোনিয়াল রিফ্লেক্স। যেকোনো প্রশ্ন, সমস্যা বা যেকোনো চিন্তার জন্য তারা পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কিন্তু তাদের এই অভ্যস্ত উত্তরের দুটো বড় সমস্যা আছে।

প্রথমত, গত আট দশক ধরে এই পশ্চিমা মডেলগুলো দিয়েই জাতীয় জীবনকে গড়ার চেষ্টা হয়েছে এবং তা ব্যর্থ।

দ্বিতীয়ত, খোদ পশ্চিমা বিশ্ব আজ গভীর সংকটে ডুবে আছে। যে সভ্যতা নিজেই নিজের ভার সইতে পারছে না, যে নিজেই এক ভয়াবহ অর্থহীনতায় ভুগছে, ভেতর থেকে ধসে পড়ছে; সে কীভাবে অন্য কোনো জাতির সভ্যতা গড়ার বুনিয়াদি ভিতের যোগান দেবে?

গন্তব্যহীন: আমরা বলেছিলাম, সমাজের বুনিয়াদি ভিত্তির প্রথম কাজ হলো একটা কম্পাসের মতো কাজ করা। কিন্তু পশ্চিমা আধুনিকতার সবচাইতে বড় গলদ হলো তার গন্তব্যহীনতা। আধুনিকতা যখন ধর্মকে খারিজ করে দিল, তখন সে মানুষের জীবন থেকে চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বা টেলোস (Telos) এর ধারণা মুছে ফেলল। বিকল্প কোনো উদ্দেশ্যও সে দিতে পারল না।

আর জীবনের যখন কোনো মহৎ উদ্দেশ্য থাকে না, তখন ভালো আর মন্দের কোনো অর্থও আর থাকে না। সবকিছুই হয়ে যায় বাজারের লাভলোকসান কিংবা মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার। নৈতিকতার বদলে ব্যক্তির আবেগই তখন মাপকাঠি হয়ে ওঠে। অ্যালেইসডার ম্যাকিনটায়ারসহ বিভিন্ন পশ্চিমা দার্শনিকই এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৬৪]

যে ব্যবস্থা নিজেই জানে না মানুষ কেন বেঁচে আছে, কীসের জন্য বেঁচে আছে; যার নিজেরই কোনো গন্তব্য নেই, সে আমাদের কোন পথ দেখাবে? যারা নিজেরাই দিকভ্রান্ত, তারা কীভাবে আমাদের কম্পাস দেবে?

ভিড়ের মাঝে নিঃসঙ্গ: সভ্যতা নির্মাণের জন্য প্রয়োজন ইস্পাতকঠিন সামাজিক সংহতি। ইবনু খালদুনের ভাষায় আসাবিয়্যাহ। কিন্তু আধুনিকতা ব্যক্তিকে 'মুক্ত' করতে গিয়ে সমাজকেই চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেছে। কমিউনিটির অস্তিত্ব প্রায় বিলীন হয়ে গেছে; আছে কেবল নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন মানুষের ভিড়।

এখানে 'আমি' সবচাইতে শক্তিশালী, 'আমরা' ভীষণ নড়বড়ে।

আজকের এই তরল আধুনিকতায় সম্পর্কগুলো খুব সহজে গড়ে ওঠে আর ভেঙে যায় তার চেয়েও সহজে। সম্পর্ক হলো নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করার একটা সাময়িক সেটআপ।

যে মতাদর্শ সমাজের বাঁধন ছিঁড়ে মানুষকে নিঃসঙ্গ করে দেয়, পারিবারিক কাঠামো ভেঙে দেয়, তাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করলে আমাদের সমাজও তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। যে ভাঙ্গন আমরা এরইমধ্যে দেখতে পাচ্ছি। পশ্চিমা মতাদর্শ আমাদের সংহতির ভিত্তি দিতে পারবে না।

অর্থহীনতার অসুখ: আমাদের এমন কোনো ভিত্তি দরকার, যা আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাবে, বেঁচে থাকার, কুরবানি করার এবং জীবন দেওয়ার অর্থ দেবে। দেবে সভ্যতা গড়ার শক্তি ও প্রত্যয়। কিন্তু আধুনিক পশ্চিমা ব্যবস্থা আজ এক ভয়াবহ *মিনিং ক্রাইসিস* বা অর্থহীনতার সংকটে ভুগছে।

---

[৬৪] Alasdair MacIntyre, *After Virtue: A Study in Moral Theory*, 3rd ed. (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2007)

মহাবিশ্বকে বোঝার এবং এর ভেতরে নিজের অবস্থান খুঁজে পাওয়ার মানসিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে মানুষ। সভ্যতার যান্ত্রিক চাকাটা হয়তো এখনো ঘুরছে, কিন্তু দিন দিন ফিকে হয়ে আসছে বেঁচে থাকার বা ত্যাগের কারণগুলো। মনোবিজ্ঞানী জন ভারভেকি একে বলছেন দুনিয়াকে বোঝার বা 'সেন্স-মেকিং'-এর সংকট।[৬৫]

যার নিজেরই জীবনের কোনো অর্থ নেই, যে সভ্যতা কেবল ভোগ আর যান্ত্রিকতার চক্রে আটকে আছে, সে আমাদের আগামীর প্রকল্পের ভিত্তি দিতে পারবে না।

মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ: আমাদের বুদ্ধিজীবী আর রাজনীতিবিদরা যখন লিবারেল ডেমোক্রেসি বা সেক্যুলারিসমকে সমাধান হিসেবে ফেরি করেন, তখন তারা এমন এক ওষুধ গছিয়ে দিতে চান, যার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ দিলে রোগীর চিকিৎসা তো হয়ই না, উল্টো ক্ষতি হয়। আর ঠিক সেটাই বারবার আমাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে।

অবক্ষয়কালের পশ্চিমের কাছে আমাদের জন্য কোনো উত্তর নেই। তাদের মতাদর্শ বা ব্যবস্থা আমদানি করে আমরা সংকট কাটাতে পারব না। বরং সংকট আরও ভয়াবহ হবে, হচ্ছে।

পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে সমাধান খোঁজার দিন শেষ। অন্যের ধার করা ছকে আমাদের মুক্তি মিলবে না। মানুষের তৈরি ব্যবস্থার ব্যর্থতা থেকে বাঁচতে হলে আমাদের ফিরতে হবে মানুষের নির্মাতার দেওয়া নির্দেশনার কাছে। আঁকড়ে ধরতে হবে সেই শাশ্বত ব্যবস্থাকে, যা আমাদের ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে।

[৬৫] John Vervaeke, "Awakening from the Meaning Crisis" (Lecture Series, University of Toronto, 2019–), YouTube, accessed December 26, 2025.

সরল পথ

আমাদের সামনে একমাত্র সমাধান ইসলাম।

এটা ঈমানি জযবা বা আবেগের কথা না। বরং আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সবচেয়ে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত।

ইসলাম বলতে এখানে কোনো বিশেষ দলের রাজনৈতিক ইশতেহার, নিছক বংশগতভাবে মুসলিম হওয়া কিংবা কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীস্বার্থের কথা বলা হচ্ছে না।

এখানে ইসলাম মানে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। একটা সভ্যতাগত পরিচয় এবং একটা পরিপূর্ণ 'ওয়ার্ল্ডভিউ'।[৬৬]

আমরা এ পর্যন্ত যতগুলো ভিত্তির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছি; নানা ধরনের জাতীয়তাবাদ কিংবা অন্যান্য পশ্চিমা আদর্শ, সবই চাপের মুখে ভেঙে পড়েছে। এগুলো এমন কোনো টেকসই নৈতিক শক্তি দিতে পারেনি, যা বাইরের ধাক্কা সামলাতে পারে। উল্টো আমাদের ভেতরের সংকটগুলোকে এগুলো আরও জটিল করে তুলেছে। আমাদের পুরো ইতিহাসকে ধারণ করা তো দূরের কথা, এই আদর্শগুলো আমাদের ইতিহাসের ন্যূনতম ধারাবাহিকতাটুকুও রক্ষা করতে পারেনি।

এই ব্যর্থতা আজ আমাদের অস্তিত্বকে ভেতরে ও বাইরে সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছে।

এই যমীনে যদি স্থায়ী কিছু গড়তে হয়, তবে অবশ্যই ভারতের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ভারতীয় আগ্রাসন আর হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের সামনে আমাদের প্রচলিত সেক্যুলার মতাদর্শগুলো অচল। আমাদের মানচিত্রের ওপর যে হুমকিগুলো আসছে, তা মোকাবিলা করার কোনো শক্তি এই আদর্শগুলোর নেই।

---

[৬৬] **ওয়ার্ল্ডভিউ (Worldview):** স্রষ্টা, মহাবিশ্ব, মানুষ, ইতিহাস, জীবনমৃত্যু, জ্ঞানসহ নানা বিষয়ে মৌলিক বিশ্বাসের সমষ্টি। এটি চিন্তার ওই কাঠামো, যার সাপেক্ষে, যার মাধ্যমে এবং যার ভেতরে মানুষ বাস্তবতাকে বোঝার ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। ওয়ার্ল্ডভিউ হলো ওই লেন্স, ওই চশমা, যার ভেতর দিয়ে আমরা পৃথিবীকে দেখি। প্রত্যেকের যেমন নিজস্ব ভাষা থাকে, তেমনিভাবে প্রত্যেকের একটা ওয়ার্ল্ডভিউ থাকে। হয়তো তারা সেটাকে 'ওয়ার্ল্ডভিউ'-এর মতো গালভরা কোনো শব্দ হিসেবে চেনে না, কিন্তু শব্দের পেছনের জিনিসটা কমবেশি সবার মধ্যেই থাকে।

এই মতাদর্শগুলো মানুষকে একতাবদ্ধ করতে পারে না, বড় কোনো স্বপ্নও দেখাতে পারে না। বড়জোর এগুলো অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে কোনোমতে টিকে থাকার কথা বলে। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় যে, এই সামান্য প্রতিশ্রুতিটুকু পূরণেও এগুলো ব্যর্থ হয়েছে।

শুধু আগ্রাসন মোকাবিলার বেলায় না, বরং সমাজে ইনসাফ নিশ্চিত করতেও এই মতাদর্শগুলো ব্যর্থ। আমরা দেখেছি, স্রেফ আইন বা সুশাসনের বুলি দিয়ে লুণ্ঠনতন্ত্র কিংবা রাষ্ট্রযন্ত্রের দানবীয় রূপ থামানো যায় না। যে শাসকের কোনো জবাবদিহিতা নেই, সে স্বৈরাচার হবেই। আমাদের এমন ভিত্তি প্রয়োজন, যা শাসক এবং সাধারণ মানুষ; সবার ওপরেই কর্তৃত্ব রাখে।

মানুষের বানানো সংবিধান কখনো এই দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। কিন্তু ইসলাম এই কাজটা করতে পারে। ইসলাম আমাদের এক আসমানি নৈতিক কাঠামো (Transcendental moral order) দেয়। যেখানে আদল ও ইনসাফ সকল সৃষ্টির হক। এই নৈতিক কাঠামোতে কাটছাঁট করার ক্ষমতা কোনো আদালত, প্রতিষ্ঠান কিংবা মানুষের নেই।

যখনই কোনো জনপদে ইসলাম কায়েম হয়েছে, তখনই মানুষ—হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম; নিরাপদ বোধ করেছে। তার হক বুঝে পেয়েছে। এ কথাগুলো ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য।

হাজার বছর যাবৎ ইসলামী শাসনের অধীনে জেরুসালেম থেকে আন্দালুস হয়ে এই উপমহাদেশ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা শান্তি এবং নিরাপত্তার সাথে বসবাস করেছে। এ উপমহাদেশের মুসলিম শাসকদের আমলেও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা নিরাপদে ছিল। দাঙ্গা আর সাম্প্রদায়িক সংঘাতের যে বিষাক্ত রাজনীতি আমরা আজ দেখি, তা শুরু হয়েছে কলোনিয়াল যুগে। আর এই সিলসিলাকে টেনে নিয়ে গেছে বিভিন্ন সেক্যুলার রাজনৈতিক দল।

পশ্চিমা মতাদর্শগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অনেক, কিন্তু বাস্তবে প্রাপ্তির খাতা শূন্য। ইসলাম বড় বড় কথা বলেনি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখেনি; বাস্তবে করে দেখিয়েছে।

ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য সুতো

ইতিহাসও আমাদের স্পষ্টভাবে এই একটা উত্তরই দেখিয়ে দেয়।

এই বাংলা বিশ্ব দরবারে শেষবারের মতো বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল সুলতানি আমলে; যা যথাযথভাবে ইসলামী না হলেও ইসলামী সভ্যতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা (islamicate) প্রকল্প ছিল।

বাবা আদম শাহ থেকে শাহ জালাল, শাহ মাখদুম থেকে খান জাহান আলী; বারবার ইসলাম এই পলিমাটিতে হাজির হয়েছে মজলুমের আশ্রয় হিসেবে। ফকির মজনু শাহ থেকে তিতুমীর হয়ে ফরায়েজী আন্দোলন; আমাদের পূর্বপুরুষরা যখনই আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, তাদের সেই প্রতিরোধের ভিত্তি ছিল ইসলাম। তাদেরকে চালিত করেছিল রক্তে আগুন ধরিয়ে দেওয়া সেই জাদুকরি স্লোগান 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

আজও জাতির যেকোনো ক্রান্তিলগ্নে; হোক তা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা স্বৈরাচারের পতন, মানুষকে জাগিয়ে তুলতে ইসলামের ভাষাই সবচেয়ে কার্যকর। জাহিলিয়াতে হাবুডুবু খেতে থাকা ছেলেটাও বুলেটের সামনে নামার সাহস পায় শহীদ হবার তামান্নাকে আঁকড়ে ধরে। ইসলামের বিধান না মানা মেয়েটাও চরম বিপদের সময়ে রাব্বুল আলামীনের সামনে হাত পাতে। এমনকি পাড় সেক্যুলাররাও বিপদের দিনে সাধারণ মানুষকে মাঠে নামাতে ইসলামের দোহাই দিতে বাধ্য হয়।

আমাদের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ—সবকিছুই ইসলামের সাথে জড়িয়ে আছে, আমরা যতটা স্বীকার করি তার চেয়েও অনেক গভীরভাবে।

বৈপ্লবিক রূপান্তর

একদিকে একের পর এক ব্যর্থতা; যা রাষ্ট্রকে দুর্বল করেছে, সমাজকে বিভক্ত করেছে। আমাদের এনে ফেলেছে অস্তিত্বের সংকটে। অন্যদিকে ঐতিহাসিক সফলতা।

হিসাব সহজ।

এই কওম ও যমীনকে যদি বাঁচাতে হয়, তাহলে ইসলাম ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো পথ নেই। আমরা ততদিনই নিরাপদ আর সম্মানিত ছিলাম, যতদিন এই শেকড় শক্ত করে ধরা ছিল। তাই আজ যদি আমরা বিলীন হতে না চাই, তবে

এই পরীক্ষিত পথেই ফিরে যেতে হবে। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই শুরু করতে হবে জাতীয় জীবনের কাঙ্ক্ষিত বিনির্মাণ।

এক্ষেত্রে আমাদের একটা ভুল ধারণা আছে।

আমরা মনে করি, রাষ্ট্রযন্ত্রকে অবিকল রেখে দিয়ে শুধু যদি এই যন্ত্রের চালক বদলে দেওয়া যায়, তবেই বুঝি সমাধান হয়ে যাবে। যদি ক্ষমতায় পরহেজগার মানুষ আসে, তাহলেই ইসলাম চলে আসবে।

আমরা ভাবি, রাষ্ট্র হলো গাড়ির মতো। ড্রাইভিং সিটে ভালো লোক বসালেই গাড়ি ভালো চলবে; চালক যেদিকে ঘুরাবে, গাড়ি যাবে সেদিকেই।

এটা মারাত্মক ভুল ধারণা। আধুনিক রাষ্ট্রের তুলনা চলে রেললাইনের ওপরে চলা ট্রেনের সাথে, গাড়ির সাথে না। গাড়ি যেখানে খুশি চালানো যায়, কিন্তু হাজারবার ট্রেনের চালক বদলালেও ট্রেন তার লাইন বদলায় না।

রাষ্ট্রের একটা স্থায়ী চরিত্র থাকে। রাষ্ট্রকাঠামো নির্দিষ্ট ধরনের রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন এবং মূল্যবোধের জন্ম দেয়। সমাজ ও সংস্কৃতিকে গড়ে তোলে নিজস্ব ছাঁচে। ক্ষমতা কার হাতে, সেটা বদলাতে পারে, কিন্তু এই চরিত্র বদলায় না।

আমাদের রাষ্ট্রের এই 'লাইন'গুলো বসানো হয়েছে সেক্যুলার এবং কলোনিয়াল শোষণকে মাথায় রেখে। এটাই এই যন্ত্রের 'ডিফল্ট সেটিং'। চালকের আসনে যেই বসুক, এই ট্রেন ওই নির্ধারিত গন্তব্যের দিকেই যাবে। স্রেফ চালক বদলে একে কখনোই ইসলামের গন্তব্যে নেওয়া যাবে না। গন্তব্য বদলাতে হলে লাইন উপড়ে ফেলতে হবে; পুরোনো কাঠামো ভেঙে বানাতে হবে নতুন পথ।

আর তার জন্য প্রধান শর্ত হলো, তাওহীদের ওপর ভিত্তি করে নতুন এক রাজনৈতিক সত্তা (Polity) খোদাই করে নেওয়া। এমন এক সত্তা, যা হবে সত্যিকার অর্থেই আযাদ; বৈশ্বিক জাহিলি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। এই রাজনৈতিক সত্তাকে এমন মজবুত হতে হবে, যেন ভেতর ও বাইরের সব শত্রুর মোকাবিলা করে টিকে থাকা যায়।

আর এ জন্য প্রয়োজন শাসনব্যবস্থা, রাজনৈতিক কাঠামো, সমাজ ও জীবনবোধের আমূল পরিবর্তন। নিছক দাওয়াহ ও তাবলীগ, ব্যক্তিগত পর্যায়ে ধর্ম পালন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রকল্প কিংবা গতানুগতিক রাজনীতি দিয়ে এমন পলিটি তৈরি করা যাবে না।

তাওহীদ ও হাদীদ

রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার অপরিহার্যতা, কেবল ইতিহাস বা সমাজতত্ত্বের উপসংহার না, আল-কুরআনের আসমানি নির্দেশনাও ঠিক একই কথা বলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের সূরা আল-হাদীদে এক চিরন্তন মূলনীতি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়ের মানদণ্ড, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি আরও নাযিল করেছি লোহা, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।"[৬৭]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেছেন,

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

"আর পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে আপনার রবই যথেষ্ট।"[৬৮]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

'দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয় পথপ্রদর্শনকারী কিতাব (যা হিদায়াত দেয়) এবং সাহায্যকারী তলোয়ারের মাধ্যমে।'[৬৯]

সূরা হাদীদের উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন,

'যে কিতাব থেকে বিচ্যুত হয়, তাকে সোজা করা হয় লোহা (শক্তি) দিয়ে; এভাবেই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসহাফ' (কুরআন) এবং তলোয়ারের সমন্বয়ে।'[৭০]

---

[৬৭] সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:২৫

[৬৮] সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৩১

[৬৯] ইবনু তাইমিয়্যা, মাজমুউল ফাতাওয়া, খণ্ড ২৮/২৩৪

[৭০] পূর্বোক্ত ২৮/৩৯৬

অর্থাৎ, দ্বীন প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হলো দুই স্তম্ভের সমন্বয়:

কিতাব; যা পথ দেখায়, যা ফুরকান বা চিরন্তন মাপকাঠি। কিতাব মানুষকে দুনিয়ার বাস্তবতা এবং আখিরাতের সত্যের সাথে জুড়ে দিয়ে তাকে সরল পথে নিয়ে যায়।

সাহায্যকারী লোহা; যা সেই পথকে রক্ষা করে ও বিজয়ী করে। কারণ শুধু সঠিক পথ জানাই যথেষ্ট না; সেই পথে চলার ও পথের বাঁধা দূর করার শক্তিও থাকতে হয়।

শাসনকর্তৃত্ব বা তলোয়ার ছাড়া কুরআনের নির্দেশনা পুরোপুরি পালন করা সম্ভব না। আর কিতাব ছাড়া তলোয়ার পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই তৃতীয় খলীফা সাইয়্যিদিনা উসমান ইবনু আফফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন:

> 'আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে যা প্রতিরোধ করেন না, তা 'সুলতান' বা রাষ্ট্রক্ষমতার মাধ্যমে প্রতিরোধ করেন।'[৭১]

শুধু মানুষকে সত্যের দিকে ডেকে হক প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাওহীদের অনুসারীদের রক্ষা করা যায় না, আদল ও ইনসাফ কায়েম করা যায় না। রক্ষা করা যায় না স্রষ্টা ও সৃষ্টির অধিকার। প্রয়োজন হয় তাওহীদের পাশাপাশি হাদীদ, দাওয়াহর পাশাপাশি শাসনকর্তৃত্ব। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পথই আমাদের দেখিয়ে গেছেন। তাই ইসলাম এবং যৌক্তিক বিবেচনা, দু দিক থেকেই শাসনকর্তৃত্ব অর্জন করা আবশ্যক।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ তাঁর *আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ* গ্রন্থে লিখেছেন:

> 'এটা জানা আবশ্যক, মানুষের ওপর কর্তৃত্ব বা শাসন পরিচালনা করা দ্বীনের অন্যতম মহান দায়িত্ব (ওয়াজিবাত); বস্তুত, এটি ছাড়া দ্বীন বা দুনিয়া; কোনোটিই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।'[৭২]

যদি যুগসন্ধির দায় মেটাতে হয়, যদি গেরুয়া আগ্রাসন রুখে দিতে হয়, যদি জুলুমের চক্র ভাঙতে হয় এবং বিশ্ব দরবারে হাজির হতে হয় স্বতন্ত্র সভ্যতা হিসেবে, তবে কেবল সরকার অথবা সংবিধান বদলালে হবে না। সমাজ কিংবা রাষ্ট্র সংস্কার করে লাভ হবে না। কিতাবের হিদায়াত এবং লোহার নুসরাত; এই দুইয়ের সমন্বয়ে তাওহীদের ওপর গড়ে তুলতে হবে আযাদ ও শক্তিশালী এক শাসনব্যবস্থা। নষ্ট হয়ে যাওয়া দালান ভেঙে, পুরোনো ভিতকে উপড়ে, ইসলামের আদর্শে গড়তে হবে নতুন ইমারত।

আমাদের মুসলিমবঙ্গ হয়ে উঠতে হবে।

---

[৭১] ইবনু কাসীর সূরা বনী ইসরাইলের (১৭:৮০) তাফসীরে এবং ইবনু তাইমিয়্যাহ 'মাজমুউল ফাতাওয়া'তে(খণ্ড ২৮) এটি উদ্ধৃত করেছেন। এটা উসমান ﷺ থেকে বর্ণিত আসার।

[৭২] ইবনু তাইমিয়্যাহ, আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ ফি ইসলাহির রায়ি ওয়ার রায়িয়্যাহ এবং মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৩৯০।

বৈশ্বিক জট, স্থানিক সমীকরণ

শুরুতে বলেছিলাম মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি হলো ধারাবাহিকতার ভ্রম। আমরা ধরে নিই পৃথিবী আজ যেভাবে চলছে, আগামীতে ঠিক সেভাবেই চলবে। তাই যখনই কোনো সংকট আসে, আমরা চেনা ব্যবস্থার ভেতরেই সমাধান খুঁজি।

কিন্তু যুগসন্ধির সময়ে, সভ্যতার পালাবদলের কালে পুরোনো ছকে সমাধান পাওয়া যায় না। তখন চিন্তা করতে হয় বাক্সের বাইরে। বেপরোয়া হয়ে স্বপ্ন দেখতে হয়, আর কাজ করতে হয় প্রচণ্ড বাস্তববাদী হয়ে।

বেশিরভাগ মানুষ স্বপ্ন দেখা আর প্রচলিত ছক ভাঙার কথা শুনলে ভয় পায়। তারা মনে করে এগুলো অবাস্তব, পাগলামি। আর এভাবেই ইতিহাসে বড় বড় কৌশলগত বিপর্যয় ঘটে। পুরোনোকে আঁকড়ে ধরে রাখার কারণে এবং নতুনকে গ্রহণ করতে না পারায় মানুষ পরাজিত হয়।

মানুষ যেটাকে অসম্ভব মনে করে, অনেক সময় সেটাই তার পতন ডেকে আনে।

১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল অবরোধের সময় বাইযেন্টাইনরা জানত তাদের উপসাগর নিরাপদ। সেখানে বিশাল শেকল দেওয়া আছে। সেখানে জাহাজ ঢোকা অসম্ভব। তাই তারা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল। কিন্তু সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ ডাঙ্গার ওপর দিয়ে জাহাজ টেনে এনে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধের সেই কঠিন সময়ে যখন মদীনার চারদিকে শত্রু, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মুসলিমরা কিসরা আর কায়সারের সাম্রাজ্য জয় করবে। মদীনার মুনাফিকরা হেসেছিল।[৭৩]

আরবের ধূলিমলিন মুসলিমরা যখন বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখেছিল, তখন সেই সময়কার দুই সুপারপাওয়ার; পারস্য আর রোম, তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ মুসলিম মুজাহিদদের দিয়েই সেই সাম্রাজ্যগুলো ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন। মরুভূমিতে খালি পায়ে ঘুরে বেড়ানো বেদুইনদের পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়েছিল রোম ও পারস্যের প্রতাপশালীরা।

আজকের বাস্তবতাও খুব একটা আলাদা না।

---

[৭৩] সুনান আন-নাসায়ী, *কিতাবুল জিহাদ*, হাদীস ৩১৭৬, সূরা আল-আহযাব, ৩৩:১২

পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থাকে অনেকেই অজেয় মনে করেন। এর বাইরে গিয়ে কিছু করার কথা তো দূরে থাক, চিন্তা করতেও অনেকে ভয় পান। কিন্তু এই ব্যবস্থার সংস্কার করে সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। এর জন্য দরকার বিশ্বব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন; প্রয়োজন সভ্যতার বৈপ্লবিক রূপান্তর।

মুসলিম হিসেবে আমরা মনে করি, এই বিপ্লব ইসলামের ভিত্তিতেই হতে হবে। স্রেফ আল-কুদস তথা ফিলিস্তিনের বিষয়টি নিয়ে ভাবলেই হিসাবটা খুব পরিষ্কার হয়ে যায়। গাযা গণহত্যা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, এখানে নিয়মতান্ত্রিক কোনো সমাধান নেই।

দখলদার ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল ব্রিটিশ ও মার্কিন সাহায্যে। আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের ফ্রেইমওয়ার্কে চলা এই বিশ্বব্যবস্থা আজও তাকে টিকিয়ে রেখেছে। কাজেই এই বিশ্বব্যবস্থার অধীনে যত অনুমোদিত পথ আছে, তার কোনোটা দিয়েই ফিলিস্তিনকে মুক্ত করা সম্ভব না। আগে এই জাহিলি বিশ্বব্যবস্থাকে ভেঙ্গেচুড়ে উপড়ে ফেলতে হবে, তারপরই বাইতিল মাকদিস মুক্ত হবে।

কিন্তু শুরুটা হবে কীভাবে? শূন্যের ওপর দাঁড়িয়ে ইতিহাস বদলানো যায় না।

আর্কিমিডিস বলেছিলেন:

> 'আমাকে একটি দাঁড়ানোর জায়গা আর লম্বা লাঠি দাও, আমি পুরো পৃথিবীকে নড়িয়ে দেবো।'

পৃথিবীকে নাড়াতে হলে একটা দাঁড়ানোর জায়গা লাগে। প্রতিটি বৈশ্বিক আন্দোলনের জন্য শক্ত ঘাঁটি প্রয়োজন হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীরাত থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই। ইসলামী সভ্যতার বিশ্বজয়ী আধিপত্য তখনই সম্ভব হয়েছিল, যখন মদীনায় একটি শক্ত, স্বাধীন এবং টেকসই ঘাঁটি তৈরি হয়েছিল।

আধুনিক সময়ে ফ্রান্সে বিপ্লব সফল হওয়ার পরই সেই চেতনা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বৈশ্বিক শক্তিতে পরিণত হতে পেরেছিল, কারণ রাশিয়াতে এই আন্দোলন শক্ত ঘাঁটি তৈরি করতে পেরেছিল। বিশ্বকে বদলাতে হলে আগে নিজের পায়ের নিচের মাটি শক্ত করতে হয়।

তার মানে এই না যে, বাংলাদেশ একাই পুরো বিশ্বকে বদলে দেবে। বরং ভৌগোলিক আর ঐতিহাসিক নানা কারণে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এই পরিবর্তনের মূল কেন্দ্র হবে অন্য কোনো অঞ্চল।

কিন্তু সেই মহাবিপ্লবের প্রক্রিয়ায় শামিল হতে হলে, আগে নিজেদের ঘর গোছাতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁদের হাতের নাগালে থাকা

সামর্থ্য আর যমীনটুকু নিয়েই কাজ শুরু করেছিলেন। আমাদেরও ঠিক তাই করতে হবে।

আমরা ফিলিস্তিন বা কাশ্মীরের জন্য দুআ করব, বিশ্ব জাহিলিয়াতের কেন্দ্রগুলো ভেঙে দেওয়ার তামান্না রাখব। কিন্তু আমরা যদি জাতি হিসেবে ইতিহাসের গতিপথ বদলে ভূমিকা রাখতে চাই, তাহলে কল্পনার জগত থেকে বের হয়ে লড়াইটা শুরু করতে হবে এখন এবং এখান থেকেই।

আমাদের লড়াইটা শুরু হবে এই যমীন থেকেই।

আমরা এতদিন ইতিহাস পড়েছি শত্রুর চোখে, স্বপ্ন দেখেছি ফিরিঙ্গিদের দেওয়া ছকে, আর ইসলামকে মনে করেছি কেবল ব্যক্তিগত ইবাদাতের বিষয়। চিন্তার এই দাসত্ব থেকে এখন আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

আমাদের বুঝতে হবে আজকের এই জাহিলি বিশ্বব্যবস্থা আর সেক্যুলার রাষ্ট্র নামের উত্তর-ঔপনিবেশিক দানব কোনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না। বিজয়ের ফয়সালা ওয়াশিংটন, বেইজিং, মস্কো কিংবা দিল্লিতে হয় না। ফয়সালা হয় আসমানে। আর মহান আল্লাহ সেই কওমকেই সাহায্য করেন, যারা নিজেদের সাহায্য করে।

পথটা কঠিন এবং এ পথে আমাদের চড়া মূল্য দিতে হবে। কিন্তু আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। আমাদের অবশ্যই নিজ কওমের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

***

অস্তিত্বের সংকটের গভীরতা আমরা মেপে দেখেছি, মোকাবিলার পথও স্পষ্ট। আমরা লক্ষ্য ঠিক করেছি, গন্তব্য চিনে নিয়েছি।

কিন্তু বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা যত সহজ, তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া ততটাই কঠিন।

যে মাটিতে আমরা নতুন দুর্গ গড়ার স্বপ্ন দেখছি, সেই মাটি এখন এমন এক ব্যবস্থার দখলে—যার প্রতিটি আইন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান আর প্রতিটি নাট-বল্টু তৈরিই করা হয়েছে আমাদের এই স্বপ্নকে গলা টিপে মারার জন্য।

গন্তব্যে পৌঁছানোর এই সফর দীর্ঘ, আর পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়সম সব প্রতিবন্ধকতা। তাই পথে নামার আগে, প্রথমেই আমাদের চিনে নিতে হবে এই পথের কঠিন বাস্তবতাগুলোকে।

অধ্যায় ২

খাঁচা

রেহানের পকেটে তখনো হয়তো বুয়েটের আইডি কার্ডটা ছিল...

প্লাস্টিকের কার্ডটা এ জনপদে একটা সামাজিক পাসপোর্টের মতো। এই কার্ড পকেটে থাকা মানে আপনি সাধারণ কেউ না; আপনি ভবিষ্যতের সম্ভাব্য এলিট। সমাজ তো বটেই, রাষ্ট্রও এই কার্ডধারীদের কিছুটা সমীহ করে। দেশ এদের সাফল্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, এদের মৃত্যুতে থমকে যায়। মিডিয়া তখন তোলপাড় করে, নড়েচড়ে বসে বিচারবিভাগ।

কিন্তু ২০১৩ সালের ৫-ই মে রাতে রেহানের বুয়েটিয়ান পরিচয়টা অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল।

রাজধানীর বাতাস তখন বারুদের গন্ধে ভারী। চারদিকে আর্তনাদ, আর সেটাকে ছাপিয়ে ভেসে আসা মেগাফোনের কর্কশ হুংকার। ধোঁয়া, আগুন, গুলির মাযল ফ্ল্যাশ মিলেমিশে তৈরি করেছে ভৌতিক লালচে আভা। এসবের ভেতরে রেহান যখন দাঁড়িয়ে, তাঁর পাশে তখন বাংলার অজপাড়া গাঁ থেকে উঠে আসা হাজারো মানুষ।

তাঁরা এসেছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা থেকে।

তাঁর অবমাননা হয়েছিল, জঘন্য আক্রমণ করা হয়েছিল তাঁর পবিত্র ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের ওপর। তাই দেশের আলিম-উলামাদের ডাকে, নবীজি ﷺ-এর ভালোবাসায় এই মানুষগুলো ছুটে এসেছিলেন। মাথায় টুপি, হাতে জায়নামাজ আর গামছায় বাঁধা শুকনো মুড়ি নিয়ে। রেহান সেই জনসমুদ্রে গিয়ে মিশেছিল ঈমানের টানে।

কিন্তু রাষ্ট্র যখন তার সবটুকু হিংস্রতা নিয়ে এই মানুষগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন রেহানের ওই সম্ভাব্য এলিট পরিচয়টা এক নিমেষেই নাই হয়ে গেল। যে মুহূর্তে সে 'ঐ মোল্লা'দের সাথে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই বুয়েটের মেধাবী ছাত্র থেকে রাষ্ট্রের চোখে সে নেমে গেল বৈধ টার্গেটের কাতারে।

৫-ই মে রেহান আহসান খুন হলো। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় কেনা বুলেট পরম দক্ষতায় ওর খুলিতে বসিয়ে দিল রাষ্ট্রযন্ত্র।[১] কিন্তু ওর মৃত্যুতে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠল না। পরদিন সংবাদপত্রের পাতায় মেধাবী ছাত্র হিসেবে ওর কথা ছাপা হলো না। উল্টো তাড়াতাড়ি লাশ দাফন করার জন্যে প্রশাসন ফোন করে ওর পরিবারকে শাসিয়ে দিল। দ্রুততম সময়ে রেহানকে মুছে ফেলা হলো।

ওর মৃত্যু ট্র্যাজেডির পর্যায়ে পৌঁছতে তো পারলই না, হতে পারল না নিছক পরিসংখ্যানও। ওর মৃত্যু হয়ে দাঁড়াল এমন এক ঘটনা, যার অস্তিত্বই শিকার করা যায় না। রেহানসহ ঐদিন মারা যাওয়া মানুষগুলো চাপা পড়ে গেল 'হুজুর' আর 'মৌলবাদী' তকমার প্রচণ্ড ওজনের নিচে।

রেহান যদি কোনো 'সেক্যুলার' দাবিতে শাহবাগে মারা যেত, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মিছিলে গিয়ে প্রাণ হারাত পুলিশের গুলিতে, তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম হতো। ওকে বলা হতো জাতীয় বীর। ওর নামে চত্বর হতো। পত্রিকা আর টকশোগুলো ওর মেধাবী মুখের ছবি দেখিয়ে বিচার চাইত দিনের পর দিন। রাষ্ট্র নিজেই হয়তো বাদী হয়ে মামলা করত।

কিন্তু রেহান মারা গেছে ইসলামের পক্ষ নিয়ে। হুজুরদের সাথে, হুজুর হয়ে। ফলে ওকে মারা, ওর লাশ তড়িঘড়ি করে দাফন করানো, ওর স্মৃতি, ওর উচ্চারণ মুছে দেওয়া—সবই রাষ্ট্রের জন্য জায়েজ। তার বুয়েটিয়ান পরিচয় তাকে বাঁচাতে পারেনি, মরার পরও স্বীকৃতি দিতে পারেনি। কারণ সে এমন এক পরিচয়ে পরিচিত হতে চেয়েছিল, যাকে এই রাষ্ট্রব্যবস্থা নিরাপত্তা ঝুঁকি মনে করে।

তাই এক রাতের মধ্যে সম্ভাব্য এলিট থেকে বৈধ নিশানা বনে গেল ও।

গাছের জন্য হাহাকার, লাশের জন্য উপহাস

বাংলাদেশের জনপরিসরে ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের অবস্থান কতটা নাজুক, তার খুব ভালো প্রমাণ শাপলা চত্বর ম্যাসাকার। সেই রাতে বাতি নিভিয়ে মতিঝিলে ক্লিয়ারিং অপারেশন চালিয়েছিল 'নিরাপত্তা' বাহিনীগুলো। নিরস্ত্র হুজুরদের দিকে

[১] বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, 'শহীদ রেহানের মা: ছেলের নিথর দেহ পড়ে ছিল মর্গে,' *জাগোনিউজ২৪.কম*, ২৩ নভেম্বর ২০২৪; 'ট্রাইব্যুনালে এসে অঝোরে কাঁদলেন রেহানের মা,' *Dhaka Post*, November 24, 2024।

ছুড়েছিল ১ লক্ষ ৫৫ হাজার রাউন্ড গুলি, টিয়ারশেল আর সাউন্ড গ্রেনেড।[২]

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের হিসেবে সেইদিন মারা গিয়েছিল ৫৮ জন মানুষ, মানবাধিকার সংস্থা *অধিকার*-এর মতে মৃতের সংখ্যা ৬১।[৩] প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, নিহতের সংখ্যা এর কয়েক গুণ।

পরদিন সকালে সেই রক্তের দাগ মুছে ফেলার দায়িত্ব নিয়েছিল মিডিয়া। রিপোর্ট করেছিল, ঢাকা শহরজুড়ে তাণ্ডব চালিয়েছে হেফাজতে ইসলাম।[৪] আওয়ামী লীগের নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সংসদে দাঁড়িয়ে উপহাস করে বলেছিল, হেফাজত 'সোভানাল্লা' বলতে বলতে পালিয়ে গেছে। সুর মিলিয়েছিল দেশের বুদ্ধিজীবীরাও। তারা বিবৃতিতে বলেছিল, হেফাজত এসেছিল সন্ত্রাস করতে।

'গ্রাম্য হুজুর'দের নিয়ে শহুরে মধ্যবিত্তের মধ্যে যে এক ধরনের অস্বস্তি ও চাপা ভয় কাজ করে, মিডিয়া সেটাকে পুরোদমে কাজে লাগাল। নবীজি ﷺ-এর অবমাননার প্রতিবাদ জানাতে আসা ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের দেখাল আগ্রাসী বাহিনী হিসেবে। অপরাধী রাতারাতি রক্ষাকর্তা বনে গেল, আর নিরীহ ভিকটিমরা পরিণত হলো আক্রমণকারীতে। পুরো ব্যাপারটা এমনভাবে দেখানো হলো, যেন 'আগ্রাসী মব'-এর হাত থেকে তিলোত্তমা ঢাকা নগরীকে রক্ষা করেছে সরকার।

সবচেয়ে বীভৎস তামাশাটা হলো গাছ নিয়ে। রাস্তার কাটা গাছের জন্য নাগরিক সমাজের হাহাকারের নিচে চাপা পড়ে গেল গ্রামবাংলার সরল মুসলমানের গুলিবিদ্ধ দেহ। পত্রিকার পাতা, টকশোর টেবিল আর সুশীল সমাজের আলোচনায় রায় চলে এলো। ঐ 'ধর্মান্ধ' মানুষগুলোর জীবন ঢাকা শহরের ধর্মনিরপেক্ষ গাছের চেয়েও সস্তা।[৫]

---

[২] এই ম্যাসাকার নির্দেশ দিয়েছিল সেই সময়কার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই নারকীয় অভিযানে অংশ নিয়েছিল র‍্যাব, বিজিবি, পুলিশ এবং যুবলীগ।

[৩] Human Rights Watch, *Blood on the Streets: The Use of Excessive Force during Protests in Bangladesh* (New York: Human Rights Watch, 2013); Odhikar, *Assembly of Hefazat-e-Islam Bangladesh and Human Rights Violations* (Dhaka: Odhikar, 2013)

[৪] অধিকাংশ পত্রিকা শিরোনামে 'তাণ্ডব', 'ধ্বংসযজ্ঞ' বা 'অগ্নিগর্ভ ঢাকা'র মতো শব্দ ব্যবহার করে। দ্রষ্টব্য: 'রাজধানীতে ৮ ঘণ্টার ধ্বংসযজ্ঞ,' প্রথম আলো, ৬ মে ২০১৩; 'Hefazat Strikes Horror,' *The Daily Star*, May 6, 2013; 'ভয়াবহ তাণ্ডব: হেফাজতের অবরোধের নামে,' *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৬ মে ২০১৩; 'শান্ত' মতিঝিলে ধ্বংসের চিহ্ন, *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ৬ মে ২০১৩।

পরবর্তী ১১ বছর শাপলা চত্বরের ঘটনা বর্ণনায় মূলধারার মিডিয়ায় 'তাণ্ডব' শব্দটির ধারাবাহিক ব্যবহার দেখা যায়; যেমন: "হেফাজতে ইসলামের তাণ্ডব," *প্রথম আলো*, ১ জানুয়ারি ২০১৪; "শাপলা চত্বরে হেফাজতের তাণ্ডব: ৮ বছরে একটি মামলারও চার্জশিট হয়নি," *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ মে ২০২১। এই প্রবণতায় পরিবর্তন আসে ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের পর।

[৫] ৫ মে'র ঘটনার পর মূলধারার সংবাদমাধ্যমে মানুষের মৃত্যুর চেয়ে 'শহরের সৌন্দর্যহানি' ও 'গাছ কাটা' নিয়ে অধিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ দেখুন: *'শাপলা চত্বরের গাছ ও পরিবেশের ক্ষতি'*, প্রথম আলো, ৭ মে ২০১৩; এবং *'Destruction of Public Property in Motijheel'*, The Daily Star, May 7, 2013.

রেহান এবং ওর সাথে পড়ে থাকা রক্তমাখা শরীরগুলো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে একটা রূঢ় সত্য দেখিয়ে গেল। এদেশে যখনই কেউ ইসলামকে বুকে নিয়ে রাজপথে দাঁড়াবে, যখনই কেউ মুসলিম পরিচয়কে আঁকড়ে ধরে সমষ্টি হিসেবে আসবে জনপরিসরে; তখনই সে না-মানুষে পরিণত হবে।

এমন মানুষ, যার জীবনের কোনো মূল্য নেই। যার কোনো অধিকার নেই। সে বুয়েটের টপার হোক, কওমি মাদরাসার ইয়াতীম শিশু হোক, অথবা হোক অসাম্প্রদায়িক এলিট পরিবারের 'বিপথগামী সন্তান'; সেক্যুলার রাষ্ট্র আর সাংস্কৃতিক জমিদারদের চোখে এরা সবাই সমান। সবাই 'অপর'।

নীরবতার প্রাচীর

শাপলা চত্বরের সেই ভয়াবহ ম্যাসাকারের পর প্রতিবাদের সুযোগ ছিল। তখনো হাসিনা সরকার পুরোপুরি দানব হয়ে ওঠেনি, পুরোপুরি বন্ধ হয়নি কথা বলার পরিবেশ। কিন্তু কেউ কথা বলেনি। উল্টো সরকারের ছড়ানো 'তাণ্ডব'-এর বয়ানকে বিনা দ্বিধায় প্রচার করেছিল বুদ্ধিজীবী আর শহুরে মধ্যবিত্তরা।

আজ পর্যন্ত শাপলা ম্যাসাকারের বিচার হয়নি। বিচার পায়নি রেহানসহ সেইদিন রাষ্ট্রের হাতে নিহত হওয়া মানুষগুলোর পরিবার। যারা শাপলার চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এর জন্য তাদের দায় তো আছে অবশ্যই।[৬] তবে সমাজও এই দায় এড়াতে পারে না। দাড়ি-টুপিওয়ালাদের হত্যা করলে এই দেশে কোনো বিচার হয় না, প্রতিবাদও হয় না।

এই সমীকরণ বারবার দেখা গেছে।

২০২১ সালে মোদিবিরোধী আন্দোলনে ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে মাদরাসার ছাত্ররা যখন রাজপথে নামল, রাষ্ট্র তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। সরকারি দল আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা বায়তুল মোকাররমের ভেতরে ঢুকে মুসল্লি পেটাল, টেনেহিঁচড়ে আনলো দাড়ি ধরে। মিডিয়া তাদের বানাল স্বাধীনতাবিরোধী আর পাকিস্তানপন্থী।

তারপর শুরু হলো আলিমদের গণগ্রেফতার, রিমান্ড আর হয়রানি। সেই সাথে গোয়েন্দা সংস্থা আর মিডিয়ার যোগসাজশে মিথ্যা, বানোয়াট অভিযোগ সাজিয়ে

---

[৬] দুঃখজনকভাবে, একপর্যায়ে হেফাজতে ইসলামের একটি অংশও শাপলার বিচার চাওয়ার বদলে সরকারের সঙ্গে আপস করে ফেলে। "এবার 'কওমি জননী' উপাধি পেলেন শেখ হাসিনা" *Bangla Tribune*, November 12, 2024; "রোববার হেফাজতের শোকরানা মাহফিল, প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি." *Samakal*, November 3, 2018.

আলিমদের চরিত্রহনন। সুশীল সমাজ মুখে কুলুপ আঁটল।

অথচ কাছাকাছি সময়ে কারাগারের ভেতর লেখক মুশতাক আহমেদের মৃত্যু নিয়ে ব্যাপক প্রতিবাদ হলো, ওঠল নিন্দার ঝড়।[৭] একজন মুশতাকের জন্য যে আবেগ দেখা গেল, তার সিকিভাগও দেখা গেল না ডজনখানেক হুজুরের মৃত্যুতে।

মুশতাকের মৃত্যু শোকের যোগ্য। হুজুররা বেশি থেকে বেশি হলে সংখ্যা।

বাগান ও বর্বর

শাপলা চত্বরে আওয়ামী রাষ্ট্র যে পন্থায় এগিয়েছিল, যেভাবে শক্তি প্রয়োগ করেছিল, সেই একই পন্থা কি হুজুর ছাড়া অন্য কারও ওপর প্রয়োগ করা যেত?

এ প্রশ্ন নিয়ে খুব বেশি জল্পনা-কল্পনার প্রয়োজন নেই। বাস্তব উদাহরণ আমাদের সামনেই আছে।

২০২২ সালের ১০ ডিসেম্বরে ঢাকার গোলাপবাগে বিরোধীদল বিএনপির জনসভা ছিল। আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই জড়ো হতে শুরু করেছিল হাজার হাজার মানুষ। অনেকের মনে শঙ্কা ছিল, এখানেও হয়তো শাপলা চত্বর স্টাইলে আক্রমণ হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ নিয়ে আলোচনাও হচ্ছিল বেশ।

প্রবাসী একজন সাংবাদিক তখন সবাইকে আশ্বস্ত করে লিখেছিলেন, শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে ক্র্যাকডাউন করা আর গোলাপবাগে বিএনপির সমাবেশে ক্র্যাকডাউন করার মধ্যে পার্থক্য আছে।

অর্থ হলো, হুজুরদের যেভাবে আক্রমণ করা যায়, সেক্যুলার দলগুলোকে সেভাবে আক্রমণ করা যায় না। কথাটা তখনো ১০০% সত্য ছিল, এখনো আছে।

যেকোনো সরকার রাজনৈতিক দলগুলোকে স্রেফ ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, অস্তিত্বের হুমকি মনে করে না। এই দলগুলো সেক্যুলার কাঠামোরই অংশ। নিজেদের মধ্যে প্রচুর ঝগড়া করলেও, দিনশেষে এরা একে অন্যের ভাই-বেরাদার।

কিন্তু দাড়ি-টুপি পরা মানুষ যখন ইসলামের দাবি নিয়ে জড়ো হয়, তখন সরকার তাদের শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে না। রাষ্ট্র তাদের সঙ্গে নাগরিক হিসেবে আচরণ করে না। তাদের দেখে নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসেবে। সাজানো বাগানবাড়ির

---

[৭] আওয়ামী সরকারের সমালোচনা করায় গ্রেফতার হন মুশতাক। তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে মামলা হয়। সরকারি বাহিনীর নির্যাতনে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কারাগারে মারা যান।

দিকে ধেয়ে আসা হিংস্র, বর্বর কোনো জাতি হিসেবে। যাদের নিয়ন্ত্রণ করা, এবং প্রয়োজনে নির্মূল করাই লক্ষ্য।

২০১৮ সালের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের কথা ভেবে দেখুন।

স্কুল-কলেজের কিশোররা যখন রাজধানী অচল করে দিয়েছিল, তখনো অস্ত্র চালানোর ব্যাপারে একটা অদৃশ্য সীমানা মেনে চলেছে রাষ্ট্র। আওয়ামী হেলমেট বাহিনীর হামলা অথবা পুলিশের লাঠিচার্জ আর টিয়ারশেলিং হয়েছে সত্য, কিন্তু রাষ্ট্র ওই কিশোরদের ওপর মেশিনগান চালানোর কথা ভাবেনি। রাষ্ট্র ও সমাজ তখনো তাদেরকে দেখেছিল নিজেদের সন্তান হিসেবে; এই সেক্যুলার ব্যবস্থার ভবিষ্যত অংশীদার হিসেবে। তাই সরকার তাদের শাসন করেছে, হত্যা করতে চায়নি।

শাপলা থেকে জুলাই: দানবের পরীক্ষাগার

তবে ২০২৪ সালে এসে সেই সমীকরণ বদলে গেল। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আমরা দেখলাম, হাসিনা সরকার ছাত্র-জনতার ওপর ঠিক সেই মারণাস্ত্র, সেই একই ম্যাসাকার-মডেল; মিডিয়া ব্ল্যাকআউট, গুম-নির্যাতন আর জঙ্গিবাদ দমনের বয়ান প্রয়োগ করল, যা তারা ২০১৩ সাল থেকে 'হুজুরদের' ওপর প্র্যাকটিস করে আসছিল।

শাপলা চত্বর ছিল রাষ্ট্রের জন্য টেস্টিং গ্রাউন্ড। সেখানে তারা পরীক্ষা করে দেখেছিল, নির্বিচারে মানুষ মারলে সমাজ চুপ থাকে কি না। রাজধানীর মাঝখানে খোলামেলা ম্যাসাকার চালিয়েও পার পেয়ে যাবার পর থেকে হাসিনা সরকার প্রচণ্ড বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। আওয়ামী জাহিলিয়াত প্রবেশ করেছিল এক নতুন, নিষ্ঠুর, সর্বগ্রাসী পর্যায়ে। পরে যার ফল ভোগ করতে হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো থেকে শুরু করে কোটা সংস্কার বা নিরাপদ সড়কের মতো অরাজনৈতিক আন্দোলনগুলোকেও।

শাপলার রক্তকে বৈধতা দিয়ে সুশীল সমাজ যে দানবের পক্ষ নিয়েছিল, সেই দানবই পরে রক্ত ঝড়িয়েছিল সবার।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে, এই পরিণতিই হবার কথা ছিল। নিপীড়নের বৈধতা তৈরি করার জন্য রাষ্ট্র প্রথমে বেছে নেয় সমাজের সবচাইতে দুর্বল আর প্রান্তিক মানুষগুলোকে। যাদের নিজেদের কিছু বলার সুযোগ নেই, যাদের পক্ষে বলারও কেউ নেই। তাদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে রাষ্ট্র প্রথমে সহিংসতাকে

স্বাভাবিক বানিয়ে নেয়। সমাজ তখন দেখেও না দেখার ভান করে। রাষ্ট্র পায় হত্যা, অপহরণ, নির্যাতনের লাইসেন্স।

আর একবার যখন এই কাজগুলোকে জায়েজ করে ফেলা যায়, তখন সেটা আর প্রান্তিক মানুষের ওপর সীমিত থাকে না; দিনশেষে এই হাতিয়ারগুলোর মুখ ঘুরে যায় সবার দিকে।

২০১৩-এর সেই নীরবতাই ২০২৪-এর গণহত্যার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। যে বুলেট প্রথমে মাদরাসার দাড়ি-টুপিওয়ালাদের জন্য বরাদ্দ ছিল, সেই বুলেটই শেষ পর্যন্ত গিয়ে বিঁধেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শার্ট-প্যান্ট পরা ছাত্রদের শরীরে।

রক্ত হালাল, পরিচয় হারাম

হুজুরদের রক্ত যে সস্তা, সেটা হুজুররা খুব ভালো করেই জানে। তারা জানে, এই রাষ্ট্রে তাদের জীবনের আগে তাদের লেবাসের বিচার হয়।

এর জ্বলন্ত উদাহরণ দেখা গেছে '২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল যাত্রাবাড়ী। এখানেই ঘটেছিল সবচেয়ে ভয়াবহ ম্যাসাকার আর তীব্র প্রতিরোধ। যার সামনের সারিতে ছিল আশেপাশের মাদরাসাছাত্ররা।

কিন্তু সেখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। আন্দোলনে মাদরাসার ছাত্ররা নেমেছিল, কিন্তু অনেকের গায়ে জুব্বা বা পাঞ্জাবি ছিল না। তারা নেমেছিল প্যান্ট-শার্ট পরে। টুপি খুলে।

কেন?

কারণ শাপলা চত্বরের সেই বিভীষিকার ১১ বছর পর তাদের মনে বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, নিজের পরিচয় নিয়ে তারা আন্দোলনে নামতে পারবে না। তারা জানত, টুপি-পাঞ্জাবি পরা অবস্থায় রাষ্ট্রের বন্দুকের নল খুব সহজেই তাদের খুঁজে নেবে। তারা জানত, পাঞ্জাবি গায়ে লাশ হলে মিডিয়া তাদের 'জঙ্গি' বলবে। আর পুরো আন্দোলনকে বানিয়ে দেবে 'মৌলবাদীদের নাশকতা'।

তাই আন্দোলন বাঁচাতে এবং নিজেদের বাঁচাতে তাদের এই ছদ্মবেশ। প্যান্ট-শার্ট পরে, টুপি লুকিয়ে, নিজেদের হুজুর পরিচয়টা ঝেড়ে ফেলে, সাময়িকভাবে নাগরিক সাজার চেষ্টা।

এই ছাত্ররা রাস্তায় নেমেছিল জুলুমের প্রতিবাদে, মজলুমের পাশে দাঁড়াতে, আদল ও ইনসাফের তাগিদে। কিন্তু ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নামলেও, ইসলামী

পরিচয়ে তারা জাতীয় জীবনে আসতে পারেনি। তাদের সেখানে আসতে হয়েছে আত্মপরিচয় গোপন করে।

গণঅভ্যুত্থানের পর বিজয়ের বয়ান থেকেও সুকৌশলে ছেঁটে ফেলা হয়েছে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে। তারা কুরবানি করেছে, কিন্তু তারা কেন রক্ত দিল, তারা কী চায়; তারা নিজেরা বলতে পারেনি। তাদের বলতে দেওয়া হয়নি। আন্দোলনের ইতিহাস আর বয়ান ঠিক করছে অন্য কেউ, আর সেই বয়ানে উপেক্ষিতই থেকে গেছে ইসলাম আর মুসলিম পরিচয়।

লড়াইয়ের সময় তাদের ডাক পড়ে। কিন্তু সেই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আসা বিজয়ের ফল ভাগ করার সময় অথবা নাগরিক মর্যাদার প্রশ্নে তাদের মুছে ফেলা হয় বারবার। তাদের ক্ষমতার সিঁড়ি বানানো যায়, কিন্তু পূর্ণ মানুষের মর্যাদা দেওয়া যায় না।

না-মানুষ

প্রাচীন রোমে এক শ্রেণির মানুষ ছিল, যাদের বলা হতো 'হোমো স্যাকের' (Homo Sacer)। এদের মেরে ফেললে সেটা অপরাধ বলে গণ্য হতো না; এরা ছিল আইনি কাঠামোর বাইরে থাকা হত্যাযোগ্য প্রাণ।[৮]

শাপলা চত্বর থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থান—এই সময়ের ঘটনাগুলোকে এক সুতোয় গাঁথলে একটা বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'হুজুর'রা সেক্যুলার বাংলাদেশের হোমো স্যাকের। তাদের বিরুদ্ধে যেকোনো প্রোপাগান্ডা চালানো যায়, ইচ্ছেমতো জেলে ভরা যায়, নির্যাতন করা যায়, চাইলে মেরেও ফেলা যায়। কারও কিচ্ছু হয় না। বিচার, প্রমাণ, জবাবদিহিতা কোনোটাই লাগে না।

'১৩ আর '২৪-এর ঘটনা একসূত্রে গাঁথা হলেও, দুই ক্ষেত্রে সমাজের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। ২০২৪-এর জুলাইয়ে যখন ছাত্রদের বুকে গুলি চলল, তখন পুরো দেশ ফুঁসে ওঠল। শাপলায় মারা যাওয়া মাদরাসা ছাত্ররাও রাজপথে নেমে এলো। কিন্তু শাপলায় যখন মোটাদাগে একই কায়দায় মানুষ মারা হয়েছিল, তখন সমাজ ছিল নীরব।

কারণ শাপলার মানুষগুলো নাগরিক পরিবারের অংশ ছিল না। রাষ্ট্র, এলিট এমনকি শহুরে মধ্যবিত্ত আর তাদের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সন্তানদের চোখেও

[৮] দেখুন Giorgio Agamben, *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*, trans. Daniel Heller-Roazen (Stanford: Stanford University Press, 1998)

তারা ছিল 'ব্রাত্য', এবং 'ব্যাকডেইটেড' জনগোষ্ঠী। হুজুরদের কখনোই তারা নিজেদের সমাজের অংশ মনে করেনি। সেই হুজুর গ্রামের মাদরাসা শিক্ষক হোক কিংবা বুয়েটের মেধাবী ছাত্র।

রাষ্ট্র জানত, জবাবদিহিতা ছাড়াই সে এদের ওপর খুন ও জুলুম চালিয়ে যেতে পারে। সাধারণ মানুষের মনে এতে কোনো রেখাপাত হয় না। তাই তাদের রক্ত ঝরানোকে রাষ্ট্র কেবল জায়েজই মনে করেনি, বরং এর জন্য ক্রেডিট চেয়েছে; এবং তা পেয়েওছে।

রাষ্ট্র ও মিডিয়া বারবার এই মানুষগুলোকে দেখিয়েছে অদ্ভুত ও বিপজ্জনক হিসেবে। জাতীয় স্মৃতি থেকে মুছে ফেলেছে তাদের অবদান। তাদেরকে মুছে ফেলেছে রাষ্ট্রীয় বয়ান, সংস্কৃতির আলাপ আর ক্ষমতার সমীকরণ থেকে। তাদের কোনো আইনি সুরক্ষা নেই। অধিকার নেই। তাদের কথা শোনা হয় না, কথা বলতেও দেওয়া হয় না। নাকচ করে দেওয়া হয় তাদের দুঃখ, কষ্ট ও অভিজ্ঞতা। তাদের একমাত্র উপযোগিতা হলো তাদের সংখ্যা; কখনো ভোটের বাক্সে, কখনো রাজপথের আন্দোলনে।

তাদের আলাদা কর্তাসত্ত্বা স্বীকার করে না কেউ। সেটা তৈরি হোক, তাও চায় না। হুজুররা জনপরিসরে সক্রিয় হওয়া মানেই যেন অরাজকতা, আর জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি। 'মৌলবাদী', 'উগ্রবাদী' কিংবা 'জঙ্গি' পরিচয়ে এদের যেভাবে পিষে ফেলা সম্ভব, তা সম্ভব না অন্য কোনো পরিচয়ের ক্ষেত্রে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিছিলে থাকা একটা মানুষের জীবন আর অধিকারকে রাষ্ট্র যেভাবে দেখে, সেই একই মানুষ যদি বায়তুল মোকাররমের মিছিলে এসে দাঁড়ায়, রাষ্ট্র তখন তাকে ওজন করে ভিন্নভাবে। দাড়ি-টুপি আর ইসলামী পরিচয় থাকলে রক্তের দর হুট করে পড়ে যায়।

এক দেশ এক আইন না, বরং অন্তত দুই ধরনের আইনি কাঠামো এখানে কাজ করে।

আইনত জীবিত থাকলেও রাজনৈতিকভাবে এবং নাগরিক হিসেবে এ মানুষগুলোকে কার্যত হত্যা করা হয়েছে। তারা এই আধুনিক প্রজাতন্ত্রের জিন্দা লাশ। রাষ্ট্রের হাতে খুন হবার পর যাদের দাফন হয় বেওয়ারিশ হিসেবে।

মুখে যতই বলা হোক, সব মানুষ সমান।

আসলে কিছু মানুষ বাকিদের চেয়ে একটু বেশি সমান।

‘অপর’ নির্মাণের কাঠামো

অনেকে বলতে পারেন: ‘এ ঘটনাগুলো ঘটেছে নানা আন্দোলনের সময়। রাষ্ট্র তো সেক্যুলার দলগুলোর আন্দোলনেও হামলা করে। এসব ঘটনা দেখে পুরো সমাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসাটা কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?’

একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এই দুই নিপীড়নের চরিত্র এক না।

পার্থক্য খেয়াল করুন। রাষ্ট্রবিরোধী দলের নেতাকর্মীকে জেলে ভরে, পেটায়। কিন্তু তাদের পোশাক, জীবন বা বিশ্বাস নিয়ে ব্যঙ্গ করে না। সুশীল সমাজ তাদের মধ্যযুগীয়, বর্বর বা জঙ্গি বলে গালি দেয় না। তাদের দাড়ি বা টুপিকে সন্ত্রাসের প্রতীক বানায় না। সেক্যুলার দল করার কারণে একঘরে বা অচ্ছুৎ হতে হয় না কাউকে।

কিন্তু যখন ভিকটিম কোনো মাদরাসার ছাত্র বা দাড়ি-টুপিওয়ালা, তখন আর আক্রমণটা কেবল রাজনৈতিক থাকে না। সেটা হয়ে যায় সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক। তখন তার পুরো অস্তিত্ব; তার শিক্ষা, তার লেবাস, তার বিশ্বাস, সবকিছুই হয়ে যায় আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু।

যে বিশেষ মনস্তত্ত্ব ইসলামকে সবসময় অপর (Other), বিপজ্জনক এবং অবাঞ্ছিত হিসেবে চিহ্নিত করে, যা মুসলিম পরিচয়কে দাঁড় করায় ভয়ের প্রতীক হিসেবে, তাকে নিছক রাজনৈতিক দমন বলা যায় না।

যদি কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রের মাপকাঠি ভিন্ন হয়, যদি তাদের জন্য থাকে আলাদা বিচারিক প্রক্রিয়া আর অলিখিত আইন, যদি নাগরিকের বদলে তাদের দেখা হয় নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসেবে, তখন বুঝে নিতে হয় যে, এই বৈষম্য ও বিদ্বেষ সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠেছে।

আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটেছে।

রাষ্ট্রীয় এই নিপীড়ন আরও গভীর অসুখের লক্ষণ। যে অসুখের শেকড় গেঁথে আছে সমাজের অনেক গভীরে। যে বিদ্বেষ মিশে আছে পুরো সিস্টেমের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। যার চর্চা ছড়িয়ে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে। আমাদের ক্লাসরুম, আড্ডা, বইয়ের পাতা থেকে মিডিয়ার পর্দায়।

বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষ

চোখ-কান খোলা রাখলেই আমাদের সমাজে ইসলামবিদ্বেষের বাস্তবতাটা ধরা পড়ে। হিজাব বা নিকাব পরার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা কর্মক্ষেত্রে অপদস্থ হওয়া, ভাইবা বোর্ডে দাড়ি-টুপির কারণে মেধাবী প্রার্থীদের বাদ পড়া, অথবা ক্লাসে হাদীস বলার 'অপরাধে' শিক্ষকের চাকরি যাওয়া; এমন অনেক নজির আছে আমাদের সামনে।

এর বাইরে রাস্তাঘাটে, গণপরিবহনে, মিডিয়া এমনকি সরকারি প্রতিষ্ঠানেও তুচ্ছার্থে 'হুজুর' বা 'মোল্লা' সম্বোধন এবং তির্যক মন্তব্যের উদাহরণও আছে প্রচুর। ইসলামবিদ্বেষ আমাদের সমাজের প্রতিদিনের বাস্তবতা।[৯]

দাড়ি-টুপি, হিজাব-নিকাব, বোরকা-জুব্বা নিয়ে ঠাট্টা আমাদের সমাজে স্বাভাবিক ব্যাপার। ইসলামের ফরজ বিধান পর্দা করার কারণে অনেক মুসলিম নারীকে এখানে 'বোরকাওয়ালি', 'নিনজা', 'বস্তা'-র মতো অপমানজনক কথা শুনতে হয়। ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি হজ করে দাড়ি রাখলে সমাজের চোখে সেটা ভালো। বৃদ্ধ বয়সে টুকটাক ইসলাম পালন করাটা সেক্যুলারিসম স্বাভাবিকভাবে নেয়। কিন্তু কোনো যুবক যদি দাড়ি রাখে, টুপি পরে, গোড়ালির ওপরে কাপড় রাখে, তখন সেটা কট্টরতা, উগ্রবাদ বা মগজধোলাইয়ের শিকার হবার লক্ষণ। ইসলামের শিক্ষা মেনে যুবক বয়সে নাচ-গান বা ফ্রি-মিক্সিং থেকে দূরে থাকাকে সমাজের বড় একটা অংশ মনে করে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কিংবা সেকেলে হওয়া।

এ সমাজে তরুণদের ইসলামচর্চাকে হুমকি মনে করা হয়।

ফিরিঙ্গিদের[১০] অনুকরণে বাংলার কাঠফাটা গরমে স্যুট-কোট পরে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে হাঁটাটা স্বাভাবিক। এটাকে কেউ গোলামির মানসিকতা মনে করে না। ঔপনিবেশিক প্রভুদের এই অন্ধ অনুকরণই সমাজের চোখে আধুনিকতা। কিন্তু পাঞ্জাবি অথবা জুব্বা পরলে, সেটা কিন্তু পাকিস্তান কিংবা আরবের সংস্কৃতির অনুসরণ!

---

[৯] জনপরিসরে ইসলামবিদ্বেষের কিছু উদাহরণ: *Islamophobia Documentation Bangladesh,*" Mullobodh (archived), accessed February 16, 2026, https://mullobodh.com/islamophobia-documentation-bangladesh/

[১০] 'ফিরিঙ্গি' বা 'ফারাঙ্গি' শব্দটির উৎস মধ্যযুগীয় ইউরোপের 'Frank' (ফ্রাঙ্ক) জাতি। আরবি 'ফিরাঞ্জ' ও ফারসি 'ফারাঙ্গি' হয়ে শব্দটি এই অঞ্চলে প্রবেশ করে। মধ্যযুগের মুসলিম ঐতিহাসিকরা ক্রুসেডারসহ সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের বোঝাতে এই সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় লেবেলটি ব্যবহার করতেন। বাংলায় শুরুতে পর্তুগিজদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও, কালক্রমে ব্রিটিশসহ সকল পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিকেই এই নামে ডাকা হতে থাকে। আমি শব্দটি সামগ্রিকভাবে পশ্চিমাদের (Westerners) জন্য ব্যবহার করেছি।

এমন অনেক দ্বিচারিতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ আর তাচ্ছিল্যের গল্প ছড়িয়ে আছে আমাদের সমাজে।

তবে সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো, তরুণদের ইসলামচর্চা নিয়ে আমাদের সুশীল সমাজের তাত্ত্বিক উদ্বেগ। তরুণরা কেন ফোন ধরে 'হ্যালো' না বলে সালাম দিচ্ছে? মেয়েরা কেন হিজাব করছে, বোরকা পরছে? কেন কথোপকথনের সময় বলছে 'আলহামদুলিল্লাহ' বা 'সুবহানাল্লাহ'? তা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করেছে তারা। দেশের নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে কবি-সাহিত্যিকরা এই আচরণগুলোকে চিহ্নিত করছেন উগ্রবাদ, রাজনৈতিক চক্রান্ত কিংবা সমাজের অধঃপতন হিসেবে।[১১]

একজন মুসলিম যখন তার দ্বীন পালন করতে চায়, আমাদের সিভিল সোসাইটির মাথারা তখন সেটাকে রোগ হিসেবে দেখেন। ইসলামচর্চাকে রোগ এবং বিপজ্জনক হিসেবে দেখানোর এই প্রবণতা ইসলামবিদ্বেষের টেক্সটবুক প্রমাণ।

ইসলামবিদ্বেষ বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের গভীরে প্রোথিত। এটা কেবল গুটিকয়েক মানুষের আচরণের সমস্যা না; এই ইসলামবিদ্বেষ কাঠামোগত। দেশের পলিসি, রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ, প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, আইন, আইনের প্রয়োগ, মিডিয়া—যে দিকেই তাকাবেন, দেখবেন সেখানে ইসলামবিদ্বেষ গেঁথে আছে। দাড়ি-টুপি বা হিজাব নিয়ে যেসব বৈষম্যমূলক আচরণ আমরা দেখি, সেগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা না। বরং বিদ্বেষের এই কাঠামোরই বিষাক্ত ফল।

মুসলিম দেশে ইসলামবিদ্বেষ?

এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে। কেউ বলতে পারেন:

ইসলামবিদ্বেষ বা ইসলামোফোবিয়া তো সাধারণত পশ্চিমে দেখা যায়। অথবা ঐসব দেশে, যেখানে মুসলিমরা সংখ্যালঘু। বাংলাদেশের মতো দেশে এই আলাপ কেন? যেখানে জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই মুসলিম? মুসলমানের দেশে আবার ইসলামবিদ্বেষ থাকে নাকি?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো—হ্যাঁ, থাকে। খুব ভালোভাবেই থাকে।

ইসলামবিদ্বেষকে কেবল সংখ্যার হিসেবে মাপা যায় না। সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু দিয়ে এর বিচার হয় না। এর বিচার হয় ক্ষমতা দিয়ে। রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির আদর্শিক নিয়ন্ত্রণের সমীকরণের মধ্য দিয়ে।

[১১] "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উগ্রবাদের প্রভাব প্রকট," *প্রথম আলো*, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭।

সমাজে কার হাতে ক্ষমতা? আর কারা প্রান্তিক? কারা শাসনকাঠামোর ঘনিষ্ঠ, আর কারা শোষণের লক্ষ্যবস্তু? কারা ঠিক করে দেয় কোনটা 'সভ্যতা' আর কোনটা 'অসভ্যতা'? কারা রাষ্ট্রের বয়ান তৈরি করে? আর কারা সেই বয়ানে 'অপর' হিসেবে চিহ্নিত হয়? কারা নিয়ন্ত্রণ করে মিডিয়া আর সংস্কৃতি?

এ প্রশ্নগুলো এখানে গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। আর এগুলোর উত্তর স্রেফ সংখ্যাগুরু আর কে সংখ্যালঘু—তার ওপর নির্ভর করে না।

তাই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রেও প্রবল ইসলামবিদ্বেষ থাকতে পারে, এবং থাকে। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান এবং পোস্ট-কলোনিয়াল স্টাডিজে এই সত্যটা স্বীকৃত।[১২] আমাদের নিজেদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাও এর বড় প্রমাণ।

ইসলামবিদ্বেষের অনেক কেতাবি সংজ্ঞা আছে। সে আলাপে না গিয়ে সহজ কথায় বলা যায়, ইসলামবিদ্বেষ হলো: ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্বেষ, পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং শত্রুতা। অনেক গবেষক একে সরাসরি ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণও বলেছেন।[১৩]

মোটাদাগে ইসলামবিদ্বেষের বৈশিষ্ট্যগুলো অনেকটা এরকম:

- ইসলামকে বর্বর, মধ্যযুগীয় ও পশ্চাৎপদ হিসেবে দেখানো।
- সমাজ ও বিশ্বের সব সমস্যার জন্য ইসলাম বা মুসলিমদের দায়ী করা।
- 'প্র্যাকটিসিং' মুসলিমদের 'অপর' (The Other) হিসেবে চিহ্নিত করা।
- তাদেরকে দেশ, উন্নয়ন বা নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখানো।
- এসব ধারণার ভিত্তিতে মুসলিমদের, বিশেষ করে 'প্র্যাকটিসিং' মুসলিমদের সাথে বৈষম্য।

ওপরের সবকটা বৈশিষ্ট্য আমাদের সমাজে প্রবলভাবে উপস্থিত।

বাংলাদেশে যারা শাসনকাঠামোর শীর্ষে, যারা সংস্কৃতি ও মিডিয়ার হর্তাকর্তা, তারা দেখতে মুসলিম হতে পারেন, তাদের নাম আবদুল্লাহ বা আবদুর রহমান হতে পারে, কিন্তু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে তারা বিচার করে বিজাতীয় প্রভুদের চশমা দিয়ে। তারা এই মাটির সংখ্যাগুরু মানুষের বিশ্বাস ও সেন্টিমেন্টকে ধারণ করতে পারে না; বরং একে দেখে চরম অবজ্ঞা আর সন্দেহের চোখে।

---

[১২] Enes Bayrakll and Farid Hafez, eds., *Islamophobia in Muslim Majority Societies* (London: Routledge, 2019), 1–5; Organization of Islamic Cooperation, *11th Annual Report on Islamophobia* (Jeddah: OIC, 2018), 10–12.

[১৩] Bayrakll and Hafez, *Islamophobia in Muslim Majority Societies*; Chris Allen, Islamophobia (Farnham: Ashgate, 2010), 5–7. Deepa Kumar, Islamophobia and the Politics of Empire (Chicago: Haymarket Books, 2012).

অনেকেই মনে করেন, এই ইসলামবিদ্বেষ বুঝি কেবল আওয়ামী আমলের ঘটনা। অথবা এটা শুধুই আওয়ামী লীগ, বামপন্থী বা 'শাহবাগীদের' প্রজেক্ট।

এটা ভুল ধারণা।

জনপরিসর থেকে ইসলামকে সরিয়ে দেওয়ার এই প্রক্রিয়া কোনো নির্দিষ্ট দল বা সরকারের এজেন্ডা না। এটা রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতির গভীরে গেঁথে থাকা এক দীর্ঘমেয়াদি অসুখ। একেক সময় একেক রাজনৈতিক শক্তি একে নিজের মতো করে ব্যবহার করে। আওয়ামী শাসনের সময়ে এই বিদ্বেষ নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছিল, এটা সত্য। কিন্তু এর শেকড় আরও গভীরে।

আর এ কারণেই আওয়ামী জাহিলিয়াতের পতনের পরও নিয়মতান্ত্রিক এই ইসলামবিদ্বেষ বহাল তবিয়তে টিকে আছে এবং থাকবে। কারণ হাসিনার পতন হলেও রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র বদলায়নি।

কাঠামোগত ইসলামবিদ্বেষ

বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রে গেঁথে থাকা এই ইসলামবিদ্বেষ এক দিনে তৈরি হয়নি। শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে মিডিয়ার ন্যারেটিভ, রাজনীতি থেকে শুরু করে সংস্কৃতি; সবকিছুই এর ভিত্তি গড়েছে। এমন এক খাঁচা তৈরি করেছে, যার কাজই হলো ইসলামকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মধ্যে আটকে রাখা। খাঁচা থেকে বের হয়ে জনপরিসরে আসলেই ইসলামকে দেখা হয় অনুপ্রবেশকারী হিসেবে।

কলম ও ক্যামেরার ঘৃণা

বাংলাদেশের নাটক, সিনেমা বা উপন্যাসের দিকে তাকালে একটা অদ্ভুত প্যাটার্ন চোখে পড়ে। দশকের পর দশক ধরে এখানে দাড়ি-টুপি, বোরকা বা হিজাবকে দেখানো হয়েছে নেতিবাচক বা হাস্যকর হিসেবে। আমাদের কালচারাল লেন্সে হুজুর মানেই প্রতারক, ক্ষমতালোভী, রাজাকার কিংবা নারীলোভী। হুজুরের স্ত্রী বা মেয়ে মানেই নির্যাতিতা।

যুদ্ধের ময়দান থেকে শুরু করে উচ্চমার্গীয় সাহিত্যের পাতা—কোথাও এই স্টেরিওটাইপগুলো থেকে নিস্তার নেই।

৭১ নিয়ে বানানো অসংখ্য সিনেমায় রাজাকারদের দেখানো হয়েছে দাড়ি-টুপি পাঞ্জাবি পরা মানুষ হিসেবে। অর্থাৎ মুসলিম ধার্মিকতার চিহ্নকে রাজাকারদের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। অথচ যুদ্ধের সময়কার আর্কাইভ ঘাটলে দেখা যায়, রাজাকার আর মুক্তিযোদ্ধাদের বেশভূষায় আদতে খুব একটা তফাত ছিল না।

হুমায়ুন আজাদের প্রলাপতুল্য এবং বাঙালি সেক্যুলারদের কাছে অতি নন্দিত উপন্যাস 'ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল'-এ ইসলামী বিশ্বাস আর মুসলিম পরিচয়কে ভণ্ডামি আর সামাজিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামকে দানব আকারে হাজির করার এই একই তাড়না ঢাকাই ছবিতে এসে 'মোল্লা বাড়ির বউ' সিনেমার গাজী ইবাদত মোল্লার চেহারা নিয়েছে। যে ধর্মকে ঢাল বানিয়ে ছেলের বউদের ওপর ছড়ি ঘোরায়।

শহুরে মধ্যবিত্তের রুচিতে বানানো মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর 'টেলিভিশন' সিনেমায় ধার্মিক আমিন চেয়ারম্যান সামনে এসেছে প্রযুক্তি আর চিন্তার শত্রু

হিসেবে। 'বে শরিয়তী' বলে যে কেবল টিভি দেখারই বিরোধিতা করে না, বরং 'পাপ' বলে বিরোধিতা করে কল্পনাশক্তিরও। মানে ইসলাম এমনই এক বস্তু, যা মুক্তি, প্রযুক্তি, নারী এমনকি কল্পনারও বিরোধী!

আমাদের কিশোরবেলায়ও এই বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে সুকৌশলে। মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'জারুল চৌধুরীর মানিকজোড়' পড়লে দেখবেন, মূল চরিত্রের 'নামাজি' বাবাকে কতটা বিরক্তিকর হিসেবে আঁকা হয়েছে। ওযুর বর্ণনার সাথে মিলিয়ে 'জিভ পরিষ্কার'-এর দৃশ্যকে এমন ডিটেইলে ইকবাল সামনে এনেছেন, যেন পাঠক হাসতে হাসতে অবচেতনভাবে শিখে নেয়, ইসলাম পালন মানেই কুরুচিপূর্ণ বা হাস্যস্পদ কাজ।

এ উদাহরণগুলো হিমশৈলের চূড়া কেবল।

মিডিয়া এভাবে নানাভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের ক্যারিক্যাচার বানায়। দিনরাত আমাদের শেখায় 'তাওহীদি জনতা' বা 'ধর্মপ্রাণ মুসলিম' মানেই হলো সহিংসতা, আবেগ আর পশ্চাৎপদতা। তাকে হাজির করে দেশের স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন আর নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে।

বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, কিন্তু আমাদের তথাকথিত মূলধারার সংস্কৃতিতে ইসলামের অবস্থান অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষীণ। এখানে উপমহাদেশের পৌত্তলিক আচার, রীতিনীতি, বেশভূষা খুব সহজেই বাঙ্গালি সংস্কৃতি হয়ে যায়। মঙ্গল প্রদীপ, মঙ্গল শোভাযাত্রা, মুখোশ আর মূর্তিকে মনে হয় নিরপেক্ষ আর অসাম্প্রদায়িক। ফলে এগুলো জোরেশোরে পালন করা যায়, এমনকি চাপিয়ে দেওয়া যায় অন্যের ওপর। কিন্তু ইসলাম থেকে আসা রীতিনীতি বা জীবনাচারকে সংস্কৃতির অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। ইসলামী বিশ্বাস ও চর্চাকে দেখা হয় না ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে। উলটো ইসলাম পালনের চেষ্টা করলেই তা হয়ে যায় বিদেশি কিংবা আরবীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ। অথবা ট্যাগ দেওয়া হয় মৌলবাদী হিসেবে।

যেখানে সরাসরি এসব তকমা কাজে লাগে না, সেখানে বানানো হয় অন্য কোনো অজুহাত। তাই দেখবেন, যারা সারা বছর পোলাও-বিরিয়ানি অথবা চিকেন ফ্রাই আর বার্গার খেয়ে বেড়ায়, কুরবানির ঈদ আসলেই তাদের গা জ্বালাপোড়া করতে শুরু করে। হঠাৎ যেন পশুপ্রেম জেগে ওঠে।

ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের এমন উদাহরণ অনেক।

সাহেব ও বাবুর সংকর সংস্কৃতি

কেন এই দ্বিমুখী প্রবণতা? কেন দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের জীবনাচারকে বিদেশি ভাবা?

উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের তাকাতে হবে বাঙালি সংস্কৃতির সীমানা আর এ মনস্তত্ত্বের ঔপনিবেশিক শেকড়ের দিকে।

ইউরোপীয় দখলদাররা যখন আমাদের দেশে এসেছিল, তখন আগ্রাসনের বৈধতা দিতে তারা একটা বয়ান ফেঁদেছিল। তারা বলত,

> ‘আমরা জমির জন্য আসিনি, সম্পদের জন্য আসিনি। আমরা এসেছি অসভ্য জাতিগুলোকে সভ্য করতে। আমরা এসেছি সংস্কৃতি আর প্রগতি নিয়ে।’

এ বয়ানে আমরা অসভ্য আর ওরা সভ্য।

আজকের সেক্যুলার-প্রগতিশীলরাও ঠিক একই ছকে কাজ করে। পার্থক্য হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির বয়ান এখন ব্যবহার হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে। এখানে সেক্যুলার-প্রগতিশীলরা সভ্য আর হুজুররা (শহুরে হোক কিংবা গ্রাম্য) অসভ্য।

এখন বক্তব্য হলো:

> ‘ইসলাম সমাজকে পেছনে টেনে রেখেছে। ধর্ম পালন করা মুসলিমরা সমাজের জন্য বোঝা। ইসলাম ও মোল্লাদের কবল থেকে সমাজকে মুক্ত করতে পারবে কেবল সেক্যুলার প্রগতিশীলরাই।’

তবে এই মানসিকতা গঠনের পেছনে কেবল ইউরোপীয় প্রভুরা না, ভূমিকা আছে ১৯ ও ২০ শতকের কলকাতার ‘ভদ্রলোক’ শ্রেণিরও।

ভারতীয় উপমহাদেশের পৌত্তলিক মূলধারার চোখে মুসলিমদের আচার-আচরণ সবসময়ই ছিল বিজাতীয়। কলকাতার হিন্দু এলিট বা জমিদাররাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের তারা দেখত করুণা, অবজ্ঞা আর ভীতির মিশেলে। তাদের চোখে মুসলিমরা ছিল প্রথমত যবন, নেড়ে; দ্বিতীয়ত বহিরাগত, অনুপ্রবেশকারী, আর তারপর চাষা-ভূষা, অশিক্ষিত, বাঙ্গাল প্রজা। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে সে সময়ের লেখকদের সাহিত্যের বড় অংশে দেখবেন মুসলিমদের দেখানো হয়েছে হয় শত্রু, নয়তো ‘নিচু জাত’, অথবা বড়জোর নির্বোধ ‘ভালোমানুষ’ হিসেবে। যার চিন্তা তার ভাষার মতোই অশুদ্ধ। যে সম্মানের না, কেবলই করুণার পাত্র।

কলকাতার এই ভদ্রলোক শ্রেণিই বাঙালি সংস্কৃতি তৈরি করেছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের রুচি ও আচারের প্রতিচ্ছবি হিসেবে। সেই কাঠামোতে মুসলমান বড়জোর প্রজা হতে পারে, কিন্তু কখনোই সমান না।

আমাদের আজকের সেক্যুলার-প্রগতিশীল শ্রেণি এই দুই ধারার এক বিষাক্ত সংকর। এক চোখে ইউরোপীয় দখলদারদের 'সভ্য করার' দম্ভ, আর অন্য চোখে কলকাতার বাবু কালচারের মুসলিমবিদ্বেষ। আর এই মনোভাবই আমাদের সামনে আসে গল্প, উপন্যাস, নাটক, সিনেমা কিংবা প্রগতিশীলদের কালচারের মধ্য দিয়ে। কখনো নারীবিদ্বেষী হুজুরের চেহারায়, কখনো মঙ্গল শোভাযাত্রায় 'অশুভ শক্তি'-র প্রতীক হিসেবে রাখা দাড়ি-টুপি পরা দানবরূপে।

এভাবে সংস্কৃতির নামে ইসলাম এবং মুসলিম পরিচয়কে ওরা হাজির করে দানব আকারে। সমাজকে ওরা বলে, ইসলাম শুধু ভিন্ন না, বরং সমাজের জন্য ভয়ংকর, আর তাই দমনযোগ্য। শিল্প-সাহিত্যের মোড়কে বৈষম্য আর বিদ্বেষকে সমাজে স্বাভাবিক করে তোলা হয়।

এর গভীর প্রভাব পড়ে সমাজের ওপর। ধর্মীয় পোশাক আর চিহ্ন দেখলেই সমাজের একটা বড় অংশ অবচেতনভাবেই মনে করে; এই মানুষগুলো অনগ্রসর, আবেগপ্রবণ এবং যৌক্তিক চিন্তায় অক্ষম।

এভাবে আমরা এমন একটা বাঙালি সংস্কৃতি পেয়েছি, যা একদিকে পৌত্তলিক সংস্কৃতিকে অসাম্প্রদায়িক বলে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়, আর অন্যদিকে ইসলামের দৃশ্যমান চিহ্নগুলোকে দেখে সাম্প্রদায়িক এবং ভয়ের প্রতীক হিসেবে।

নিজের নিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্য এ সংস্কৃতি টোকেন হিসেবে বেছে বেছে মুসলিম সমাজের সেই অংশগুলো গ্রহণ করে, যেগুলোকে নিজেকে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে যথেষ্ট পরিমাণে 'হিন্দুস্তানি' হয়ে ওঠতে পেরেছে। যেমন উপমহাদেশীয় ওরশ, পারসীয় মাজার সংস্কৃতি কিংবা বাউল-ফকিরদের তথাকথিত 'লোকায়ত ইসলাম'।

অর্থাৎ যে আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রথার সাথে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সম্পর্ক নেই, যেগুলো শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক, বাঙালি সংস্কৃতির সীমানার ভেতরে কেবল সেগুলোরই জায়গা মেলে। ইসলামের মৌলিক রীতিনীতি বা দৃশ্যমান চিহ্নকে সংস্কৃতির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না।

শিক্ষা ও ইতিহাস

সংস্কৃতির ময়দানে তৈরি বিদ্বেষের বয়ানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় শিক্ষাব্যবস্থা। শিশুদের মগজে স্থায়ীভাবে গেঁথে দেয় হীনম্মন্যতার বীজ।

মগজধোলাইয়ের শুরুটা হয় বর্ণমালা দিয়ে। হাতেখড়ির সময় একটা মুসলিম শিশুকে বুঝিয়ে দেয়া হয়, তার দ্বীনের ভাষা আর শিক্ষার ভাষা আলাদা। ঘরের জীবন আর স্কুলের জীবনের কেন্দ্র আলাদা। যে শিশুটা জন্মের পর তার কানে আযান দেওয়া হয়, যে ঘরে বড় হয় আল্লাহ, রাসূল ﷺ আর কুরআনের কথা শুনে, সে স্কুলের বইতে গিয়ে দেখে একদম ভিন্ন এক জগত। শুরুতেই তাকে নিজের ঘরে আগন্তুক বানিয়ে দেওয়া হয়।

প্রাইমারি স্কুলের বাংলা বইগুলোতে এ ভূখণ্ডের হাজার বছরের মুসলিম ঐতিহ্যের তেমন কোনো চিহ্ন নেই। এসব বইয়ের পাতায় পাতায় বাউল আছে, একতারা আছে, ঢাক-ঢোল-তবলা আছে। আছে ডালিমকুমার আর কংকাবতী। কিন্তু আযান নেই, মুয়াযযিন নেই, ইমাম নেই, নামাজ নেই। বিশাল এই ক্যানভাসে নেই মুসলিম জীবনের ছায়া।

বইয়ের ছবিতে প্রায় সবাই শান্তিনিকেতনী সাজে সজ্জিত। দাড়ি-টুপি, হিজাব-বোরকা নেই বললেই চলে। যেন 'বাঙালি' হতে হলে ওই বিশেষ ছাঁচেই নিজেকে সাজাতে হবে। এভাবে ছোটবেলা থেকেই শিশু অবচেতনে শেখে তার ইসলামী শেকড় এখানে বেমানান।

পাঠ্যবইগুলো খুব কৌশলে শিশুদের শেখায় পহেলা বৈশাখই হলো বাঙালির সার্বজনীন উৎসব। ঈদ বা রমাদান নিছক সাম্প্রদায়িক আচার; যেগুলোর অবস্থান দুর্গা পূজা আর বড়দিনের সাথে এক কাতারে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শেখায় ফ্রি-মিক্সিং হলো স্মার্টনেস, আর পর্দা হলো পশ্চাৎপদতা। পশ্চিমা মতবাদগুলো হলো যৌক্তিক, আধুনিক, উন্নত। আর ইসলামকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা হলো সাম্প্রদায়িকতা।

এভাবে সুনিপুণ দক্ষতায় প্রজন্মের পর প্রজন্মকে তার শেকড়, বিশ্বাস ও পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই ব্যবস্থা।

তবে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি হয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে।

আমাদের ইতিহাসের বইগুলো সেন বা পাল রাজাদের শাসনকালকে দেখায় গৌরবের অধ্যায় হিসেবে। বখতিয়ার খিলজী থেকে শুরু করে মুসলিম শাসকরা সেখানে দখলদার বা বহিরাগত।

রংপুরের লালমনিরহাটে ৬৯ হিজরিতে বানানো সাহাবা আমলের মাসজিদের কথা আমাদের পাঠ্যবই বলে না। কারণ এই মাসজিদ প্রমাণ করে দেয়, এদেশে ইসলামের শেকড় কতটা গভীর।

পাঠ্যবইগুলো আমাদেরকে এই জনপদের অসংখ্য অলি-আউলিয়ার কথা জানায় না। বলে না কীভাবে ইসলামী ওয়াকফ, মক্তব আর মাদরাসার মতো প্রতিষ্ঠানগুলো জনমুখী আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল। গড়ে তুলেছিল শত শত বছর ধরে টিকে থাকা এক সমৃদ্ধ সভ্যতা।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলিমদের বিশাল অবদান; ফকির বিদ্রোহ, ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের জিহাদ বা বালাকোটের জাগরণ, সেগুলোও ইতিহাসের বয়ানে উপযুক্ত জায়গা পায় না। লুকানো হয় ১৮৫৭ এর মহাঅভ্যুত্থানে মুসলিমদের কেন্দ্রীয় ভূমিকা। মুসলিম বিপ্লবীদের মুছে দিয়ে জাতীয় ইতিহাসের হিরো বানানো হয় 'রাজা' রামমোহন রায়, ক্ষুদিরাম, সূর্যসেন আর প্রীতিলতাকে।

বিকৃত এই ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য জাতিসত্তার শেকড় থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। যাতে ইসলামী প্রতিরোধকে কখনোই রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক স্বীকৃতি দিতে না হয়। জাতীয় মুক্তির বয়ানে যেন ইসলামের জায়গা না থাকে। যেন আমরা ভুলে যাই, এই জনপদ ও তার সভ্যতা নির্মাণে আমাদের পূর্বপুরুষদের অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশি। যেন নিজেদের আমরা ইতিহাসহীন জাতি মনে করি। আর শেকড়ের সন্ধানে বারবার তাকাই কলকাতা কিংবা পশ্চিমের দিকে।

শিক্ষা, সংস্কৃতি আর মিডিয়ার এই চালচিত্র আমাদের বুঝিয়ে দেয় ইসলামবিদ্বেষের এই জালটা আসলে কত বড়। এখানে চারদিক থেকে মুসলিম ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে। শিক্ষা তাকে শেখায় শত্রুর চোখে নিজেকে দেখতে। ইতিহাসের বয়ান তাকে শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইয়াতীম বানায়। মিডিয়া দিনরাত বলে মাথায় গেঁথে দেয় যে, তার বিশ্বাস বিপজ্জনক। সংস্কৃতি তাকে নিজ দেশেই শরণার্থী বানায়।

এ ব্যবস্থার প্রতিটা কলকবজা এমনভাবে সাজানো, যাতে এর প্রত্যেক অংশ অন্য অংশগুলোকে শক্তিশালী করে। এই পুরো কাঠামো জনপরিসরে মুসলিমকে হীনম্মন্য করে তোলে। তাকে অপরাধী করে, করে নতজানু। তাকে বুঝিয়ে দেয়, এই রাষ্ট্রে সে সমান অংশীদার না। সে এমন কেউ, যাকে বাধ্য হয়ে সহ্য করা হচ্ছে।

এমন অবস্থায় মুসলমানের সামনে দুটো পথ খোলা থাকে: হয় বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে না-মানুষ হিসেবে থাকা, অথবা পরিচয় বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পণ করা এই কাঠামোর কাছে।

শহুরে মধ্যবিত্ত অথবা মফস্বল থেকে এসে মধ্যবিত্ত হতে চাওয়া 'চাষার ছেলেরা' বেশিরভাগে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পথটাই বেছে নেয়।

মুসলিম যখন বহিরাগত

বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী একবার টকশোতে বলেছিলেন, 'তুমি মুসলমান ভালো কথা, কিন্তু বাঙালি নয় কেন?'[১৪]

প্রশ্ন থেকে তাদের চিন্তার ধরনটা বোঝা যায়।

মুসলিম হিসেবে জায়গা পেতে হলে আপনাকে সেক্যুলার-প্রগতিশীলদের বেঁধে দেওয়া ছক মেনে চলতে হবে। ইসলাম মানা যাবে, তবে তাদের বেঁধে দেওয়া সীমার ভেতর। তাদের নিয়ম মেনে। তা না হলে 'বাঙালি' হওয়া যাবে না।

আর 'বাঙালি' না হওয়ার মানে কী?

এর মানে হলো, আপনি এ সমাজের অংশ না। রাষ্ট্র ও সমাজে আপনার কোনো হিস্যা নেই। হয় নিজেকে পাল্টে আপনি 'সহীহ বাঙালি' হবেন, নয়তো দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবেই থাকবেন আজীবন। এটা ওদের জমিদারি, আর আপনি এখানে প্রজা।

নানা মোড়কে, নানা ভঙ্গিতে একই বয়ান বারবার আমাদের সামনে আসে। অনেকে যেমন বলে, 'বাংলাদেশে আরবের ইসলাম চলবে না, বাংলার ইসলাম চলবে, লোকায়ত ইসলাম চলবে।'

মূল কথাটা একই। ইসলামের যে দিকগুলো সেক্যুলার-প্রগতিশীলদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে মেলে, শুধু সেগুলোই মেনে নেওয়া হবে। বাকি সব কিছু বাতিল। ইসলাম মানতে হবে ওদের ঠিক করে দেওয়া কাঠামোয়। ওদের বেঁধে দেওয়া সীমানায়। তারা কিছু নির্দিষ্ট আচার-আচরণ আর কথাকে 'অনুমোদিত ইসলাম' হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। এর বাইরে যা কিছু আছে, তার সব মৌলবাদ, উগ্রবাদ কিংবা ধর্মান্ধতা। কোন ইসলামটা মানা যাবে আর কোনটা অননুমোদিত, তার সঙ্গে ইসলামের মূল উৎস বা শরীয়াহর দলিলের কোনো সম্পর্ক নেই। মুসলিমদেরও এর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এটা ঠিক করবে একচেটিয়াভাবে সেক্যুলার প্রগতিশীলরা।

---

[১৪] "সংস্কৃতিজনের রাজনীতি ভাবনা: মিতা হক," YouTube ভিডিও, ৭১ টিভি, https://www.youtube.com/watch?v=V9uwh3tOa2M

এভাবে একদিকে তারা ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়কে নিজেদের মতো করে সংজ্ঞায়িত করে। অন্যদিকে যারা এই সীমানা মানতে চায় না, তাদের দেখায় বহিরাগত হিসেবে। আর কাউকে যখন অস্বাভাবিক কিংবা বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তখন খুব সহজেই বৈধতা দেওয়া যায় রাষ্ট্রীয় নজরদারি, দমন আর নিপীড়নের।

মজার ব্যাপার হলো, অসাম্প্রদায়িকতার বুলি আওড়ানো সেক্যুলার-প্রগতিশীলদের এই অবস্থানের সাথে অদ্ভুত মিল আছে হিন্দুত্ববাদের বয়ানের।

সাভারকার আর গোলওয়ালকারদের কাছে উপমহাদেশের মুসলিমরা ছিল বহিরাগত আগ্রাসী শক্তি। মুসলিমদের কেবল তখনই জায়গা দেওয়া হবে, যখন তারা নিজেদের স্বকীয়তা বিসর্জন দেবে। মাথা নিচু করে মেনে নেবে ওদের বশ্যতা।

হিন্দুত্ববাদ আর বাংলাদেশের সেক্যুলারদের বয়ানের মূল সুর এক।

মুসলমানিত্বের অভিনয়

সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে যাদের অচ্ছুৎ বানিয়ে রাখা হয়, তাদেরই আবার প্রয়োজন পড়ে রাজনীতির মাঠে। বাংলাদেশের সেক্যুলার রাজনীতির এ এক বড় প্যারাডক্স।

রাজনীতিবিদরা ইসলামের শিক্ষা আর বিধান গ্রহণ করতে চায় না। শরীয়াহ তাদের কাছে মধ্যযুগীয়, সাম্প্রদায়িক কিংবা ফ্যাসিবাদী। কিন্তু ভোটের প্রয়োজনে বা আন্দোলনের মাঠে ইসলামকেই তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

নির্বাচনের সময় হঠাৎ নেতানেত্রীদের হাতে তসবীহ ওঠে, মাথায় বসে কাপড় অথবা টুপি। সারাজীবন যারা ইসলামী শাসনের দাবিকে মৌলবাদ বলে এসেছে, তারাই তখন মদীনা সনদে দেশ চালানোর কথা বলে। ক্ষমতায় গেলে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন হবে না বলে প্রবোধ দেয়।

তারা ভালো করেই জানে, এদেশের মানুষ সেক্যুলারিসমের জন্য জীবন দেবে না। তাই ইসলামী শব্দগুলো তারা জবরদখল করতে চায়। শাহাদাত, জুলুম, ইনসাফ-এর ইসলামী উৎস ও তাৎপর্য মুছে ফেলে সেগুলোকে তারা নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের কাজে লাগায়। গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের সময় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যবহার করে জিহাদ আর শাহাদাতের মতো শব্দ।

কিন্তু কাজ হাসিল হলেই ভোল পাল্টায়। যখনই কেউ ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণের কথা বলে, তাদের দমন করে সর্বশক্তি দিয়ে। এরা মুসলিমদের সমর্থন চায়, কিন্তু ইসলামের বিরোধিতা করে। ইসলামকে পাশ কাটিয়ে সেক্যুলার রাজনৈতিক প্রকল্পের পেছনে মুসলিমদের জড়ো করাই এ রাজনীতির লক্ষ্য।

রাজনৈতিক স্বার্থে এদের কেউ কেউ এক ধরনের পারফর্মেটিভ বা লোকদেখানো 'মুসলিম' পরিচয় তৈরির চেষ্টা করে। যেখানে শবে বরাত থেকে শুরু করে কাওয়ালি থাকে, ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে হিজাব থাকে, বিকিনির স্বাধীনতার পাশাপাশি থাকে বোরকার স্বাধীনতা। কিন্তু শরীয়াহ থাকে না, উবুদিয়্যাহ থাকে না। থাকে না আল্লাহর হাকিমিয়্যাহর বুঝ। প্রথাপ্রচলন আর আবেগনির্ভর সাংস্কৃতিক 'মুসলিম' পরিচয় থাকে, কিন্তু ইসলামের মৌলিক বিধান থাকে না।

নানা আঙ্গিকে এ রাজনীতির মূল এজেন্ডা একটাই। কুরআন-সুন্নাহকে বাদ দিয়ে, সামাজিক প্রথাপ্রচলন আর সেক্যুলার ছাঁচে একটা অন্তঃসারশূন্য 'মুসলিম' পরিচয় তৈরি করা।

জঙ্গি দমন: আধুনিক ইনকুইযিশান

বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষের চূড়ান্ত ও প্রাণঘাতী রূপটা দেখা যায় 'জঙ্গিবাদ দমনের' প্রকল্পের মধ্য দিয়ে। ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়ের সাথে এর অদ্ভুত মিল আছে।

মধ্যযুগে স্পেনে হয়েছিল ইনকুইযিশান।[১৫] ক্যাথলিক চার্চ যাকে খুশি ডাইনি বা জাদুকর ঘোষণা করে সবার সামনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারত তখন। আমরা যে 'মধ্যযুগীয় নির্যাতন' কথাটা ব্যবহার করি, তার জন্ম ইনকুইযিশানের সময়ের ভয়াবহ অত্যাচার থেকেই।

ইনকুইযিশানের কয়েকটা ধাপ ছিল।

প্রথমে সমাজে ডাইনি আর জাদুকরদের নিয়ে একটা প্রচণ্ড ভয় তৈরি করা হতো। এরপর যাদের চিন্তাই চার্চের মতের সাথে মিলত না, তাদের বানিয়ে দিতো ডাইনি

[১৫] **ইনকুইযিশান (Inquisition)**: মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ বিচারিক ট্রাইব্যুনাল বা আদালত। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্যাথলিক চার্চের মতবাদের বিরোধিতাকারীদের (Heretics) খুঁজে বের করা এবং কঠোর শাস্তি দেওয়া। ইহুদি, মুসলিম এবং কথিত 'ডাইনি' বা জাদুকরদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো এবং জনসমক্ষে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার (Auto-da-fé) মতো শাস্তির জন্য এটা কুখ্যাত।

বা জাদুকর। তারপর আসত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। উদ্দেশ্য ছিল দুটো: একদিকে ভিন্নমতকে পিষে ফেলা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করা।

বাংলাদেশে ঠিক একই জিনিস ঘটেছে জঙ্গিবাদ দমনের নামে।

এখানে ডাইনি বা জাদুকরের জায়গা নিয়েছে ইসলামপন্থী কিংবা 'জঙ্গি'। চার্চের ভূমিকা পালন করেছে রাষ্ট্রযন্ত্র। আর সেই শাস্তি ঘটা করে প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছে মিডিয়া। ক্ষমতাসীনরা যাদেরই নিজেদের জন্য হুমকি মনে করেছে, তাদের গায়েই সেঁটে দিয়েছে 'জঙ্গি' তকমা। আর একবার এই তকমা লাগানোমাত্র বৈধ হয়ে গেছে যেকোনো রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন।

নিরাপত্তার ব্যবসা ও হত্যার লাইসেন্স

দমনপীড়নের এই প্রেক্ষাপট তৈরি করা হয়েছিল এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। যার মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছিল ২০০৮ সালে নির্বাচনের ঠিক আগমুহূর্তে।

এসময় হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় পশ্চিমা এক গবেষকের সাথে মিলে হার্ভার্ড ইন্টারন্যাশনাল রিভিউ-তে একটা 'গবেষণাপত্র' ছাপিয়েছিল। সেখানে দাবি করেছিল, সেনাবাহিনীর প্রায় ৩৫ শতাংশ সদস্য নাকি উগ্রবাদে দীক্ষিত হয়ে গেছে। মাদরাসাগুলো পরিণত হয়েছে জঙ্গি তৈরির কারখানায়।[১৬]

আসলে এই লেখাটা ছিল ওয়াশিংটন আর দিল্লির নীতিনির্ধারকদের জন্যে বানানো সেইলস পিচ (Sales Pitch)। বার্তা ছিল পরিষ্কার: বাংলাদেশ আফগানিস্তান হওয়ার পথে, কেবল আওয়ামী লীগই দক্ষিণ এশিয়াকে এই সংকট থেকে বাঁচাতে পারবে।

পরে এই বয়ানই রাষ্ট্রীয় ক্র্যাকডাউনের পথ পরিষ্কার করে দেয়। সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, আগামী দিনের বাংলাদেশে 'নিরাপত্তা'- হবে সবচাইতে দামি পণ্য, আর ইসলামপন্থীরা হবে প্রধান শত্রু।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এই নীল নকশাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয় একের পর এক নাটকীয় 'সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান'-এর মধ্য দিয়ে।

---

[১৬] Ciovacco, Carl, and Sajeeb Wazed. "Stemming the rise of Islamic extremism in Bangladesh." *Harvard International Review* 19 (2008). এই আর্টিকেলে তারা দাবি করেন যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মৌলবাদীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যা পরবর্তীতে আওয়ামী সরকারের সেনা ও সিভিল প্রশাসনে শুদ্ধি অভিযানের তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

মানুষ শিকার

রাষ্ট্র তার পুরো শক্তি নিয়ে মাঠে নামে। শুরু হয় মানুষ শিকার।

রিকশাচালক, মাদরাসা শিক্ষক, গার্মেন্টসকর্মী থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—বাদ যায় না কেউ। রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলো তাদের তুলে নিয়ে গুম করে। মাসের পর মাস আটকে রাখে 'আয়নাঘর'-এর মতো গোপন বন্দিশালাগুলোতে। সেখানে চলে অমানুষিক নির্যাতন আর জোর করে স্বীকারোক্তি আদায়।

তারপর শুরু হয় নাটকের রক্তাক্ত মঞ্চায়ন।

হঠাৎ একদিন গণমাধ্যমে আসত ব্রেকিং নিউস; গোপন জঙ্গি আস্তানায় পুলিশী অভিযান চলছে! 'রোমহর্ষক' এসব অভিযান শেষে দেখা যেত, কিছুদিন আগে যারা গুম হয়েছিল, তাদের লাশ পড়ে আছে সেখানে। রাষ্ট্র নির্বিকারভাবে জানিয়ে দিত, ওরা 'বন্দুকযুদ্ধে' মারা গেছে।[১৭]

এভাবে যারা ক্রসফায়ারে মারা যেত, তারা এক অর্থে বেঁচে যেত। যারা বেঁচে থাকত, তাদের জন্য অপেক্ষা করত আরেক বিভীষিকা।

জঙ্গিবাদ দমনের সফলতা দেখানোর জন্য বাহিনীগুলো জঙ্গি নাটক সাজাত। সেই নাটকের প্রদর্শনী হতো প্রেস ব্রিফিংয়ে। মিডিয়ার সামনে একটা টেবিল পাতা হতো। সেই টেবিলে সাজিয়ে রাখা হতো কিছু ইসলামী বই, ভাঙা মোবাইল ফোন, সিম, নগদ টাকা, ব্যাটারি আর জং ধরা চাপাতি। এসব ভয়ংকর অস্ত্র (!) দেখিয়ে কলেজপড়ুয়া কিশোর থেকে শুরু করে সাধারণ গৃহিণীকে ভয়ংকর জঙ্গি নেতা বা অমুকতমুক সংগঠনের আমীর হিসেবে হাজির করত ওরা।

বাহিনীগুলো যাদের গ্রেফতার দেখাত, তাদের আগেই পিটিয়ে আধমরা করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিতে বাধ্য করত। যারা রাজি হতো না, তাদের বাবা, ভাই বা স্ত্রীকে তুলে এনে নির্যাতন করত অফিসাররা। পর্দানশীন নারীরাও এই নৃশংসতা থেকে রেহাই পায়নি; জঙ্গি দমনের নামে তাঁদের ওপর চালানো হয়েছে জঘন্য যৌন নিপীড়ন।

পুরো প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল সমাজের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে রাখা। যেন আপনি আপনার পাশের মানুষটাকেও বিশ্বাস করতে না পারেন; যেন সারাক্ষণ মনে হয় আপনার আশেপাশেই হয়তো আছে কোনো ভয়ংকর জঙ্গি।

---

[১৭] হাসিনা আমলের জঙ্গি নাটকের বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ও তার বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, আবু সুফিয়ান, *ডার্ক ডকট্রিন: বাংলাদেশে জঙ্গি-নাটকের নেপথ্যে* (ঢাকা, সিয়ান পাবলিকেশন, ২০২৫।

মিডিয়া ট্রায়াল

গুম, খুন আর এই অমানুষিক নির্যাতনকে সামাজিকভাবে জায়েজ করার জন্য রাষ্ট্রের সবচাইতে বড় সহযোগী ছিল মিডিয়া আর বিচার বিভাগ। ইরাক দখলের আগে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ভুয়া গল্প ফেঁদে আগ্রাসনকে বৈধতা দিয়েছিল মার্কিন মিডিয়া।[১৮] বাংলাদেশের মিডিয়াও জঙ্গি নাটকে ঠিক একই ভূমিকা পালন করেছে।

পত্রিকা আর টিভি চ্যানেলগুলো কোনো রকমের যাচাই-বাছাই ছাড়াই রাষ্ট্রীয় বাহিনীর প্রেস রিলিজ প্রচার করেছে। হাস্যকর থেকে হাস্যকরতম গল্পগুলোকে ফেরি করেছে অনুগত কুকুরের মতো। রাষ্ট্র যখন মানুষ খুন করত, মিডিয়া তখন খুনের পেছনে নানা রকম অজুহাত দাঁড় করাত। জঙ্গি নাটক সাজাত খুনে বাহিনীগুলো, সেগুলোর মার্কেটিং ও পরিবেশনা করত মিডিয়া।

এসময়টাতে বিচার বিভাগ হয়ে উঠে দমনপীড়নের রাবার স্ট্যাম্প। যেকোনো বিচারব্যবস্থার মূলনীতি হলো; অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তি নির্দোষ। কিন্তু ইসলামপন্থীদের ক্ষেত্রে নিয়মটা উলটে গেল। রাষ্ট্র যাকে জঙ্গি বা উগ্রবাদী বলবে, তাকে আগে থেকে দোষী ধরে নেওয়াটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। তাকেই প্রমাণ করতে হবে সে নির্দোষ।

কিন্তু বেশির ভাগ মানুষের সামনে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের পথ খোলা ছিল না। কেউ গুম হলে পুলিশ জিডি নিত না, গোয়েন্দাবাহিনী তুলে আনার কথা অস্বীকার করত।

ওদিকে বিচার শুরু হওয়ার আগেই মিডিয়া ট্রায়ালের মাধ্যমে তাকে অপরাধী বানিয়ে দেওয়া হতো সমাজের সামনে। তারপর রিমান্ডের নামে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে আদায় করা হতো সাজানো জবানবন্দি। বিচার বিভাগ সেই জবরদস্তিমূলক জবানবন্দিকেই সত্য ধরে নিয়ে রায় ঘোষণা করে দিত।

পুলিশ, মিডিয়া আর আদালত মিলে এভাবে এমন এক চক্র তৈরি করেছিল, যেখানে একবার আটকা পড়লে বের হওয়ার কোনো পথ খোলা থাকত না।

---

[১৮] Taibbi, Matt. *Hate Inc.: Why Today's Media Makes Us Despise One Another.* OR Books, 2019. লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে মিডিয়া যুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি করতে ভুয়া তথ্য ব্যবহার করে।

শব্দের মারণক্ষমতা

পুরো প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে ছিল 'জঙ্গি' শব্দটা। শব্দটার ক্ষমতা প্রচণ্ড। এ শব্দ অলিখিত মৃত্যু পরোয়ানা।

কাউকে যখন জঙ্গি বলা হয়, তখন মুহূর্তের মধ্যে তার জীবন, সম্মান আর অধিকার ধুলোয় মিশে যায়। সে তখন আইনের আশ্রয় পায় না, সহানুভূতি পায় না মানবাধিকার সংগঠনগুলোর। তাকে খুন করে ফেললেও বিচার চায় না কেউ। সে তখন আর রক্ত-মাংসের মানুষ থাকে না, স্রেফ হত্যাযোগ্য একটা টার্গেট হয়ে যায়। মৃত্যুর পর যার লাশটা নিতেও ভয় পায় পরিবার। তার জানাজা পড়তেও সমাজ কুণ্ঠাবোধ করে।

আমরা হোমো স্যাকের বা না-মানুষের কথা বলেছিলাম। বাংলাদেশে জঙ্গিরা হলো না-মানুষদের মধ্যেও সবচেয়ে নিচের শ্রেণিতে।

আর এ-কারণেই গুম, নির্যাতন আর ক্রসফায়ার সবচেয়ে লাগামছাড়া, সবচেয়ে তীব্রভাবে হয়েছে তথাকথিত জঙ্গিদের ওপর। রাজনৈতিক কর্মীদের অধিকার নিয়ে দু-চারজন কথা বললেও, জঙ্গি তকমা দিয়ে যাদের মারা হয়েছে বা আয়নাঘরে বন্দি রাখা হয়েছে, তাদের নিয়ে আমাদের সুশীল সমাজের নীরবতা আজও ভাঙেনি। কতজনকে যে এ নামে মারা হয়েছে, তার সঠিক হিসেবও সম্ভবত কারও কাছে নেই।

স্রেফ এই জঙ্গি শব্দের জাদুকরি ক্ষমতার ওপর ভর করে রাষ্ট্র বিনা বাধায়, বিনা বিচারে এবং সম্পূর্ণ দায়হীনভাবে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতা পেয়ে যায়।

'জঙ্গিবাদ' দমনের অর্থনীতি

ব্যবসায়িক মডেল হিসেবেও জঙ্গিবাদ দমন ছিল লাভজনক। ব্যবসার হিসাবটা সহজ: পশ্চিমা বিশ্বের কাছে 'নিরাপত্তা' খুব দামি পণ্য। আওয়ামী লীগ নিজেকে তুলে ধরেছিল বাংলাদেশে এই পণ্যের একমাত্র সরবরাহকারী হিসেবে। তাদের বার্তা ছিল, তারা না থাকলে বাংলাদেশ আফগানিস্তান হয়ে যাবে। এই ভয় বিক্রি করেই দেড় দশক ধরে জুলুম আর লুটপাট করার লাইসেন্স আদায় করে নিয়েছিল তারা।

ঘরের ভেতরেও জঙ্গিবাদ দমন ছিল সরকারি বাহিনী আর আমলাদের জন্য সোনার ডিম পাড়া হাঁস। বাহিনীগুলো খুব দ্রুতই বুঝে ফেলেছিল—এটা একটা লোভনীয় ক্যারিয়ার ট্র্যাক। যত বেশি জঙ্গি আবিষ্কার করা যাবে, তত বেশি মিলবে বিদেশি

ফান্ড, অত্যাধুনিক সরঞ্জাম, বিদেশ ভ্রমণ আর দ্রুত প্রমোশন। ফলে কে কার চেয়ে বড় আর ভয়ংকর জঙ্গি নাটক সাজাতে পারে, তা নিয়ে বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে শুরু হয়ে গেল অসুস্থ প্রতিযোগিতা। যে ব্যবসায় লাভ বেশি, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে উৎপাদনও বেশি হয়।

লুটপাটের মহোৎসবে পিছিয়ে ছিল না এনজিও আর সুশীল সমাজও। উগ্রবাদ ঠেকানোর নামে আসা বিদেশি ফান্ড বাগাতে তারা দ্বিগুণ উৎসাহে আওয়ামী বয়ানকে বৈধতা দিতে শুরু করল। কখনো ইসলামের নানা বিষয়কে 'জঙ্গিবাদ' হিসেবে চিহ্নিত করল, কখনো জঙ্গি নেটওয়ার্ক নিয়ে ফাঁদল নানা তত্ত্ব।

রাষ্ট্র, এজেন্সি, এনজিও আর সুশীল সমাজ মিলে এমন এক ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলল, যেখানে 'জঙ্গি' হলো ব্যবসার কাঁচামাল। ব্যবসার স্বার্থেই কাঁচামালের সরবরাহ বন্ধ হতে দেওয়া হয়নি।

বি-ইসলামীকরণ

জঙ্গিবাদ দমনের এই বিশাল আয়োজনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল জনপরিসর থেকে ইসলামকে পুরোপুরি অদৃশ্য আর নির্বাক করে দেওয়া।

এ প্রকল্পের সাফল্য গ্রেফতার বা ক্রসফায়ারের সংখ্যা দিয়ে মাপা যাবে না। মধ্যযুগের সেই ইনকুইযিশানের মতোই এর আসল সাফল্য হলো সমাজের মানুষের ভেতর ভয় ঢুকিয়ে দেওয়াতে। পুরো প্রকল্পটার মাধ্যমে রাষ্ট্র সফলভাবে একটা বার্তা সবার মগজে গেঁথে দিয়েছিল; ইসলামী আদর্শ তো দূরের কথা, ইসলামের কোনো চিহ্ন বা পরিচয় বহন করাও এখন আর নিরাপদ না।

ফলে নিজের অজান্তেই মানুষ নিজেকে গুটিয়ে নেয়। বইয়ের তাক থেকে ইসলামী বইগুলো সরে যায়, আড্ডায় ধর্মের আলাপ বন্ধ হয়, দাড়ি বা হিজাব নিয়ে তটস্থ হয়ে পড়ে মানুষ। ভয়ের রাজত্ব কায়েম করার মাধ্যমে আধুনিক এই ইনকুইযিশান কার্যত মুসলিমদের সামাজিক ও রাজনৈতিক এজেন্সি (কর্তাসত্তা) কেড়ে নেয়। এটি ছিল পশ্চিমা ছাঁচে 'নিরাপদ' ও 'অনুগত' ইসলাম তৈরির চূড়ান্ত বন্দোবস্ত।

শুরুতে শুধু ইসলামপন্থীদের ওপর প্রয়োগ করা হলেও দমনপীড়নের এসব কৌশল ধীরে ধীরে প্রয়োগ হয়েছে সবার ওপর। একপর্যায়ে দেখা গেছে, যারাই সরকারের বিরোধিতা করছে, তাদের সবাইকে এই ইনকুইযিশানের যাঁতাকলে পড়তে হচ্ছে।

এমনকি হাসিনা সরকারের পতনের দিনও রাষ্ট্রীয় প্রচারণায় ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানকে জঙ্গি হামলা হিসেবে দেখানো হয়েছিল। এতেই বোঝা যায়, জঙ্গি দমনের এই বয়ান হাতিয়ার হিসেবে কতটা শক্তিশালী ছিল।

এ বয়ান কেবল রাষ্ট্রকে অত্যাচারের লাইসেন্স দেয়নি, সমাজকেও শরিক করেছে নিষ্ঠুরতায়। সমাজের নীরবতা, নিষ্ক্রিয়তা, গা বাঁচিয়ে চলার মনোভাব, আর সরকারি গল্পের প্রতি নীরব সমর্থন; সবই এই দমনপীড়নকে লম্বা সময় টিকিয়ে রেখেছে।

বিদ্বেষের কাঠামো কতটা বিপজ্জনক ও প্রাণঘাতী হতে পারে, কীভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে ব্যক্তি ও পরিবারকে, কীভাবে অসংখ্য মানুষের জীবন আর ক্যারিয়ারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারে মুহূর্তের মাঝে, জঙ্গিবাদ দমনের উপাখ্যান তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। বাংলাদেশে কাঠামোগত ইসলামবিদ্বেষের রক্তাক্ত দলিল।

সেক্যুলারিসমের লোহার খাঁচা

বাংলাদেশ ৯০% মুসলিমের দেশ—এজাতীয় কথা আমরা হরহামেশাই শুনি। মুখস্থ এই বুলি আমাদের মধ্যে নিরাপত্তার মিথ্যা বোধ তৈরি করে। কিন্তু এতক্ষণের আলোচনা থেকে একটা বিষয় দিনের আলোর মতো পরিষ্কার—জনপরিসরে ইসলাম এবং মুসলিম পরিচয় কোণঠাসা। একে বেঁধে রাখা হয়েছে এক লোহার খাঁচায়।

মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, ঈমানের পরিচয়কে আঁকড়ে মূলধারায় আসতে পারে না। যখনই কোনো জমায়েত ইসলামের জায়গা থেকে জনপরিসরে আসতে চায়, তখনই তারা হয়ে যায় দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক।

মুসলিম কথা বলতে পারে না।

কথাটা পুরোপুরি ঠিক হলো না। মুসলিম কথা বলতে পারবে, তবে ইসলামের জায়গা থেকে না। তাকে কথা বলতে হবে লিবারেল-সেক্যুলারিসমের পাটাতনে দাঁড়িয়ে। কথা বলতে হবে মানবাধিকার আর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জায়গা থেকে।

আপনি যদি মুসলিম হিসেবে কথা বলতে চান, রাজনীতি করতে চান, অথবা কেবল নিজের হকটুকু বুঝে পেতে চান, তবে আগে আপনাকে সেক্যুলার কাঠামোর বেদিতে সিজদাহ দিয়ে আসতে হবে। আপনাকে তখনই গ্রহণ করা হবে, যখন আপনি ঈমান, আকীদাহ, হালাল-হারাম, ইসলামী শাসন, ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ বাদ দিয়ে লিবারেল-সেক্যুলার ব্যবস্থার পক্ষে কথা বলবেন।

যতক্ষণ আপনি তাদের ঠিক করে দেওয়া ফ্রেইমওয়ার্ক মেনে নিচ্ছেন, ততক্ষণ আপনাকে মডারেট মুসলিম হিসেবে সহ্য করা হবে। কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনি বলবেন, 'আমি সেক্যুলারিসমকে চ্যালেঞ্জ করব, আমি ইসলামের নিজস্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক আকাঙ্ক্ষার কথা বলব', ঠিক তখনই থামিয়ে দেওয়া হবে আপনাকে।

মুহূর্তের মধ্যে আপনার গায়ে 'জঙ্গি' বা 'উগ্রবাদী' তকমা সেঁটে দেওয়া হবে। আর সেই তকমার জোরেই তৈরি হবে আপনাকে দমন করার বৈধতা। আপনাকে জেলে যেতে হবে, আয়নাঘরে গুম হতে হবে, অথবা হতে হবে কোনো বন্দুকযুদ্ধের অনিচ্ছুক শিকার।

ইসলামবিদ্বেষের শেকড় এতটাই গভীর যে, বারবার সরকার পতন হলেও এই ব্যবস্থা টিকে থাকবে।

বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিম পরিচয় নিরন্তর নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যবস্তু।

আমরা এক অসম্ভব সমীকরণের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

কিন্তু কীভাবে তৈরি হলো এই পরিস্থিতি?

৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে এই কাঠামোই বা গড়ে ওঠল কেমন করে?

উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে অতীতে।

বিদ্বেষের শেকড় সন্ধানে

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে ইসলামবিদ্বেষের অসুখ। এই রাষ্ট্রের ডিএনএ থেকে শুরু করে শিক্ষা, সংস্কৃতি আর ভূরাজনীতির জটিল সমীকরণ; সবকিছু মিলেই তৈরি হয়েছে বিদ্বেষের এই বিস্তৃত জাল।

সমস্যার শেকড় চিনতে না পারলে তার সমাধান করা যায় না। আমরা এখন সেই উৎসগুলো খুজে দেখব, যা আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে আজকের এই অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে। আর উৎসের এই খোঁজে আমাদের ফিরে যেতে হবে ঔপনিবেশিক অতীতের দিকে।

কল্পিত সম্প্রদায়, নির্মিত পরিচয়

কোনো সমাজ বা গোষ্ঠীর আত্মপরিচয় কখনো নিরপেক্ষ হয় না। জাতি কোনো চিরন্তন বাস্তবতা না। ইতিহাস আর রাজনীতির প্রয়োজনে মানুষ সচেতনভাবে একে তৈরি করে নেয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন তার বিখ্যাত 'ইম্যাজিনড কমিউনিটিস' বইতে দেখিয়েছেন আধুনিক অর্থে জাতি এক ধরনের কল্পিত সম্প্রদায়। বিভিন্ন বিশ্বাস, প্রতীক আর আচার-আচরণের সমন্বয়ে এই পরিচয়টা তৈরি করা হয়।[১৯]

সোজা কথায়, আধুনিক জাতিপরিচয়গুলো প্রাকৃতিকভাবে আসেনি। এগুলো মানুষের বানানো। মানুষ নিজের বিশ্বাস ও স্বার্থ অনুযায়ী এগুলো তৈরি করেছে।

কথাগুলো বাঙালিত্বের ক্ষেত্রেও খাটে। আজ আমরা বাঙালি পরিচয় বলতে যা দেখি, সেটা কোনো অপরিবর্তনীয় বা সর্বজনীন বিষয় না, বরং মানুষের বানানো একটা কাঠামো। আর এ কাঠামোতে শুরু থেকেই ইসলামকে বাদ দেওয়া হয়েছে সচেতনভাবে।

এ কারণেই আমরা দেখি বারবার এই পরিচয়কে পুঁজি করে মুসলিমকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। তাকে বলা হয় ইসলাম ছাড়তে। এমনকি তার মুখের ভাষাও

---

[১৯] Anderson, Benedict. "Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism." *In The new social theory reader*, pp. 282-288. Routledge, 2020.

বাঙালিয়ানার মাপকাঠিতে 'শুদ্ধ' হিসেবে গণ্য হয় না। বাঙালিত্বের এই আগ্রাসনের জেরে বাংলার মুসলিম এখনো 'বাঙালি মুসলিম', 'মুসলিম বাঙালি' বা 'বাংলাদেশি' পরিচয়ের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

বেঙ্গল রেনেসাঁ

বর্তমানে আমরা যে 'বাঙালি' পরিচয়টা দেখি, এর পেছনে ইতিহাসের দুটো অধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রথমটা হলো উনিশ শতকে কলকাতার বাবু সমাজে জন্ম নেওয়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, যেটাকে আমরা বেঙ্গল রেনেসাঁ বা বাংলার নবজাগরণ নামে চিনি।

বেঙ্গল রেনেসাঁ ছিল মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের ভেতরে একটা সংস্কার আন্দোলন। এর মূল কারিগররা প্রায় সবাই ছিলেন কলকাতাকেন্দ্রিক। তারা পশ্চিমা এনলাইটেনমেন্টের চিন্তা থেকেও দারুণভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

স্বাভাবিকভাবেই এর মধ্য দিয়ে বাঙালি পরিচয় ও সংস্কৃতির যে কাঠামো তৈরি হয়, তার পরতে পরতে ছিল হিন্দু ধর্ম, পুরাণ ও রুচির প্রভাব। তারা চেয়েছিলেন 'বাঙালিত্ব'কে একটা হিন্দু বা বৈদিক সভ্যতানির্ভর পরিচয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে। বেঙ্গল রেনেসাঁ বাঙালিত্বের মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মকে সাংস্কৃতিক রূপে পেশ করেছিল। তাই এই বাঙালিত্ব নিরপেক্ষ কোনো সংস্কৃতি ছিল না। ছিল বাঙালি হিন্দু জাতীয়তাবাদেরই একটা রূপ। আর এ কাঠামোতে মুসলিম ছিল বহিরাগত বা অপর।

বেঙ্গল রেনেসাঁর প্রায় দেড়শো বছর পরেও মুসলিম পরিচয়ের ব্যাপারে কলকাতাকেন্দ্রিক বাবুদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল, তার একটা বিশ্লেষণ পাওয়া যায় আবুল মনসুর আহমদের বিখ্যাত 'আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর'-বইতে। তিনি লিখেছেন:

> '...ঐক্যবাদী মুসলিম নেতৃত্ব ও ঐক্যবাদী হিন্দু-নেতৃত্বের মধ্যে একটা মৌলিক বিরোধ ছিল। মুসলিম নেতৃত্ব চাহিয়াছিলেন দুই স্বতন্ত্র সত্তার মধ্যে রাজনৈতিক মিলন বা ফেডারেশন। পক্ষান্তরে হিন্দু-নেতৃত্ব চাহিয়াছিলেন সার্বিক মিশ্রণ বা ফিউশন। ...তাঁরা বুঝিতেন মাইনরিটি মুসলমান সমাজ বিপুল বেগবান হিন্দু সম্প্রদায়ে 'হইবে লীন'। যেমন ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল মহাসমুদ্রে লীন হয়। এটাকে তাঁরা অন্যায় বা অসম্ভব মনে করিতেন না। ধর্মে পৃথক হইয়াও যখন ব্রাহ্ম-খ্রিষ্টান বৌদ্ধ-জৈন-পার্শি-গুর্গা-শিখেরা মহান হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে বাধে নাই, তখন মুসলমানের বাধিবে কেন?

> ...হিন্দুরা চাহিত 'আর্য্য-অনার্য্য শক-হন' যেভাবে মহাভারতের সাগরতীরে' 'লীন' হইয়াছিল, মুসলমানরাও তেমনি মহান হিন্দু সমাজে লীন হইয়া যাউক। তাদের শুধু ভারতীয় মুসলমান থাকিলে চলিবে না, 'হিন্দু-মুসলমান' হইতে হইবে। এটা শুধু কংগ্রেসী বা হিন্দু-সভার জনতার মত ছিল না, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথেরও মত ছিল।'[২০]

শর্তটা পরিষ্কার। সাচ্চা ভারতীয় হতে হলে আগে নিজেদের স্বতন্ত্র মুসলিম পরিচয় থেকে সরে আসতে হবে। মিশে যেতে হবে হিন্দু সমাজের সংস্কৃতির মাঝে।

আমাদের দেশের প্রগতিশীল মহলে ইসলাম নিয়ে যে দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়, তার সাথে এই হিন্দুত্ববাদী বয়ানের খুব একটা পার্থক্য নেই। একই মনমানসিকতা আজও আমাদের সমাজে টিকে আছে। তফাত হলো, আগে বলা হতো ভারতীয় হতে হলে হিন্দু সংস্কৃতির সাথে মিশে যেতে হবে। আর এখন বাংলাদেশে বলা হয়, বাঙালি হতে হলে হাজার বছরের 'বাঙালি সংস্কৃতি' বা 'লোকায়ত ইসলাম'-এর মধ্যে লীন হতে হবে।

দাবির মূল ছকটা এক।

পার্থক্য কেবল বাঙালি বা ভারতীয় হয়ে ওঠার শর্তে।

দুই জাতি, দুই পথ

কলকাতায় যখন হিন্দুয়ানি রেনেসাঁ চলছে, তখন বাংলার মুসলিম সমাজে চলছিল অন্য এক ধরনের সংস্কার আন্দোলন। গ্রাম-বাংলায় তখন ছড়িয়ে পড়ছিল তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়া, ফরায়েজী আন্দোলন বা তাইউনি আন্দোলনের মতো উদ্যোগগুলো।

এই আন্দোলনগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মুসলিম সমাজের ইসলাহ বা সংস্কার। তাঁরা চেয়েছিলেন মুসলিম সমাজকে কুফর, শিরক, বিদআহ আর উপমহাদেশীয় পৌত্তলিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত করতে। তাঁদের কাছে আদর্শ সমাজ ছিল সাহাবায়ে কেরামের সমাজ। তাঁরা অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন সালাফুস সালিহীনের পথ।

অর্থাৎ একই সময়ে হিন্দু ও মুসলিম, দুই সমাজেই বড় ধরনের পরিবর্তনের হাওয়া বইছিল। কিন্তু সংস্কারের চরিত্র, আদর্শ, গতিপথ ও লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। একটা তাকিয়ে ছিল বেদের দিকে, অন্যটার ভিত্তি ছিল পবিত্র কুরআন।

---

[২০] আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল)

বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

আজকের 'বাঙালি' পরিচয় তৈরির পেছনে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ১৯৫০ ও ৬০-এর দশক। যখন সেইসময়কার পূর্ব-পাকিস্তানে দানা বাঁধছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।

পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল মুসলিম পরিচয়ের নামে। আর বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা চাচ্ছিল পাকিস্তানি পরিচয়ের বিরুদ্ধে 'বাঙালি' পরিচয়টাকে দাঁড় করাতে। তাই খুব সচেতনভাবেই তারা বাঙালি পরিচয়কে একইসাথে পাকিস্তানি এবং মুসলিম পরিচয়ের প্রতিপক্ষ হিসেবে তুলে ধরল।

বাঙালিত্বের বয়ান দাঁড় করাতে গিয়ে তারা দ্বারস্থ হলো উনিশ শতকের সেই বেঙ্গল রেনেসাঁর। পাকিস্তানের বিরোধিতা করতে গিয়ে এখানকার বুদ্ধিজীবী আর নেতারা আশ্রয় নিলেন কলকাতার বাবুদের তৈরি বাঙালিয়ানার কাছে।

পাশাপাশি বেঙ্গল রেনেসাঁর মতো এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও পশ্চিমা দর্শনের প্রতি মুগ্ধতা ছিল। ফলে একাত্তরের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যখন বাংলাদেশের জন্ম হলো, তখন পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে সংবিধানে সমাজতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মতো মতবাদ বসিয়ে দেওয়া হলো। যদিও এসব তন্ত্রমন্ত্রের অর্থ কী, বাংলার সাধারণ মানুষ তা জানতও না।

বুদ্ধির মুক্তি, বুদ্ধির ভ্রান্তি

উনিশ শতকের সেই হিন্দুয়ানি রেনেসাঁ আর পঞ্চাশের দশকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন; এই দু'য়ের মাঝখানে সময়ের একটা বড় ব্যবধান ছিল। এদের মধ্যে দরকার ছিল একটা যোগসূত্র।

এই যোগসূত্র তৈরির কাজটা হয় ১৯২০-এর দশক থেকে। তখন পূর্ববাংলার সদ্য শহুরে হতে থাকা মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বুদ্ধির মুক্তি নামে একটা আন্দোলন শুরু হয়। শিখা পত্রিকা আর মুসলিম সাহিত্য সমাজের মতো উদ্যোগগুলো ছিল এই আন্দোলনের অংশ। কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আব্দুল ওদুদ বা আবুল হুসেনের মতো ব্যক্তিরা ছিলেন আন্দোলনের মূল ব্যক্তি।

এই বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের মুসলিম সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করলেও তাদের চিন্তা গড়ে উঠেছিল ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট আর লিবারেলিসমের ওপর ভিত্তি করে। অনেকের ওপর মার্ক্সবাদেরও প্রভাব ছিল।

অন্যদিকে বাঙালিত্ব আর সংস্কৃতির কাঠামো তারা ধার করেছিলেন কলকাতার রেনেসাঁ থেকে। তারা একটা 'অসাম্প্রদায়িক' পরিচয় নির্মাণ করতে চাইলেন। আর এর আইকন হিসেবে বেছে নিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। যে সংস্কৃতি আর পরিচয় গড়ে উঠেছিল বৈদিক ছাঁচে, এই বুদ্ধিজীবীরা সেটাকেই আঁকড়ে ধরলেন।

তাদের চিন্তার কাঠামো ছিল একইসাথে কলকাতা আর পশ্চিমমুখী। ইসলামের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও এই দুই প্রভাবেই তৈরি হয়েছিল। ফলে সমাজের সংস্কারের নামে তারা এমন কিছু প্রস্তাব আনলেন, যা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিল। ১৯২৯ সালে মুসলিম সাহিত্য সমাজের এক অধিবেশনে যেমন বলা হয়েছিল:

> 'এই সভা বাঙালী মুসলমান সমাজের নেতৃবৃন্দকে পর্দাপ্রথা দূরীকরণার্থে আদর্শ স্থাপন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।'[২১]

তাদের চিন্তার ধরন নিয়ে বিচারপতি আবদুল মওদুদ লিখেছেন, এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নিজেদের মুসলিম পরিচয় নিয়ে এক ধরনের গভীর হীনম্মন্যতা কাজ করত। তার ভাষায়:

> 'শিখার অধুনালব্ধ সংখ্যাগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায়, মুসলিম সাহিত্য সমাজের সাহিত্যচিন্তা বলতে প্রায় কিছুই ছিল না, কিন্তু সমাজচিন্তা ছিল ষোলোআনা, এবং এ চিন্তাটা ছিল মুসলমান সমাজে জন্মলাভ করাটাই ভীষণ অপরাধবোধের মতো। দুঃস্থ অনগ্রসর সমাজের শোচনীয় অবস্থার কারণগুলি কী, সেসবের অনুসন্ধান এবং সেসব দূরীকরণমানসে বাস্তব কর্মপন্থা, অনুশীলনের উদ্যম এ সমাজের কারও ছিল না, ছিল সমাজটাকেই দায়ী করে তার নির্মম সমালোচনাতে মুখর হওয়ার প্রবণতা।'[২২]

তিনি আরও লিখেছেন,

> 'এই সহানুভূতিহীন নির্মমতা ও মুসলমানের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের, এমনকি বিশ্বনবীরও বিরুদ্ধে অশোভন, অসংযত ও অশ্রদ্ধ উক্তিসমূহের জন্যেই তৎকালীন ঢাকার মুসলমান সমাজ বিরূপ হয়ে উঠেছিল সাহিত্য সমাজের প্রতি।'[২৩]

---

[২১] সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং নবীন হোসেন, "'শিখা' গোষ্ঠী: ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা," *যুগান্তর*, ঈদ সংখ্যা (২০০৩)।

[২২] আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ৩৬৩।

[২৩] প্রাগুক্ত, ৩৬৪।

সভ্য হওয়ার জন্য, ভদ্রলোক হয়ে ওঠতে চাওয়া এই বুদ্ধিজীবীরা কলকাতার বাবুদের অনুকরণকেই একমাত্র পথ মনে করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের এই বুদ্ধিজীবীদের হাতে গড়া কলকাতামুখী, হিন্দু ধর্ম-আশ্রিত 'বাঙালিত্ব'-এর ধারণাই পরে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কাছে এসে পৌঁছায়।

একাত্তরের পর এই দুই ধারার মিশ্রণ; অর্থাৎ বেঙ্গল রেনেসাঁ আর পঞ্চাশ-ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তা, হয়ে ওঠে বাঙালি পরিচয়ের একমাত্র অনুমোদিত ব্যাখ্যা ও সংস্করণ। আজ আমাদের দেশে 'বাঙালিয়ানা' বা 'বাঙালি সংস্কৃতি' বলতে এই হাইব্রিড সংস্কৃতিকেই বোঝানো হয়। যে বাঙালিত্ব মানে মঙ্গল শোভাযাত্রা, ফানুস ওড়ানো, প্রদীপ জ্বালানো, এক মিনিট নীরবতা আর সূর্যবন্দনা।

বাঙালিত্ব কি অগ্রহণযোগ্য?

এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট থাকা দরকার। আজকের বাঙালি সংস্কৃতি আর বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রশ্ন করার মানে এই না যে, আমরা বাঙালি পরিচয়কেই নাকচ করে দিচ্ছি। ভাষা বা ভূখণ্ডভিত্তিক পরিচয় হিসেবে বাঙালি পরিচয় নিয়ে আপত্তির কিছু নেই।

এই জনপদকে গৌড় বা বঙ্গ নামের আঞ্চলিক গণ্ডি থেকে বের করে প্রথমবারের মতো শাহ-ই-বাঙ্গালাহ বা অখণ্ড বাংলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একজন মুসলিম শাসক; সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ।[২৪]

১৪শ শতকেই সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ মক্কা-মদীনায় যে মাদরাসা তৈরি করেছিলেন, সেগুলো সেখানে পরিচিত ছিল 'মাদরাসা আল-বাঙ্গালিয়্যাহ' নামে।[২৫]

[২৪] আধুনিক 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারা প্রায়শই বাংলার ইতিহাসকে শশাঙ্ক বা পাল আমল থেকে টানতে চান। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য হলো, শশাঙ্ক ছিলেন মূলত গৌড়ের রাজা (উত্তর-পশ্চিম বাংলা); সমগ্র বাংলার নন। পাল বা সেন রাজারাও ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী, তাঁরা বাংলাকে কোনো একক জাতিরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলেননি। ১৩৪২–১৩৫২ সালের মধ্যে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও—এই তিন কেন্দ্রকে এক কর্তৃত্বাধীন শাসনে এনে প্রথমবারের মতো সমগ্র বাংলাকে একীভূত করেন। ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফিফ 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ', ও 'সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ' বিশেষণে ভূষিত করেন।

[২৫] Abdul Karim, "Ghiyasia Madrasa," in *Banglapedia: The National Encyclopedia of Bangladesh*, online ed., ed. Sirajul Islam, Sajahan Miah, Mahfuza Khanam, and Sabbir Ahmed (Dhaka: Banglapedia Trust, Asiatic Society of Bangladesh, 2012)

এমনকি ১৮৩১-এ বালাকোটের শহীদদের তালিকাতেও অনেক নামের শেষে 'আল-বাঙালি' পদবি লেখা আছে।[২৬]

কাজেই ৭১, ৪৭ কিংবা কলকাতার নবজাগরণেরও বহু আগে ইতিহাসে বাঙ্গালাহ এবং বাংলার মুসলিমকে খুঁজে পাওয়া যায়। ইসলামের সাথে এই পরিচয়ের কোনো সংঘাত নেই।

ইসলামের দৃষ্টিতে স্থানীয় সংস্কৃতি

ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটা 'দ্বীনুল ফিতরাহ'।[২৭] মানবপ্রকৃতি আর জীবনের বাস্তবতার সাথে ইসলাম সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেহেতু এই দ্বীন এসেছে কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষের জন্য, তাই এর ভেতরে রয়েছে বিশাল প্রশস্ততা ও বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করার ক্ষমতা।

মহান আল্লাহ আমাদের জন্য একটা মৌলিক কাঠামো আর কিছু নির্দিষ্ট সীমানা ঠিক করে দিয়েছেন। এগুলো ঠিক রেখে বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করার সুযোগ ইসলামে আছে।

ইসলাম এক অঞ্চলের মানুষকে অন্য অঞ্চলের ভাষা, খাবার বা সামাজিক রীতিনীতি হুবহু অনুকরণ করতে বলে না। আরবরা খাবারে খুব কম মশলা দেয়, যা আমাদের কাছে পানসে লাগে। ইসলাম বাংলার মানুষকে আরবের খাবার খেতে বাধ্য করে না। আফ্রিকার মানুষকে বলে না পারস্যের খাবার খেতে।

কুরআন-সুন্নাহর ভাষা হওয়ার কারণে আরবির বিশেষ মর্যাদা আছে। কিন্তু ইসলাম কোনো ভাষাকে নাকচ করে না। বাংলাকে হিন্দুয়ানি ভাষা বলে বাতিল করার যে প্রবণতা পাকিস্তানের সেক্যুলার শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল, তার সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

শরীয়াহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হলে ইসলাম সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো বাদ দিতে বলে না। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে আমরা এত বৈচিত্র্য দেখি। একেক অঞ্চলের খাবার একেক রকম; পাগড়ি বা টুপির ধরনও আলাদা। আরবের

---

[২৬] মাসিক *আল-কাউসার*, "অমর বালাকোট-সংগ্রামী: নোয়াখালীর মাওলানা গাজী ইমামুদ্দীন বাঙ্গালী রাহ.," https://www.alkawsar.com/bn/article/868/। মাসিক *আল-কাউসার*, "অমর বালাকোট-সংগ্রামী মিঠানালার সুফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী রাহ.," https://www.alkawsar.com/bn/article/889/।

[২৭] **ফিতরাহ (Fitrah)**: মানুষের জন্মগত বিশুদ্ধ স্বভাব বা Natural Disposition। আল্লাহ মানুষকে যে সহজাত সত্যনিষ্ঠ, তাওহীদমুখী স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, ইসলামী পরিভাষায় তাকেই ফিতরাহ বলা হয়। কোনো বাহ্যিক বিকৃতি না ঘটলে মানুষের ফিতরাহ তাকে তার রবকে চিনিয়ে দেয়, এবং হিদায়াতের দিকে ধাবিত করে।

জুব্বা, উপমহাদেশের পায়জামা-পাঞ্জাবি কিংবা কুর্দিদের সালোয়ার; সবই যার যার সংস্কৃতির অংশ। নারীদের জিলবাবের রঙও একেক দেশে একেকরকম। স্থাপত্য বা ক্যালিগ্রাফির মতো শিল্পেও অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন রুচির ছাপ পাওয়া যায়।

যতক্ষণ শরীয়াহর শর্তগুলো মানা হচ্ছে, ততক্ষণ এ-ধরনের বৈচিত্র্য কোনো সমস্যা তো না-ই; বরং উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যের জন্য এগুলোকে স্বীকার করে নেওয়া জরুরি। তবে অবশ্যই সব ক্ষেত্রে সুন্নাহর অনুসরণ প্রশংসিত, উত্তম এবং কাম্য।

নিয়ন্ত্রণ করবে কে?

সমস্যা দেখা দেয় যখন সংস্কৃতির কোনো উপাদানের সাথে ইসলামের স্পষ্ট বিরোধ থাকে। তখন প্রশ্ন উঠে, এমন পরিস্থিতিতে কে প্রাধান্য পাবে?

মুমিন এবং সেক্যুলার, এই প্রশ্নের উত্তর দুই পক্ষ দুই ভাবে দেয়।

সেক্যুলাররা বলে সংস্কৃতি প্রাধান্য পাবে। তাদের দাবি হলো, ইসলামের যেটুকু আঞ্চলিক সংস্কৃতি আর আধুনিক পশ্চিমা মূল্যবোধের সাথে খাপ খাবে, সেটুকু আমরা গ্রহণ করব। বাকিটা বাদ দেবো। ইসলামকে সংস্কৃতির অধীন হতে হবে।

বাংলাদেশের প্রগতিশীলরা এই মূলনীতিতেই ইসলামের নানা বিধানকে আরবীয় সংস্কৃতি বলে নাকচ করে দেয়। দেশীয় সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে ইসলামের বিরোধিতা করে।

অন্যদিকে মুমিনের অবস্থান খুব সহজ: ইসলাম সব অবস্থায় প্রাধান্য পাবে। ইসলাম সব কিছুর ওপরে। সংস্কৃতির যা কিছু ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না, তা আমরা গ্রহণ করব। যা কিছু সাংঘর্ষিক বা কাফির-মুশরিকের অনুকরণ বলে গণ্য হবে, তা আমরা বাদ দিতে বাধ্য।

তফাতটা মাপকাঠিতে।

একজন মুসলিমের মাপকাঠি ইসলাম। সংস্কৃতি, রাজনীতি বা অর্থনীতি; জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে। ইসলাম এই অঙ্গনগুলোর সীমানা ঠিক করে দেবে। সংস্কৃতি অথবা অন্য কোনো কিছু ইসলামের সীমানা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।

ইসলাম নিয়ন্ত্রণ করে, নিয়ন্ত্রিত হয় না।

বাঙালিত্ব যখন ফাঁদ

ইসলাম জাতিগত পরিচয় হিসেবে বাঙালিকে অথবা স্থানীয় সংস্কৃতিকে নাকচ করে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আজ আমাদের সামনে বাঙালিত্বের কোনো নিরপেক্ষ বা নির্ভেজাল ধারণা আর অবশিষ্ট নেই।

আমাদের সামনে আছে বেঙ্গল রেনেসাঁ আর সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া সেই নির্মিত বাঙালিত্ব। এই পরিচয়ের শেকড় একদিকে যেমন হিন্দু ধর্মের সাংস্কৃতিক রূপের ভেতর প্রোথিত, অন্যদিকে এটা সেক্যুলার-প্রগতিশীল শক্তির সামাজিক আধিপত্য ধরে রাখার প্রধান হাতিয়ার।

একজন মুসলিমের পক্ষে এই বাঙালিত্বকে গ্রহণ করা সম্ভব না। একে গ্রহণ করার অর্থ নিজের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারকে সংকুচিত করা। নিজেকে কলকাতার মুখাপেক্ষী করা। ইসলামকে প্রান্তিক করে রাখা আর মুসলিম পরিচয়কে গৌণ করে ফেলা।

বাঙালিয়ানা আর বাঙালি জাতীয়তাবাদ আজ বাংলাদেশের কাঠামোগত ইসলামবিদ্বেষের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

কালচারাল হেজেমনি

বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষের আরেকটা বড় স্তম্ভ হলো সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আধিপত্য বা কালচারাল হেজেমনি (Cultural Hegemony)।

হেজেমনি কী?

দেখুন, ক্ষমতা কেবল লাঠির জোরে বা ভয় দেখিয়ে টিকিয়ে রাখা যায় না। শুধু অস্ত্রের জোরে একটা জনপদকে দশকের পর দশকে দমিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে হলে জনগণের শরীরের পাশাপাশি দখলে নিতে হয় তাদের মন ও চিন্তার জগতকেও।

শাসকশ্রেণিকে তাই শুধু পুলিশ বা মিলিটারি নিয়ন্ত্রণ করলেই হয় না, তাদের কাজ করতে হয় আরও গভীরে গিয়ে। সমাজের চিন্তা, মূল্যবোধ আর ইতিহাসের বয়ানকে তারা এমনভাবে সাজিয়ে নেয়, যাতে মানুষ গোলামিকে স্বাভাবিক ও চিরন্তন মনে করে। যেন তারা প্রশ্ন করা ভুলে যায়।

চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণের এই কাজটা মূলত হয় শিক্ষা, মিডিয়া, বিনোদন, আইন এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে। এগুলোকে ব্যবহার করে শাসকগোষ্ঠী তাদের বয়ান এমনভাবে আমাদের মগজে ঢুকিয়ে দেয় যে, একসময় আমরা ধরে নিই, এটাই বুঝি একমাত্র সত্যি। তাদের বানানো বয়ান আমাদের কাছে 'কমনসেন্স' হয়ে দাঁড়ায়। আর এই কমনসেন্স-ই তখন সমাজের ওপর তাদের আধিপত্যকে বৈধতা দেয়। সাংস্কৃতিক আধিপত্য বা কালচারাল হেজেমনি এই প্রক্রিয়ারই নাম।

ফিরআউনের জাদুকর বাহিনী

কুরআনে বর্ণিত ফিরআউনের কথা ভাবুন।

ফিরআউনের শুধু বিশাল সেনাবাহিনীই ছিল না, তার ছিল অনুগত জাদুকর আর পুরোহিতের বাহিনী। ছিল হামানের মতো সহযোগী আর অনেক পারিষদ, কুরআনের ভাষায় 'আল-মালা'। শাসন টিকিয়ে রাখতে ফিরআউনের এ দু' দলকেই দরকার ছিল।

সেনাবাহিনী তাকে দিত অস্ত্রের শক্তি। তারা ছিল বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার। অন্যদিকে জাদুকর আর পুরোহিতরা ফিরআউনকে দিত মনস্তাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। এরা সমাজের মানুষকে বোঝাত যে, ফিরআউনই 'রব'। তার শাসনই অমোঘ নিয়তি। বিদ্রোহ মানেই বিশৃঙ্খলা আর দুর্দশা। তাই এই জুলুম মেনে নাও।

সেনাবাহিনী মানুষকে ভয় দেখাত। জাদুকররা মানুষকে পোষ মানাত। নিয়ন্ত্রণ করত মানুষের চিন্তার সীমানা আর কাঠামো।

ঠিক একই ঘটনা আধুনিক রাষ্ট্রেও ঘটে। প্রাচীন সেই ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রে নতুন রূপে হাজির হয়েছে। এখন ফিরআউনের সেনাবাহিনীর কাজ করে আর্মি, পুলিশ আর গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। এগুলো রাষ্ট্রের দমনমূলক যন্ত্র। অস্ত্রের জোরে এরা মানুষের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আর জাদুকর আর পুরোহিতদের ভূমিকা পালন করে আজকের মিডিয়া, অ্যাকাডেমিয়া, সাংস্কৃতিক এলিট আর শাসকদের অনুগত ধর্মীয় নেতারা। এগুলো রাষ্ট্রের আদর্শিক যন্ত্র। এদের কাজ মানুষের মনে সম্মতি তৈরি করা। এরা জনগণের মাথায় এমন কিছু ধারণা ঢুকিয়ে দেয়, যা তাদের রাষ্ট্রের অনুগত দাস বানায়।

ক্ষমতার সমীকরণটা আমরা এভাবে দেখতে পারি,

রাষ্ট্র = শক্তি + সম্মতি

আধুনিক রাষ্ট্রগুলো কেবল অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পছন্দ করে না, কারণ তাতে জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া বা বিদ্রোহের ঝুঁকি থাকে। এর চেয়ে যদি জাদুকরদের মতো চতুর বয়ান বা মিডিয়ার ভেলকি দিয়ে জনগণের 'সম্মতি' আদায় করে নেওয়া যায়, তবে শাসন ও শোষণের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়।

ক্ষমতাসীনগোষ্ঠী তাই সমাজের মধ্যে এমন সব মূল্যবোধ, উৎসব ও আদর্শ ছড়িয়ে দেয়, যেগুলো তাদের শাসনকে বৈধতা দেয়।[২৮] জনগণ তখন এই ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক বা কমনসেন্স হিসেবে মেনে নেয়।

আদর্শিক এই নিয়ন্ত্রণই হলো কালচারাল হেজেমনি।

বাংলাদেশে জমিদারেরা

ক্ষমতার এই সমীকরণ বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বাংলাদেশে জাদুকরদের ভূমিকায় আছে সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠী। তারাই সমাজের চিন্তার সীমানা নিয়ন্ত্রণ করে। ঠিক করে দেয় আমরা কী ভাবব আর কতটুকু ভাবব।

মিডিয়া, অ্যাকাডেমিয়া, প্রশাসন এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনের দখল তাদের হাতে। ইতিহাসের ব্যাখ্যা থেকে শুরু করে সামসময়িক আলোচনার সীমানা পর্যন্ত সবকিছু তারাই ঠিক করে দেয়। তারাই ঠিক করে কোন দৃষ্টিকোণ গ্রহণযোগ্য আর কোন চিন্তা বর্জনীয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, আর উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে এরা এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গেছে যে, এগুলো নিয়ে প্রশ্ন করা যায় না। ফিরআউনের জাদুকরদের মতো, এরাও আমাদের শেখায় সেক্যুলার ব্যবস্থাতেই মুক্তি, আর ইসলামী শাসন নিয়ে চিন্তাও অপরাধ।

জাদুকরদের ভেলকি দেখে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মানুষ হাততালি দেয়। নিজের অজান্তেই সম্মতি দেয় জুলুমের শাসনকে।

কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা সরকারের মধ্যে এই আধিপত্য সীমাবদ্ধ না। প্রতিটি সরকারই কার্যত এদের বানানো বয়ানের মধ্যেই কাজ করে। ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের প্রতি বিদ্বেষ এখন পরিণত হয়েছে স্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্তে।

[২৮] উল্লেখ্য, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বলতে কেবল কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা রাজপরিবার উদ্দেশ্য না। বরং কুরআনে যাদেরকে 'আল-মালা' বলা হয়েছে, অর্থাৎ সমাজের নেতা বা শাসনক্ষমতার নিকটবর্তী এলিট—তারাও এর অন্তর্ভুক্ত।

ভারতীয় আধিপত্যবাদ

বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষের যে বিষবৃক্ষ আমরা দেখি, তার শেকড় কেবল আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ভেতরে আটকে নেই। এর সাথে জড়িয়ে আছে ভারতের গভীর ভূরাজনৈতিক স্বার্থ। ভারতীয় আধিপত্যবাদের হুমকি নিয়ে আমরা এরই মধ্যে আলোচনা করেছি। তবে ভারতীয় আগ্রাসন কেবল নদী, সীমান্ত বা বাণিজ্যের লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ না। তাদের আসল যুদ্ধটা আমাদের বিশ্বাস, পরিচয় আর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে।

অখণ্ড ভারত

ভারতের হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক শক্তি অখণ্ড ভারতের স্বপ্নে বিশ্বাসী। আফগানিস্তান থেকে বার্মা পর্যন্ত পুরো অঞ্চলটা তারা ভারতের অধীনে আনতে চায়। তৈরি করতে চায় হিন্দু রাষ্ট্র। এ পরিকল্পনার কথা তারা খোলাখুলিই বলে।

আরএসএস নেতা রাম মাধব যেমন স্পষ্ট করেই বলেছিল: 'আরএসএস বিশ্বাস করে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ একসময় আবার ভারতের সঙ্গে একীভূত হবে। দুই জার্মানি কিংবা ভিয়েতনামের দুই অংশ যেমন ভাগ হবার পর আবার এক হয়েছিল।'[২৯]

আরএসএস প্রধান মোহন ভাগাওয়াত তো রীতিমতো সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণী করেছে, ২০৪০ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে অখণ্ড ভারত বাস্তবতা হয়ে ওঠতে পারে।[৩০]

২০২৩ সালে ভারতের নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের সময় সেখানে অখণ্ড ভারতের মানচিত্র বসানো হয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও মিয়ানমারকে দেখানো হয়েছে ভারতের অংশ হিসেবে।[৩১] হিন্দুত্ববাদীদের বার্তা স্পষ্ট।

---

[২৯] BJP Leader Ram Madhav Believes India, Pakistan and Bangladesh Will Reunite to Form 'Undivided India.'" Al Jazeera, December 24, 2015.

[৩০] আরএসএস প্রধান মোহন ভাগাওয়াত ২০২৩ সালে এক ভাষণে বলেছিল, বর্তমান প্রজন্ম বার্ধক্যে পৌঁছানোর আগেই অখণ্ড ভারত বাস্তবতায় পরিণত হবে। ২০২২ সালে ভাগাওয়াত বলেছিল, তারা অখণ্ড ভারতের লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছে এবং এই গতিতে চললে আগামী ২০-২৫ বছরের মধ্যে এটি বাস্তবায়িত হবে। তবে চেষ্টা যদি আরও বাড়ানো হয়, তাহলে ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যেই এটি সম্ভব হবে। Times of India, "Akhand Bharat Will Be a Reality Soon: RSS Chief Mohan Bhagwat," The Times of India, April 15, 2022.

[৩১] Al Jazeera, "Why a map in India's new parliament has riled its neighbours," June 7, 2023.

২০২৪-এ বাবরি মাসজিদের ধ্বংসস্তূপের ওপর বানানো রাম মন্দির উদ্বোধনের সময় মধ্যপ্রদেশের সেইসময়কার মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব রাখঢাক না করেই বলেছে, 'এই মন্দির নির্মাণ অখণ্ড ভারত গড়ে তোলার দিকে এক বিরাট পদক্ষেপ।'[৩২]

অনেকে হয়তো এ-ধরনের কথাগুলোকে নিছক রাজনৈতিক স্টান্টবাজি কিংবা 'ধর্মান্ধদের বাগাড়ম্বর' হিসেবে উড়িয়ে দিতে চাইবেন। কিন্তু হিন্দুত্ববাদীদের ট্র্যাকরেকর্ড আমাদের ভিন্ন এক বাস্তবতার কথা বলে।

বাবরি মাসজিদ ভেঙে রাম মন্দির তৈরি করা, কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা (আর্টিকেল ৩৭০) বাতিল করা, কিংবা নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (CAA) বাস্তবায়ন—এর কোনোটাই কিন্তু হুট করে সামনে আসা কোনো বিষয় না। সবগুলোই হিন্দুত্ববাদীদের বহু দশকের পুরোনো এজেন্ডা। সময় লাগলেও, প্রতিটা এজেন্ডাই তারা বাস্তবায়ন করে ছেড়েছে। কাজেই অখণ্ড ভারতের এই প্রকল্পকে কেবল কল্পনা মনে করে বসে থাকাটা ভুল হবে।

অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে বড় বাধা হলো, এই অঞ্চলে ইসলাম আর এখানকার মানুষের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব। তাই তারা আগে মানসিকভাবে আমাদের পঙ্গু করে দিতে চায়। আর এ কারণেই বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষকে উসকে দেওয়া ভারতের জন্য একটা জরুরি ভূরাজনৈতিক প্রজেক্ট।

সর্বভারতীয় প্রকল্প

তবে সম্প্রসারণবাদী নীতি কেবল আরএসএস বা বিজেপির একার না। এটা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রকল্প। বিজেপির যেমন আছে অখণ্ড ভারত, কংগ্রেসের তেমনি আছে নেহরু ডকট্রিন; যার লক্ষ্য পুরো উপমহাদেশকে ভারতের নিয়ন্ত্রণে রাখা। সেটা সরাসরি দখল করেই হোক অথবা প্রক্সি শাসনের মাধ্যমে আড়াল থেকে সুতো টেনেই হোক।

অনেক বছর ধরে ভারত এই নীতি মেনে চলেছে। ১৯৭৫ সালে সিকিম দখল থেকে শুরু করে সত্তরের দশক জুড়ে তামিল টাইগারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, ২০০১-এ নেপালের রাজপরিবার হত্যা অথবা ২০০৯-এ পিলখানা হত্যাকাণ্ড; উপমহাদেশে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রাখার চেষ্টার অল্প কিছু উদাহরণ। এ ঘটনাগুলোর বড় অংশই ঘটেছে কংগ্রেসের আমলে। তাই ভারতীয় আগ্রাসনকে কেবল হিন্দুত্ববাদীদের প্রজেক্ট মনে করাটা আত্মঘাতী ভুল।

---

[৩২] *The Indian Express*, "Ram Mandir in Ayodhya a big step towards 'Akhand Bharat', says MP CM Mohan Yadav," January 20, 2024.

বিশেষ করে বাংলাদেশ প্রশ্নে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে কোনো মৌলিক তফাত নেই। ভারতের সব রাজনৈতিক শক্তিই বাংলাদেশকে তাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখে। তাই সরকার বদলালেও দিল্লির দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় না।

চিকেন'স নেক

ভারতের এই আগ্রাসী মনস্তত্ত্বের পেছনে কাজ করে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি। ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে তাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্যকে যুক্ত করেছে মাত্র ২২ কিলোমিটারের এক সরু পথ। একে বলা হয় শিলিগুড়ি করিডোর বা 'চিকেনস নেক'। ঠিক এই করিডোরের নিচেই বাংলাদেশের অবস্থান।

দিল্লির ভয় হলো বাংলাদেশে ইসলাম শক্তিশালী হলে এই চিকেন'স নেক অরক্ষিত হয়ে পড়বে। ২০ কোটি মুসলমান যদি ঈমানী চেতনা ও স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে জেগে ওঠে, তবে ভারতের অখণ্ডতা টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে।

ভৌগোলিক আশংকার সাথে যোগ হয়েছে ঐতিহাসিক ভয়। ব্রিটিশ আমলে আসাম ও ত্রিপুরার একটা বড় অংশ বাংলার প্রশাসনিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাংস্কৃতিকভাবে এই পুরো জনপদ একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঐতিহাসিক এই নৈকট্য তাদের দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে দেয়।

তাই ভারত কোনোভাবেই চায় না, বাংলাদেশে এমন কোনো শক্তি মাথাচাড়া দিক, যারা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি হিসেবে ধারণ করবে। আর এ জন্যেই ভারত বিরামহীনভাবে এ দেশে ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়কে দুর্বল করার চেষ্টা করে। তারা এমন এক বাংলাদেশ চায়, যা নামে মুসলিমপ্রধান, কিন্তু আত্মায় সেক্যুলার।

আধিপত্যের নীল নকশা

ভারতের জন্য একাত্তর ছিল পাকিস্তান ভাঙার মোক্ষম সুযোগ। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগানোর পরই শুরু হয়েছে আসল সংকট। বাংলাদেশের অবস্থান, এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মুসলিম পরিচয় আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন প্রদেশের সাথে আমাদের ঐতিহাসিক নৈকট্য; সব মিলিয়ে বাংলাদেশের অস্তিত্বই এখন ভারতের জন্য স্থায়ী কৌশলগত চ্যালেঞ্জ। তাই নিতান্ত বাস্তববাদী ও কৌশলগত কারণেই ভারত নিরবচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশকে কবজায় রাখতে চায়।

বাংলাদেশে ভারতীয় আধিপত্যের ছক মূলত দুটো স্তরে কাজ করে:

- **দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য:** ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ বাস্তবায়ন করা। সেটা অখণ্ড ভারতের নামে হোক বা নেহরু ডকট্রিনের নামে।
- **মধ্যমেয়াদি লক্ষ্য:** চূড়ান্ত আগ্রাসনের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশকে প্রক্সি শাসনের আওতায় রাখা।

এ লক্ষ্যে ভারত নানা কৌশলে, নানা ফ্রন্টে কাজ করে। রাজনৈতিকভাবে তাদের সবচেয়ে বড় এবং কার্যকর ফ্রন্ট আওয়ামী লীগ। এটা ভারতীয় স্বার্থ রক্ষায় সবচেয়ে কার্যকর রাজনৈতিক শক্তি। এর আগে জাসদসহ অন্যান্য দলকেও তারা ব্যবহার করেছে। এছাড়া জাতীয়তাবাদী, ডানপন্থী এমনকি ইসলামপন্থী বলে পরিচিত দলগুলোর ভেতরেও তাদের অনুপ্রবেশ আছে।

এছাড়া আধিপত্য ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশের ভেতরে ভারত একটা প্রভাবশালী 'পঞ্চম বাহিনী' তৈরি করেছে।[৩৩] লম্বা সময় ধরে সাংস্কৃতিক অঙ্গন, বুদ্ধিজীবী মহল, মিডিয়া জগত ও সুশীল সমাজের মধ্যে বানিয়েছে শক্ত ঘাঁটি। ভারতের প্রভাববলয়ে থাকা এই লোকেরা বাংলাদেশে এমন এক সংস্কৃতি তৈরি করেছে, যেখানে ভারতবিরোধিতাকে সাম্প্রদায়িকতা হিসেবে নাকচ করা হয়।

দুঃখজনকভাবে, ভারতবিরোধিতার দাবি করা অনেক জাতীয়তাবাদীও ভারতের তৈরি বা প্রচার করা ইসলামবিদ্বেষী ধারণাকে গ্রহণ করে নিয়েছে, এবং নির্বোধের মতো সেগুলো প্রচার করে বেড়াচ্ছে বহু দশক যাবত।

সেক্যুলার-প্রগতিশীল শক্তির সাংস্কৃতিক আধিপত্য আর ভারতীয় আঞ্চলিক আধিপত্যের প্রকল্প একে অপরের পরিপূরক। কংগ্রেসের নেহেরু ডকট্রিন, আরএসএস-বিজেপির অখণ্ড ভারত, আর এ ভূখণ্ডের মুসলিমদের পরিচয়কে নাকচ করা বাঙালিত্বের বয়ান, এক সুতোয় গাঁথা।

ফিরিঙ্গি সাম্রাজ্যবাদ

বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের। বিশেষ করে, তথাকথিত ওয়ার অন টেরর বা 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' নতুন মোড়কে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে পুরোনো এক লড়াই।

[৩৩] রাজনৈতিক পরিভাষায় 'পঞ্চম বাহিনী' বলতে রাষ্ট্রের ভেতরে থাকা এমন গোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা গোপনে বিদেশি শক্তি বা শত্রুপক্ষের স্বার্থে কাজ করে। পরিভাষাটির উৎপত্তি ১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়।

চিরন্তর অপর

ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের যুদ্ধ অনেক পুরোনো। আধুনিক পশ্চিমের আত্মপরিচয় গড়ে ওঠেছে ইসলামকে 'অপর' বা প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর মধ্য দিয়ে।

পশ্চিমা বিশ্ব বলতে আজ আমরা ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকভাবে একীভূত যে সত্ত্বাকে বুঝি, এক হাজার বছর আগেও এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সেখানকার মানুষ তখন আলাদা আলাদা গোত্র বা অঞ্চলের নামে নিজেদের পরিচয় দিত। 'পশ্চিম'-এর ধারণাটা দানা বাঁধতে শুরু করে একাদশ শতাব্দীর দিকে। এই সময়ে ক্যাথলিক চার্চের পতাকার নিচে ইউরোপের ছোট ছোট রাজ্যগুলো একজোট হতে শুরু করে। নিজেদের বলে ক্রিসেনডোম (Christendom) বা 'খ্রিষ্টজগৎ'। আর এই ক্রিসেনডোমই ছিল আধুনিক পশ্চিমের প্রাথমিক অবতার। এই ধারণা থেকেই কালের পরিক্রমায় পশ্চিমা সভ্যতার ধারণা জন্ম নেয়।[৩৪]

ক্রিসেনডোম নামের এই নতুন পরিচয়ের পেছনে সবচাইতে বড় ভূমিকা ছিল ক্রুসেডের। ইসলামের 'হুমকি' মোকাবিলা আর জেরুসালেম পুনরুদ্ধারের স্লোগান তুলেই খ্রিষ্টজগতের ধারণা সামনে এনেছিল ক্যাথলিক চার্চ।

এই পরিচয় গড়ে উঠেছিল দুটো স্তম্ভের ওপর ভর করে; ক্যাথলিক ধর্মীয় দায়িত্ববোধ, আর ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা। আধুনিক 'পশ্চিম'-এর জন্মই হয়েছিল ইসলামকে প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে।

রেনেসাঁ, রিফর্মেশান আর এনলাইটেনমেন্টের পর পশ্চিমে ধর্মের প্রভাব কমে গেল। কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে মনস্তত্ত্ব বদলালো না। তাদের কাছে ইসলাম চিরশত্রু হয়েই রয়ে গেল; শত্রুতার বয়ান পাল্টাল কেবল। আগের 'ধর্মযুদ্ধ' পরে 'সভ্যতা বনাম বর্বরতা', 'শান্তি বনাম সন্ত্রাস', আর 'গণতন্ত্র বনাম মৌলবাদ'-এর যুদ্ধে রূপ নিল।

পাশ্চাত্য কীভাবে নিজেদের সভ্য ও র‍্যাশনাল (Rational) হিসেবে দেখাতে মুসলিমবিশ্বকে বর্বর ও 'ইর‍্যাশনাল' প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে, তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন গবেষক এডওয়ার্ড সাইদ। অন্য দিকে জোসেফ মাসাদ তুলে ধরেছেন; আধুনিক লিবারেলিসম কীভাবে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করেছে ইসলামের বিপরীতে দাঁড়িয়ে। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য ইসলামকে বানিয়েছে প্রধান 'অপর' (The Other)। জ্ঞানতাত্ত্বিক এই বাইনারি একদিকে তাদের আত্মপরিচয়ের

---

[৩৪] Nora Berend, "The Expansion of Latin Christendom," in *The Central Middle Ages: Europe 950–1320*, ed. Daniel Power (Oxford: Oxford University Press, 2006)

ভিত্তি দিয়েছে, অন্যদিকে জুগিয়েছে মুসলিম বিশ্বে সামরিক আগ্রাসনের অজুহাত।

আধুনিক পশ্চিমের জন্মের সময় ইসলাম ছিল শত্রু। আজও পশ্চিমের চোখে ইসলাম সেই একই ভূমিকায়—শত্রু ও হুমকি। আমরা ভুলে গেলেও এ সত্যটা ওরা ভুলেনি।

১৯১৭ সালে জেরুসালেম যখন ব্রিটিশদের দখলে আসে, ব্রিটিশ জেনারেল এডমান্ড অ্যালেনবি তখন দম্ভভরে ঘোষণা করেছিল, 'আজ ক্রুসেডের লড়াই শেষ হলো।'[৩৫]

১৯২০-এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী বেশে দামাস্কাসে ঢোকার পর ফরাসি জেনারেল হেনরি গ্যুরো ছুটে গিয়েছিল সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবির কবরের পাশে। ইতিহাসের মহান নায়কের কবরে লাথি মেরে ঔদ্ধত্যের সাথে বলেছিল, 'ওঠো, সালাদিন! দেখো, আমরা ফিরে এসেছি।'[৩৬]

২০০১ সালে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক দেওয়ার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশের মুখেও উচ্চারিত হয়েছিল সেই পুরোনো শব্দ—ক্রুসেড।

ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে।

ক্রুসেড থেকে উপনিবেশবাদ, এবং সেখান থেকে আজকের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' সবই ইসলামকে নিরবচ্ছিন্নভাবে শত্রু হিসেবে দেখার অংশ।

আর সেই লড়াইয়েরই আধুনিক ফ্রন্টলাইন যায়নবাদী ইসরায়েল। ইসরায়েল হলো ইসলামের প্রাণকেন্দ্র আরবের বুকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত প্রক্সি। নব্য উপনিবেশবাদী প্রকল্প।

নতুন এই ক্রুসেড দখলদারিত্বের পাশাপাশি চালিয়েছে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। আগ্রাসনের অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে মিডিয়া ও সংস্কৃতিকে। পশ্চিমের বিনোদন জগত আর মিডিয়া দশকের পর দশক ধরে ইসলাম, মুসলিম আর বিশেষ করে আরবদের উপস্থাপন করেছে আগ্রাসী বর্বর শক্তি হিসেবে।[৩৭]

---

[৩৫] Hatem Bazian, "Revisiting the British Conquest of Jerusalem," *Al Jazeera*, December 14, 2014, accessed February 18, 2026.

[৩৬] Barr, James. *A line in the sand: Britain, France and the struggle that shaped the Middle East.* Simon and Schuster, 2011.

[৩৭] Jack G. Shaheen, *Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People* (Northampton, MA: Olive Branch Press, 2001); Evelyn Alsultany, *Arabs and Muslims in the Media: Race and Representation after 9/11* (New York: New York University Press, 2012); Edward W. Said, *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World* (New York: Vintage Books, 1997).

দীর্ঘমেয়াদি এই বয়ান-যুদ্ধের প্রভাব গোটা দুনিয়ার মতো বাংলাদেশেও পড়েছে। আমাদের দেশের তথাকথিত সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠী এই বৈশ্বিক লড়াইয়েরই স্থানীয় সেপাই। পশ্চিমা মিডিয়া বা অ্যাকাডেমিয়া যেভাবে ইসলামকে বিচার করে, এরাও ঠিক সেই লেন্স দিয়েই নিজেদের সমাজকে চেনে। তাদের ইসলামবিদ্বেষ ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী বয়ান আর পশ্চিমা ওরিয়েন্টালিসমের এক বিচিত্র সংকর। কলকাতার বাবু সংস্কৃতির প্রতি অন্ধ মোহ আর পশ্চিমের প্রতি মুগ্ধতাই বাঙালি প্রগতিশীলদের মুসলিম বাংলার সমাজ ও বিশ্বাসের বিপক্ষে হিসেবে দাঁড় করিয়েছে।

গণহত্যার মহড়া: নব্বইয়ের দশক

আধুনিক সময়ে মুসলিমবিশ্বের বিরুদ্ধে পশ্চিমের সরাসরি আগ্রাসন শুরু হয় নব্বইয়ের দশকে। যখন স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর নতুন 'বৈশ্বিক শত্রু' খুঁজছিল পশ্চিম।

এ সময়টাতেই প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাক আক্রমণ করে অ্যামেরিকা। জাতিসংঘকে দিয়ে চাপিয়ে দেয় অমানবিক নিষেধাজ্ঞা। খাবার আর ওষুধের অভাবে ধুকে ধুকে মারা যায় লাখ লাখ মানুষ। ইউনিসেফের তথ্যমতে, নিষেধাজ্ঞার কারণে মারা যায় ৫ লাখের বেশি শিশু।[৩৮] ইরাকে ৩৪০ টনের মতো ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ মিসাইল ছুড়ে অ্যামেরিকা। মাত্র ৪ বছরের ব্যবধানে ক্যান্সারের হার বেড়ে যায় ২০ গুণ।[৩৯]

১৯৯৬ সালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইটকে প্রশ্ন করা হয়েছিল,

> 'ইরাকে ৫ লাখ শিশু মারা গেল, হিরোশিমাতেও তো এত মানুষ মারা যায়নি। আপনি কি মনে করেন এই চড়া মূল্য দেওয়াটা সঠিক ছিল?'

বিন্দুমাত্র অনুশোচনা ছাড়া অলব্রাইট জবাব দিয়েছিল,

> 'আমরা মনে করি, এই মূল্যটুকু দেওয়া জরুরি ছিল (We think the price is worth it)।'[৪০]

---

[৩৮] UNICEF, "Results of the 1999 Iraq Child and Maternal Mortality Surveys,"

[৩৯] Iraq: War's Legacy of Cancer," *Al Jazeera*, March 15, 2013; Dahr Jamail, "Iraqi Doctors Call Depleted Uranium Use 'Genocide,'" *Truthout*, October 14, 2014.

[৪০] Rahul Mahajan, "'We Think the Price Is Worth It,'" FAIR (Fairness & Accuracy in Reporting), quoting CBS *60 Minutes* (May 12, 1996).

২০০১-এর আগেই পশ্চিমারা মুসলিমদের হত্যাযোগ্য এবং খরচযোগ্য সাব্যস্ত করে ফেলেছিল। নব্বইয়ের দশক ছিল পরের দশকে শুরু হওয়া বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব।

ওয়ার অন টেরর

নব্বইয়ের দশকে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল, ২০০১ সালে সেটাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় জর্জ ডব্লিউ বুশ। ঘোষণা করে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। এ যুদ্ধ কেবল বোমা আর ড্রোন হামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। আগ্রাসনকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে জায়েজ করার জন্য তৈরি করেছে আইনি ও দার্শনিক কাঠামো।

ঔপনিবেশিক যুগে পশ্চিমারা নিজেদের সভ্যতার অগ্রদূত দাবি করত। ওরা বলত—তোমরা বর্বর, আমরা এসেছি তোমাদের সভ্য করতে। এখনকার দখলদাররা একই সুরে বলে; তোমরা বর্বর, তাই আমরা তোমাদের গণতন্ত্র, মানবাধিকার আর উন্নয়ন শেখাতে এসেছি।

শব্দের কিছু পার্থক্য এসেছে। কিন্তু মূল মিশন এক: যেসব বর্বরদের বশ করা সম্ভব তাদের 'সভ্য' বানানো। যারা প্রতিরোধ করবে, তাদের নিশ্চিহ্ন করা।

কোনো জনগোষ্ঠী বা আদর্শকে সভ্যতার জন্য হুমকি হিসেবে দাঁড় করানো গেলে, তাদের বিরুদ্ধে যেকোনো কিছু করা ন্যায্য হয়ে যায়। তখন ড্রোন হামলা, বিনাবিচারে আটক, গুয়ান্তানামো বে'র মতো টর্চার সেল, এমনকি গণহত্যাও আর অপরাধ মনে হয় না। এ লড়াইয়ের কোনো ভৌগলিক সীমানা নেই, নেই নির্দিষ্ট সময়সীমা। এ এক অনন্ত যুদ্ধ, যেখানে সভ্যতা রক্ষার জন্য সব কিছু জায়েজ।

আইনের মোড়কে আইনহীনতা

সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের সাথে ঔপনিবেশিক দখলদারিত্বের মিল কেবল বয়ানে না। এ যুদ্ধের আইনি কাঠামোতেও সেই একই উত্তরাধিকার স্পষ্ট।

কলোনিয়াল যুগে প্রজাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে শাসকরা এমন সব আইন বানাতো, যা সন্দেহভাজনদের ন্যূনতম আইনি সুরক্ষা থেকেও বঞ্চিত করত। ফিরিঙ্গিরা যখনই যেখানে প্রতিরোধের মুখে পড়ত, তখনই সাধারণ আইন স্থগিত করে আশ্রয় নিত 'বিশেষ ক্ষমতা'র।

আঠারো শতকের দিকে আয়ারল্যান্ডের বিদ্রোহ দমন করার জন্য যেমন ব্রিটিশরা কিছু বিশেষ আইন তৈরি করেছিল। এই আইনগুলোর মূল কাজই ছিল জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো সাময়িকভাবে বাতিল করে দেওয়া। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বানানো এই আইনগুলো নির্দিষ্ট সময় পর পর নবায়ন করতে হতো। পরবর্তীতে ব্রিটিশরা ঠিক এই একই মডেল হিন্দুস্তানেও প্রয়োগ করে।

১৯১৯ সালের 'রাউলাট অ্যাক্ট'-এর সুবাদে পুলিশ চাইলেই স্রেফ সন্দেহের বশে যে কাউকে তুলে নিয়ে দুই বছর পর্যন্ত বিনা বিচারে আটকে রাখতে পারত।[৪১] এই কালাকানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সময়ই ব্রিটিশরা ভয়াবহ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড চালায়।

এছাড়া ১৯১৫ সালের 'ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' এবং আরও পুরোনো 'বেঙ্গল রেগুলেশন-থ্রি'-এর মাধ্যমে গভর্নর জেনারেলকে একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।[৪২] সে চাইলেই যেকোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করে রাখতে পারত অনির্দিষ্টকালের জন্য। এসব আইনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সব প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে যেকোনো মূল্যে ফিরিঙ্গি শাসন টিকিয়ে রাখা।

'ওয়ার অন টেরর'-এর আইনি কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে হুবহু এই ঔপনিবেশিক মডেলের ওপর। আজকের পৃথিবীতে আমরা যখন 'জঙ্গি দমন' কিংবা 'বিশেষ ট্রাইব্যুনাল'-এর নামে বিনাবিচারে আটক, গুম আর হত্যার সংস্কৃতি দেখি, তখন সেটা আসলে নতুন পোশাকে ফিরে আসে সেই কলোনিয়াল প্রেতাত্মাই।

পার্থক্য হলো, আগে টার্গেট ছিল 'বিদ্রোহী প্রজা', এখন টার্গেট হলো 'র‍্যাডিকাল মুসলিম'।

শেরিন রাজাকের মতো গবেষকরা দেখিয়েছেন, সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের আইনি কাঠামো ব্যবহার করে আজ কীভাবে মুসলিমদের 'স্থায়ী হুমকি' হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।[৪৩]

পশ্চিমা বিশ্ব যেসব চিন্তা আর আদর্শকে বিপজ্জনক মনে করে, সেই সব চিন্তা ধারণ করা মুসলিমরা এই যুদ্ধের কাঠামোর ভেতর চিরস্থায়ী সন্দেহভাজনে পরিণত হয়। নিয়মিত সালাত আদায় করা, দান-সাদকাহ করা, ভ্রমণ করা বা রাজনৈতিক

---

[৪১] *The Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919*, যা 'Rowlatt Act' নামে পরিচিত। এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়েই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল।

[৪২] *The Bengal State Prisoners Regulation, 1818* (Regulation III of 1818). এই আইনটি ব্রিটিশ সরকারকে বিনা বিচারে আটকের (Preventive Detention) ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছিল, যা পরবর্তীতে ভারত ও পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

[৪৩] Razack, Sherene. *Casting Out: The Eviction of Muslims from Western Law and Politics*. University of Toronto Press, 2008.

বক্তব্য দেওয়া—সবই তখন নিরাপত্তার লেন্সে সন্দেহজনক হিসেবে দেখা হয়। হয়ে যায় উগ্রবাদের সম্ভাব্য চিহ্ন!

ফলে রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে অসীম সময় ধরে দমনপীড়ন চালানোর লাইসেন্স পেয়ে যায়। নজরদারি করা, বিনা পরওয়ানায় তুলে নিয়ে যাওয়া, এমনকি স্বাভাবিক জীবনের অধিকার কেড়ে নেওয়া—সবই তখন নিরাপত্তার দোহাইয়ে বৈধ হয়ে যায়।

কলোনিয়াল প্রজার মতোই আজকের মুসলিমরাও আইনের সুরক্ষার বাইরে।[৪৪] আইনের মোড়কে সেই একই আইনহীনতা। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ মুসলিমদের এমন এক প্রাণীতে পরিণত করেছে, যাদের রক্তমাংসের শরীর আছে, কিন্তু কোনো অধিকার নেই।

এ কারণেই আমরা দেখি, গত পঁচিশ বছরে মুসলিমদের যেকোনো প্রতিবাদ অথবা রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা দমনের মোক্ষম অস্ত্র ছিল সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের বয়ান। একে কাজে লাগিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমের বিভিন্ন সরকার ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

বৈশ্বিক রাজনীতির এই সমীকরণ বাংলাদেশেও পুরোদমে কার্যকর হয়েছে। আজকের বিশেষ ক্ষমতা আইন আর সন্ত্রাসবিরোধী আইনগুলো ব্রিটিশ আমলের আইনগুলোর আধুনিক সংস্করণ।

এগুলো এতটাই বিস্তৃত আর অস্পষ্ট যে, এদের আওতায় প্রায় যেকোনো কাজকে সন্ত্রাস বলে চালিয়ে দেওয়া সম্ভব। নিছক একটা বই পড়া বা অনলাইনে ভিডিও দেখাও এখন অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।

বিচারের মানদণ্ডও বদলে যায়। রাজনৈতিক দল রাস্তা বন্ধ করে প্রতিবাদ করলে সেটা হয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন। কিন্তু ইসলামপন্থীরা মিছিল করলে সেটা হয়ে যায় উগ্রবাদী তৎপরতা। কোনো বামপন্থী যদি বর্তমান ব্যবস্থা ভেঙে বিপ্লবের ডাক দেন, তাকে বলা হয় বিপ্লবী। অথচ একজন ইসলামপন্থী একই কথা বললে

[৪৪] Agamben, Giorgio. *State of Exception.* Translated by Kevin Attell, University of Chicago Press, 2005। আগামবেন দেখান যে, গুয়ান্তানামো-বে'র বন্দিরা এমন এক অবস্থায় আছে, যেখানে আইন তাদের অধিকার দেয় না, কিন্তু আইনের ক্ষমতা তাদের ওপর প্রয়োগ করা হয়। আর দেখুন, Ulrich Raulff, "An Interview with Giorgio Agamben," *German Law Journal* 5, no. 5 (May 2004): 609–614.

হয়ে যায় জঙ্গি বা উগ্রবাদী। আর একবার এই তকমা লাগলে তার সব নাগরিক অধিকার উবে যায়।

মূলত, ওয়ার অন টেরর-এর দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র সেই পুরোনো ঔপনিবেশিক দমনপীড়নকেই ফিরিয়ে এনেছে।

শরীয়াহর অপরাধীকরণ

২০০৬ এর এক বক্তব্যে জর্জ ডব্লিউ বুশ কোনো রকম রাখঢাক ছাড়াই সরাসরি বলেছিল, র‍্যাডিকাল ইসলামিস্টরা সুযোগ পেলে আবার খিলাফত কায়েম করবে, আর অ্যামেরিকা কোনোভাবেই তা হতে দেবে না।[৪৫]

প্রায় দুই যুগ পর ঠিক একই সুর শোনা যায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর কণ্ঠে। তার মতে, র‍্যাডিকাল ইসলাম নিয়ে অ্যামেরিকার দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ হলো 'এর প্রকৃতিটাই বৈপ্লবিক।'[৪৬]

মার্কিন সরকারের দীর্ঘমেয়াদি নীতি, কৌশল এবং এসব বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়। তাদের যুদ্ধটা কেবল আল-কায়েদার বিরুদ্ধে না। তাদের লড়াই একটা আদর্শের বিরুদ্ধে। এ লড়াই ইসলামের সেই বিপ্লবী প্রকল্পের বিরুদ্ধে, যা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, সামাজিক ও আইনি ব্যবস্থার কথা বলে। মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক উত্থান আর খিলাফাহর আকাঙ্ক্ষাকে তারা তাদের আধিপত্যের জন্য হুমকি মনে করে; আর তাই একে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চায়।

ইসলামের মৌলিক অবস্থান হলো, সমাজ ও রাষ্ট্র শরীয়াহ দ্বারা পরিচালিত হবে। উম্মাহ একতাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু 'সন্ত্রাসবিরোধী' যুদ্ধের বয়ান ইসলামের এই মৌলিক অবস্থানগুলোকেই সভ্যতার জন্য হুমকি হিসেবে হাজির করেছে। তারা বিশ্বজুড়ে এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছে, যেখানে শরীয়াহ চাওয়া অথবা খিলাফাহর কথা বলাই মহা-অপরাধ। অর্থাৎ ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে অপরাধ বানিয়ে ফেলা হয়েছে।

মজার ব্যাপার হলো, ইসলামী শাসন চাওয়াকে 'উগ্রতা' হিসেবে দেখানোর এই কৌশলের শুরুটাও কিন্তু সেই ঔপনিবেশিক আমলে। ইংরেজ শাসনের সময়

---

[৪৫] George W. Bush, "Remarks on the Global War on Terror: The Enemy in Their Own Words," September 5, 2006, in *Selected Speeches of President George W. Bush*, 2001–2008 (Washington, DC: The White House, 2008), 402.

[৪৬] Secretary of State Marco Rubio, "Interview with Sean Hannity of Fox News," U.S. Department of State, December 2025.

আলিমদের অনেকে বারবার প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাজ সংস্কার করতে, ফিরিঙ্গি কাফিরদের হটাতে আর আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে।

ফিরিঙ্গিরা জানত, এই আদর্শিক শক্তিকে মোকাবিলা করা কঠিন। তাই তারা প্রথমেই মুজাহিদদের গায়ে সেটে দিয়েছিল উগ্রবাদের তকমা। ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট উইলিয়াম হান্টার তার বিখ্যাত বই 'দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমানস'-এ তরিকায়ে মুহাম্মাদিয়ার মুজাহিদদের নাম দিয়েছিল 'হিন্দুস্তানি ফ্যানাটিকস' (Hindustani Fanatics)। সিত্তানা পাহাড়ে তাঁদের যে ঘাঁটি ছিল, সেটাকে বলেছিলেন 'ফ্যানাটিক ক্যাম্প' বা উন্মাদদের ঘাঁটি।[৪৭]

দখলদারদের চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থা হটিয়ে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়াকে উগ্রতা হিসেবে দেখানোর সেই যে শুরু; তা আজও চলছে।

ইতিহাসের এই পুনরাবৃত্তি বিস্ময়কর।

১৮৭০ সালে হান্টার যেটাকে বলেছিলেন ফ্যানাটিসিসম, আজকের সিএনএন বা বিবিসি সেটাকে বলে 'ইসলামিক টেরোরিসম'। শব্দ বদলেছে, কৌশল বদলায়নি। সেকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যাদের ভয় পেত, একালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঠিক তাদেরই ভয় পায়। আর সেই ভয় থেকেই তারা শরীয়াহর দাবিকে 'সন্ত্রাসবাদ' হিসেবে তুলে ধরে।

তখনের মতো এখনো তাদের কৌশল দ্বিমুখী। যারা শরীয়াহ চাইবে, পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করবে, তাঁরা 'ব্যাড মুসলিম'। তাঁদের বিরুদ্ধে বুশদের ক্রুসেড। অন্যদিকে যারা শরীয়াহ চাইবে না, উম্মাহর রাজনৈতিক ঐক্যের কথা তুলবে না, আর পশ্চিমের বানানো সেক্যুলার ছাঁচে ইসলামকে কেবল আচারঅনুষ্ঠান আর প্রতীকে সীমাবদ্ধ রাখবে, তারা হলো 'গুড মুসলিম'।

পশ্চিমা বিশ্ব সর্বশক্তি দিয়ে প্রথম দলকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে। আর বস্তা বস্তা ডলার ঢেলে দ্বিতীয় দলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

বৈশ্বিক রাজনীতির এই সমীকরণ আমদানি হয়েছে বাংলাদেশেও। এখানে ভালো মুসলিম হওয়ার শর্ত হলো—আপনার ইসলামচর্চা বাঙালিয়ানা অথবা পশ্চিমা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ; যেকোনো একটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। আর যদি দুটোই একসাথে থাকে, তাহলে সোনায় সোহাগা।

---

[৪৭] Hunter, William Wilson. *The Indian Musalmans.* Trübner and Company, 1876.

আর যারা সেক্যুলার ব্যবস্থার আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে, যারা বিশ্বরাজনীতিকে দেখে কুরআনের দৃষ্টিতে, যারা গণতন্ত্রসহ সব পশ্চিমা মতবাদ আর ব্যবস্থাকে ছুড়ে ফেলে ইসলামী শাসন চায়, তারা হলো খারাপ মুসলিম। র‍্যাডিকাল, উগ্রবাদী, সন্ত্রাসী, জঙ্গি!

এভাবেই বাংলাদেশে শরীয়াহ শাসন আর খিলাফাহর আকাঙ্ক্ষা নিষিদ্ধ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। লিবারেল ডেমোক্রেসিকে বানানো হয়েছে 'ঈমানের স্তম্ভ'। আর ইসলামী পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে বানানো হয়েছে 'জঙ্গিবাদের লক্ষণ'।

আমাদের সমাজের বিশাল অংশ এই ফাঁদে পা দিয়েছে। তারা 'গুড মুসলিম' হওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পশ্চিমের শেখানো বুলি আউড়ে নিজেই আগ বাড়িয়ে নিজের ভাইয়ের গায়ে 'জঙ্গি' তকমা লাগিয়ে দিচ্ছে।

আজকের মাপকাঠিতে যদি আমরা আমাদের অতীতকে বিচার করতে যাই, তাহলে বিচিত্র এক ফলাফল বেরিয়ে আসে। আজকের সংজ্ঞায় সাইয়্যিদ আহমেদ শহীদ, মীর নিসার আলী তিতুমীর কিংবা হাজী শরীয়াতুল্লাহর মতো ইতিহাসের মহীরুহরা নিশ্চিতভাবেই জঙ্গি, র‍্যাডিকাল, উগ্র এবং 'ব্যাড মুসলিম' সাব্যস্ত হবেন। বিপরীতে ইংরেজদের আনুগত্য আর দালালি করা মীরজাফররা পাবে মডারেট আর গুড মুসলিমের সার্টিফিকেট।

উপনিবেশের উত্তরাধিকার

আজকের বাংলাদেশে আমরা যে কাঠামোগত ইসলামবিদ্বেষ দেখি, তার সবচেয়ে শক্ত শেকড়ের সম্পর্ক দীর্ঘ দুশো বছরের ঔপনিবেশিক প্রকল্পের সাথে। ফিরিঙ্গিরা আমাদের কেবল শাসনই করেনি, বদলে দিয়েছে আমাদের দেখার চোখ, চেনার পদ্ধতি এবং সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড।

স্ট্রাকচারাল জেনোসাইড

পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তির সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো, তারা আমাদের বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছে যে, আমাদের নিজস্ব যা কিছু আছে তা আদিম, অযৌক্তিক ও বর্বর। আর পশ্চিম থেকে যা কিছু আসে, তা-ই হলো সভ্য, বিজ্ঞানমনস্ক ও চূড়ান্ত। উপনিবেশ কেবল আমাদের জমি দখল করেনি, বদলে দিয়েছে আমাদের চিন্তার কেবলাও।

বখতিয়ার খিলজী থেকে শুরু করে আলীবর্দী খান পর্যন্ত মুসলিম শাসকদের আমলে এ অঞ্চলে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। উইলিয়াম অ্যাডামের মতো ঐতিহাসিকদের জরিপে দেখা যায়, পলাশীর বিপর্যয়ের পরও বাংলায় লক্ষাধিক স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু ছিল। অনেক জায়গায় প্রতি চারশ বা পাঁচশ মানুষের জন্য ছিল একটি করে মাদরাসা বা মক্তব।[৪৮] এক বিশাল, জনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল এখানে।

কিন্তু ইংরেজরা এসে এই ব্যবস্থার গলায় ছুরি চালাল। পলাশীর সামরিক-রাজনৈতিক পরাজয়ের পর ধ্বংসযজ্ঞ চলল তিন ধাপে।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আর সূর্যাস্ত আইনের মাধ্যমে তারা মুসলিম জমিদার ও অভিজাত শ্রেণিকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিল। এরপর এলো ১৮২৮ সালের ধাক্কা। ইংরেজ সরকার লাখেরাজ বা করমুক্ত ওয়াকফ সম্পত্তিগুলো বাজেয়াপ্ত করা শুরু করল। ওয়াকফ সম্পত্তির আয় দিয়েই চলত হাজার হাজার মাসজিদ, মাদরাসা, খানকা আর মুসাফিরখানা। এই সম্পদ কেড়ে নেওয়ার ফলে রাতারাতি আমাদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ল। শিক্ষা চলে গেল সাধারণ মুসলিমদের নাগালের বাইরে।

কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেওয়া হলো ১৮৩৭-এ। প্রশাসনিক কাজে ফারসির বদলে ইংরেজি ভাষা চালু করল ফিরিঙ্গিরা। কলমের এক খোঁচায় শিক্ষিত মুসলিম সমাজকে রাতারাতি বেকার বানিয়ে দেওয়া হলো। এভাবে বাংলায় মুসলিম-ক্ষমতার কবর দেওয়া সম্পন্ন হলো।

জ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সামাজিক কাঠামো গুঁড়িয়ে দিয়ে কোনো জাতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার এ প্রক্রিয়াকে ওয়াইয়েল হাল্লাকের মতো চিন্তাবিদরা বলেছেন কাঠামোগত গণহত্যা (structural genocide)।[৪৯] এর ফলে কাল পর্যন্ত যারা ছিল বাংলার সম্মানিত শাসক, তারাই রাতারাতি লাঞ্ছিত, রিক্ত ও পরাজিত জাতিতে পরিণত হলো।

---

[৪৮] William Adam, "First Report on the State of Vernacular Education in Bengal" (1835), in *Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal and Behar, Submitted to Government in 1835, 1836 and 1838* (Calcutta: Home Secretariat Press, 1868)

[৪৯] Hallaq, Wael B. *Restating orientalism: A critique of modern knowledge*. Columbia University Press, 2018.

জ্ঞানতাত্ত্বিক সহিংসতা

পরের ধাপে শুরু হলো তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লড়াই। ঔপনিবেশিক কর্তা আর তাদের পোষা অ্যাকাডেমিকদের চোখে পশ্চিমের জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি আর তত্ত্বই ছিল শ্রেষ্ঠ, চূড়ান্ত ও সার্বজনীন। ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব ও শিক্ষাব্যবস্থাকে তারা দেখত স্রেফ অকেজো জঞ্জাল হিসেবে। ভারতবর্ষে ইংরেজদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান নির্মাতা ম্যাকলে স্পষ্ট বলেছিল—

> *“ইউরোপের ভালো কোনো লাইব্রেরির একটি তাকের বই সমগ্র ভারত ও আরবের সমস্ত সাহিত্যের চেয়ে বেশি মূল্যবান।”* [৫০]

প্রথমে একটি জাতির সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামো ধ্বংস করে, তারপর ফিরিঙ্গিদের নিজেদের বয়ানকে একমাত্র ধ্রুব সত্য হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার আগ্রাসনের কেতাবি নাম জ্ঞানতাত্ত্বিক সহিংসতা (Epistemic Violence)। এই সহিংসতার আঘাত শরীরে লাগে না, কিন্তু তা উপড়ে ফেলে জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক শেকড়, গুঁড়িয়ে দেয় তার আত্মপরিচয়ের ভিত্তি। আক্রান্ত সমাজ তার নিজস্ব স্বরে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে পরিণত হয় আজ্ঞাবহ প্রজায়। চিন্তাকে শেকল পরিয়ে রাখে এই জ্ঞানতাত্ত্বিক সহিংসতা।

ঠিক এই ব্যাপারটাই হিন্দুস্তানে, এবং বিশেষভাবে বাংলাতে ঘটেছে। আমরা নিজের চোখে দুনিয়াকে দেখি না; দেখি পশ্চিমের ধার করা চোখে।

ঔপনিবেশিক শিক্ষা আমাদের মগজে এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছে যে; ইসলাম মানেই পশ্চাৎপদতা, আর পশ্চিমা জ্ঞানই হলো মুক্তির একমাত্র পথ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বা বুদ্ধিবৃত্তিক জগত পশ্চিমা চিন্তার বাইরে অন্য যেকোনো চিন্তাকে নাকচ করে দেয়। সমাজের একটা বড় অংশ মনে করে, ইসলাম থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখাই বুঝি আধুনিকতার লক্ষণ। নিজের দ্বীন নিয়ে হীনম্মন্যতা আমাদের সমাজে গভীরভাবে গেঁথে আছে।

পশ্চিমা চিন্তা, দর্শন আর ব্যবস্থাকে আমরা এমনভাবে গ্রহণ করেছি, যেন এগুলোই উন্নতির একমাত্র ছাঁচ, এর বাইরে আর কোনো রাস্তা নেই। আর ঠিক এ কারণেই ইসলাম যখন ব্যক্তিগত ইবাদতের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে হাজির হয়, তখনই সেটাকে সন্দেহ ও শত্রুতার চোখে দেখে সমাজ।

---

[৫০] Macaulay, Thomas Babington. “Minute on Indian education.” (1835).

এভাবেই ফিরিঙ্গিসেন্ট্রিক জ্ঞানতত্ত্ব আর দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক দর্শন এবং সামগ্রিক মনস্তত্ত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

ম্যাকলে বেঁচে থাকলে হয়তো তৃপ্তির হাসি হাসতো। কারণ আমাদের মনের ভেতরে তার প্রেতাত্মা আজও রাজত্ব করছে। আমাদের শাসকরা যেমন পশ্চিমে তৈরি হওয়া আইনের দাস, আমরা সাধারণ জনগণ তেমনি পশ্চিমে তৈরি হওয়া সাহেবী চিন্তার গোলাম।

ব্রাউন সাহিব: ম্যাকলের মানসপুত্র

১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ম্যাকলে যখন ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে দাঁড়িয়ে তার কুখ্যাত 'মিনিট অন এডুকেশন' পেশ করছিল, তখন সে আসলে এক নতুন প্রজাতির গোলাম তৈরির কথা বলছিল। যারা দেখতে ভারতীয় হলেও, মননে হবে পুরোদস্তুর ব্রিটিশ। ম্যাকলে বলেছিল:

> *'আমাদের এখন এমন একটি শ্রেণি তৈরিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে, যারা আমাদের (শাসক) এবং আমাদের কোটি কোটি প্রজার (শাসিত) মাঝখানে দোভাষী হিসেবে কাজ করবে। এমন এক শ্রেণি—যারা রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়; কিন্তু রুচি, মত, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ।'*[৫১]

ম্যাকলে দোভাষী শব্দটা ব্যবহার করেছিল। তবে এই দোভাষীর কাজ স্রেফ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় তরজমা করা না। ম্যাকলে চাচ্ছিল, এমন এক দালাল শ্রেণি তৈরি করতে, যারা নিজের বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আর জ্ঞানকে ঘৃণা করতে শিখবে। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করবে ইউরোপীয় জীবনবোধ ও দর্শনই শ্রেষ্ঠ।

দখলদারদের সবচাইতে বড় অস্ত্র হবে এই লোকগুলোই। দখলদারদের চিন্তা তারা নিজের কওমের ওপর চাপিয়ে দিতে সহায়তা করবে। ঘরের সব গোপন তথ্যগুলো পরম উৎসাহে তুলে দেবে তাদের হাতে। চিন্তা ও চেতনায় হবে ফিরিঙ্গিদের একনিষ্ঠ আর আন্তরিক গোলাম। মূলত, এ শ্রেণির হাত ধরেই দখলদারিত্ব সরাসরি ঢুকে পড়ে আমাদের অন্দরমহলে, আর তারপর আমাদের মগজে।

ফিরিঙ্গিরা এই নতুন শ্রেণি তৈরির কাজে হাত দেয়। আর ১৮৫৭ সালের মহাঅভ্যুত্থানের পর এ প্রকল্প তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

---

[৫১] প্রাগুক্ত

ব্রিটিশদের চোখে ইসলাম ছিল হিন্দুস্তানে তাদের শাসন ও কর্তৃত্বের জন্য এক নম্বর হুমকি। মুসলিমরা 'অবাধ্য প্রজা', সুযোগ পেলেই যারা বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইগুলোর কেন্দ্রে থাকতেন আলিমগণ এবং তাজদীদী আন্দোলনের নেতারা। এজন্যেই ১৮৫৭-এর মহাঅভ্যুত্থানের পর হাজার হাজার আলিমদের হত্যা করেছিল ওরা।

এর ফলে মুসলিমদের মধ্যে তৈরি হলো গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক ও নেতৃত্ব শূন্যতা, যা এনে দিল ম্যাকলের প্রকল্প সফল করার সুবর্ণ সুযোগ। যারা লড়াই চালিয়ে গেল, ব্রিটিশরা তাদের ওপর চালাল অবর্ণনীয় জুলুম। যারা বশ্যতা স্বীকার করে নিল, তাদের কপালে জুটল জমিদারি, খেতাব আর ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট।

ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজের ভেতরে তৈরি হলো এক নতুন জাত; ব্রিটিশদের অনুগত সেই দোভাষী শ্রেণি। যাবার বেলায় ফিরিঙ্গিরা ক্ষমতার চাবি দিয়ে গেল তাদের এই রুহানী সন্তানদের হাতেই। আজ প্রায় দু'শো বছর পর ম্যাকলে কবরে, ব্রিটিশরা হাজার মাইল দূরে। কিন্তু ম্যাকলের সেই প্রেতাত্মারা আমাদের ঘাড়ের ওপর শক্ত হয়ে চেপে বসে আছে।

এটা বাংলাদেশসহ অধিকাংশ মুসলিম দেশের ট্র্যাজেডি। আমাদের ক্ষমতার চাবিকাঠি এমন এক শ্রেণির হাতে, যারা দেখতে আমাদের মতো হলেও চিন্তায় ফিরিঙ্গি প্রভুদের প্রতিনিধি। নিজেদের ক্ষমতা আর অবস্থান টিকিয়ে রাখতে এরা পশ্চিমা বিশ্বের দালালি করে। করে তাদের বসানো সেক্যুলার কাঠামোর পাহারাদারি। কেতাবি ভাষায় এরা 'কম্প্রেডর ক্লাস' (Comprador Class) বা দালাল শ্রেণি।

সরকার আসে, সরকার যায়; কিন্তু 'ব্রাউন সাহিব'দের আধিপত্য বদলায় না। ঔপনিবেশিক প্রভুদের মতোই তারা ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়কে দেখে বিপজ্জনক শক্তি হিসেবে, যা সবসময় শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। ইসলামী সমাজ ও শাসনের যেকোনো প্রকল্পকে দমিয়ে রাখাকে তারা নিজেদের পবিত্র দায়িত্ব মনে করে।

ব্রিটিশ শাসনামলে জমিদারদের সংখ্যা কম হলেও তাদের ক্ষমতা ছিল ব্যাপক। ঠিক একইভাবে, আজকের বাংলাদেশে সেক্যুলার এলিটরা হলো আমাদের 'সাংস্কৃতিক জমিদার'। সংখ্যায় অল্প হলেও ক্ষমতার কাঠামোর একদম কেন্দ্রে তাদের অবস্থান। এরা কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের মধ্যে সীমিত না; বরং প্রশাসন, মিডিয়া, বিচারবিভাগ ও শিক্ষাঙ্গনসহ রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে তারা ছড়িয়ে আছে ক্যানসারের মতো।

শাসকের চামড়ার রঙ বদলেছে, কিন্তু ক্ষমতা ও শাসনের পুরোনো কাঠামো বদলায়নি।

উত্তর-ঔপনিবেশিক সেক্যুলার রাষ্ট্র

মুসলিম ভূখণ্ডগুলো এক সময় ইসলামী শরীয়াহ দিয়ে শাসিত হতো। শাসকদের ভুলত্রুটি ছিল, জুলুম ছিল, কিন্তু শাসক এবং জনগণের আনুগত্য ছিল ইসলামের প্রতি। ইউরোপীয়রা এসে সেই কাঠামো ধ্বংস করে, সেখানে বসায় তাদের নিজেদের বানানো ব্যবস্থা। আজ তারা চলে গেলেও আমরা আগাগোড়া তাদের সেই ফেলে যাওয়া ব্যবস্থা আঁকড়ে ধরে আছি।

আমরা সত্যিকার অর্থে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীন হইনি। আমাদের তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর কাঠামো, বিচারব্যবস্থা, পলিসি আর আদর্শ; সব কিছু গড়ে ওঠেছে ইউরোপীয় ছাঁচে। আধুনিক 'মুসলিম রাষ্ট্র'গুলো হলো সেই বিষবৃক্ষ, যার বীজ বোনা হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসনামলে।

দখলদার পিতাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া শাসনব্যবস্থাকেই ক্ষমতাসীন এলিটরা কিছুটা ঘষেমেজে নতুন মোড়কে উপস্থাপন করেছে। তারা আমাদের নতুন নতুন জাতীয় দিবস দিয়েছে, হাতে ধরিয়ে দিয়েছে রংবেরঙের পতাকা, শুনিয়েছে স্বাধীনতার মনভুলানো বুলি।

কিন্তু চটকদার পর্দার আড়ালের বাস্তবতা হলো, আধুনিক জাতিরাষ্ট্র ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থারই ধারাবাহিকতা মাত্র। পার্থক্য এটুকুই যে, সাদা চামড়া বদলে এখন শাসন চালাচ্ছে বাদামি চামড়ার সাহেবরা।

আর ঠিক এ কারণেই, বাংলাদেশে আজ আমরা যে ইসলামবিদ্বেষ দেখছি, তার সবচাইতে বড় কারণ হলো পোস্ট-কলোনিয়াল বা উপনিবেশ-পরবর্তী সেক্যুলার রাষ্ট্রকাঠামো। এই কারণ অন্য সব কারণের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

সমাজ ও শাসনের ক্ষেত্রে ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়কে কোণঠাসা করে দেওয়ার পেছনে সবচাইতে বড় কারিগর হিসেবে কাজ করছে এই রাষ্ট্রযন্ত্র।

নিরপেক্ষতার ভাওতাবাজি

আমাদের শেখানো হয় সেক্যুলারিসম মানে ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ। আর সেক্যুলার রাষ্ট্রের চোখে সবাই নাকি সমান।

তবে সংজ্ঞার সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। সেক্যুলারিসম আসলে ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ না, বরং ধর্মের ওপর রাষ্ট্রের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। এখানে ধর্মের বৈশিষ্ট্য, কাঠামো, সীমানা—সবকিছুই থাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। রাষ্ট্র ঠিক করে দেয় কোন ধর্মীয় কাজটা ভালো, কোনটা খারাপ; ধর্মের কোন ব্যাখ্যা বৈধ, কোনটা জঙ্গিবাদের লক্ষণ। সেক্যুলার ব্যবস্থায় রাষ্ট্র নিজেই মুফতি আর মুফাসসির বনে যায়। ঠিক করে দেয় ধর্ম কোথায় কথা বলতে পারবে, আর কোথায় চুপচাপ রাষ্ট্রের গোলামি করে যাবে।

ড. ওয়াইয়েল হাল্লাকের বিশ্লেষণে এর নিখুত বর্ণনা উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন:

> ‘সেক্যুলারিসম কী, আমাদের মনে রাখা দরকার। সেক্যুলারিসম কেবল ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে ঠেলে দেওয়ার নাম না; বরং সেক্যুলারিসম মানে রাষ্ট্রই নির্ধারণ করবে কোনটা ধর্মের অংশ, কোনটা ধর্মের অংশ না। কোথায়, কীভাবে, কোন শর্তে ধর্ম পালন করা যাবে, তা ঠিক করবে রাষ্ট্র। ...রাষ্ট্র যেকোনো ধর্মীয় চর্চার সীমানা নির্ধারণ করতে পারে, সংকুচিত করতে পারে, বাদ দিতে পারে, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। রাষ্ট্রই তার প্রয়োজন ও ইচ্ছামতো ঠিক করে ধর্মীয় পরিসরের গুণগত মান এবং বিস্তৃতি কেমন হবে।’[৫২]

সেক্যুলার রাষ্ট্র তাই কেবল ইসলামকে নিয়ন্ত্রণ করেই ক্ষান্ত হয় না, সে চায় ইসলামের চরিত্রটাই বদলে দিতে। সে ইসলামের এমন এক সংস্করণ চায়, যা রাষ্ট্রের আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

যে ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত ইবাদাত, বিয়েশাদি আর জানাযার নামাজের মধ্যে সীমিত, রাষ্ট্র সেটাকে সত্যিকারের ইসলাম বলে মেনে নেবে। কিন্তু যে ইসলাম অর্থনীতি, বিচারব্যবস্থা, রাজনীতি এবং বৈশ্বিক প্রকল্পের কথা বলে, বলে নতুন সভ্যতা তৈরির কথা, রাষ্ট্র তাকে দেখবে হুমকি হিসেবে।

সহজ কথায়, রাষ্ট্র চায় একটা গৃহপালিত ইসলাম।

---

[৫২] Wael Hallaq, interview by *Daily Philosophy*, "Interview: Wael Hallaq on Islamic Law," *Daily Philosophy*

তাই সে প্রতিনিয়ত ইসলামের নতুন নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করায়। ইসলামকে আধুনিক করার নামে তার মূল কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে চায়। ইসলামের ক্লাসিকাল বোঝাপড়াকে প্রত্যাখ্যান করে, নিরাপত্তা ঝুঁকি হিসেবে চিত্রিত করে।

সেক্যুলার সংবিধানের অধীনে যে ধর্মীয় 'স্বাধীনতা' দেওয়া হয়, সেটা হলো গোলামকে দেওয়া মনিবের স্বাধীনতার মতো। গাছের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা গরু যেমন দড়িতে টান পড়ার আগ পর্যন্ত 'স্বাধীনভাবে' চলাফেরা করতে পারে, সেক্যুলারিসমও ধর্মকে তেমন স্বাধীনতা দেয়। দড়ি কতটুকু লম্বা হবে, তা ঠিক করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের।

এ বিষয়গুলো কোনো নির্দিষ্ট সরকার বা রাজনৈতিক দলের সমস্যা না। এগুলো সেক্যুলার রাষ্ট্রের মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। আগুনের ধর্ম যেমন পোড়ানো, পানির ধর্ম যেমন ভেজানো, তেমনি সেক্যুলারিসমের ধর্মই হলো সমাজ আর জীবনের প্রতিটা স্তর থেকে ধর্ম ও নৈতিকতাকে উচ্ছেদ করা।

শেষ প্রতিরোধ

ইসলামের সাথে সেক্যুলার রাষ্ট্রের সংঘাতের আরেকটা বিশেষ দিক আছে। পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মই আধুনিক রাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে কেবল ব্যক্তিগত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে। রাষ্ট্র যা বলেছে, তারা মেনে নিয়েছে।

কিন্তু ইসলাম এখনো দাঁড়িয়ে আছে একা, মাথা উঁচু করে, প্রতিরোধের শেষ দেয়াল হিসেবে। ইসলাম এখনো রাষ্ট্রকে চূড়ান্ত বিধানদাতা হিসেবে মেনে নেয়নি। এখনো রাষ্ট্রের আনুগত্যের দাবি মানেনি। ইসলাম এখনো বিশ্বাস করে সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর। এখনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দর্শন নিয়ে সেক্যুলার ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছে ইসলাম।

এ কারণে ইসলামের অবস্থান অন্য দশটা ধর্মের চেয়ে আলাদা। সেক্যুলার ব্যবস্থার কাছে ইসলাম হলো সেই অবাধ্য শক্তি, যা এখনো পোষ মানেনি।

ইসলাম কখনো সেক্যুলারিসম মেনে নেবে না, আর সেক্যুলারিসমও কখনো ইসলামকে মানতে পারবে না। সংঘাত অবধারিত। তাই ইসলাম কেবল নিয়ন্ত্রণের শিকার না, বরং এক বিশেষ ধরনের শত্রুতা এবং দমনের লক্ষ্যবস্তু।

ইসলামের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় পাওয়ার আগ পর্যন্ত সেক্যুলার ব্যবস্থা নিরাপদ বোধ করবে না। যতদিন ইসলামের স্বকীয়তা অক্ষত থাকবে, সেক্যুলার কাঠামো

ততদিন হুমকি অনুভব করবে। জনপরিসরে ইসলামের প্রভাব কমিয়ে আনা, মুসলিমদের রাজনৈতিক চেতনাকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা, তাদেরকে আদর্শিকভাবে সেক্যুলার কাঠামো গ্রহণ করতে বাধ্য করা; স্রেফ পলিসির বিষয় না। বরং সেক্যুলার রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রশ্ন।

সেকুলার রাষ্ট্র এই কওম ও যমীনের কোনো স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তবতা না। এটা অস্ত্রের জোরে চাপিয়ে দেওয়া, অস্ত্রের জোরে টিকিয়ে রাখা। এ কারণেই আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামবিদ্বেষ একটা কাঠামোগত আবশ্যকতা। সেক্যুলার রাষ্ট্র নিজেকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই ইসলামকে দমন করতে বাধ্য।

বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী তালাল আসাদ দেখিয়েছেন, সেক্যুলার রাষ্ট্র আসলে ধর্মহীন (Godless) না; বরং আধুনিক জাতিরাষ্ট্র নিজেই এক ধরনের দেবতা। রাষ্ট্র নিজেই নিজেকে খোদার আসনে বসায়।[৫৩]

তাই, যারা এই রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে আল্লাহর আইন চায়, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথা বলে, রাষ্ট্রের চোখে তারা স্রেফ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ না, তারা ধর্মদ্রোহী। রাষ্ট্ররূপী দেবতার চোখে কুরআনের শাসন চাওয়া হলো ব্লাসফেমি। আর ইতিহাসের সব যুগে, সব সমাজেই ধর্মদ্রোহের শাস্তি সমাজচ্যুতি, নির্যাতন, নির্বাসন কিংবা মৃত্যু।

আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের বর্তমান সংকটের মূল রহস্যটা লুকিয়ে আছে এখানে।

ইসলাম ও সেক্যুলার কাঠামোর দ্বন্দ্বই এ সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব।

তবে এ লড়াইয়ে দুই পক্ষ এক সমতলে দাঁড়িয়ে নেই।

একদিকে দানবীয় রাষ্ট্রযন্ত্র, জনগণকে অবশ করে রাখা মিডিয়া আর আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শক্তির সমর্থন। অন্যদিকে যারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে চায়, তাঁদের লড়াই করতে হচ্ছে কেবল জনপরিসরে কথা বলার জায়গা আর বাকি দশজনের সমান হকটুকু পাওয়ার জন্য।

উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এক লোহার খাঁচার ভেতর ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়কে আটকে রেখেছে।

---

[৫৩] Talal Asad, "Free Speech, Blasphemy, and Secular Criticism," in *Is Critique Secular? Blasphemy, Injury, and Free Speech*, ed. Talal Asad, Wendy Brown, Judith Butler, and Saba Mahmood (New York: Fordham University Press, 2013), 20–58; Asad, Talal. *Formations of the secular: Christianity, Islam, modernity*. Stanford University Press, 2003.

মুসলিমবঙ্গের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে হলে, তাওহীদের ভিত্তিতে এই যমীনকে নতুন করে গড়তে হলে, এ খাঁচা ভাঙতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। এখানে কোনো শর্টকাট নেই।

কিন্তু আমরা কি তা করার জন্য প্রস্তুত?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে সংকটের আরেক চেহারা।

গতানুগতিকতার সংকট

গত পঞ্চাশ বছরে দেশে মাসজিদ আর মাদরাসা বেড়েছে। শহরের রাস্তায় দাড়ি-টুপি কিংবা বোরকা পরা মানুষের সংখ্যাও এখন বেশি। গত তিন দশকে আমরা বারবার দেখেছি যে, রাজপথে মানুষ জড়ো করার দিক থেকে ইসলামপন্থীদের টেক্কা দেওয়ার মতো কেউ নেই।

কিন্তু এত কিছুর পরেও আমরা খাঁচার ভেতরে বন্দি হয়ে আছি। বর্তমান কাঠামোটাকে টলাতে পারছি না। বরং এই কাঠামো দিন দিন আমাদের চিন্তাভাবনাকে বশ করে ফেলছে। ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিটাই।

কেন এমন হচ্ছে?

জটটা খুলতে হলে আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে, এই বৈরী স্রোতের বিপরীতে আমরা আসলে কীভাবে টিকে থাকার চেষ্টা করেছি।

অনেক বছর ধরে এই রাষ্ট্রের ইসলামবিদ্বেষী কাঠামো আর রাজনৈতিক পরাধীনতার মাঝেই আমাদের পথ চলতে হচ্ছে। এই লম্বা সময়ে টিকে থাকার তাগিদে জন্ম নিয়েছে কিছু কর্মপদ্ধতি আর মনস্তত্ত্ব। মোটাদাগে এগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

- একীভূত হওয়া
- বিচ্ছিন্নতা
- নিষ্ক্রিয় প্রত্যাখ্যান

একীভূত হওয়া

আমাদের সমাজ ও রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় একীভূত হবার মনোভাব। অর্থাৎ বিদ্যমান কাঠামোকে অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিয়ে, তার সাথে মিশে যাওয়ার চেষ্টা।

যারা এই পথে চলেন তারা মনে করেন, এই সিস্টেমকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা আত্মঘাতী ভুল। তারচেয়ে বরং সিস্টেমের ভেতরে ঢুকে ধীরে ধীরে ইসলামের জন্য কিছুটা জায়গা করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

অস্তিত্ব রক্ষার তাড়না থেকে জন্ম নেওয়া এ ধারার অনুসারীরা ইসলামকে একটা ক্রমাগত কাস্টোমাইযেবল বা পরিবর্তনশীল বস্তু বানিয়ে ফেলেন। তারা ইসলামের সেই অংশগুলোকে ছেঁটে ফেলেন, যা সেক্যুলার-লিবারেল ব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক। কথা বলতে শুরু করেন হিউম্যান রাইটস, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আর নানা ধরনের এনজিও-কেন্দ্রিক পরিভাষায়। চিন্তা করেন পশ্চিমের পছন্দের মডারেট ইসলামের ছাঁচে।

কোনো জাতি যখন মানসিকভাবে হেরে যায়, তখন তারা প্রতিপক্ষের ভাষা, রুচি আর মাপকাঠিকে নিজের বলে ভাবতে শুরু করে। ইবনু খালদুনের ভাষায়: *'পরাজিত জাতি সবসময় বিজয়ীর অনুকরণ করে।'*

আধুনিক গবেষকদের অনেকে একে বলেন উপনিবেশিত চেতনা (colonized consciousness)। একীভূত করার পথে হাঁটা মুসলিমরা ভাবে, পশ্চিমের অনুকরণ আর জাহিলিয়াতের 'ইসলামীকরণ'ই বুঝি ইসলামের জন্য কাজ করার সবচেয়ে ভালো উপায়।

ব্যক্তিগত এবং বৈষয়িক দিক থেকে এই পথ নিরাপদ। কিন্তু ঈমান ও কওমের জন্য এটা বিপজ্জনক ফাঁদ। আর এ ফাঁদের সবচেয়ে বড় শিকার ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো।

এ দলগুলো মনে করে, ক্ষমতায় নেককার মানুষ বসাতে পারলেই রাষ্ট্র সীরাতুল মুস্তাকিমের দিকে চলতে শুরু করবে। কিন্তু সেক্যুলার রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতায় যে-ই বসুক না কেন, তার অবস্থা ট্রেনের চালকের মতো। ট্রেনের গন্তব্য সেক্যুলার-লিবারেল স্টেশনে ঠিক করা। ড্রাইভার যেমনই হোক না কেন, রেললাইন তাকে আগে থেকে ঠিক করা গন্তব্যেই পৌঁছে দেবে।

এ পথে চলে ইসলামী শাসনের দিকে আগানো যায় না, কিন্তু এ পথের পথিকরা সময়ের সাথে সাথে বদলে যেতে থাকেন। সেক্যুলারিসমের সাথে আপস করতে করতে তারা একসময় প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, ইসলাম ও পশ্চিমা গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

দিনশেষে তারা আর ইসলামী রাজনৈতিক সত্তার জন্য লড়েন না, তারা লড়েন সুশাসন, দলীয় অর্জন, গোষ্ঠীগত স্বার্থ কিংবা বেশি থেকে বেশি হলে কিছু ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধার জন্য। তারা রাজনীতি করেন, কিন্তু ইসলামের শর্তে না, সেক্যুলারিসমের শর্তে।

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটা হলো, এ সবকিছুকে তারা ইসলামসম্মত বলে দাবি করেন। নিজেদের কাজগুলোকে জায়েজ করার জন্য পালটে ফেলেন ইসলামের অবস্থানকে।

এই পথে ছাড় দেওয়ার আসলে কোনো শেষ নেই। সেক্যুলারিসম আপনাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড় দেবে না, যতক্ষণ না আপনি পুরোপুরি তাদের মতো হয়ে যাচ্ছেন।

প্রথমে তারা নিকাব নিয়ে বলবে, নিকাব বাদ দিলে বলবে বোরকা ছাড়তে। বোরকা ছাড়লে হিজাবের কথা আনবে। সবশেষে প্রশ্ন তুলবে কুরআন নিয়েই। এ পথের শেষ বিন্দু হলো নিজের পরিচয়টাই হারিয়ে ফেলা। প্রথম প্রজন্ম যা কৌশল হিসেবে করে, পরের প্রজন্ম সেটাকেই মৌলিক অবস্থান ভাবে। ইসলামের অবস্থানকে বদলাতে বদলাতে দুই থেকে তিন প্রজন্ম পর তারা স্রেফ নামে মুসলিম থাকে।

এ পথে গিয়ে মুসলিমরা হয়তো সাময়িক কিছু বৈষয়িক উপকার পায়। কিছু ক্ষতি এড়াতে পারে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্থ হয় ঈমান। একদিকে ব্যবস্থার সাথে তাল মেলানোর চেষ্টা, অন্যদিকে সেটাকে ইসলামের জায়গা থেকে জায়েজ করার তাড়না; এ দুইয়ের চাপে ক্রমাগত ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা হতে থাকে। অস্পষ্ট হতে থাকে ইসলামের স্পষ্ট অবস্থানগুলো।

আপসের এই অন্তহীন চক্রটাই তখন স্থায়ী গন্তব্যে পরিণত হয়। উসিলাই তখন হয়ে দাঁড়ায় লক্ষ্য।

বিচ্ছিন্নতা

একীভূত হবার উল্টো প্রতিক্রিয়া হলো বিচ্ছিন্নতা।

চারপাশের জগতটা যখন বৈরী আর ইসলামবিদ্বেষী হয়ে ওঠে, তখন একদল মানুষ নিজেদের গুটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা মনে করেন, সমাজ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে মাদরাসা, মাসজিদ আর খানকার ভেতর নিজস্ব একটা বলয় বানিয়ে নেওয়াই হয়তো টিকে থাকার শ্রেষ্ঠ উপায়।

কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এ পথও আত্মঘাতী।

দেয়াল তুলে কখনো প্লাবন ঠেকানো যায় না। দেয়ালগুলো উল্টো কতগুলো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ তৈরি করে। আর সেক্যুলার রাষ্ট্রের জন্য বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোকে চিহ্নিত করা, ঘেরাও দেওয়া, প্রভাবিত করা এবং নিরন্তর নজরদারির আতস কাঁচের নিচে রাখা সহজ হয়ে যায়।

তাছাড়া নিরাপদ এই গণ্ডি সময়ের সাথে সাথে ছোট হতে বাধ্য। সেক্যুলার রাষ্ট্র কখনোই তার নাকের ডগায় কোনো স্বতন্ত্র দুর্গকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। কোনো-না-কোনো উসিলায় সে হস্তক্ষেপ করেই। দানব সবকিছুকে তার নিয়ন্ত্রণে আনতে চায়।

কখনো সে মাদরাসায় জাতীয় সংগীত গাইতে বাধ্য করে, কখনো স্বীকৃতির ছলে চেষ্টা করে কারিকুলাম নিয়ন্ত্রণের, আবার কখনো খুতবার বিষয়বস্তু ঠিক করে দিতে চায়।

বিপত্তি কেবল বাইরে থেকে না, ভেতরে ভেতরেও চলে নীরব ক্ষয়। ইসলাম ক্রমশ সমাজ ও জনজীবনের কেন্দ্র থেকে সরে যায়। কথা বলার জায়গা ছোট হয়ে আসতে থাকে। সাধারণ মানুষ আলিমদের কাছে ইবাদাত বা মাসআলা জানতে যায় ঠিকই, কিন্তু সমাজ, অর্থনীতি, শাসনব্যবস্থা বা ন্যায়বিচার নিয়ে তাদের কথা আমলে নেয় না। বরং ভাবে, হুজুররা আবার এসব বিষয়ে কী বুঝবে?

মানুষ তার নেতৃত্বই মেনে নেয়, যাকে সে তার জন্য কথা বলতে দেখে। যে তার দৈনন্দিন সমস্যায় পথ দেখাতে পারে। কিন্তু দ্বীনকে যখন অল্প কিছু ইস্যুর মধ্যে আটকে রাখা হয়, তখন মানুষ ধরে নেয়, দুনিয়াবি সমস্যার সমাধান আছে সেক্যুলার রাজনীতিতে। ইসলামের কাছে আছে কেবল আখিরাতের সমাধান। তখন সমাজ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি না হয়ে ইসলাম মানুষের কাছে পরকালের বীমার মতো কিছু একটা হয়ে দাঁড়ায়।

আলিম ও ধর্মীয় নেতৃত্বের অবস্থানও তখন বদলে যায়। তারা আর জনজীবনের ভাষায় কথা বলা সমাজের নেতার ভূমিকায় থাকেন না। হয়ে যান বিয়ে, জানাজা, ধর্মীয় বিধিবিধান কিংবা সাময়িক আধ্যাত্মিকতা সংক্রান্ত সেবা প্রদানকারী। নিজেদের গণ্ডির ভেতর প্রভাব রাখলেও সমাজের মূল স্রোত বা গতিপথ পালটে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের থাকে না। এক পর্যায়ে এই বিচ্ছিন্ন জীবনটাই রুটিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন তারা চাইলেও আর মূলধারায় ফিরতে পারেন না। কারণ সেই পথটা তখন অনেক বেশি জটিল এবং ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়।

সেক্যুলার রাষ্ট্রও এই বিচ্ছিন্নতাকে স্বাগত জানায়। তারা একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত একে সহ্য করে নেয়। এমনকি মাঝেমধ্যে নির্বাচনী ভাগবাটোয়ারাতেও অলিখিত একটা কোটা বরাদ্দ রাখে। কারণ ইসলাম যতক্ষণ কেবল ব্যক্তিগত বলয়ের মধ্যে সীমিত থাকছে, ততক্ষণ সেটা সেক্যুলার রাষ্ট্রের জন্য হুমকি না। ইসলামকে পুরোপুরি উৎখাত করার চেয়ে ক্রমশ ছোট হতে থাকা গণ্ডির ভেতর আটকে ফেলা রাষ্ট্রের জন্য অনেক বেশি সুবিধাজনক।

যারা বিচ্ছিন্নতার পথ বেছে নেন, সমাজ, রাজনীতি এবং ইতিহাসের গতিপথে তারা অনিবার্যভাবেই পার্শ্বচরিত্র হয়ে যান। ইচ্ছা থাকলেও বিদ্যমান কাঠামোর পুনর্গঠনের স্বতন্ত্র কোনো প্রকল্প তাঁরা শুরু করতে পারেন না। দিনশেষে তারা সেক্যুলার শক্তিগুলোর রাজনৈতিক খেলায় দর্শক অথবা কোনো এক পক্ষের অনুসারী হিসেবেই আটকে যান।

নিষ্ক্রিয় প্রত্যাখ্যান

একীভূত হওয়ার মাধ্যমে বিদ্যমানতার মধ্যে বিলুপ্ত হওয়া আর বিচ্ছিন্নতার স্থবিরতা দেখে অনেকের ভেতরে তীব্র বিতৃষ্ণা তৈরি হয়। তারা দেখে কৌশলের দোহাই দিয়ে কীভাবে ঈমান জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। আবার নিরাপদ বলয়ের নামে কীভাবে বেছে নেওয়া হয় প্রান্তিক হয়ে থাকার পথ। এই দুই ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেয় তৃতীয় পথ—নিষ্ক্রিয় প্রত্যাখ্যান।

এই পথের অনুসারীরা বিদ্যমান সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোকে জাহিলিয়াত হিসেবে চিহ্নিত করেন, সঠিকভাবে। বাস্তবতাকে বোঝার ক্ষেত্রে এই ধারার অবস্থান সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় সত্যকে চেনার পর।

তারা ভাবতে শুরু করেন, বিদ্যমানতার মাঝে কিছু করা মানেই আপস, গঠনের চেষ্টা মানেই দূষণ। ফলে নিন্দা থাকে, নির্মাণ থাকে না; প্রত্যাখ্যান থাকে, কিন্তু থাকে না বিকল্প কোনো প্রকল্প।

তারা মনে করেন, এই সমাজের আর কোনো পরিবর্তন সম্ভব না। তাই বিদ্যমানতার সমালোচনার বাইরে আর কোনো কিছু করেই লাভ নেই। সামাজিক-রাজনৈতিক যেকোনো উদ্যোগ নেওয়া মানেই হলো নির্বুদ্ধিতা। ফলে কেউ সমাজ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেন, কেউ প্রথম সুযোগে দেশান্তরী হওয়ার কথা ভাবেন, কেউ আবার এমন কোনো 'ঘটনা'র অপেক্ষায় দিন গোনেন; যেদিন সব কাঠামো ভেঙে পড়বে আর তারা হঠাৎ করে 'কিছু একটা' করার সুযোগ পাবেন।

মনে করুন, জাহাজডুবির পর একদল লোক নির্জন দ্বীপে আটকা পড়েছে। তারা মুক্তি চায়, কিন্তু তার জন্য কোনো উদ্যোগ নেয় না। এমনকি একটা ভেলা তৈরির চেষ্টাও তারা করে না। শুধু দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ভাবে: কোনো এক দিন একটা জাহাজ আসবে আর আমরা সেটাতে ওঠে পড়ব।

কিন্তু এই অপেক্ষা অনেক সময় আসলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া। যতক্ষণ শুধু অপেক্ষা করতে হয়, ততক্ষণ বড় কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় না; ঝুঁকি নেওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না। থাকে না ভুলের দায়ভার নেওয়ার ঝামেলা।

কিন্তু নিষ্ক্রিয় অপেক্ষা যত দীর্ঘ হয়, সামর্থ্য তত মরে যায়। ফলে প্রতীক্ষিত সেই ঘটনা যদি কোনোদিন চলেও আসে, তবু নিষ্ক্রিয় মানুষ তা কাজে লাগাতে পারে না। কারণ বড় কোনো পরিবর্তনের জন্য যে প্রস্তুতি আর পরিকল্পনা দরকার, সেটা তাদের নেই।

নিষ্ক্রিয় প্রত্যাখ্যান মানে কার্যত দায়িত্ব আর উদ্যোগ থেকে পিছিয়ে আসা। এর মাশুল দিতে হয় দু' দিক থেকে।

প্রথমত, সেই মানুষ আর তার আদর্শ সমাজের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। কারণ মানুষের জীবন-মরণ সমস্যাগুলো যেখানে দানা বাঁধে, সেই ময়দানে তার কোনো কার্যকর উপস্থিতি নেই।

দ্বিতীয়ত, বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে চিন্তাভাবনা ধীরে ধীরে অকেজো হতে থাকে। মানুষের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত আর লড়াইয়ের সাথে সংযোগ ছাড়া কোনো চিন্তাই বেশিদিন কার্যকর থাকে না। সবচেয়ে মহান আদর্শও তখন তাত্ত্বিকতায় পরিণত হয়।

আসলে পরিবর্তন কখনো নিজ থেকে ঘটে না। নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) জাহিলিয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কিন্তু নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকেননি। মানুষকে তাঁরা সাধ্যমতো হকের দিকে ডেকেছেন, সতর্ক করেছেন, চেষ্টা করেছেন সমাজকে বদলাবার। জাহিলিয়াত থেকে দূরে থেকেও তাঁরা মানুষের মাঝে সক্রিয় থেকেছেন। আলাইহিমুস সালাম।

সত্যকে চেনা একটা দায়িত্ব; আর সেটাকে সমাজে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা আরেকটা স্বতন্ত্র দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ব পালন করতে হয় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, আর প্রস্তুতির মাধ্যমে। কেবল নিষ্ক্রিয় প্রত্যাখ্যান থেকে দিনবদল হয় না।

ইসলামের একটা মৌলিক শিক্ষা হলো: ইলম হলো আমলের জন্য। সবচেয়ে বিপ্লবী আদর্শও যদি নিষ্ক্রিয় হয়, তবে তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। মানুষ যদি ক্ষমতার কাঠামোকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা না করে, তবে সেই কাঠামো একদিন তাকে গিলে খায়। দিনশেষে এই ব্যবস্থার কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হয়, নামমাত্র প্রত্যাখ্যান নিয়ে।

বিচ্ছিন্নতা ও নিষ্ক্রিয়তার মনোভাব থেকে বের হতে না পারলে আমাদের শোষণ, লাঞ্ছনা আর নিয়ন্ত্রিত হবার সময় আরও দীর্ঘায়িত হবে। পরিবর্তন আসবে না।

***

> **একীভূতকরণ** সিস্টেমের ভেতরে ঢুকে বদলানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বাস্তবে সিস্টেম তাকেই বদলে দেয়। এর শেষ পরিণতি আত্মবিলুপ্তি।
>
> **বিচ্ছিন্নতা** চেষ্টা করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তার গণ্ডি ছোট হয়। ইসলামের অবস্থান সমাজে অপ্রাসঙ্গিক হতে থাকে।
>
> **নিষ্ক্রিয় প্রত্যাখ্যান** বাস্তবতাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে। কিন্তু অনিশ্চিত কোনো দিনের অপেক্ষায় নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে।

তিনটি পথই বিদ্যমানতাকে বদলানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থ।

তাহলে কি সমাজে যে ইসলামী কাজগুলো হচ্ছে, সেগুলো সব পণ্ডশ্রম? মাসজিদ-মাদরাসার মেহনত, দাওয়াহর কাজ, সমাজসেবামূলক উদ্যোগ, জাহিলিয়াতকে প্রত্যাখ্যানের আহ্বান—সবই কি বৃথা?

না, মোটেও না। বরং প্রতিকূল পরিবেশে ইসলামের যতটুকু প্রভাব এখনো টিকে আছে, তার পেছনে এগুলোর অনেক বড় ভূমিকা আছে। শরীয়াহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিটি মেহনতকে আমাদের অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে।

কিন্তু, এখানে একটা বড় 'কিন্তু' আছে।

এ কাজগুলো দরকারী, কিন্তু যথেষ্ট না।

মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা তাকে লাইফ সাপোর্ট দিই। লাইফ সাপোর্ট রোগীকে সাময়িকভাবে বাঁচিয়ে রাখে, কিন্তু রোগ সারায় না। বর্তমান কাজগুলো অনেকটা লাইফ সাপোর্টের মতো। এগুলো আমাদের সাময়িক স্বস্তি দিচ্ছে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সমাধান দিতে পারছে না।

ধরুন, রাতারাতি এই কাজগুলো দশগুণ বেড়ে গেল। প্রতিটা মহল্লায় একটা করে মাদরাসা হলো, সেবামূলক কাজ অনেক বেড়ে গেল, আর গতানুগতিক দাওয়াহ ছড়িয়ে গেল অনেক দূর।

একটু ঠান্ডা মাথায় ভাবুন তো, এতে কি রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকা ইসলামবিদ্বেষ কিংবা সেকুল্যার আধিপত্যে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসবে? এই দশগুণ

কাজ কি সেক্যুলার রাষ্ট্রের তৈরি লোহার খাঁচাকে ভাঙতে পারবে? সমাজ ও শাসনকে তাওহীদের ভিত্তিতে পুনর্গঠনের প্রকল্প কি এগোবে? মোকাবিলা করা যাবে অস্তিত্বের সংকটগুলোর?

উত্তর যদি 'না' হয়, তবে আমাদের মেনে নিতে হবে যে, যুগসন্ধির দায় মেটানোর জন্যে এই কাজগুলো যথেষ্ট না। চলমান কাজের পাশাপাশি আমাদের আরও কিছু প্রয়োজন।

ঈমান, ইতিহাস আর বর্তমানের বাস্তবতা দাবি করে এক আমূল পরিবর্তন। তাওহীদের ভিত্তিতে সমাজ ও শাসনের বিনির্মাণ।

আমরা এ যাবত যেসব পদ্ধতিতে এগোনোর চেষ্টা করেছি, সেগুলো আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতে পৌঁছে দিতে পারবে না। আমাদের প্রস্তুত করতে পারবে না ধেয়ে আসা অস্তিত্বের সংকট মোকাবিলার জন্য।

আমাদের সামনে দুটো রাস্তা খোলা।

> এক. যেভাবে সবকিছু চলছে সেভাবেই চলতে দেওয়া এবং অনিবার্য পরিণতির অপেক্ষা করা।
>
> দুই. পরিবর্তনের পথ খোঁজা।

এখানে তৃতীয় আর কোনো পথ নেই।

এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা।

***

সময়ের সাথে সাথে চারপাশের আগুনের বৃত্ত ছোট হয়ে আসছে। ক্রমেই ভেঙে পড়ছে আমাদের দালানকোঠা। আজ যদি আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হই, তবে ভবিষ্যতে হয়তো আমাদের সম্পদ আর সংখ্যা থাকবে, কিন্তু মুসলিম হিসেবে আমাদের পরিচয় আর ঈমানের শেষ চিহ্নটুকু হয়তো মুছে যাবে।

আমাদের বিকল্প পথ খুঁজতে হবে। এমন পথ, যা শুধু টিকে থাকার না, বরং বিজয়ের সম্ভাবনা তৈরি করার।

পরের অধ্যায়ে আমরা ঠিক সেই কাজটাই করব।

অধ্যায় ৩

বুনিয়াদ

আমরা যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। এ সময় আমাদের সামনে এসেছে সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে। সংকটগুলো বহুমাত্রিক, গভীর এবং অস্তিত্বের। পতন, পচন আর আগ্রাসনের মোকাবিলার একমাত্র বাস্তবসম্মত পথ হলো এই যমীনে তাওহীদের ভিত্তিতে এক আজাদ ও শক্তিশালী শাসনকাঠামো গড়ে তোলা। আমাদের মুসলিমবঙ্গ হয়ে ওঠা।

কিন্তু সেই পথে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়সম বাধা। সেক্যুলার রাষ্ট্র ইসলামকে খাঁচায় আটকে রেখেছে, মুসলিম পরিচয়কে কোণঠাসা করেছে, আমাদের বানিয়েছে না-মানুষ। এই কোণঠাসা অবস্থা পরাজিত মানসিকতা তৈরি করে, আর সেই মানসিকতা দিনশেষে অন্যায়ের কাঠামোকেই শক্তিশালী করে তোলে।

অন্তহীন এই চক্র আমাদের ক্রমাগত গ্রাস করে ফেলছে।

সেক্যুলার রাষ্ট্র আমাদের সামনে দুটো পথ খোলা রেখেছে: হয় গতানুগতিকতায় মিশে গিয়ে আত্মসমর্পণ, নয়তো নিজেকে ব্যক্তিগত অঙ্গনে গুটিয়ে নিয়ে চারপাশে দেয়াল তুলে বিচ্ছিন্ন অথবা নিষ্ক্রিয় হওয়া।

এই ফলস বাইনারি থেকে আমাদের বের হতে হবে।

ব্যক্তিগত পর্যায়ের মেহনত দরকারী, কিন্তু কাঠামোগত সমস্যার সমাধান ব্যক্তি পর্যায়ে হয় না। অন্যদিকে গতানুগতিক রাজনীতির ময়দান এমনভাবে সাজানো যে, সেখানে ঢুকলেই সিস্টেমের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

আমাদের প্রয়োজন ভিন্ন এক পথ। নিজস্ব ক্ষমতা গড়া আর বিকল্প ময়দান তৈরির নতুন রাজনৈতিক ব্যাকরণ। বিদ্যমান ছকের ভেতরে জেতার ব্যর্থ চেষ্টা বাদ দিয়ে ছকটাকেই অকার্যকর করে দেওয়া দরকার।

আমাদের প্রয়োজন বৈপ্লবিক রূপান্তর।

আর সেই রূপান্তরের জন্য দ্বীনের পুনর্জাগরণ অপরিহার্য।

তাজদীদ

ইসলাম ইট-পাথরের কাঠামো বা বইয়ের পাতায় টিকে থাকে না, ইসলাম বেঁচে থাকে মানুষের হৃদয়ে। আল্লাহ এই দ্বীনকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেন মুমিনদের ইখলাস, নিয়্যাত, কুরবানি ও মেহনতের মধ্য দিয়ে। এটা দুনিয়াতে মহান আল্লাহর সুন্নাহ। তাই সমাজ ও শাসনের বৈপ্লবিক রূপান্তরের আগে মানুষের মনগুলোকে বদলানো অপরিহার্য।

ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

> 'এই উম্মতের শেষ অংশ তখনই সফল হবে, যখন তারা সেই পথ অবলম্বন করবে, যার ওপর ছিল এই উম্মাহর প্রথম অংশ।'[১]

এই উক্তির ব্যাখ্যায় আলিমগণ বলেছেন, 'উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম সফল হয়েছিল কুরআন-সুন্নাহ ও তাওহীদের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। আমাদের সফলতার সূত্রটাও সেখানে। ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম শিক্ষার দিকে ফিরে যাবার কোনো বিকল্প নেই।'[২]

তাতারদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের প্রাথমিক পরাজয়ের প্রেক্ষাপটে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছিলেন,

> 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বিজয় ও সফলতা কেবল তাদেরকেই দান করেন, যারা তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যে যত বেশি আনুগত্যশীল, তার সাথেই বিজয় তত প্রবল হয়। আর মুসলিমদের মধ্যে যদি দ্বীনের কোনো হক পূরণে ঘাটতি দেখা দেয়, তবে সেই ঘাটতির অনুপাতে তাদের পরাজয় ঘটে। কিন্তু তারা যদি তাওবা করে এবং ফিরে আসে, আল্লাহ আবার তাদের প্রতি বিজয় ফিরিয়ে দেন।'[৩]

---

[১] আবুল কাসিম হিবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবনু মানসুর আল-লালাকাই, শরহ উসূল ই'তিকাদ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ, ১ম খণ্ড (রিয়াদ: দারুত তায়িবা, ১৯৯৫)- তে উদ্ধৃত।

[২] আব্দুল্লাহ আল-রাজহি, শরহ সহীহ ইবনু খুযাইমাহ (রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০৮), খণ্ড ১, (ইমাম মালিকের বক্তব্যের আলোচনা)।

[৩] মাজমুউল ফাতাওয়া; খণ্ড ২৮, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪।

একই ধরনের বক্তব্য অতীত ও বর্তমানের অগণিত মনীষীর কলমে ওঠে এসেছে। দ্বীনের পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়েই পরিবর্তনের জমি তৈরি হয়। সমাজ যখন ভেতর থেকে বদলায়, তখনই সে বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে ধারণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। আর এভাবেই গড়ে ওঠে ঐ অগ্রগামী কাফেলা, যারা দুনিয়াকে বদলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখে।

ইতিহাসের সাক্ষ্য

আমাদের ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষী। যখনই উম্মাহ বড় কোনো সংকটে পড়েছে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ তৈরি হয়েছে দ্বীনের পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে।

- ক্রুসেডারদের কবল থেকে পবিত্র ভূমিকে মুক্ত করেছিলেন সালাহউদ্দীন আল-আইয়্যুবি। কিন্তু এর ভিতটা গড়ে দিয়েছিলেন সুলতান নূরউদ্দীন আয-যিংকি। একদিকে তিনি সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ছক এঁকেছিলেন, অন্যদিকে সমান তালে কাজ করেছিলেন নূরিয়্যাহর মতো মাদরাসা তৈরি, কাজীদের সংস্কার আর জনকল্যাণমূলক ওয়াকফ প্রকল্প নিয়ে। তিনি পুরো মুসলিম সমাজকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। তাঁর শাসনামলে সিরিয়ার সমাজে আকীদাহ ও ইখলাসের যে পুনর্জাগরণ হয়েছিল, সেই বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়েই বিজয়ী হয়েছিলেন সালাহউদ্দীন। জেরুসালেম মুক্ত হয়েছিল ইসলামী আদর্শে একটা প্রজন্ম গড়ে ওঠার পর।

- তাতারদের আক্রমণের পর উম্মাহর স্বকীয় পরিচয় যখন হুমকির মুখে, তখন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল আকীদাহ ও চিন্তার নতুন জাগরণ। তিনি উম্মাহর সামনে কুরআন–সুন্নাহর বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা আবারও তুলে ধরেছিলেন। ইয়াসা/ইয়াসাক নামের তাতারী সংবিধানকে প্রত্যাখ্যান করে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, আল্লাহর শরীয়াহ ছাড়া অন্য কোনো আইনে শাসন করার অর্থ তাওহীদকে বিসর্জন দেওয়া। তাঁর ইলম, দাওয়াহ এবং জিহাদের ডাক শামের মুসলিমদের মধ্যে নতুন করে যে আত্মবিশ্বাস আর ঐক্যের জোয়ার এনেছিল, তা তাতারবিরোধী প্রতিরোধকে টেকসই করে তোলে।

- আঠারো শতকে মুঘল সাম্রাজ্য যখন ভেঙে পড়ছে, হিন্দুস্তানের মুসলিমদের অবস্থা তখন শোচনীয়। মুসলিমরা রাজনৈতিকভাবে দুর্বল,

সমাজ ডুবে আছে শিরক-বিদআহ আর নানা পৌত্তলিক কুসংস্কারে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি এই অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা থেকে বিচ্যুতিকে। এ অবস্থা বদলানোর জন্য তিনি এক ইলমি, আদর্শিক ও রূহানি জাগরণের কাজ শুরু করেন। তাঁর এই তাজদীদী প্রকল্পই ছিল সেই ভিত্তি, যার ওপরে গড়ে ওঠেছিল সৈয়দ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়ার আন্দোলন, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা আর সাদিকপুরি উলামার নেতৃত্বে ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে কয়েক দশকের জিহাদ।

- বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনও শুরু হয়েছিল দ্বীনের পুনর্জাগরণের মাধ্যমে। একইভাবে যমীনে তাওহীদের পতাকা উচিয়ে ধরা মুরাবিতুন, ফুলানী, এবং আরবের মুওয়াহহিদুন-এর মতো সফল আন্দোলনের শুরুটা হয়েছিল বিশুদ্ধ আকীদাহ ও দাওয়াহর পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়েই।

বিজয় কখনো হুট করে আকাশ থেকে পড়ে না। লড়াইয়ের আগে সমাজকে আদর্শিকভাবে প্রস্তুত করতে হয়।

শত্রু যতই শক্তিশালী হোক, সংকট যতই গভীর হোক, সবার আগে প্রয়োজন চিন্তা আর চেতনার পরিশুদ্ধি। ওপরের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, সংকট মোকাবিলা এবং পরিবর্তনের জন্য অগ্রগামী বাহিনী গড়ে ওঠার শর্ত ছিল বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদাহ, মানহাজ ও ফিকরের পুনর্জাগরণ।

আমরা যদি সত্যিই সমাজ আর শাসনে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে দেখতে চাই, তবে আমাদের সেই শেকড়েই ফিরে যেতে হবে। আমাদের ফিরতে হবে সেই আদি আর অকৃত্রিম আদর্শে, যা সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং তাঁদের নেককার অনুসারীদের পরিচালিত করেছিল।

তবে এটুকুই যথেষ্ট না।

দ্বীনের পুনর্জাগরণ আমাদের তখনই কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে দিকে পৌঁছে দিতে পারবে, যখন তা সমাজ ও শাসনের কাঠামোতে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাবে। আর এই রূপান্তর কেবল রাজনৈতিক হলে চলবে না। একে হতে হবে আরও গভীর, আরও ব্যাপক। যার জন্য প্রয়োজন সমাজবিপ্লব।

বিপ্লব

কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলোর অর্থ সবাই জানে বলে ধরে নেয়। বিপ্লব শব্দটাও এমন। শব্দটা অতি পরিচিত। বহুল ব্যবহৃত। এর মধ্যে আছে রোমাঞ্চ, সম্ভাবনা আর এক ধরনের রোমান্টিসিসম। সমস্যা হলো, বেশিরভাগ সময় এই শব্দটা আমরা ভুল অর্থে ব্যবহার করি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানে বিপ্লবের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে। শাস্ত্রীয়ভাবে বিপ্লব বলতে বোঝানো হয়:

- এক নির্দিষ্ট ধরনের ফেনোমেনন, ইভেন্ট বা ঘটনা[৪]
- এক নির্দিষ্ট মাত্রার পরিবর্তন।[৫]

অনেকে মনে করেন, মানুষ রাস্তায় নেমে মিছিল করে সরকার ফেলে দিল, একেই বুঝি বিপ্লব বলে। এটা ভুল ধারণা। এ-ধরনের ঘটনাকে আন্দোলন বা ক্ষেত্রবিশেষে গণঅভ্যুত্থান বলা যেতে পারে, কিন্তু বিপ্লব না।

বিপ্লব আন্দোলনের কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি না, বরং এটা এক নির্দিষ্ট ধরনের পরিবর্তন, যা বিভিন্ন পদ্ধতিতে ঘটতে পারে।

---

[৪] রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফ্রেড হ্যালিডে লিখেছেন: "রাজনৈতিক আলোচনা ও সমাজবিজ্ঞানে 'বিপ্লব' শব্দটির দ্বৈত চরিত্র রয়েছে। 'জাতি', 'সমাজ', 'শ্রেণি', 'যুদ্ধ' এবং 'সম্প্রদায়'-এর মতো এটি একই সাথে একটি বাস্তবতা; যা শনাক্ত করে বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন করা যায়, আবার এটি একটি আকাঙ্ক্ষাকে নির্দেশ করে... বিপ্লবের ধারণার মূল কেন্দ্রে রয়েছে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি বড় ধরনের সহিংস পরিবর্তন, যা সহিংস হয়ে ওঠতে পারে।" Fred Halliday, "Revolutions in World Politics," in Revolution and World Politics: The Rise and Fall of the Sixth Great Power (London: Macmillan Education UK, 1999), 4.

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্কলার জর্জ লসন যোগ করেন: "(বিগত দুই শতক ধরে) বিপ্লবকে দেখা হয়েছে... আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মতো এক আকস্মিক বিস্ফোরণ হিসেবে...অতীতের সাথে এমন এক চূড়ান্ত বিচ্ছেদ, যেখান থেকে সমাজের আর পিছু হটার সুযোগ নেই।" এবং, "...জাতীয়তাবাদী, কৃষক, কমিউনিস্ট, কট্টরপন্থী সামরিক গোষ্ঠী, উদারপন্থী কিংবা ধর্মীয় মৌলবাদী; অনেকেই বিপ্লব সংঘটিত করেছে... তাই বিপ্লবকে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া হিসেবে দেখাই শ্রেয়, যার বৈশিষ্ট্যগুলো বিশ্ব-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং তার নিজস্ব সামাজিক বাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল।" George Lawson, "Negotiated Revolutions: The Prospects for Radical Change in Contemporary World Politics," Review of International Studies 31, no. 3 (2005): 473–493.

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্যাট্রিক ভ্যান ইনভেগেন আরও সংক্ষেপে বলেছেন, "বিপ্লব হলো শাসনব্যবস্থায় বলপূর্বক, অনিয়মতান্ত্রিক এবং গণসমর্থিত পরিবর্তন।" Patrick Van Inwegen, Understanding Revolution (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2011, p, 4).

[৫] "বিপ্লব হলো কোনো সমাজের আমূল ও চূড়ান্ত পরিবর্তন। প্রথমত ও প্রধানত, বিপ্লব মূলত বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সংঘটিত এক ঘটনা। দ্বিতীয়ত, নেতৃত্বের এই পরিবর্তন হতে হবে অনিয়মতান্ত্রিক, সংবিধানবহির্ভূত কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরের কোনো উপায়ে। তৃতীয়ত, এই পরিবর্তনে জনগণের একটি বড় অংশের সমর্থন থাকতে হবে। তাই বিপ্লব মানে কেবল ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তি বা দলের পরিবর্তন নয়, বরং পুরো শাসনব্যবস্থারই এক ব্যাপক পরিবর্তন। বিপ্লব প্রথাগত পদ্ধতির বাইরে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের নামান্তর।" Van Inwegen, *Understanding Revolution*, 4.

বিপ্লবের আছে নানা ধরনও।

রাজনৈতিক বিপ্লব: যে ধরনের বিপ্লব নিয়ে সবচেয়ে বেশি কথা হয়, তা হলো রাজনৈতিক বিপ্লব। এই বিপ্লবে রাষ্ট্রকাঠামো ও শাসনব্যবস্থা বদলে যায়। তবে সমাজের শ্রেণিবিন্যাস, পুরোনো মূল্যবোধ, অর্থনীতি অথবা সংস্কৃতি—এগুলো মোটাদাগে অক্ষত থাকে।[৬]

উদাহরণ হিসেবে ১৬৮৮ সালের ইংল্যান্ডের গ্লোরিয়াস রেভল্যুশন বা ১৭৭৬ সালের অ্যামেরিকান বিপ্লবের দিকে তাকানো যেতে পারে। গ্লোরিয়াস রেভল্যুশনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের শাসনপদ্ধতি বদলেছিল ঠিকই, কিন্তু সেখানকার সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, অভিজাতদের ক্ষমতার কাঠামো আর কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়ে যায় আগের মতোই।

একই কথা খাটে অ্যামেরিকান বিপ্লবের বেলাতেও। বিপ্লবের ফলে কলোনিগুলো স্বাধীন হয়ে রিপাবলিক (সাধারণতন্ত্র) গঠন করেছিল। কিন্তু সামাজিক কাঠামো আর অভিজাত শ্রেণির আধিপত্যে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আসেনি।

সমাজবিপ্লব: বিপ্লবের অন্য ধরনটা হলো সমাজবিপ্লব। আমাদের অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে, সমাজবিপ্লব বোধহয় রাজনৈতিক বিপ্লবের চেয়ে হালকা কোনো বিষয়। কিন্তু অ্যাকাডেমিক সংজ্ঞানুযায়ী সমাজবিপ্লবের পরিধি, ব্যাপ্তি, প্রভাব এবং পরিবর্তনের মাত্রা রাজনৈতিক বিপ্লবের চেয়ে অনেক বেশি গভীর এবং স্থায়ী।

সমাজবিপ্লব কেবল শাসনব্যবস্থা বদলায় না, বরং পুরো সমাজকেই বদলে দেয়। মানুষের চিন্তা, মূল্যবোধ, জীবনযাপনের ধরন থেকে শুরু করে আইনি ব্যবস্থা; উল্টেপাল্টে দেয় সবকিছু। অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক আর সংস্কৃতিও এখানে নতুন চেহারা পায়। সমাজবিপ্লবের প্রভাব রাজনৈতিক বিপ্লবের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক ও স্থায়ী। এজন্য ইতিহাসে এই ধরনের বিপ্লব কম দেখা যায়।[৭]

---

[৬] সমাজবিজ্ঞানী থিডা স্কোকপোলের বিশ্লেষণ: রাজনৈতিক বিপ্লব রাষ্ট্রকাঠামোতে রূপান্তর ঘটায়, কিন্তু সমাজকাঠামোতে নয়। Theda Skocpol, *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China* (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), 4.

[৭] সমাজবিপ্লব রাষ্ট্রকাঠামোর পাশাপাশি অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধেও আমূল পরিবর্তন আনে। ফ্রেড হ্যালিডে লিখেছেন: "সামাজিক বিপ্লব... কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তনই নয়, বরং অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক এবং মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তনও ঘটায়।" Halliday, Revolutions in World Politics, 46.

থিডা স্কোকপোল-এর ভাষায়, সমাজবিপ্লব হলো: "কোনো সমাজের রাষ্ট্র ও শ্রেণিকাঠামোর দ্রুত এবং মৌলিক রূপান্তর।" এবং, "সামাজিক বিপ্লবকে... ইতিহাসে সংঘটিত অসংখ্য অ-বিপ্লবী রাজনৈতিক সংকট থেকে দুটি আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পৃথক করা যায়: ১) সামাজিক বিপ্লব রাষ্ট্র ও শ্রেণিকাঠামো—উভয়েরই মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে; এবং ২) এই পরিবর্তনগুলো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ও তীব্র সামাজিক-

ফরাসি বিপ্লব, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব অথবা চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লব সমাজবিপ্লবের উদাহরণ। ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে সামন্ততন্ত্রের অবসান হয়েছিল, অভিজাতদের বিশেষ সুবিধাগুলো বিলুপ্ত হয়েছিল, আইনের পুরোনো কাঠামো ভেঙে তৈরি হয়েছিল 'নাগরিকত্ব' নামের নতুন ধারণা।

রুশ এবং চীনের বিপ্লবগুলোও শুধু শাসনব্যবস্থা পাল্টায়নি; বরং জমির মালিকানা থেকে শুরু করে কল-কারখানার নিয়ন্ত্রণ, আর সমাজের মধ্যকার শ্রেণি সম্পর্কগুলো নতুন ছাঁচে গড়েছে। তৈরি করেছে নতুন সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামো।[৮]

তবু অনেকেই সমাজবিপ্লবকে হালকাভাবে দেখেন। কারণ, আমরা মনে করি রাজনীতির বলয় সমাজের বলয়ের চেয়ে বড়। আসলে ব্যাপারটা উল্টো। রাজনীতি সমাজের মুখাপেক্ষী। সমাজই তার ভেতরে রাজনীতিকে ধারণ করে। একটা সমাজের সংস্কৃতি আর মানুষের মূল্যবোধই শেষ পর্যন্ত ঠিক করে দেয়, সেই দেশের রাজনীতি কোন পথে হাঁটবে।

তাই সমাজ ও সংস্কৃতির গোড়ায় যদি পরিবর্তন না আসে, তবে কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তনই স্থায়ী রূপ পায় না।[৯]

রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়।" Skockpol, States and Social Revolutions, p 4-5.

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন লিখেছেন, সমাজবিপ্লব হলো: "কোনো সমাজের প্রভাবশালী মূল্যবোধ ও মিথ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সমাজকাঠামো, নেতৃত্ব, সরকারি কর্মকাণ্ড এবং নীতিমালায় সংঘটিত—দ্রুত, মৌলিক এবং সহিংস এক অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন।" Huntington, S.P., 2006, Political order in changing societies, Yale University Press, London., 264.

প্যাট্রিক ভ্যান ইনভেগেন আরও যোগ করেছেন: "বিপ্লব সাধারণত যেকোনো ধরনের সামাজিক আন্দোলনের চরমতম প্রবণতাগুলো ধারণ করে; আর সামাজিক বিপ্লব ধারণ করে খোদ বিপ্লবেরই চরমতম রূপ। তবে সামাজিক বিপ্লবের একটি সীমাবদ্ধতা হলো এটি অত্যন্ত বিরল।" Van Inwegen, Understanding Revolution, 13.

[৮] এই বিপ্লবগুলোর ফলাফল ভালো ছিল না-কি মন্দ, সেই আলোচনায় যাচ্ছি না। বিপ্লবগুলোর পেছনে মতাদর্শ সমর্থনেরও প্রশ্ন আসে না। আমরা কেবল পরিবর্তনের মাত্রা বা বিশালতাকে বোঝানোর জন্য এগুলোর দিকে তাকাচ্ছি।

[৯] রাজনৈতিক বিপ্লব ও সমাজবিপ্লবের সংজ্ঞা ও পার্থক্যের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখতে পারেন, Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven: Yale University Press, 1968); Theda Skocpol, States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China (Cambridge: Cambridge University Press, 1979); Jack A. Goldstone, Revolution and Rebellion in the Early Modern World (Berkeley: University of California Press, 1991); John Foran, Taking Power: On the Origins of Third World Revolutions (Cambridge: Cambridge University Press, 2005); Charles Tilly, European Revolutions, 1492–1992 (Oxford: Blackwell, 1993); Patrick Van Inwegen, Understanding Revolution (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2011), 12–15.

নুবুওয়াতের বিপ্লব

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নুবুওয়াতের মিশনের ফলাফলকে কোনো অর্থেই নিছক রাজনৈতিক বিপ্লব বলা যায় না। এটা ছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গভীর ও ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিবর্তন, যা মানুষের জীবনের ছোট-বড় প্রতিটি ক্ষেত্রকে স্পর্শ করেছে।

ইসলাম আসার আগে আরবের জাহিলি সমাজের নিজস্ব কিছু বিশ্বাস ছিল, সমাজ ও শাসনের নির্দিষ্ট কাঠামো ছিল। ভালো-মন্দের সংজ্ঞা ছিল। দুনিয়াকে দেখার জন্য তাদের চোখে ছিল আলাদা এক ধরনের চশমা।

এ অবস্থায় মহান আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ নবী ও রাসূল ﷺ-কে পাঠালেন নতুন এক জীবনবিধান দিয়ে। আপসহীন তাওহীদের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়ে আসলেন চিন্তা ও জীবনযাপনের পূর্ণাঙ্গ এক কাঠামো। যে কাঠামো অস্তিত্বের সার্বিক ব্যাখ্যা দেয়। মানুষ শিখল মহাবিশ্বে তার ভূমিকা কী, তার কাজের সীমানা কতটুকু এবং মালিকের সাথে তার সম্পর্কটা আসলে কেমন। অস্তিত্বের এমন কোনো দিক নেই, যা এর বাইরে ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনা এই পরিবর্তন শুধু শাসনব্যবস্থায় সীমিত ছিল না। বরং ২৩ বছরের মধ্যে আরবের সমাজ, তাদের আইন, সংস্কৃতি আর দুনিয়াকে দেখার ভঙ্গিটাই বদলে গেল। গোত্রীয় বিধানের জায়গায় এলো কুরআন আর সুন্নাহর আইন। সুদের শোষণ বন্ধ হয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা হলো যাকাত, সাদাকাহ আর ওয়াকফের ভিত্তিতে জনমুখী অর্থনীতি। গোত্রীয় পরিচয়ের বদলে সম্পর্কের নতুন কাঠামো গড়ে ওঠল ঈমানের ভিত্তিতে।

তৈরি হলো নতুন আইনি ব্যবস্থা, নতুন শাসনব্যবস্থা আর নতুন পরিচয় (উম্মাহ)। আল্লাহর উবুদিয়্যাহর ভিত্তিতে গড়ে ওঠল নতুন ব্যক্তিসত্তা, মূল্যবোধের নতুন কাঠামো। নুবুওয়াতের বিপ্লব কেবল নতুন রাজনৈতিক সত্তা (polity) তৈরি করে থামল না, গড়ে তুলল নতুন এক সভ্যতা।

মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদউয়ী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর ভাষায়,

> ‘আরবদের স্বভাব-চরিত্রে এই যে বিরাট বিপ্লব, যা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বরকতময় হাতে সাধিত হলো এবং মুসলমানদের দ্বারা মানব সমাজে সংঘটিত হলো, ইতিহাসের বুকে এ ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই বিপ্লবের প্রতিটি বস্তুই ছিল একক ও অনন্য। এর দ্রুততা, এর গভীরতা, এর বিশালতা ও সর্বজনীনতা, এর বিস্তৃতি ও মানবীয় উপলব্ধির কাছাকাছি হওয়া—এসবই ছিল সেই বিস্ময়কর ঘটনার অনন্য দিকসমূহ। এই বিপ্লব

অপরাপর অলৌকিক ঘটনার ন্যায় কোনো জটিল বিষয় ও দুর্বোধ্য হেঁয়ালি ছিল না।'[১০]

আধুনিক মুসলিম চিন্তাবিদরা নবীজি ﷺ-এর মিশনকে ব্যাখ্যা করেছেন সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতানির্মাণকারী প্রকল্প হিসেবে। কারও ভাষায় এটা পূর্ণাঙ্গ ইনকিলাব, কারও ভাষায় সভ্যতাগত পুনর্গঠন।[১১] অনেক পশ্চিমা ইতিহাসবিদ ও গবেষকও এই পরিবর্তনকে সামাজিক পুনর্গঠনের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন।

তাই রাসূলুল্লাল্লাহ ﷺ-এর আনা পরিবর্তনকে কেবল রাজনৈতিক বিপ্লব বলা বিশাল সমুদ্রকে ছোট খালে আটকানোর ব্যর্থ চেষ্টা। এর প্রভাব, গভীরতা ও স্থায়িত্ব রাজনীতির সংকীর্ণ সীমানাকে অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে। একে কমপক্ষে সমাজবিপ্লব বলতে হয়, তবে সেই সীমানাও রূপান্তরের এই ব্যাপ্তিকে ধারণ করার ক্ষমতা রাখে না। এই পরিবর্তন আসলে সভ্যতাগত বিপ্লব—পুরো বিশ্বব্যবস্থার এমন রূপান্তর যা গোটা দুনিয়ার গতিপথ চিরদিনের জন্য পালটে দিয়েছে।

নুবুওয়াতের দৃষ্টান্ত বলে, এই কওম ও যমীনের বর্তমান সংকট মোকাবিলা এবং কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের জন্য নিছক রাজনৈতিক বিপ্লব যথেষ্ট না। যুগসন্ধিক্ষণের দায় মেটাতে হলে আমাদের প্রয়োজন অন্তত একটা সমাজবিপ্লব, যার বুনিয়াদ হবে দ্বীনের সামগ্রিক পুনর্জাগরণ। যেখানে কেবল রাষ্ট্র আর শাসনব্যবস্থা বদলাবে না; বরং আইন, সমাজ কাঠামো, মূল্যবোধ আর জীবনব্যবস্থায়ও আসবে আমূল রূপান্তর।

বুনিয়াদ ও ইনকিলাব

আজ থেকে তিনশো বছর আগে উপমহাদেশের মহীরুহ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ) মুসলিম সমাজকে আবিষ্কার করেছিলেন বহুমুখী বিপর্যয়ে জর্জরিত অবস্থায়। যমীনে জুলুম ও ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল ইসলাম, ভূলণ্ঠিত হচ্ছিল তাঁর প্রতীকগুলো। চারদিকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছিল কুফর ও শিরক।

---

[১০] মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো? অধ্যায়: নবী কারীম ﷺ-এর আবির্ভাবের পর

[১১] এই রূপান্তরকে 'পূর্ণাঙ্গ ইনকিলাব' বা 'সভ্যতাগত রূপান্তর' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন মাওলানা আবুল আলা মওদুদী, মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদউয়ী, ডা. ইসরার আহমেদ, মাওলানা আব্দুররহীম প্রমুখ।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ এই ঘূর্ণিপাকের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, এমন সময়ে আল্লাহর হুকুম হলো:

> ফুক্কু কুল্লা নিযাম—
>
> ভেঙে দাও বিদ্যমান সব ব্যবস্থা।[১২]

পুরোনো কাঠামোর সংস্কার বা সংশোধন করে লাভ নেই। এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে হলে ভেঙে দিতে হবে পুরোনো ব্যবস্থা। তৈরি করতে হবে নতুন সমাজ, শাসন আর নতুন ধরনের মানুষ। নতুন পৃথিবী গড়তে হলে আগে বদলাতে হবে মানুষের মন আর সমাজকে, তারপর আসবে ব্যবস্থার পরিবর্তন।

শব্দগুলো শাহ ওয়ালিউল্লাহর, কিন্তু ইতিহাসজুড়ে বিভিন্ন আলিম এবং মুজাদ্দিদদের কণ্ঠে আমরা এই একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। উম্মাহ যখনই সংকটে পড়েছে, তখন উত্তরণের প্রথম ধাপ ছিল দ্বীনের পুনর্জাগরণ। তারপর সেই পুনর্জাগরণের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে পুরো সমাজকে বদলে দেওয়া।

আগে বুনিয়াদ, তারপর ইনকিলাব।

আরব বসন্ত থেকে বাংলাদেশের জুলাই গণঅভ্যুত্থান—ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে মজবুত আদর্শিক ভিত্তি ছাড়া স্রেফ রাজপথের জনবিস্ফোরণ টেকসই হয় না। সমাজ ও শাসনের গোড়ায় যদি পরিবর্তন না আসে, তবে পুরোনো ব্যবস্থাই ফিরে আসে নতুন রঙে। কেবল শাসক বা সংবিধান বদলানোর কসমেটিক সংস্কার ভেতরের পচনকে আড়াল করতে পারে, কিন্তু সারাতে পারে না।

কাজেই, আমরা যদি সত্যিই বড় কোনো পরিবর্তন চাই, তবে সবার আগে তৈরি করতে হবে বুনিয়াদ। সব নিযাম গুড়িয়ে দিয়ে ইলাহী নিযাম কায়েম করার ইনকিলাবকে দাঁড়াতে হবে তাওহীদের মজবুত ভিত্তির ওপর। এভাবেই ইসলামের দাওয়াহ শুরু হয়েছিল। যুগে যুগে দ্বীনের পুনর্জাগরণের আন্দোলনগুলোও ঠিক এই পথেই হেঁটেছে।

---

[১২] শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী, *ফুয়ূদুল হারামাইন* (আরবি), মুশাহাদাহ ৪৪।

মূল আরবি: «وَسَأَلُونِي: مَاذَا حُكْمُ اللهِ فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ؟ قُلْتُ: فَكَّ كُلَّ نِظَامٍ»

অর্থ: "তারা আমাকে জিজ্ঞেস করল—এই মুহূর্তে আল্লাহর হুকুম কী? আমি বললাম: 'সব ব্যবস্থা ভেঙে ফেলো।'" উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এই বক্তব্য স্লোগান হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। কখনো ফারসি-উর্দু ঢঙে 'ফুক্কে কুল নিযাম' হিসেবে, আবার কখনো আরবি 'ফুক্কু কুল্লা নিযাম' হিসেবে। দেখুন: গুলাম হুসাইন জলবানী, *শাহ ওয়ালি আল্লাহ কী তালীম* (লাহোর: ইদারা-ই মাতবূ'আত, ১৯৯৯); উবাইদুল্লাহ সিন্ধী, *শাহ ওয়ালি আল্লাহ অউর উন কী সিয়াসি তাহরীক*; ড. এম. মাযহার বাকা, "ইমাম ওয়ালি আল্লাহ দেহলভী (রহ.) অউর উন কে দৌর কে সিয়াসি হালাত; জাহিদুর রাশিদি, "ফক্ কুল নিযাম; এবং *ফুয়ূদুল হারামাইন*—Digital Library of India স্ক্যান (DLI আইটেম: in.ernet.dli.2015.432233)।

বাতিঘর

প্রশ্ন হলো, সেই বুনিয়াদ আমরা গড়ব কীভাবে? কী হবে পথ ও পদ্ধতি?

আমরা কি স্রেফ নিজেদের খেয়ালখুশিমতো কাজ করে যাব? নাকি নির্দিষ্ট কোনো মানুষকে অন্ধভাবে অনুসরণ করব? অথবা কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই এলোমেলো ছুটোছুটি করব আর এভাবেই এক দিন 'কিছু একটা' হয়ে যাবে, সেই আশায় বসে থাকব?

গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ কখনো এভাবে হয় না। খুব সামান্য কিছু টাকা বিনিয়োগ করার আগেও মানুষ লম্বা সময় নিয়ে মার্কেট রিসার্চ করে। পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে সে সবচেয়ে ভালো ডাক্তার আর হাসপাতালের খোঁজ করে। এমনকি দামি পোশাক কেনার সময়ও দশটা দেখে একটা বাছাই করে।

ছোট ছোট বিষয়ে মানুষ এত হিসেবি। তাহলে দ্বীন ইসলামের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আমাদের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ, দুনিয়া ও আখিরাতের সাথে জড়িত, সেখানে অপরিকল্পিতভাবে কাজ করার কী যুক্তি থাকতে পারে?

সতর্ক, হিসেবি আর সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি ছাড়া সামনে থাকা দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে মনযিলে পৌঁছানো অসম্ভব। এখানে খামখেয়ালি সিদ্ধান্ত নেওয়া শুধু কাণ্ডজ্ঞানহীনতা নয়, বরং এক অর্থে অপরাধও।

আমাদের বুনিয়াদ গড়ার নকশা খুঁজতে হবে এমন উৎসের কাছে, যা নিখুঁত ও চিরন্তন। আমাদের কর্মপদ্ধতি সাজাতে হবে তাঁদের অনুকরণে, যারা মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম পথপ্রদর্শক। করণীয় কী—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ফিরে যেতে হবে নবী-রাসূলগণের দাওয়াহর কাছে; সেই অবিনশ্বর বাতিঘরে।

আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম।

পথিকৃৎদের পদচিহ্ন

যেকোনো কাজ সম্পর্কে ভালোভাবে জানার উপায় হলো, সেই পথের সেরাদের কাছ থেকে শেখা। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণই (আলাইহিমুস সালাম) শ্রেষ্ঠ। তাঁরাই মানবজাতির সফলতম শিক্ষক। তাওহীদ প্রতিষ্ঠা, দ্বীনের পুনর্জাগরণ, দাওয়াহর পদ্ধতি, কিংবা মানুষ নিয়ে কাজ করা—প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরাই আমাদের একমাত্র নির্ভুল দিশারী। আলাইহিমুস সালাম।

আমরা আজ যে পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) তার চেয়েও হাজার গুণ বেশি প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাঁরা

তাঁদের কওমগুলোকে আবিষ্কার করেছেন অন্ধকার গোলকধাঁধায়। একদম শূন্য থেকে শুরু করে সীমিত সামর্থ্য নিয়ে তাঁরা কাজ করে গেছেন সমাজ পরিবর্তনের জন্য। বদলে দিয়েছেন ইতিহাসের গতিপথ।

অস্তিত্বের যে মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে দুনিয়ার তাবৎ বড় বড় দার্শনিকরা খেই হারিয়ে ফেলেছে, যেখানে হাজারো বাদ-মতবাদ আর তন্ত্রমন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে, নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) সেগুলোর জট খুলে দিয়ে গেছেন। হাজার বছর ধরে পথ চলতে গিয়ে মানুষ বারবার দিকভ্রান্ত হয়েছে, নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) গন্তব্যের সরল পথ আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চাইলে আসমানি কিতাবগুলো সরাসরি নাযিল করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি কিতাব পাঠিয়েছেন নবী-রাসূলগণের কাছে। তাঁরা মানুষকে শিখিয়েছেন। কারণ এভাবেই মানুষ শেখে। এটা মহান আল্লাহর হিকমাহ।

তাই সমাজকে কীভাবে পথ দেখাতে হয়, আর কীভাবে আমূল পরিবর্তন আনতে হয়, তা জানার শ্রেষ্ঠ উৎস হলো নবীদের দাওয়াহ। আলাইহিমুস সালাম।

বনী আদমের জন্য নবী-রাসূলগণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

> 'মানবজাতির জন্য সূর্য, চন্দ্র, বাতাস ও বৃষ্টি যতটুকু প্রয়োজন, একজন মানুষের জন্য তাঁর জীবন, চোখের জন্য আলো, দেহের জন্য খাদ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন যতটুকু, মানবজাতির জন্য রাসূলদের প্রয়োজন এর চেয়েও অনেক বেশি। অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে নবী-রাসূলগণ মানবজাতির জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ন। নবী-রাসূলগণ হলেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য দূত। তাঁরা তাঁর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা পৌঁছে দেন। এবং তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মুহাম্মাদ ﷺ।'[১৩]

কাজেই বিদ্যমান সংকটের মোকাবিলায় আমাদের চিন্তা, দাওয়াহ এবং কর্মপদ্ধতি সাজাতে হবে নববী দাওয়াহর ছাঁচেই। এই পথ ও পদ্ধতি সাত আসমানের ওপর থেকে নির্ধারণ করা, খোদ মানবজাতির মালিকের বাছাই করা। তাই ইসলামী ইনকিলাবের পুরো প্রকল্পকে দাঁড় করাতে ঐ বুনিয়াদের ওপরেই।

আর সে জন্য আমাদের জানতে হবে কেমন ছিল নবী-রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) দাওয়াহ।

---

[১৩] মাজমুআতুল ফাতাওয়া, (১৯/৯৯-১০২)

নববী দাওয়াহর বৈশিষ্ট্য

নবী-রাসূলগণ সবাই একই সময়ে বা একই ভূখণ্ডে আসেননি। তাঁদের সময় ছিল ভিন্ন; আলাদা ছিল তাঁদের ভাষা, জনপদ এবং রাজনৈতিক বাস্তবতা। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রের এই ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের সবার মিশনের মূল কাঠামো ছিল অভিন্ন। তাঁদের সবার দাওয়াতে ছিল মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য। কারণ, এই দাওয়াহর শিক্ষা এসেছিল একই উৎস থেকে। সেই চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্যের প্রধান কয়েকটি সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক।

তাওহীদ

নবীদের দাওয়াহর প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য তাওহীদ, মহান আল্লাহর চূড়ান্ত একত্বের শিক্ষা। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

> ‘আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাঁর কাছে এ ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমরাই ইবাদাত করো।’[১৪]

তিনি বলেছেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

> ‘কাজেই জেনে রাখুন (হে নবী), আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই।’[১৫]

মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, একমাত্র সত্য উপাস্য। তিনিই সবকিছুর মালিক, সৃষ্টিকর্তা, ব্যবস্থাপক ও পরিচালক। সমস্ত অস্তিত্ব ও জীবন তাঁর সৃষ্টি। এই মহাবিশ্ব এবং এতে যা কিছু আছে, যা কিছু ঘটে, সবকিছুর ওপর তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। সমস্ত অস্তিত্বকে তিনি আশ্রয় দেন, টিকিয়ে রাখেন। সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁর মুখাপেক্ষী।

---

[১৪] সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:২৫

[১৫] সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭:১৯

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ

'বলুন, "তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।"'[১৬]

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

'আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।'[১৭]

কেবল স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকে চেনার নাম তাওহীদ না; তাওহীদ মানে জীবনের সব ক্ষেত্রে তাঁর কর্তৃত্ব আর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া।

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

'তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত করো। তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর তত্ত্বাবধায়ক।'[১৮]

তিনিই সার্বভৌম, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, অপ্রতিরোধ্য। কর্তৃত্ব ও মালিকানার মতো তিনি তাঁর নাম ও গুণাবলিতেও একক। তিনিই রিযিকদাতা, বিধানদাতা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক। তাঁর কোনো তুলনা নেই, কোনো শরিক নেই।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'[১৯]

সমগ্র সৃষ্টির অবস্থান *কাফ* আর *নুনের* মাঝখানে,

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

'তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন, "হও" (কুন), ফলে তা হয়ে যায় (ফা-য়াকুন)।'[২০]

তাওহীদের মূল দাবি হলো আমাদের সবটুকু ইবাদাত আর আনুগত্য হতে হবে কেবল আল্লাহর জন্য। সেখানে অন্য কাউকে বা অন্য কোনো কিছুকে শামিল করা

---

[১৬] সূরা ইখলাস, ১১২:১-২
[১৭] সূরা আয-যুমার, ৩৯:৬২
[১৮] সূরা আনআম, ৬: ১০২
[১৯] সূরা আশ-শূরা, ৪২:১১
[২০] সূরা ইয়াসিন, ৩৬:৮২

যাবে না। তাওহীদ আমাদের শেখায়—আমরা আল্লাহর গোলাম, কোনো মানুষের বা ব্যবস্থার না।

একজন মানুষ যখন মনেপ্রাণে তাওহীদকে গ্রহণ করে, তখন সব মিথ্যা ইলাহ আর মানুষের বানানো সব তন্ত্রমন্ত্র ও ব্যবস্থার আনুগত্য অবৈধ হয়ে যায়। তাওহীদ মানে প্রকৃত মুক্তি, সবার গোলামি ছেড়ে কেবল বিশ্বজগতের মালিকের কাছে শর্তহীন আত্মসমর্পণ।

নবী-রাসূলদের (আলাইহিমুস সালাম) দাওয়াহর কেন্দ্র ঠিক এই জায়গাটাই। তাঁরা চেয়েছিলেন মানুষের মন থেকে সব ধরনের মিথ্যা ভয় আর দাসত্ব উপড়ে ফেলে কেবল আল্লাহর গোলামিতে তাকে অভ্যস্ত করে তুলতে। তাঁদের মিশন ছিল মানুষকে তাওহীদের দিকে ডাকা। কুফর, শিরক ও জাহিলিয়াতের কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করা।

তাওহীদের দুই স্তম্ভ

তাওহীদের শিক্ষার দুটি অংশ আছে।

- প্রত্যাখ্যান (নাফি) এবং
- সত্যায়ন (ইসবাত)।

মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا

"দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং **যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে,** সে এমন মজবুত রশি আঁকড়ে ধরল, যা ছিন্ন হবার নয়।'[২১]

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

'আর অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, **তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।**'[২২]

[২১] সূরা আল-বাকারা, ২: ২৫৬

[২২] সূরা আন-নাহল, ১৬: ৩৬

অর্থাৎ তাওহীদের স্তম্ভ দুটি:

- তাগুতকে অস্বীকার করা (*কুফর বিত-তাগুত*) এবং
- এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনা (*ঈমান বিল্লাহ*)।

তাগুত

'তাগুত' শব্দের আভিধানিক অর্থ সীমালঙ্ঘনকারী। পারিভাষিকভাবে তাগুত হলো মিথ্যা ইলাহ। কাউকে যদি আল্লাহর বদলে রব কিংবা ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা হয়, অথবা যেসব বৈশিষ্ট্য কেবলই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলো যদি কারও ওপর আরোপ করা হয় এবং সে এতে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে সে তাগুত।

- রব হলেন মহান আল্লাহ, কিন্তু ফিরআউন নিজেকে রব দাবি করেছিল। ফিরআউন তাগুত।
- জীবন ও মৃত্যু নির্ধারণ করেন আল্লাহ। নমরুদ বলেছিল, সে জীবন ও মৃত্যুর ফয়সালা করতে পারে। নমরুদ তাগুত।
- সন্তান দেওয়ার মালিক আল্লাহ। তিনি রিযিকের মালিক। কোনো পীর বা 'বাবা' যদি দাবি করে, সে কাউকে সন্তান দিতে পারে, কারও রিযিক বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে, তাহলে সে তাগুত।
- বিধানদাতা আল্লাহ। যারা আল্লাহর বিধান অকার্যকর করে এবং নিজেরা বিধানপ্রণেতার স্থানে বসে, তারা তাগুত।
- মানুষের বানানো উপাস্য মূর্তি তাগুত। এবং সবচেয়ে বড় তাগুত হলো ইবলীস।

তাগুতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ)'র নিচের উক্তিটি প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন,

> 'তাগুত হলো এমন সব কিছু, যার কারণে বান্দা আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা লঙ্ঘন করে। চাই সেটি হোক উপাস্য (মা'বুদ), কিংবা অনুসরণীয়, অথবা আনুগত্যের পাত্র। সুতরাং, প্রত্যেক জাতির তাগুত হলো সেই ব্যক্তি বা সত্তা, যার কাছে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরিবর্তে বিচার প্রার্থনা করে; অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার উপাসনা করে; অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়াই যাকে অনুসরণ করে; অথবা তারা এমন কোনো বিষয়ে যার আনুগত্য করে, যা তারা জানে না যে, তা আল্লাহর আনুগত্য।

> তুমি যদি এগুলো ভেবে দেখো এবং মানুষের অবস্থাও বিবেচনা করো, তবে দেখতে পাবে—তাদের অধিকাংশই আল্লাহর ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে তাগুতের ইবাদাতের দিকে ঝুঁকেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে তাগুতের আনুগত্য ও তার অনুসরণের দিকে চলে গেছে।’[২৩]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

> ‘তাগুত শব্দটি থেকে এসেছে “তুগইয়ান” (সীমালঙ্ঘন)... আল্লাহর অবাধ্যতায় যার আনুগত্য করা হয় অথবা হিদায়াত ও সত্য দ্বীনের অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোনো কাজে যার অনুসরণ করা হয়; সেটি আল্লাহর কিতাবের বিপরীত কোনো সংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে হোক কিংবা আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কোনো আদেশের ক্ষেত্রে হোক—সে-ই তাগুত। আর এই কারণেই, যে আল্লাহর কিতাব ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা বিচার করে, তার কাছে বিচারপ্রার্থনা করা হলে তাকে তাগুত নামকরণ করা হয়েছে।’[২৪]

নবী-রাসূলদের দাওয়াহর ভিত্তি আর প্রধান বৈশিষ্ট্য তাওহীদ। আর তাওহীদের অর্থ হলো, সব তাগুতকে অস্বীকার করে এক আল্লাহর কাছে শর্তহীনভাবে নিজেকে সঁপে দেওয়া।

ইসলাম ও জাহিলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব

আজকের বিশ্বে যেমন নানা ভূরাজনৈতিক হিসেবনিকেশ আছে, পরাশক্তি আর তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব আছে, আগেও তেমন ছিল। নবী ﷺ-এর যুগে পারস্য এবং রোম, দুই দানবীয় সাম্রাজ্য একে অপরের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়ছিল। যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ছিল অঞ্চলে অঞ্চলে।

একই সময়ে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে ছিল চীনের বিস্তৃত সাম্রাজ্য। সেখানেও ছিল ভেতর ও বাইরের নানা সংঘাত। ছিল ভারতের রাজাদের মধ্যকার ক্ষমতার টানাপোড়েন, নানা দ্বন্দ্ব ছিল আফ্রিকার জনপদগুলোতেও। কুরাইশদের ছিল গোত্রীয় রেষারেষি, ক্ষমতার কাড়াকাড়ি আর ব্যবসায়িক স্বার্থের সংঘাত।

---

[২৩] ইলামুল মুআক্কিয়ীন ১ম খন্ড, ৫০

[২৪] ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমূ‘ আল-ফাতাওয়া*, সংকলন: আবদুর রহমান ইবনু কাসিম, ২৮:২০০-২০১।

কিন্তু আজ এগুলো ইতিহাসের ফুটনোট, বেশি থেকে বেশি হলে পার্শ্বচরিত্র। ঐসময়কার সব দ্বন্দ্ব আর সমীকরণকে ছাপিয়ে দুনিয়াকে বদলে দিয়েছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াহ।

আরবের রুক্ষ এক প্রান্তে শিরককে চ্যালেঞ্জ করে যে দাওয়াহর শুরু, অল্প কয়েক দশকের মধ্যে তা কুরাইশদের গোত্রীয় গণ্ডি পেরিয়ে পারস্য আর রোমের দ্বন্দ্বকে পর্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক বানিয়ে দিয়েছিল। জয় করে নিয়েছিল অর্ধেক বিশ্ব। তাওহীদ ও শিরকের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ফলাফল গড়ে দিয়েছিল ইতিহাসের নতুন গতিপথ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই বিজয়ের ঘোষণা দিয়ে বলেছেন:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

'তিনিই সে সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি একে সমস্ত দ্বীনের ওপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।'[২৫]

এই দ্বন্দ্ব সব নবী-রাসূলের যুগেই ছিল। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কওমের ভেতর নিশ্চয়ই অনেক ধরনের সমস্যা ছিল। কিন্তু তিনি শুরুতে গিয়ে মূর্তিগুলো ভেঙেছিলেন। আঘাত করেছিলেন জাহিলি কাঠামোর গোঁড়ায়। তিনি জানতেন, আসল দ্বন্দ্ব এখানে। এখানেই সত্য আর মিথ্যার বিভাজন। আগামীর দিনগুলো কেমন হবে, তার চূড়ান্ত মীমাংসা হবে তাওহীদের সাথে শিরকের, ঈমানের সাথে কুফরের লড়াইয়ের ওপর ভিত্তি করে।

তাওহীদ বনাম শিরক, ঈমান বনাম কুফর, ইসলাম বনাম জাহিলিয়াত; এটাই মানবইতিহাসের প্রধান দ্বন্দ্ব। ইতিহাসের গতিপথ কোন দিকে যাবে, সেটার ফয়সালা করে দেয় এই লড়াইটাই। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই লড়াইয়ের ফলাফলই নির্ধারণ করে সমাজ ও শাসনের কাঠামো কেমন হবে। ঠিক করে দেয় সভ্যতার মৌলিক চরিত্র। এ দ্বন্দ্বে একজন মানুষের অবস্থান কোন দিকে, তার ওপর নির্ভর করে তার চূড়ান্ত গন্তব্য।

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

'আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফরি করে, তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত;

[২৫] সুরা আত-তাওবা, ৯:৩৩

তারা তাদের আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়।'[২৬]

তাই নবীদের দাওয়াহ বারবার সেই দ্বন্দ্বকে প্রধানতম প্রশ্ন হিসেবে সামনে এনেছে। এটি নবী-রাসূলগণের দাওয়াহর মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং বিশুদ্ধ তাওহীদের দাওয়াহর অনিবার্য উপসংহার।

সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী

নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) পাঠানো হয়েছে জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ককারী হিসেবে। এটা তাঁদের দাওয়াহর আরেক মৌলিক বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

'আমি সুসংবাদ দানকারী ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যেন রাসূল আসার পর আল্লাহর বিপক্ষে মানুষের জন্য কোনো অজুহাত না থাকে।'[২৭]

নবী-রাসূলরা আমাদের শুধু তাওহীদের শিক্ষাই দেননি, বরং সেই শিক্ষার সাথে খুব শক্তভাবে জুড়ে দিয়েছেন আখিরাতের অনিবার্য সত্যকে। তাঁরা আমাদের বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, মাটির এ পৃথিবী আমাদের আসল ঠিকানা না। আমরা আখিরাতের মুসাফির, দুনিয়াতে এসেছি অল্প কিছু সময়ের জন্য। মৃত্যুর পর আমাদের সবাইকে আবার জাগিয়ে তোলা হবে। বিচার হবে দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি কাজের।

একই সাথে নবী-রাসূলগণ হুজ্জাহ কায়েম করেছেন।

হুজ্জাহ অর্থ এমন অকাট্য প্রমাণ, যা সত্যকে স্পষ্ট করে দেয়, অজুহাত খাটানোর পথ বন্ধ করে দেয়। নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) দাওয়াহর পর হাশরের ময়দানে কারও আর এই কথা বলার সুযোগ থাকবে না যে, 'আমরা সত্য জানতাম না' বা 'আমাদের কাছে তো কোনো পথপ্রদর্শক আসেনি'।

---

[২৬] সুরা আল-বাকারাহ, ২:২৫৭

[২৭] সূরা নিসা, ৪:১৬৫

মহান আল্লাহ তাঁর নীতি জানিয়ে দিয়েছেন,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

'আর আমরা রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত শাস্তি প্রদানকারী নই।'[২৮]

জাহান্নামের রক্ষীরা যখন অপরাধীদের পাকড়াও করবে, তখন এই সতর্কবার্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে:

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝ قَالُوا بَلَىٰ

যখনই 'তাতে (জাহান্নামে) কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, "তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেনি?", তারা বলবে, "হ্যাঁ, অবশ্যই...।"'[২৯]

নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ মানবজাতির ওপর অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, *'...যেন রাসূল আসার পর আল্লাহর বিপক্ষে মানুষের জন্য কোনো অজুহাত না থাকে'*।[৩০]

তাই নবীদের পৃথিবীতে আসাটা মানবজাতির জন্য নিয়ামত। একই সাথে এটা মানবজাতির ওপর প্রমাণও। তাঁরা সত্যকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। নবীদের দাওয়াহর পরও যারা সত্যকে অস্বীকার করবে, মহান আল্লাহর সামনে তাদের কোনো অজুহাত থাকবে না।

আল ওয়ালা ওয়াল বারা

নবীদের দাওয়াহর আরেকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, আল ওয়ালা ওয়াল বারা। সোজা বাংলায় একে বলা যায়, আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব আর আল্লাহর জন্য সম্পর্কচ্ছেদ। যা তিনি ভালোবাসেন, সেগুলোকে ভালোবাসা। তিনি যা ঘৃণা করেন, সেগুলো ঘৃণা করা।

ওয়ালা অর্থ হলো নৈকট্য, ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুত্ব বা মৈত্রী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য আর মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব হলো ওয়ালা।

---

[২৮] সূরা বনী ইসরাইল, ১৭:১৫

[২৯] সূরা মুলক, ৬৭:৮-৯

[৩০] সূরা নিসা, ৪:১৬৫

বারা অর্থ কোনো কিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া, দূরত্ব বজায় রাখা বা সম্পর্ক ছিন্ন করা। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর শত্রু, কথা, কাজ বা পরিকল্পনার মাধ্যমে যারা আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করে, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও শত্রুতা হলো বারা।

নবী-রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) শিক্ষা হলো, শিরক ও কুফরকে কেবল মনে মনে ঘৃণা করা যথেষ্ট না, বরং এগুলোর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে হয়। যারা এগুলো ধারক-বাহক এবং অনুসারী, সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয় তাদের সাথে।

মহান আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, "তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনো।"'[৩১]

একজন মুমিনের জন্য এই সম্পর্কের মাপকাঠি এতটাই আপসহীন যে, নিজের আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্কও এখানে গৌণ হয়ে যায়,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

'আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায় তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতাকারীদেরকে ভালোবাসে; যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়।'[৩২]

নবীজি ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ওয়ালা এবং বারা-এর নিখুঁত ভারসাম্য:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

[৩১] সূরা আল মুমতাহিনা, ৬০:৪

[৩২] সূরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮:২২

> 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আর যারা তার সাথে আছে, তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, পরস্পরের প্রতি সদয়...'[৩৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

> 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসল, আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করল, আল্লাহর জন্য কাউকে দান করল এবং আল্লাহর জন্য কাউকে দান করা থেকে বিরত থাকল, সে ব্যক্তি নিজ ঈমানকে পূর্ণতা দান করল।'[৩৪]

সব নবী শাসক ছিলেন না, সব নবীকে কিতাল বা লড়াইয়ের আদেশ দেওয়া হয়নি। দুনিয়াবি হিসেবে বিজয় পাননি সবাই। কিন্তু সব নবী তাগুতকে অস্বীকার করেছেন। কুফর ও শিরককে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন, আল ওয়ালা ওয়াল বারা-এর শিক্ষা তাঁদের দাওয়াহ ও জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। আলাইহিমুস সালাম।

আমর বিল মা'রুফ, নাহি আনিল মুনকার

নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) মানুষকে সৎ কাজের আদেশ আর মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। তাওহীদের দাওয়াহর পাশাপাশি তাঁরা অবস্থান নিয়েছেন সমাজের জুলুম ও অনাচারের বিরুদ্ধে।

ফিরআউন বনী ইসরাইলকে দাস বানিয়ে রেখেছিল। তাদের ওপর চালাচ্ছিল সীমাহীন অত্যাচার। মূসা (আলাইহিস সালাম) যখন আল্লাহর নির্দেশে ফিরআউনের কাছে গেলেন, তখন তিনি তাকে প্রথমে তাওহীদের দিকে ডাকলেন। তারপর আহ্বান জানালেন বনী ইসরাইলকে মুক্ত করে দেওয়ার। আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন:

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۝

> 'অতএব, তোমরা উভয়ে ফিরআউনের কাছে যাও এবং বলো, "আমরা তো সৃষ্টিকুলের রবের রাসূল, বনী ইসরাইলকে আমাদের সঙ্গে যেতে দাও।"'[৩৫]

---

[৩৩] সূরা ফাতহ, ৪৮:২৯

[৩৪] আবূ দাউদ, হাদীস নং- ৪৬৮৩

[৩৫] সূরা আশ-শুআরা, ২৬:১৬-১৭

এই একই প্যাটার্ন আমরা বারবার নবীদের জীবনে দেখি।

লূত (আলাইহিস সালাম) তার জাতিকে বিকৃত যৌনতার জঘন্য পাপ থেকে সরে আসতে বলেছিলেন। তিনি কিন্তু ভাবেননি, এরা তো ঈমানই আনেনি, এদেরকে মানা করে কী লাভ? সমাজে চলা চরম অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি সাধ্যমতো অবস্থান নিয়েছিলেন।

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

'আর আমি লূতকে পাঠিয়েছিলাম। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, "তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি? তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষের কাছে যাও, তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।"'[৩৬]

শুআইব (আলাইহিস সালাম) মাদইয়ানবাসীকে ওজন ও পরিমাপে কম দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, কারণ শিরকের পর এটাই ছিল সেই সমাজের সবচেয়ে বড় জুলুম।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

'আর মাদইয়ানবাসীদের কাছে আমি তাদের ভাই শুআইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। আর মাপে ও ওজনে কম দিয়ো না। আমি তোমাদের ভালো অবস্থাতেই দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের ওপর এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের ভয় করছি। হে আমার সম্প্রদায়! মাপ ও ওজন ইনসাফের সঙ্গে পূর্ণ করো, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ো না এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না।"'[৩৭]

হূদ (আলাইহিস সালাম) আদ জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, যারা ছিল উদ্ধত, অহংকারী, অত্যাচারী। তিনি তাদের অহংকার, জুলুম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন:

---

[৩৬] সুরা আল-আরাফ, ৭:৮০-৮১

[৩৭] সুরা হূদ, ১১:৮৪-৮৫

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ۝ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۝ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝

'তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে অনর্থক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছ? আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে? আর যখন তোমরা আঘাত করো, তখন আঘাত করো স্বেচ্ছাচারী হয়ে। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে অনুসরণ করো।'[৩৮]

কুরআন এবং হাদীসে এমন উদাহরণ অনেক।

নবীজি ﷺ-এর জীবনজুড়ে ছড়িয়ে আছে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধের দৃষ্টান্ত। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

... يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

'...তিনি তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেন ও বারণ করেন অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন আর অপবিত্র বস্তু হারাম করেন।'[৩৯]

মহান আল্লাহ কুরআনে একে মুসলিম উম্মাহর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। বলেছেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

'আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় আর অসৎ কাজে নিষেধ করে...'[৪০]

এবং তিনি বলেছেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেব, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।'[৪১]

[৩৮] সূরা আশ-শূআরা, ২৬:১২৮-১৩১

[৩৯] সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৫৭

[৪০] সূরা তাওবাহ, ৯:৭১

[৪১] সূরা আলি ইমরান, ৩:১১০

নবীজি ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন অন্যায়ে বাধা দেওয়ার সাথে সম্পর্ক আছে ঈমানের। তিনি বলেছেন:

> 'তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় দেখবে, সে যেন তা তার হাত দিয়ে বাধা দেয়। আর যদি হাত দিয়ে বাধা না দিতে পারে, তবে যেন মুখ দিয়ে বাধা দেয়। আর যদি মুখ দিয়ে বাধা না দিতে পারে, তবে যেন অন্তর দিয়ে বাধা দেয়। আর এটি হলো দুর্বল ঈমানের পরিচয়।'[৪২]

নবীদের দাওয়াহ জনবিচ্ছিন্ন ছিল না। তাঁরা নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। তাওহীদ ও আখিরাতের দাওয়াহর পাশাপাশি, সামসময়িক জুলুম, শোষণ আর অনাচারের বিরুদ্ধেও তাঁরা কথা বলেছেন। সমাজ পরিবর্তনের সক্রিয় লড়াই নববী দাওয়াহর মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আজকে এ বিষয়টা অনেক বেশি অবহেলিত।

মেষপালক ও রাখাল

সব নবী কোনো-না-কোনো সময় মেষপালক ছিলেন। নবী ﷺ বলেছেন,

> 'আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি, যিনি ছাগল-ভেড়া চরাননি।'
>
> সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিও কি?'
>
> তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও কিছু ক্বীরাত্বের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম।'[৪৩]

মেষপালন ছিল নবী-রাসূলগণের জন্য এক ধরনের বিশেষ প্রশিক্ষণ। বনী আদমের ইতিহাসে নবীরা রাখালের মতো আর মানুষ ভেড়ার পালের মতো।

ইমাম ইবনু হাজর (রাহিমাহুল্লাহ) বিষয়টা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

> উলামাগণ বলেছেন: 'নুবুওয়াতের আগে নবীগণের ভেড়া চরানোর অভিজ্ঞতার পেছনে হিকমাহ হলো, এর মাধ্যমে তাঁরা উম্মতের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশিক্ষিত হন। ভেড়ার দেখাশোনার কারণে তাঁদের মধ্যে ধৈর্য ও মমতা গড়ে ওঠে।
>
> কারণ, তাঁরা যখন ভেড়া চরানোর সময় বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া ভেড়াগুলোকে একত্র করেন, এক চারণভূমি থেকে আরেকটিতে নিয়ে যান, হিংস্র প্রাণী

[৪২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯
[৪৩] সহীহ বুখারি, হাদীস নং ২২৬২

> বা চোরের মতো শত্রুর হাত থেকে তাদের রক্ষা করেন, আর তাদের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব, প্রবল দুর্বলতা সত্ত্বেও বারবার বিচ্ছিন্ন হবার স্বভাব ও অবিরাম যত্নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন—তখন তাঁরা উম্মতের প্রতি ধৈর্যশীল হতে অভ্যস্ত হন। তাঁরা উম্মতের স্বভাবের ভিন্নতা ও বোধ-বুদ্ধির তারতম্য বুঝে যান; ফলে তাদের ভাঙন মেরামত করেন, দুর্বলদের প্রতি কোমলতা দেখান এবং তাদের উত্তম যত্ন নেন।
>
> ভেড়া চরানোর মাধ্যমে ধীরে ধীরে যে প্রশিক্ষণ তাঁরা পান, তার কারণেই উম্মতের এই কষ্টকর দায়িত্ব তাঁদের জন্য সহজ হয়ে যায়; প্রথমেই যদি হঠাৎ এই গুরুভার চাপিয়ে দেওয়া হতো, তবে তা আরও কঠিন হতো।'[৪৪]

পাশাপাশি মেষপালন মানুষের হৃদয়কে কোমল করে তোলে। ভেড়া দুর্বল প্রাণী। তাদের দেখাশোনা করতে গেলে মানুষের মধ্যে দয়া, সহানুভূতি ও নম্রতা জন্মায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> 'অহংকার ও দাম্ভিকতা হলো ঘোড়া ও উটের মালিকদের বৈশিষ্ট্য, আর সেই বেদুইনদের বৈশিষ্ট্য, যারা তাদের উটপালনে মশগুল থেকে দ্বীনের প্রতি কোনো মনোযোগ দেয় না। আর বিনয় ও নম্রতা থাকে ভেড়ার মালিকদের মধ্যে।'[৪৫]

মেষপালনের অভিজ্ঞতা একজন রাখালকে শেখায় কীভাবে একটা বিশৃঙ্খল জমায়েতকে সুশৃঙ্খল করে তুলতে হয়। কীভাবে সবাইকে এক সুতোয় গাঁথতে হয়।

বাংলায় একটা বাগধারা আছে, গড্ডলিকা প্রবাহ। এর মানে হলো, কোনো বাছবিচার ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠের পেছনে ছোটা। গড্ডলিকা শব্দটা এসেছে 'গড্ডল' থেকে, যার অর্থ পুরুষ ভেড়া। গড্ডলিকা প্রবাহ-এর আক্ষরিক অর্থ ভেড়ার পালের স্রোত।

অন্ধ অনুসরণকে ভেড়ার সাথে যুক্ত করার কারণ কী?

কারণ, ভেড়া অনুকরণপ্রিয় প্রাণী। একজন যেদিকে যায়, বাকিরা কোনো চিন্তা ছাড়াই সেদিকে ছুটতে শুরু করে। সামনের জন যদি ভুল করে খাদে পড়ে, তবে পেছনের সবাই বিচার-বিবেচনা ছাড়াই তার পেছন পেছন খাদে ঝাঁপ দিতে পারে।

স্রোতে ভাসানো, একা থাকতে ভয় পাওয়া, আর সংখ্যাগুরু যেদিকে যায় সেদিকে চোখ বুজে ছোটা; এই বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের সাথেও মিলে যায়।

---

[৪৪] ফাতহুল বারী, খণ্ড ৪, কিতাবুল ইজারা।
[৪৫] বুখারি, ৩৩০১

মেষপালনের অভিজ্ঞতা নবী-রাসূলগণকে (আলাইহিমুস সালাম) শেখায় কীভাবে একটা জাতিকে অন্ধ অনুসরণ থেকে বের করে আনতে হয়। স্রোতে গা ভাসানো আর হুজুগে মেতে ওঠার স্বভাবটা কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা তাঁদেরকে প্রস্তুত করে মানুষকে সামলানোর জন্য। প্রস্তুত করে মানুষের ভুলগুলোকে সহমর্মিতার চোখে দেখে, অসীম ধৈর্য ও দরদ দিয়ে তাদের সত্যের পথে ফিরিয়ে আনতে।

কুরবানি, আত্মনিবেদন, সবর

আল্লাহর পথে নিজের সবটুকু বিলিয়ে দেওয়া, সীমাহীন কুরবানি আর পাহাড়সম কষ্টের মুখে অটল ধৈর্য—নবী-রাসূলগণের দাওয়াহর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নবীদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন, যাঁরা বছরের পর বছর মানুষকে তাওহীদের দিকে ডেকেছেন, অথচ খুব সামান্য মানুষের সাড়া পেয়েছেন। তবু হাল ছাড়েননি।

নূহ (আলাইহিস সালাম) এর জীবনের কথা ভাবুন। সাড়ে নয়শো বছর ধরে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর কওমকে তাওহীদের দিকে ডেকেছেন। কিন্তু আল্লাহ কুরআনে বলেছেন—

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ...

'আর তার সাথে ঈমান এনেছিল কেবল অল্প কয়েকজন।'[৪৬]

এটা অনেক নবীর (আলাইহিমুস সালাম) ক্ষেত্রেই নির্মম বাস্তবতা ছিল। এমন নবীও পৃথিবীতে এসেছেন, যাঁর সারা জীবনের দাওয়াহর পর মাত্র একজন মানুষ ঈমান এনেছে। এমনকি এমন নবীও ছিলেন, যাঁর ডাকে কেউই সাড়া দেয়নি। নিঃসঙ্গ এ লড়াইয়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জানিয়েছেন—

> '...আমার সামনে উম্মতদের পেশ করা হলো। আমি দেখলাম; কোনো নবীর সাথে একটি ছোট দল আছে, কোনো নবীর সাথে মাত্র একজন বা দুজন লোক আছে; আবার এমন নবীও অতিবাহিত হয়েছেন, যাঁর সাথে (তাঁর উম্মতের মধ্যে) কেউই নেই।'[৪৭]

তবুও তাঁরা থামেননি। তাঁদের কাজ ছিল আল্লাহর দিকে ডাকা। সবটুকু ঢেলে দিয়ে তাঁরা সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলাফল আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

---

[৪৬] সুরা হূদ, ১১:৪০

[৪৭] সহীহ বুখারি, হাদীস নং ৫৭৫২

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

'নিশ্চয়ই আপনি যাকে ভালোবাসেন, তাকে আপনি হিদায়াত দিতে পারবেন না; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। আর হিদায়াতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনি ভালো জানেন।'[৪৮]

নবীগণ পরীক্ষিত হয়েছেন। তাঁদের ওপর প্রচণ্ড শারীরিক আর মানসিক নির্যাতন হয়েছে। সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়েছে তাঁদের। এমনকি তাঁদের হত্যারও ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বারবার।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুনিয়াবি ক্ষমতার দিক থেকে তাঁরা ছিলেন দুর্বল, আর প্রতিপক্ষ ছিল প্রবল শক্তিশালী। তাঁরা অসম লড়াইয়ে নেমেছিলেন। কিন্তু শত প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁরা আল্লাহর আনুগত্য থেকে একচুল বিচ্যুত হননি। প্রবল জাহিলি শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অবিচলভাবে তাওহীদকে আঁকড়ে ধরে রাখাই ছিল তাঁদের শিক্ষা।

নবী হূদ (আলাইহিস সালাম) এর কওম যখন তাঁর বিরোধিতা শুরু করল এবং তাঁকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করল, তখন তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন,

إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝ مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ

'... নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাকো যে, নিশ্চয়ই আমি তা থেকে মুক্ত যাকে তোমরা শরিক করো আল্লাহ ছাড়া। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো, এরপর আমাকে কোনো অবকাশ দিয়ো না!'[৪৯]

এটাই নবী-রাসূলগণের পথ। আলাইহিমুস সালাম।

তাঁদের কালজয়ী দাওয়াহ গড়ে ওঠেছিল কুরবানি, ইখলাস এবং সবরের সমন্বয়ে। তাঁরা মানুষকে শিখিয়েছেন সংখ্যা, সম্পদ অথবা ক্ষমতা সফলতার মাপকাঠি না; বরং পাহাড়সম প্রতিকূলতার মাঝে হকের ওপর অটল থাকা সবচেয়ে বড় বিজয়।

***

[৪৮] সূরা আল-ক্বাসাস, ২৮:৫৬
[৪৯] সূরা হূদ, ১১:৫৪-৫৫

নবী-রাসূলগণের দাওয়াহর বৈশিষ্ট্য কেবল এই সাতটার মধ্যেই সীমিত না। এটা আসলে কূলহীন সমুদ্রের মতো; যেখানে ছড়িয়ে আছে অগণিত মণিমুক্তো আর দুর্লভ রত্ন। সেখানে যতবার ডুব দেওয়া হবে, ততবারই ওঠে আসবে নতুন কোনো অমূল্য রত্ন।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেই সমুদ্রের বিশালতাকে পুরোপুরি ধারণ করা অসম্ভব। আমরা সেই বিশাল সমুদ্রের তটরেখা থেকে তাঁদের দাওয়াহর প্রধান কয়েকটি দিক এখানে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

নববী দাওয়াহর আলোকে সমাজ পরিবর্তন

নববী দাওয়াহর বৈশিষ্ট্যগুলো চিনে নেওয়ার পর আমাদের সামনে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, আজকের বাস্তবতায় সেগুলোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা। এগুলো ইতিহাসের পাতায় বন্দি তাত্ত্বিক আলোচনা না; বরং সমাজ পরিবর্তনের সেই শাশ্বত নকশা, যা প্রতি যুগে সমানভাবে কার্যকর।

নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) যে মিশন নিয়ে এসেছিলেন, সেই একই মিশন আমাদেরও। জাহিলিয়াতের প্রত্যাখ্যান, সমাজের রূপান্তর, তাওহীদ প্রতিষ্ঠা।

লক্ষ্য এক। পথও এক।

একমাত্র প্রশ্ন হলো, আমাদের সময় ও প্রেক্ষাপটে এ পথে হাঁটার অর্থ কী?

এবার সেটা দেখা যাক।

ভিত্তি ও কেন্দ্র: তাওহীদ

নববী দাওয়াহর প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য তাওহীদ। এটা সেই কেন্দ্র, যা অন্য সব কিছুকে সংজ্ঞায়িত করে, কিন্তু নিজে কোনো কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না। ইসলামী পুনর্জাগরণের যেকোনো প্রকল্পের বুনিয়াদ হতে হবে তাওহীদ।

মহান আল্লাহ একমাত্র রব, তিনিই পবিত্রতম নাম ও গুণাবলির অনন্য অধিকারী এবং তিনিই একমাত্র সত্য ইলাহ—এই চিরন্তন সত্যের স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি সব ধরনের মিথ্যা উপাস্য আর বাতিল জীবনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করে নেওয়াই হলো ইসলামী ইনকিলাবের মূল ঘোষণা।

আধুনিক দেবতা

কিন্তু আজকের মিথ্যা ইলাহ কারা? আর মিথ্যা দ্বীনগুলোই বা কী?

জাহিলি যুগের মুশরিকরা পূজা করত মাটি, রঙ আর পাথরের তৈরি মূর্তির। পবিত্র কাবার ভেতরে-বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তিনশো ষাটটা মূর্তি চোখে দেখা যেত। হাতে ধরা যেত। কিন্তু আধুনিকতা আমাদের সামনে এমন মূর্তি হাজির করেছে, যেগুলো দেখা যায় না, ধরা যায় না।

এগুলোও মানুষের বানানো। তবে মাটি আর পাথর দিয়ে না। এগুলো বানানো হয়েছে তত্ত্ব, মতবাদ, আইন আর প্রতিষ্ঠানের আবরণে।

আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা নিজেকে দেখাতে চায় বিশ্বাসের ওপর যুক্তির বিজয় হিসেবে। কিন্তু এ সভ্যতায় আসলে বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়নি, তার স্থানান্তর ঘটেছে কেবল। পুরোনো জাহিলিয়াতে মানুষ পাথরের মূর্তি আর মিথ্যা ধর্মের ওপর ঈমান আনত। আধুনিক মানুষ ঈমান আনে বাদ-মতবাদ আর তন্ত্রমন্ত্রের ওপর।

নতুন এই জাহিলিয়াত মানুষের বানানো বিভিন্ন কাঠামো আর প্রতিষ্ঠানের ওপর মহান আল্লাহর বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে। রাষ্ট্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আর বাদ-মতবাদকে বসিয়েছে চূড়ান্ত কর্তৃত্বের জায়গায়। ফলে জন্ম নিয়েছে অনেক মিথ্যা ইলাহ আর বিচিত্র সব মিথ্যা দ্বীন।

আধুনিকতার বিশ্বাসগুলো নিজেদের কখনো ধর্ম বলে পরিচয় দেয় না। কিন্তু তারা মানুষের ওপর ঠিকই নিরঙ্কুশ আনুগত্য আর সার্বভৌমত্বের দাবি করে। প্রত্যেক জনপদ ও জীবনের ওপর এমন সব আইনি কাঠামো আর বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেয়, যা মহান আল্লাহর বিধানকে অবলীলায় অগ্রাহ্য করে।

তারা আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বকে কেবল অকার্যকর ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং মানুষকে মাপকাঠি বানিয়ে নিজেরাই নির্ধারণ করে নৈতিকতা ও আইনের নতুন সংজ্ঞা ও সীমানা।

তন্ত্রমন্ত্র

বিভিন্ন আধুনিক বাদ-মতবাদের মধ্যে মৌলিক কিছু মিল আছে। সেক্যুলারিসম, লিবারেলিসম, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ—সবগুলো তাওহীদ, রিসালাত আর আসমানি কিতাবের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। তারা দাবি করে: 'সার্বভৌমত্ব মানুষের, আল্লাহর না।'

মানুষই এখানে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। নিজের মর্জিমাফিক মানুষই ভালো-মন্দের সীমারেখা টানে। মানুষের বিবেকবুদ্ধিই পরম মাপকাঠি।

সবার ওপর মানুষ সত্য, তাহার ওপর নাই!

এই মতবাদগুলো স্রষ্টার কাছ থেকে কর্তৃত্ব এবং সার্বভৌমত্ব সরিয়ে তা সৃষ্টির ওপর আরোপের চেষ্টা করে। এ কারণেই এ তন্ত্রমন্ত্রগুলো স্রেফ রাজনৈতিক দর্শন না; এগুলো একেকটা মিথ্যা দ্বীন। শব্দ আর তত্ত্বের বুননে এগুলো নতুন নতুন মাবুদ আর ইলাহ তৈরি করে। কখনো রাষ্ট্র, কখনো ব্যক্তি, কখনো নফস, আর কখনোবা 'জনগণের আকাঙ্ক্ষা'-কে বসায় উপাস্যের আসনে।

লিবারেলিসম যেমন শেখায় ব্যক্তির স্বাধীনতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। মানুষ সার্বভৌম এবং স্বাধীন। নিজের খেয়ালখুশি মতো পরিচয়, জীবন আর জীবনের উদ্দেশ্যকে সংজ্ঞায়িত করার নিরঙ্কুশ অধিকার আছে তার।

এই অবস্থান মানুষের খেয়ালখুশিকে আসমানি দিকনির্দেশনার ওপর প্রাধান্য দেয়। নফসকে বানায় চূড়ান্ত বিচারক। নব্য জাহিলিয়াতের এই দৃষ্টিভঙ্গি কুরআনের এই আয়াতকে মনে করিয়ে দেয়,

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ

> 'আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার খেয়ালখুশিকে নিজ ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে...?'[৫০]

সেক্যুলার শাসনে মানুষ ঘোষণা দিয়ে ওহীর বিপরীতে আইন বানায়। আর সেগুলোর বৈধতা দেয় প্রগতি, উন্নতি আর আধুনিকতার মোড়কে। মক্কার কুরাইশদের চিন্তাচেতনার সাথে এর তেমন কোনো মৌলিক পার্থক্য পাওয়া যায় না।

কুরাইশরা আল্লাহকে বিশ্বাস করত, কিন্তু তাঁকে ইবাদাতের উপযুক্ত একমাত্র সত্তা হিসেবে মানত না। মানত না সমাজ ও শাসনের ওপর তাঁর সার্বভৌমত্ব। তারা চলত নিজেদের প্রথা-প্রচলন আর গোত্রীয় নিয়মকানুন অনুযায়ী। আজকের বিশ্বে ঠিক একই কাজ হচ্ছে। শুধু আগের সেই গোত্রীয় মজলিসের জায়গায় এসেছে সংসদ আর সংবিধান।

---

[৫০] সূরা আল-জাসিয়াহ, ৪৫:২৩

শুআইব (আলাইহিস সালাম) মাদইয়ানবাসীকে বলেছিলেন, তারা যেন কেনাবেচার সময় ওজনে কম না দেয়। জবাবে তারা বলেছিল,

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ

'তারা বলল, "হে শুআইব! তোমার সালাত কি তোমাকে এ নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের ইবাদাত করত, আমরা তাদের ত্যাগ করি? অথবা আমাদের সম্পদে আমরা ইচ্ছামতো যা করি, তাও (ত্যাগ করি?)'[৫১]

অর্থাৎ, তুমি ধর্মকর্ম করো ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের ব্যবসাবাণিজ্যের সাথে তার কী সম্পর্ক? আমরা কীভাবে টাকা কামাব, আর কোথায় খরচ করব, সেটা বলার তুমি কে? আর তোমার ধর্ম কে?[৫২]

সেক্যুলারিসম প্রাচীন এই 'মাদইয়ানি চিন্তা'-কে বৈশ্বিক রূপ দিয়েছে। মাদইয়ানবাসী কেবল অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আল্লাহর কর্তৃত্ব অস্বীকার করেছিল, সেক্যুলারিসম পুরো দুনিয়ার ওপর মহান আল্লাহর কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করে।

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেছেন,

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

'আর তিনিই সত্য ইলাহ আসমানে এবং তিনিই সত্য ইলাহ যমীনে; আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।'[৫৩]

মহান আল্লাহর কালামের বিপরীতে সেক্যুলারিসম একটা বিভাজন রেখা টেনে দেয়। বলে: আল্লাহ বলে যদি কেউ থেকে থাকেন, তবে তাঁর কর্তৃত্ব কেবল আসমানের সীমানায়; যমীনে শাসন, বিচার আর আইনপ্রণয়নের একচ্ছত্র অধিকার থাকবে কেবল মানুষের হাতে।

সেক্যুলারিসম যমীনে আল্লাহর রাজত্বকে অস্বীকার করে সেখানে মানুষের রাজত্ব ঘোষণা করে।

---

[৫১] সুরা হূদ, ১১:৮৭

[৫২] তাফসীর মারিফুল কুরআন

[৫৩] সূরা যুখরুফ, ৪৩:৮৪

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সব মিথ্যা ইলাহ আর মিথ্যা দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করে এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার দাবি হলো, ওহীর কর্তৃত্বকে নাকচ করা প্রত্যেক মতবাদ ও তন্ত্রমন্ত্রকে মনেপ্রাণে বর্জন করা। এখানে লুকোচুরির কোনো জায়গা নেই, স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে: চূড়ান্ত আনুগত্য কেবল আল্লাহর প্রতি।

কোনো রাষ্ট্র, জাতি, মতবাদ কিংবা মানবরচিত ব্যবস্থার কাছে মাথা নত না করে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে দ্বীন ইসলামকে আঁকড়ে ধরাই তাওহীদের দাবি।

সেই দাওয়াহই সত্যিকার অর্থে নববী দাওয়াহ, যা মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সমাজ এবং শাসনব্যবস্থা—সবকিছুকে মহান আল্লাহর হুকুমের অধীনে আনার আহ্বান জানায়।

প্রধান দ্বন্দ্ব

তাওহীদ বনাম শিরক, ঈমান বনাম কুফর, ইসলাম বনাম জাহিলিয়াত—এটাই মানব ইতিহাসের প্রধান দ্বন্দ্ব। নবীদের দাওয়াহ বারবার এ সত্যকেই সামনে এনেছে। তাই আজ যদি আমরা নববী দাওয়াহর আলোকে কর্মপন্থা সাজাতে চাই, তবে চিরন্তন এ দ্বন্দকেই বানাতে হবে দাওয়াহর কেন্দ্র।

বর্তমান বাস্তবতায় এই সংঘাত ঠিক কীভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তা চিহ্নিত করা এবং সমাজের সামনে তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব। আর বাস্তবতার আলোকে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমাদের সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব হলো ইসলামী ব্যবস্থা এবং সেক্যুলার ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব। আল্লাহর আইন বনাম গাইরুল্লাহর আইনের সংঘাত। এটিই আমাদের সময়ে ইসলাম ও জাহিলিয়াতের চিরন্তন লড়াইয়ের সবচেয়ে প্রকাশ্য এবং ব্যাপক রূপ।

আমরা চারপাশে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অবক্ষয় কিংবা নৈতিক সংকটের কথা শুনি, সেগুলো আসলে এই মূল দ্বন্দ্বের একেকটা বাহ্যিক উপসর্গ মাত্র। এই লড়াইয়ের প্রভাব আজ আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

এটা নিছক কোনো রাজনৈতিক বা মতাদর্শিক বিরোধ না; বরং বিশ্বাসের লড়াই। এমন এক সংঘাত, যার সাথে সরাসরি জড়িয়ে আছে মানুষের অস্তিত্বের মৌলিক প্রশ্নগুলো।

- মানবজীবনের উদ্দেশ্য কী?
- ভালো-মন্দের মাপকাঠি কোথা থেকে আসে?
- বিধান দেওয়ার মালিক কে? আইনের ভিত্তি কী হবে? শাসনব্যবস্থার উৎস কী হবে?
- সার্বভৌমত্ব কার?

প্রত্যেক সমাজ আর সভ্যতাকে এ প্রশ্নগুলোর মীমাংসা করতে হয়। এই উত্তরগুলোর ওপর নির্ভর করে সেই সভ্যতার ভবিষ্যত গতিপথ। আর এখানে ইসলাম এবং আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার অবস্থান সাংঘর্ষিক।

আধুনিকতা মানুষকেন্দ্রিক। সে মাপকাঠি বানায় মানুষের চিন্তা এবং প্রবৃত্তিকে।

ইসলাম বলে, সবকিছুর কেন্দ্র হলেন আল্লাহ। তিনিই মালিক, তিনিই নৈতিকতার সংজ্ঞাদাতা, বৈধ-অবৈধের চূড়ান্ত ফায়সালাকারী। সবক্ষেত্রে তিনিই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ।

আধুনিকতা আর ইসলাম, এই দুই দ্বীনের মধ্যে বিরাজ করে এক অমোচনীয় বৈপরীত্য। আর এই বৈপরীত্যের সবচেয়ে স্পষ্ট এবং ব্যাপক বহিঃপ্রকাশ ঘটে ইসলামী শাসনব্যবস্থা বনাম সেক্যুলার শাসনব্যবস্থার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে।

ইসলামের আকীদাহ, মূল্যবোধ, নৈতিকতা আর রূহানিয়াত-এর মতো বিষয়গুলোর সামগ্রিক রূপ ফুটে ওঠে ইসলামী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ, পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে ইসলামের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে। ঠিক একইভাবে, পশ্চিমা সভ্যতার মৌলিক বিশ্বাস, জীবনবোধ এবং জ্ঞানতত্ত্বের সার্বিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে সেক্যুলার রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে।

আধুনিক এই তন্ত্রমন্ত্রগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনো অ্যাকাডেমিক আলাপ বা দার্শনিক প্রশ্ন হিসেবে হাজির হয় না। এগুলো আমাদের ওপর চেপে বসে শিক্ষা, আইন, সংস্কৃতি এবং শাসনকাঠামোর ভেতর দিয়ে। কাঠামোগতভাবে এগুলো আমাদের জীবনকে বেঁধে ফেলে। আর এ কাঠামোগুলোর বিরাট একটা অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে সেক্যুলার রাষ্ট্র।

সেক্যুলার ব্যবস্থাই হলো সেই প্রধান হাতিয়ার, যার মাধ্যমে আধুনিক জাহিলিয়াত আমাদের জীবনে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়।

তাই, ইসলাম ও সেক্যুলার ব্যবস্থার সংঘাত কেবল মতাদর্শিক তর্ক কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন না। এটা দুটো ভিন্ন ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মধ্যকার অনতিক্রম্য

যুদ্ধ। ইসলাম যেখানে জীবনের প্রতিটি কোণকে ওহীর আলোকে সাজাতে চায়, সেক্যুলার ব্যবস্থা সেখানে ওহীকে অকেজো করে মানুষের তৈরি আইনকে প্রতিষ্ঠা করে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় হিসেবে।

কে সার্বভৌম?

ইসলাম আর সেক্যুলার ব্যবস্থার এই সংঘাতের গভীরতা বোঝার সবচেয়ে ভালো জায়গা হলো সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন।

সার্বভৌমত্ব হলো সেই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব, যা আইন ও বৈধতার প্রশ্নে শেষ কথা বলে। একটা সমাজে চূড়ান্তভাবে কার হুকুম চলবে এবং কার দেওয়া নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে ভালো-মন্দের ফয়সালা হবে, তা নির্ভর করে 'সার্বভৌমত্ব কার?'—এ প্রশ্নের উত্তরের ওপর।

এ বিষয়ে ইসলামের অবস্থান স্পষ্ট। মহান আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম সত্তা। মহাবিশ্বের প্রতিটা ধূলিকণা থেকে শুরু করে মানুষের জীবন ও শাসনের প্রতিটা স্তরে কর্তৃত্ব কেবল তাঁরই।

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'বলুন, হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন; যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা আপনি হীন করেন। কল্যাণ আপনারই হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'[৫৪]

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তার রাজত্ব আল্লাহরই এবং তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'[৫৫]

কিন্তু সেক্যুলার ব্যবস্থা সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রের ওপর আরোপ করে।

গতো দু'শো বছরে রাষ্ট্রের কাঠামো আর চেহারায় নানা পরিবর্তন এলেও সার্বভৌমত্বের ধারণায় মৌলিক পরিবর্তন আসেনি। আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রের

---

[৫৪] সূরা আলি ইমরান, ৩:২৬

[৫৫] সূরা মায়িদা, ৫: ১২০

অস্তিত্বই মূলত সার্বভৌমত্বের ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এটা ছাড়া তার অস্তিত্ব অসম্ভব।

আর রাষ্ট্র যখন নিজেকে সার্বভৌম ঘোষণা করে, তখন এর অর্থ দাঁড়ায়—নিজ সীমানার ভেতরে রাষ্ট্রই সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। রাষ্ট্রের আইন অলঙ্ঘনীয়। এই আইনের বাইরে আর কোনো আইন নেই। নাগরিকদের চূড়ান্ত আনুগত্য হবে রাষ্ট্রের প্রতি।

কর্তৃত্ব এবং পূর্ণ আনুগত্যের প্রশ্নে রাষ্ট্র কোনো অংশীদারকে সহ্য করে না। কিন্তু এ সবই মহান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক ড. পল কান তার বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন, একত্ববাদী ধর্মগুলোতে স্রষ্টার যেসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়, আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্র সার্বভৌমত্বের আবরণে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো নিজের ওপর আরোপ করেছে।

পল কানের বিশ্লেষণে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

- রাষ্ট্রের ওপরে কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। সে নিজেই নিজের বৈধতার উৎস।
- রাষ্ট্র আইন ও বিচারের একমাত্র উৎস।
- রাষ্ট্র আনুগত্যের চূড়ান্ত হকদার।
- রাষ্ট্র ঠিক করে কী বৈধ, কী অবৈধ।
- রাষ্ট্র সহিংসতার একমাত্র বৈধতা দানকারী। বাকি সব সহিংসতা অপরাধ, সন্ত্রাস কিংবা অরাজকতা। রাষ্ট্রের জন্য সহিংসতা বৈধ, প্রয়োজনীয় এবং পবিত্র।
- 'নাগরিক' রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার সৃষ্টি। রাষ্ট্র তার নাগরিকদের অস্তিত্ব ও পরিচয়ের উৎস। রাষ্ট্রহীন মানুষের কোনো আইনি অস্তিত্ব আধুনিক বিশ্বে সম্ভব না।
- শিক্ষা, অর্থনীতি, সামাজিক কাঠামো, সংস্কৃতি এমনকি ধর্ম—রাষ্ট্রের উপস্থিতি সব জায়গায়। তার নিয়ন্ত্রণ সব কিছুর ওপর।[৫৬]

---

[৫৬] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: Kahn, Paul W. Political Theology: Four New Chapters on the Concept of Sovereignty. New York: Columbia University Press, 2011.

রাষ্ট্রদেবতা

আধুনিকতায় কার্যত রাষ্ট্রের ওপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিণত হয়েছে নতুন ইলাহতে। ব্যাপারটা কোনো দুর্ঘটনা না। এটা ইউরোপের ইতিহাস আর সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ফসল।

এনলাইটেমেন্টের মাধ্যমে ইউরোপ যখন নিজের খ্রিষ্টীয় পরিচয়কে ঝেড়ে ফেলে সেক্যুলার হয়ে ওঠল, তখন সে আধিপত্যের সিংহাসন থেকে গির্জা বা খ্রিষ্টবাদকে হটিয়ে দিল। তবে সেই আসন সে খালি রাখল না। সেখানে সে বসিয়ে দিল রাষ্ট্র নামের নতুন এক সত্তাকে। এই নতুন সত্তাই হয়ে ওঠল আইন, আনুগত্য আর ক্ষমতার উৎস।

ক্রিশ্চিয়ানিটিতে ঈশ্বরের যে অবস্থান ছিল, সেক্যুলারিসমে রাষ্ট্র সেই অবস্থান দখল করে নিল। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের জায়গায় আসলো সার্বভৌম রাষ্ট্র।

রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে এই বিকল্প ধর্মতত্ত্ব নির্মাণের বিষয়টা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ওঠে এসেছে জার্মান আইনজ্ঞ এবং দার্শনিক কার্ল শ্মিটের বিশ্লেষণে। পুরো ব্যাপারটাকে শ্মিট তুলে ধরেছেন এভাবে:

> 'আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ সব ধারণাই ধর্মতাত্ত্বিক (আধ্যাত্মিক) বিভিন্ন ধারণার সেক্যুলার রূপ। এগুলোর ঐতিহাসিক বিকাশ ঘটেছে ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন ধারণাকে রাষ্ট্রতত্ত্বে এনে বসানোর মাধ্যমে। যেমন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা পরিণত হয়েছে (রাষ্ট্র নামক) সর্বশক্তিমান বিধানদাতায়...'[৫৭]

শ্মিট বলছেন, আধুনিক সেক্যুলার রাষ্ট্রে যেসব রাজনৈতিক ধারণা আর প্রতিষ্ঠানকে আমরা 'নিরপেক্ষ' বা 'যুক্তিনির্ভর' মনে করছি, সেগুলোর শেকড় আসলে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের সাথে।

সার্বভৌমত্বের কথা ধরা যাক। আধুনিক সময়ে কেউ সার্বভৌম হবার অর্থ—এমন এক সত্ত্বা হওয়া, যে আইনদাতা, কিন্তু নিজে সেই আইনের ঊর্ধ্বে। সে যেকোনো সময় 'জরুরি অবস্থা' জারি করে সাধারণ আইনকে স্থগিত করার ক্ষমতা রাখে। শ্মিট এই ক্ষমতাকে সরাসরি স্রষ্টার ধারণার সেক্যুলারাইযড রূপ হিসেবে দেখেছেন।

---

[৫৭] Carl Schmitt, *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, trans. George Schwab (Chicago: University of Chicago Press, 2005), 36.

সেক্যুলার ব্যবস্থায় আইন রাষ্ট্রের সৃষ্টি। রাষ্ট্রের সীমানার ভেতরে সবাই সেই আইন মানতে বাধ্য, তা না হলে তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্র নিজে এই আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ না। রাষ্ট্র যদি সব অবস্থাতেই নিজের তৈরি আইনের অধীনে থাকে, তাহলে সত্যিকার অর্থে সে আর সার্বভৌম থাকে না।

সার্বভৌম হওয়ার শর্তই হলো প্রয়োজনে আইনের সীমানা ডিঙিয়ে যাওয়ার এবং আইনের ঊর্ধ্বে ওঠার ক্ষমতা রাখা। আইনের ব্যতিক্রম করতে পারা। এই ক্ষমতা রাষ্ট্র প্রয়োগ করে জনস্বার্থে অথবা জাতীয় স্বার্থে, মহামারি অথবা মহাযুদ্ধে, জনকল্যাণ কিংবা জনকল্যাণের নামে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধিতে।

যে কারণেই হোক না কেন, আইনের বাইরে যাবার এই একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাই রাষ্ট্রকে সার্বভৌম করে তোলে।

স্রষ্টা যেমন মহাবিশ্বের নিয়মের নির্মাতা হয়েও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে মুজিযা বা কারামত ঘটাতে পারেন, সেক্যুলার রাষ্ট্রও তেমনি আইনের নির্মাতা হয়েও আইনের ব্যতিক্রম করতে পারে। আইনকে অকেজো করে দিতে পারে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই রাষ্ট্র তার লৌকিক মুখোশ খুলে নিজের 'দেবত্ব' প্রকাশ করে।

শ্মিটের ভাষায়:

> 'সার্বভৌম সে-ই, যে ব্যতিক্রম নির্ধারণ করে... আইনশাস্ত্রে "আইনের ব্যতিক্রম" হলো ধর্মতত্ত্বের মুজিযা বা কারামতের মতো। এই সাদৃশ্য সম্পর্কে সচেতন হবার মাধ্যমেই গত শতাব্দীগুলোতে রাষ্ট্রের ধারণার ক্রমবিকাশ কীভাবে হয়েছে, তা বোঝা সম্ভব।'[৫৮]

পবিত্রতার স্থানান্তর

শ্মিট যেটাকে ধর্মতত্ত্বের সেক্যুলার রূপ বলেছেন, তার একটা সুনির্দিষ্ট প্রকাশ দেখা যায় পবিত্রতার ধারণার ক্ষেত্রে।

এক সময় ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চকে কেন্দ্র করে পবিত্রতা, আনুগত্য এবং উপাসনার এক নিবিড় কাঠামো গড়ে ওঠেছিল। আজ একই ধরনের কাঠামো তৈরি হয়েছে রাষ্ট্রকে ঘিরে। ফারাক হলো, গির্জার শাসনামলে যে উপাসনা ছিল প্রকাশ্য, আধুনিক রাষ্ট্রে তা গুপ্ত বা 'সেক্যুলার রূপে' প্রকাশিত।

---

[৫৮] Carl Schmitt, *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, trans. George Schwab (Chicago: University of Chicago Press, 2005), 5.

পবিত্রতা পুরোপুরি একটা ধর্মীয় ধারণা। ধর্মের প্রেক্ষাপট থেকে সরিয়ে নিলে পবিত্রতার কোনো অর্থ থাকে না। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম স্থপতি এমিল ডুর্খেইম আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, পবিত্রতাকে কেবল ধর্মের বৈশিষ্ট্য না, বরং পবিত্রতার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির মাধ্যমে ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব।

তার মতে, ধর্ম হলো—

> 'পবিত্র গণ্য করা হয় এমন কিছুর ব্যাপারে বিশ্বাস ও আচারের সমষ্টি, যা এই বিশ্বাস ও আচারগুলো অনুসারীদের একটি একক নৈতিক সম্প্রদায়ে আবদ্ধ করে।'[৫৯]

ডুর্খেইমের মতে, 'প্রত্যেক সমাজে এমন কিছু সত্ত্বা বা ধারণা থাকে, যা তর্কবিতর্কের ঊর্ধ্বে। এমন কিছু, যা বাকি সব কিছুর ওপর অগ্রাধিকার পায়। যার দোহাই দেওয়া হলে মানুষ তা গ্রহণ করে নেয়।

কোনো বিশেষ বস্তু, প্রতীক বা ধারণাকে যখন সাধারণ জগত থেকে আলাদা করে চরম সম্মান ও অলঙ্ঘনীয় মর্যাদার আসনে বসানো হয়, তখনই সেখানে ধর্মীয় আবহের সৃষ্টি হয়। সমাজে যা কিছুকে পবিত্র গণ্য করা হয়, তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় ঐ সমাজের ধর্ম।'[৬০]

ডুর্খেইমের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, পবিত্রতার স্থানান্তরের এই প্রক্রিয়া শুরু হয় ফরাসি বিপ্লবের সময়। এসময় পিতৃভূমি, স্বাধীনতা, মুক্তচিন্তার মতো বিষয়গুলো পরিণত হয় ভক্তি, বন্দনা আর পূজার পাত্রে।[৬১]

ফরাসি বিপ্লবের সময়কার জাতীয়তাবাদের ব্যাপারে ডুর্খেইম মন্তব্য করেন–

> 'সমাজের নিজেকে উপাস্য হিসেবে দাঁড় করানোর কিংবা নতুন নতুন উপাস্য তৈরি করার যে সক্ষমতা, তার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায় ফরাসি বিপ্লবের শুরুর বছরগুলোতে। সেই সময়ের প্রবল উৎসাহে যেসব বিষয় স্বভাবজাতভাবে সম্পূর্ণ ইহজাগতিক, সেগুলো জনমতের চাপে পবিত্র বিষয়ে রূপান্তরিত হয়: যেমন—স্বদেশ, স্বাধীনতা এবং যুক্তি। সেখানে এক নতুন ধর্ম গড়ে ওঠার প্রবণতা দেখা দেয়, যে ধর্মের ছিল নিজস্ব বিশ্বাস, প্রতীক, বেদি এবং উৎসব।'[৬২]

---

[৫৯] Durkheim, Émile. The Elementary Forms of Religious Life. Translated by Joseph Ward Swain. London: George Allen & Unwin, 1915.

[৬০] Ibid

[৬১] Ibid

[৬২] Ibid, 214

এই প্রক্রিয়া আজও চলমান।

নিজেদের যারা সেক্যুলার বলে, তারাও দেখবেন কোনো-না-কোনো বিষয়কে পবিত্র মনে করে। শুধু তাই না, তাদের কাছে যা কিছু পবিত্র, তারা চায় বাকি সবাই সেই বিষয়গুলোকে সম্মান করুক, সেগুলোর পবিত্রতা রক্ষা করে চলুক।

কেন এমন হয়?

কারণ, এনলাইটেনমেন্টের পর জনপরিসর থেকে ধর্ম বিদায় নিলেও পবিত্রতার আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হয়নি। সেগুলো এসে ভর করেছে রাষ্ট্র, সংবিধান আর জাতির ওপর।

পবিত্রতা ছাড়া সমাজ টিকে থাকতে পারে না। সমাজের অস্তিত্বের জন্য পবিত্র কোনো ভিত্তির প্রয়োজন। সেক্যুলার রাষ্ট্র তাই ধর্মের বিকল্প হিসেবে নিজের জন্য নতুন ধর্মতত্ত্ব গড়ে তুলেছে।

ফলে আসমানি কিতাবের জায়গা দখল করে নিয়েছে ‘পবিত্র সংবিধান’। সর্বশক্তিমান স্রষ্টার পরিবর্তে এসেছে সার্বভৌম রাষ্ট্র। জন্ম নিয়েছে ‘পবিত্র’ জাতীয় পতাকা আর জাতীয় সঙ্গীতের মতো বিষয়গুলো। দেশের ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনা, স্থাপনা কিংবা স্মৃতিস্তম্ভকে ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছে ভক্তি ও শ্রদ্ধার এক ঘন আবরণ।[৬৩]

জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, সংবিধান, সংসদ আর আদালতের মতো বস্তুগুলোর ‘পবিত্রতা’ রক্ষায় রাষ্ট্রীয়ভাবে নানা নিয়মকানুন বা কঠোর হুকুম-আহকামও জারি হয়েছে। এগুলোর ‘অবমাননা’ শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ফলে নাগরিকরা যখন রাষ্ট্রের এসব প্রতীকের প্রতি আনত হয়, নির্দিষ্ট দিবসে বিশেষ আচার পালন করে, কিংবা রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার নামে জীবন বিসর্জন দেয়, তখন তারা আসলে নিজের অজান্তেই এক ধরনের ‘সেক্যুলার উপাসনায়’ জড়িয়ে পড়ে।

সেক্যুলার রাষ্ট্র নামের যে সত্তাকে তৈরি-ই করা হয়েছে ধর্মকে বাদ দেওয়ার জন্য, বিচিত্রভাবে সেটার ওপরই আবার আরোপ করা হয়েছে পবিত্রতার মতো নিরেট ধর্মীয় অনুষঙ্গ। আধুনিক রাষ্ট্র নিজেকে ধর্মহীন দাবি করলেও, সে নাগরিকদের আবেগ ও আনুগত্যকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যা কোনো অংশেই প্রথাগত ধর্মের চেয়ে কম না।

---

[৬৩] বাংলাদেশেও ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ কিংবা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মতো ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে একই ধরনের আবেগ দেখা যায়। শহীদ মিনার কিংবা স্মৃতিসৌধের মতো স্মারকগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে যে বিনম্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, পালন করা হয় নির্দিষ্ট আচার। সম্মান, পবিত্রতা ও অবমাননার মতো বিষয়ও অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সাথে দেখা হয়।

আধুনিকতা ধর্মকে ব্যক্তিজীবনে নির্বাসিত করার দাবি তুলে রাষ্ট্রকেই এক নতুন 'পবিত্র' ইলাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। আধ্যাত্মিকতার খ্রিষ্টীয় কাঠামোকে ভেঙে তৈরি করে নতুন সংস্করণ। যেখানে রাষ্ট্র কেবল প্রশাসনিক যন্ত্র না, বরং পরম পবিত্র এক সত্তা, যার হুকুম বা সার্বভৌম অস্তিত্বকে প্রশ্ন করাকে এক ধরনের আধুনিক 'ধর্মত্যাগ' হিসেবে দেখা হয়।

রাষ্ট্রকে ইলাহ বানানোর এই প্রক্রিয়ার সাথে আসে ধর্মদ্রোহিতার নতুন ধারণা। আজকের ভাষায় যাকে বলা হয় 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'।

ইসলামের অবস্থান থেকে আমরা যেটাকে ধর্মত্যাগ বা রিদ্দাহ (Apostasy) বলি, সেক্যুলার ব্যবস্থায় দেশদ্রোহিতা অনেকটা সেই মাপের অপরাধ। অতীতে যেভাবে ধর্মত্যাগীকে সমাজ ও ধর্মের শত্রু মনে করা হতো, বর্তমান সেক্যুলার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রদ্রোহীকে তেমনি দেশ, জাতি ও মানবতার শত্রু হিসেবে দেখা হয়।

আধুনিক এই জাহিলিয়াত মানুষের চিন্তার জগত এমন এক সীমানার ভেতরে এনে ফেলেছে, যেখানে মহান আল্লাহর বিধান কিংবা তাঁর রাসূল ﷺ-কে তুচ্ছজ্ঞান করা গেলেও, রাষ্ট্রের তৈরি করা 'পবিত্র' কাঠামোর বিরুদ্ধে কথা বলা অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।

নাগরিক ধর্ম

সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট বেলাহ একেই বলেছেন 'নাগরিক ধর্ম' (Civil Religion)। এমন এক সেক্যুলার ধর্ম, যার আছে নিজস্ব বিশ্বাস, পবিত্র দিবস, প্রতীক এবং আচরণ-অনুষ্ঠান।

এই নাগরিক ধর্ম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর এক ধরনের অতীন্দ্রিয় মাহাত্ম্য চাপিয়ে দেয়। রাষ্ট্রকে পবিত্রতার অধিকারী হিসেবে উপস্থাপন করে। যার ফলে সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি এক ধরনের শর্তহীন আনুগত্য দেখাতে শুরু করে।[৬৪]

রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই বিশ্বাসের চূড়ান্ত রূপটা দেখা যায় হত্যা ও আত্মত্যাগের প্রশ্নে।

রাষ্ট্র কেবল নাগরিকদের কাছ থেকে আনুগত্য আর কর আদায় করে ক্ষান্ত হয় না, বরং সময়ে সময়ে রক্ত আর জীবনের কুরবানিও দাবি করে। আর এর বৈধতা

[৬৪] Bellah, Robert N. "Civil religion in America." *Daedalus* (1988): 97-118; Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World. Berkeley: University of California Press, 1970.

আসে জাতীয়তাবাদের কাছ থেকে। দেশ, জাতি ও পতাকার মতো বিষয়গুলো কাজে লাগিয়ে জাতীয়তাবাদ মানুষের মধ্যে তীব্র আবেগ এবং উন্মাদনা সৃষ্টি করে। তাদের প্ররোচিত করে হত্যা ও আত্মত্যাগে।

আত্মত্যাগ এবং মৃত্যুর প্রশ্নগুলো গভীরভাগে ধর্মীয় প্রশ্ন।

ধর্ম মাত্রই মনে করে জীবন দেওয়া ও নেওয়ার প্রশ্নে সিদ্ধান্তের এখতিয়ার স্রষ্টার। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী হত্যা করা বৈধ। বাকি সব হত্যা অপরাধ। কে বাঁচবে, কে মরবে, কে হত্যাযোগ্য আর কে হত্যার আওতার বাইরে, তা ঠিক করে ঈশ্বর।

ধর্মের জন্য এই জীবন দেওয়াকে আধুনিক রাষ্ট্র 'ফ্যানাটিসিসম' বা 'জঙ্গিবাদ' বলে। কিন্তু সেই একই রাষ্ট্র যখন নিজের সীমানা বা স্বার্থ রক্ষার জন্য মানুষকে জীবন দিতে বলে (যুদ্ধে), তখন সেটাকে বলা হয় 'দেশপ্রেম' আর মহান 'আত্মত্যাগ'।

জীবন ও মৃত্যুর ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা, আধুনিক জাতিরাষ্ট্র তা কুক্ষিগত করেছে। রাষ্ট্রই ঠিক করে কে বাঁচবে, কে মরবে এবং কার রক্ত পবিত্র।

নৃতত্ত্ববিদ তালাল আসাদ এই বিষয়টিকে আরও গভীর ও কাঠামোগত জায়গা থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার ভাষায়,

> 'মানুষ এবং তাদের জীবনযাত্রার বিনাশ; অর্থাৎ, কখন এবং কীভাবে তাদের বেঁচে থাকতে বা মরতে দেওয়া হবে, সেই সিদ্ধান্ত আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য অপরিহার্য। রাজনৈতিক অমরত্ব (এর ধারণা) এবং জাতির জন্য আত্মত্যাগের সব অঙ্গীকারই হত্যা ও মৃত্যুকে অনিবার্য করে তোলে।'[৬৫]

কোনো সমাজের চূড়ান্ত সত্য হলো ঐ বিশ্বাস, যার জন্য হত্যা করা যায়। যার জন্য জীবন দেওয়া যায়। আর আধুনিক রাষ্ট্রে জীবন দেওয়া-নেওয়া আবর্তিত হয় রাষ্ট্র, পতাকা, দেশ আর জাতির নামে।

আধুনিকতায় জীবন নেওয়ার কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের।

এভাবেই সার্বভৌমত্ব, পবিত্রতা, আনুগত্য, সহিংসতা এবং আত্মত্যাগের মতো বহু প্রশ্নে সেক্যুলার রাষ্ট্র সরাসরি ইসলামের বিপরীতে অবস্থান নেয়। তাওহীদের বিপরীতে এক প্রতিদ্বন্দ্বী ইলাহ দাঁড় করায়।

---

[৬৫] Asad, Talal. "Thinking about terrorism and just war." *Cambridge Review of International Affairs* 23, no. 1 (2010): 3-24.

পরাজয়ের মনস্তত্ত্ব

এখানে আরও কিছু দিক প্রাসঙ্গিক।

আমাদের সমাজে আধিপত্য কায়েম করা সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠীর পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটাই দাঁড়িয়ে আছে সেক্যুলার নানা দর্শন আর বয়ানের ওপর। বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে বয়ানটা আমাদের সামনে বারবার আনা হয়, সেটাও আগাগোড়া সেক্যুলার বয়ান। এই বিশেষ ধরনের পরিচয় নির্মাণের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ইসলামকে জনপরিসরে দুর্বল করে রাখা এবং শাসনের কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া।

চিন্তা আর আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে যে পরাধীনতা আজ আমরা দেখি, তার পেছনেও প্রধান কারণ হলো সেক্যুলার কাঠামোর বাইরে গিয়ে চিন্তা করতে না পারা।

মুসলিম উম্মাহ আগেও বহুবার সামরিকভাবে পরাজিত হয়েছে। মঙ্গোলদের ধ্বংসযজ্ঞ আব্বাসি খিলাফতকে তছনছ করে দিয়েছিল, ক্রুসেডাররা দখল করে নিয়েছিল পবিত্র আল-আকসা। কিন্তু সেই চরম দুর্দিনেও মুসলিমরা মানসিকভাবে হার মানেনি। তারা মঙ্গোলদের অনুকরণ করেনি, ক্রুসেডারদের আদর্শকেও গ্রহণ করেনি।

কিন্তু আজ আমরা পশ্চিমাদের বানানো তন্ত্রমন্ত্রের পেছনে অন্ধের মতো ছুটছি। এমনকি যখন ইসলাম নিয়ে ভাবছি, তখনো সেটা করছি ওই নির্দিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক আর রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে, যা পশ্চিমেরই তৈরি। এই কাঠামোকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করার সাহস বা সামর্থ্য—দুটোই যেন আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

সম্ভবত আমাদের ইতিহাসে এই প্রথম উম্মাহর একটা বিশাল অংশ পরাজয় মেনে নিয়ে শত্রুর আদর্শিক কাঠামোকে গ্রহণ করে নিয়েছে। আমরা শুধু সামরিক অথবা রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হইনি, আমরা মনস্তাত্ত্বিকভাবেও পরাজিত হয়েছি।

এ সমস্যাগুলোর গোড়া সেক্যুলার ব্যবস্থায়। আমরা যদি চিন্তার পরাধীনতা থেকে মুক্ত হতে চাই, যদি আমরা বর্তমানকে বদলাতে চাই এবং ইসলামের পুনর্জাগরণ দেখতে চাই, তবে আমাদের প্রথমেই ইসলাম ও সেক্যুলার ব্যবস্থার সংঘাতকে সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

নববী দাওয়াহর বৈশিষ্ট্য তখনই ফুটে ওঠবে, যখন এই দ্বন্দ্বকে সমাজের সামনে স্পষ্ট করা হবে। যখন সমাজের সামনে স্পষ্ট প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হবে—

> আমরা কি আল্লাহর বিধান গ্রহণ করব, নাকি গাইরুল্লাহর বিধান আঁকড়ে থাকব?

আমরা কি ইসলামকে সমাজের ভিত্তি বানাব? নাকি জাহিলিয়াতের অনুসরণ করে যাব?

আসমানি কম্পাস

তাওহীদ যদি কেন্দ্র হয়, ইসলাম ও জাহিলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব যদি ঠিক করে দেয় গন্তব্য, তবে আল ওয়ালা ওয়াল বারা হলো ইসলামী পুনর্জাগরণের নিখুঁত কম্পাস। এই নীতিই ঠিক করে দেয় একজন মুমিনের সামাজিক আর রাজনৈতিক মৈত্রীর সীমানা। বাতিলের প্রচণ্ড ঝড়েও তাওহীদের ধ্রুবকেন্দ্রের দিকে মুখ করে থাকা এই কম্পাস মুমিনকে পথ হারাতে দেয় না।

কোনো জাতিই নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। কে বন্ধু আর কে শত্রু, এই হিসেবটা সবার করতে হয়। এই চিরন্তন নীতি সবাই মেনে চলে, তফাত কেবল ভিত্তির জায়গায়।

আজকের পৃথিবী বন্ধুত্ব আর শত্রুতার মানদণ্ড বানিয়েছে রাষ্ট্র, ভাষা, ভূখণ্ড, রাজনৈতিক স্বার্থ আর মতাদর্শকে। আমাদের সমাজটাও ভাগ হয়ে আছে ক্ষণস্থায়ী নানা মেরুকরণে।

কিন্তু ইসলামে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার ভিত্তি একটাই, তাওহীদ।

আমাদের সবচাইতে বড় পরিচয়, আমরা মুসলিম। আমরা 'আগে বাঙালি' বা 'আগে বাংলাদেশি' আর তারপর মুসলিম না। আমরা আগে মুসলিম। আমাদের আনুগত্য মানচিত্রে টানা ফিরিঙ্গিদের আঁকিবুঁকির প্রতি না; আমাদের আনুগত্য আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ আর মুমিনদের প্রতি।

তার মানে এই না যে, আমরা আমাদের মাটি বা শেকড়কে অস্বীকার করি।

আমরা এই মাটির সন্তান, নিজেদের ইতিহাসকে আমরা অবশ্যই ধারণ করি। কিন্তু জাতি, বর্ণ, ভাষা কিংবা ভূখণ্ডকেন্দ্রিক যেকোনো পরিচয়ের আগে মুসলিম পরিচয়টাই সবচেয়ে দামি। এটাই আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র শিক্ষা।

আমাদের ওয়ালা ইসলাম এবং মুসলিমদের প্রতি। মুসলিমদের মধ্যে চিন্তা বা মানহাজের পার্থক্য থাকবে, কিন্তু যতক্ষণ সেটা ইসলামের গণ্ডির ভেতরে থাকছে, ততক্ষণ সামগ্রিক অর্থে তাঁরা একে অপরের মিত্র।

আমাদের বারা তথা সম্পর্কচ্ছেদ কুফরি মতবাদ, পদ্ধতি এবং কুফরের অনুসারীদের সাথে। দ্বীনের দোহাই দিয়ে কুফরি মতবাদ কিংবা তাগুতের সাথে

আপস করা নববী দাওয়াহর পরিপন্থী। এগুলো আদর্শিক দুর্বলতা আর চরম পরাজিত মানসিকতার লক্ষণ।

ভুল পথে হাঁটা মুসলিমদের প্রতি আমাদের নাসীহাহ থাকবে। যতক্ষণ তারা ঈমানের গণ্ডিতে আছে, ততক্ষণ তাদের সাথে ভ্রাতৃত্বের নীতিও বজায় থাকবে। কিন্তু নবীদের দাওয়াহ কখনোই অস্পষ্ট ছিল না। দ্বীনের লড়াইয়ে বাতিলের সাথে আপস করার সুযোগ নেই।

তাই মুসলিম ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা যেমন থাকবে, তেমনি চারপাশের ভ্রান্তি আর দ্বীনের নামে চলে আসা ভুল ব্যাখ্যাগুলো স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়াও জরুরি।

কিন্তু বিধর্মীদের কী হবে?

আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র আপসহীন নীতি নিয়ে আলোচনার সময় সাধারণত একটা প্রশ্ন আসে, অমুসলিমদের কী হবে?

এ প্রশ্নের তাত্ত্বিক উত্তর দেওয়ার জন্য লম্বাচওড়া তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। এর স্পষ্ট জবাব আছে ইতিহাসেই।

ইসলামী শাসনের অধীনে বহু শতাব্দী যাবৎ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা শান্তি এবং নিরাপত্তার সাথে বসবাস করেছেন। আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন জেরুসালেম বিজয় করেন, তখন তিনি ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী সেখানকার ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের উপাসনালয়, সম্পত্তি ও ধর্ম পালনের অধিকারের সুরক্ষা দিয়েছিলেন।[৬৬]

আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতের সময়কার বিখ্যাত ঘটনার কথা ভাবুন। তাঁর হারিয়ে যাওয়া বর্ম যখন একজন ইহুদির কাছে পাওয়া গেল, তিনি তখন বিষয়টা আদালতের কাছে সোপর্দ করলেন। পর্যাপ্ত সাক্ষী না থাকায় বিচারক খোদ খলীফার বিপক্ষেই রায় দিলেন। আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তা নিঃসংকোচে মেনে নিলেন। খোদ খলীফার করা মামলাতেও একজন সাধারণ অমুসলিমের পক্ষে রায় গেল।[৬৭]

---

[৬৬] আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত-তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল-মুলূক (The History of al-Tabari)*, খণ্ড ১২: আল-কাদিসিয়্যার যুদ্ধ ও সিরিয়া-ফিলিস্তিন বিজয় (৬৩৫–৬৩৭ খ্রি./১৪–১৫ হি.); *Eutychius of Alexandria (Said ibn Bitriq), Gli Annali, trans. Bartolomeo Pirone (Cairo: Franciscan Centre of Christian Oriental Studies, 1987)*

[৬৭] আবু নুআইম আল-ইসফাহানী, *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, খণ্ড ৪ (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, তারিখবিহীন), ১৫১–১৫৩।

শাম অঞ্চল (সিরিয়া, ফিলিস্তিন, লেবানন, জর্ডান) ইসলামী শাসনের অধীনে আসে সপ্তম শতকে। কিন্তু সেখানে কাউকে জোর করে মুসলিম বানানো হয়নি। বরং আরও প্রায় চারশো বছরে ধরে শামে মুসলিমরা ছিল সংখ্যালঘু। ইহুদি, খ্রিষ্টান ও সাবিয়ানরা নিজেদের ধর্ম নিয়ে সেখানে শান্তিতে বসবাস করেছিল।[৬৮]

আজও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত হিসেবে ইসলামী শাসনের অধীনে থাকা আন্দালুস আর জেরুসালেমের কথা বলা হয়। আমাদের এ উপমহাদেশেও মুসলিম শাসকদের অধীনে অন্যান্য ধর্মের অনুসারী নিরাপদে বসবাস করেছে।

উসমানীরা 'মিল্লেত' নামের পদ্ধতি তৈরি করেছিল। যেখানে অমুসলিম গোষ্ঠীগুলোর নিজ নিজ ধর্মীয় ও পারিবারিক আইন অনুযায়ী চলার এবং নিজেদের মোকদ্দমা নিজেরা মীমাংসা করার এখতিয়ার ছিল।

সুতরাং, আল ওয়ালা ওয়াল বারা'র নীতি মানে অন্যের ওপর জুলুম করা না। এটা হলো আকীদাহ্ আর আদর্শের জায়গায় অটল থাকা, আর শাসনের জায়গায় শরীয়াহ্ অনুযায়ী সবার হক রক্ষা করা।

ইসলামী শাসনব্যবস্থায় অমুসলিমরা একটা নির্দিষ্ট কর দিয়ে শরীয়াহ্র শর্ত অনুযায়ী বসবাস করেন। এর নাম জিযিয়া। এই জিযিয়ার পরিমাণ মুসলিমদের ওপর প্রযোজ্য বাধ্যতামূলক যাকাতের চেয়ে কম।

যারা জিযিয়া দেবেন, তারা মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ। ইসলামী শরীয়াহ্র নীতি হলো, শাসক শরীয়াহ্র শর্ত অনুযায়ী অমুসলিমদের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষার দায়িত্ব নেবেন।[৬৯]

এ ব্যবস্থায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যে মাত্রায় ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্ত্বশাসন উপভোগ করে, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তা দেয় না। রাষ্ট্রের বানানো নাগরিক ধর্ম ক্রমাগত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও জীবনযাত্রার ওপর হস্তক্ষেপ করে। বাংলাদেশের পাহাড়ের উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই আছে।

---

[৬৮] Richard W. Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in Quantitative History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979).

[৬৯] শাইখ ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন: 'জিম্মি হলেন এমন ব্যক্তি, যার সাথে মুসলিমদের এই মর্মে একটি চুক্তি ও অঙ্গীকার হয়েছে যে, তিনি দারুল ইসলামে সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবেন এই শর্তে যে, তিনি জিযিয়া প্রদান করবেন... যদি তারা এটি করে, তবে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা আমাদের ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। তাদের সম্পদ, জীবন বা সম্মানের ওপর যেকোনো ধরনের আক্রমণ আমাদের জন্য হারাম। মাজমু' ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল ফাদিলাতুশ শাইখ মুহাম্মদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন। (আশ-শুরুতুল উমুরিয়্যাহঃ২/১০৩)

অন্যদিকে ধর্মের জন্য ঠিক করা সেক্যুলার রাষ্ট্রের ছোট্ট সীমানা ক্রমাগত ধর্ম পালনের ক্ষেত্রকে সীমিত করে। সেই সাথে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোকে বাধ্য করে তাদের ধর্মকে বদলাতে। যা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি।

ইসলামী মূলনীতির আলোকে পরিচালিত সমাজেই মুসলিম-অমুসলিম, বাঙালি-অবাঙালি সকল জাতিগোষ্ঠীর সম্মান, নিরাপত্তা ও কল্যাণের নিশ্চয়তা মেলে। কারণ একমাত্র এখানেই আদল ও ইনসাফের সংজ্ঞা আর সীমানা সুনির্দিষ্ট এবং চিরন্তন। নিজের খেয়ালখুশি মতো কেউ এগুলো পাল্টাতে পারে না।

সামাজিক দাওয়াহ

নবী-রাসূলগণের দাওয়াহর অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সমাজের চলমান জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান নেওয়া। মানুষকে সৎকাজের দিকে ডাকা আর সাধ্যমতো অন্যায়ে বাধা দেওয়া।

তাই আমর বিল মা'রূফ এবং নাহি আনিল মুনকার-কে স্রেফ বিচ্ছিন্ন সংস্কার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। যদি তা-ই হতো, তাহলে নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) এই কাজকে এতটা গুরুত্ব দিতেন না। এটা নববী দাওয়াহর গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

একজন মুমিন যখন ওহীর মাপকাঠি নিয়ে জাহিলি সমাজের অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন সেটা কেবল ব্যক্তিগত প্রতিবাদ থাকে না। সেটা হয়ে ওঠে পুরো সিস্টেমের বৈধতা আর কর্তৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ। এর মাধ্যমে সমাজ সেই মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়, যা মানুষ সচরাচর ভুলে থাকতে চায়:

> পৃথিবী কার হুকুমে চলবে? মানুষের খেয়ালখুশি মাফিক, নাকি ওহীর শাশ্বত মানদণ্ডে?

এভাবে এই দাওয়াহ সমাজকে আখিরাতের জবাবদিহিতার কথা মনে করিয়ে দেয় এবং সমাজের ওপর হুজ্জাহ কায়েমের অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

ছোট ছোট অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অথবা মানুষকে সৎকাজের দিকে ডাকা তাই অর্থহীন না। বরং এগুলো জাহিলিয়াতের বিশাল দালানের ইটগুলো গোঁড়া থেকে আলগা করে দেওয়ার মতো কাজ।

বড় বড় পরিবর্তনগুলো কখনো হুট করে আকাশ থেকে পড়ে না। এগুলো গড়ে উঠে অসংখ্য ছোট ছোট প্রতিবাদ, সংস্কার আর প্রতিরোধের সম্মিলিত শক্তিতে। এটা সমাজ ও সভ্যতার রূপান্তরের ইলাহী সুন্নাহর অংশ।

ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রকল্প তাই সবসময় সক্রিয়। এখানে প্রতিকূল পরিস্থিতি, ক্ষমতার অভাব অথবা কৌশলের দোহাই দিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকার সুযোগ নেই।

সৎকাজের আদেশ আর মন্দ কাজে বাধা দেওয়ার মানে হলো জাহিলিয়াতের বিষাক্ত বাস্তবতার ভেতরে বিকল্পের নকশা এঁকে যাওয়া। আধুনিকতার নামে চলা সব সংকটের বিপরীতে ইসলামী প্রতিরোধ। মানুষের বানানো তাগুতি ব্যবস্থার বিপরীতে ইলাহী ইনসাফের নমুনা। যা মানুষকে দুনিয়াতে বিকল্প পথ দেখানোর পাশাপাশি জান্নাত ও জাহান্নামের চূড়ান্ত পরিণতির কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইসলামী পুনর্জাগরণের যেকোনো প্রকল্পে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার-কে তাই হতে হবে সমাজের সাথে দাওয়াহ ও কার্যকরী সম্পর্কের অন্যতম প্রধান মাধ্যম।

মৌলিক এই দায়িত্বের গুরুত্ব নিয়ে আল-গাযযালি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

> 'সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ দ্বীনের সর্ববৃহৎ কেন্দ্রীয় অক্ষ। এটাই সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার জন্য আল্লাহ সকল নবীকে প্রেরণ করেছেন। যদি এই নীতিকে উপেক্ষা করা হয়, এর জ্ঞান ও আমলকে অবহেলা করা হয়, তাহলে নুবুওয়াতের উদ্দেশ্য অকার্যকর হয়ে পড়বে, দ্বীন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সর্বব্যাপী পচন ধরবে, ভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়বে, অজ্ঞতা ব্যাপক আকার ধারণ করবে, ফাসাদ প্রবল হবে, ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হবে, দেশসমূহ বরবাদ হবে এবং মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আর তারা নিজেদের ধ্বংস উপলব্ধি করবে কেবল আহ্বানের দিনে (কিয়ামতের দিনে)।'[৭০]

এ কেবল তাত্ত্বিক সতর্কবাণী না। ইতিহাস এর সাক্ষী।

সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজে নিষেধের বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া গুরুতর বিচ্যুতি, এবং এটা বনী ইসরাইলের গোমরাহীর অন্যতম কারণ। মহান আল্লাহ সূরা মায়িদার ৬৩ নং আয়াতে বনী ইসরাইলের আলিমদের ব্যাপারে বলেছেন:

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

[৭০] আবু হামিদ আল-গাযযালি। ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, বৈরুত: দার আল-মা'রিফা, খণ্ড ২, পৃ. ৩০৬।

> ‘কেন তাদেরকে রব্বানী ও পণ্ডিতগণ, তাদের পাপের কথা ও হারাম ভক্ষণ থেকে নিষেধ করে না? তারা যা করছে, নিশ্চয়ই তা কতই না মন্দ।’

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আল-কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

> ‘এরপর আল্লাহ তাদের আলিমদের তিরস্কার করেছেন; কারণ তারা তাদের (গুনাহকারীদের) অসৎকাজ থেকে নিবৃত্ত করেনি। এই বলে: *“তারা যা করছে, নিশ্চয়ই তা কতই না মন্দ।”*
>
> ঠিক যেমন যারা গুনাহে দ্রুত লিপ্ত হতো, তিনি তাদের তিরস্কার করেছেন এই বলে: “তারা যা করছিল, তা কতই না মন্দ!”
>
> এই আয়াতটি থেকে বোঝা যায় যে, যারা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয় না, তারা যেন আসলে সেই অসৎকর্মকারীর মতোই।। সুতরাং, এই আয়াতটি আলিমদের জন্য এক তিরস্কার। কারণ তারা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করা ছেড়ে দিয়েছিল।’[৭১]

কিন্তু ইসলামী ঘরানার মধ্যে আজ এই ক্ষেত্রে এক বিপজ্জনক স্থবিরতা তৈরি হয়েছে। যার নেতিবাচক প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

আজ যখন সেক্যুলার ব্যবস্থা সমাজের সব ক্ষেত্রে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে, তখন ইসলামকে কেবল ব্যক্তিগত ইবাদাতে সীমাবদ্ধ রাখা আত্মঘাতী।

আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকার তাই আজ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি জরুরি। এই সক্রিয়তা ছাড়া ইসলামী পুনর্জাগরণ সম্ভব না।

পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান

সেক্যুলারিসম ধর্মকে ব্যক্তিগত পরিসরে বন্দি রাখে। তার কাছে ধর্ম মানে মাসজিদ-মন্দির, আর কিছু আচার-অনুষ্ঠান। কিন্তু ইসলাম আমাদের বলে মানবজীবনের সব ক্ষেত্রকে ওহীর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী চালাতে।

সমাজ, শাসন অথবা অর্থনীতির মতো বিষয়গুলো দ্বীনের বাইরের কোনো আলোচনা না। একজন মুসলিম যখন দাওয়াহ ও কাজ করবে, তখন সেখানে স্বাভাবিকভাবেই এ বিষয়গুলো চলে আসবে। সেক্যুলারিসমের বানানো খাঁচার ভেতর ইসলামকে আটকে রাখা যায় না।

---

[৭১] আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন*, সূরা আল-মায়িদা ৫:৬৩-এর তাফসির।

দুঃখজনকভাবে, গত আট-নয় দশকে অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলন এই সেক্যুলার খাঁচাকেই নিজেদের নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়েছে। দ্বীনকে এভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আটকে ফেলার কারণে মানুষের চিন্তার জগতে নিজে থেকেই এক ধরনের বিভাজন তৈরি হয়ে গেছে।

মানুষ ধরেই নিয়েছে, পেটের ক্ষুধা, সামাজিক সংকট, অর্থনীতি, কিংবা জুলুমের মোকাবিলা করার জন্য কেবল সেক্যুলার রাজনীতির কাছেই ধরনা দিতে হবে।

অথচ ব্যাপারটা সবসময় এমন ছিল না। ইসলামের শাসনের যুগে তো বটেই, কলোনিয়াল দখলদারিত্বের সময়ও আমাদের পূর্বসূরিরা 'দ্বীনি' ও 'দুনিয়াবি' ইস্যুকে আলাদা করে দেখেননি। বরং এ দুইয়ের সমন্বয়ে বহু আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল, যার উদাহরণ পাওয়া যায় আল-জাযায়েরী, আল-খাত্তাবী, ইমাম শামিলসহ আরও অনেকের মাঝে।

আমাদের হাতের কাছেই আছে শহীদ তিতুমীর এবং ফরায়েজী আন্দোলনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিতুমীরের ইসলাহী আন্দোলন এক পর্যায়ে জমিদার এবং ব্রিটিশ দখলদারদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল।

আরবের মুওয়াহহিদুন আন্দোলন থেকে অনুপ্রাণিত হাজী শরীয়াতুল্লাহর তাজদীদী আন্দোলন এক সময় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল আর্থ-সামাজিক নানা জুলুমের বিরুদ্ধে। দুদু মিয়ার সেই বিখ্যাত স্লোগান, 'লাঙল যার, জমি তার'; কোনো সেক্যুলার বুলি ছিল না; এটা ছিল যমীনে আল্লাহর মালিকানা এবং ইনসাফের তাওহীদী ঘোষণা। এভাবেই তাজদীদের প্রকল্পগুলো গণমানুষের আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল।

বাস্তবতা হলো অধিকাংশ মানুষ বিমূর্ত আদর্শ দ্বারা চালিত হয় না। যে মানুষটা ক্ষুধার্ত, যে মধ্যবিত্ত নয়টা-পাঁচটার রুটিনের যাতাকলে ক্লান্তশ্রান্ত, চাইলেও তার জন্য কেবল বিমূর্ত আকীদাহর বয়ান শুনে সক্রিয় হওয়া কঠিন।

এই মানুষগুলোকে কাছে টানতে হলে তাদের প্রতিদিনের দুশ্চিন্তা আর আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কথা বলতে হবে। বিপদের সময় তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। আওয়াজ তুলতে হবে সমাজের জুলুমের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি সমাজ, অর্থনীতি ও শাসনের সমস্যার বাস্তব সমাধান হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপন করতে হবে।

এটা কৌশল না, বরং দ্বীন ইসলামেরই দাবি। অল্প কিছু বিষয়কে 'দ্বীনি' নাম দিয়ে সেগুলোর মধ্যেই যদি আমরা নিজেদের সীমিত রাখি, আবার একইসাথে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানও বলি, তাহলে সেটা ভয়াবহ স্ববিরোধিতা।

স্বল্পমেয়াদি ইস্যু বনাম দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে ইসলামী ঘরানার পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠেছে। এসব লড়াইয়ের পেছনে বহু ত্যাগ ও কুরবানির গল্প আছে, আছে সাময়িক কিছু সফলতাও। কিন্তু এই আন্দোলনগুলো নিজ নিজ সময়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠলেও, শেষ পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি কোনো গন্তব্যের দিকে আগাতে পারেনি। আন্দোলনের ধারাবাহিকতা টেকেনি, ধাপে ধাপে সম্প্রসারণও ঘটেনি। ফলে ইস্যুকেন্দ্রিক কিছু সফলতা আসলেও টেকসই অর্জন এসেছে সামান্যই।

এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো, এই নির্দিষ্ট ইস্যুকেন্দ্রিক আন্দোলনগুলোকে সমাজের প্রধান দ্বন্দ্বের সাথে মেলানো যায়নি।

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার-এর কাজকে স্রেফ তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ হিসেবে না দেখে, একে আমাদের মূল আদর্শিক লড়াইয়ের অংশ হিসেবে দেখতে হবে। কেবল ইস্যু আসলে প্রতিক্রিয়া দেখালেই চলবে না, আবার সামসময়িক সমস্যাগুলোকে উপেক্ষাও করা যাবে না। এখানে ভারসাম্যের প্রয়োজন।

দীর্ঘমেয়াদি কোনো প্রকল্প গড়ে তুলতে হলে প্রতিটি সাময়িক ইস্যুকে ইসলামী ব্যবস্থা বনাম সেক্যুলার ব্যবস্থার চিরন্তন সংঘাতের সাথে মেলাতে হবে। আমাদের চারপাশের প্রতিটা অন্যায় আর জুলুমের শেকড় যে ঐ সেক্যুলার কাঠামোর গভীরে গাঁথা, এই সত্য দাওয়াহর মাধ্যমে স্পষ্ট করা অপরিহার্য।

সামষ্টিকতা

নববী দাওয়াহর এই মহান বৈশিষ্ট্য কেবল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় পূর্ণ করা যাবে না। এটা এক সামষ্টিক দায়িত্ব, যা পালনের জন্য সুসংগঠিত শক্তির প্রয়োজন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর তারাই সফলকাম।'[৭২]

---

[৭২] সূরা আলি ইমরান, ৩:১০৪

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর ভাষায়:

> '...সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দকাজ থেকে নিষেধ করা একটি সামষ্টিক দায়িত্ব। আর যেকোনো সামষ্টিক দায়িত্বের মতোই, যদি এই দায়িত্ব পালনের জন্য পর্যাপ্ত লোক এগিয়ে না আসে, তাহলে যারা এ কাজে সক্ষম, তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্যের পরিমাণ অনুযায়ী গুনাহের অংশীদার হবে। কারণ এই দায়িত্ব যখন অপরিহার্য হয়ে ওঠে, তখন প্রত্যেক মুসলিমের ওপর এটি তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ফরজ হয়ে যায়।'[৭৩]

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই দায়িত্ব পালনের অর্থ হলো, ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুত্তাকি হওয়ার পাশাপাশি সামষ্টিক সক্ষমতা ও মজবুত কাঠামো গড়ে তোলা।

রাখাল: বিচ্ছিন্নতা থেকে সমষ্টি

নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) মেষপালন করেছেন। এ ছিল তাঁদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সবর, দায়িত্বশীলতা ও নেতৃত্বের গভীর পাঠ।

আজ আমাদের সমাজের অবস্থাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ভেড়ার পালের মতো।

মানুষ আজ বিভক্ত, বিভ্রান্ত, স্থবির এবং দুর্বল। আমরা এমন এক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে আছি, যা কওমের আত্মপরিচয়কে প্রায় মুছে ফেলেছে। ইসলামকে আঁকড়ে ধরে যখন কেউ জনপরিসরে আসতে চায়, সে কার্যত 'দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক' হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ ইসলামকে ভালোবাসে, কিন্তু তারা আটকে আছে জাহিলি কাঠামোর ভেতরে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এই জনগোষ্ঠীকে পথ দেখানো ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রকল্পের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আর এর প্রথম ধাপটা হলো বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোকে সমষ্টিতে রূপান্তর করা।

রাখাল কেবল দু-একটা ভেড়াকে পথ দেখায় না। সে সবাইকে এক সাথে করে গন্তব্যে নিয়ে যায়। আর যে ভেড়াটা দলছুট থাকে, নেকড়ে তাকেই আক্রমণ করে। বিচ্ছিন্নতার মানে দুর্বলতা।

---

[৭৩] আস-সিয়াসাহ আশ-শারইয়্যাহ, অধ্যায়: ন্যায়বিচার ও শাসনব্যবস্থা

মানবসমাজের ক্ষেত্রেও একাকী মানুষ চরম অসহায়। তার কোনো শক্তি থাকে না, নিজস্ব কণ্ঠ থাকে না। আধুনিক রাষ্ট্র এই বিচ্ছিন্নতাকেই তার টিকে থাকার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

আগেকার গোত্রীয় সমাজে কোনো ব্যক্তি যখন মজলুম হতো, পুরো গোত্র তার ঢাল হয়ে দাঁড়াত। সামষ্টিক সত্তার অংশ হিসেবে সেখানে তার একটা শক্তি ছিল। এই সামষ্টিক পরিচয় ভাষা, আদর্শ বা দ্বীন—যেকোনো কিছুর ভিত্তিতেই গড়ে ওঠতে পারে।

কিন্তু আধুনিকতা সব ধরনের সামষ্টিকতাকে মুছে দিতে চেষ্টা করে। তার লক্ষ্য থাকে, ব্যক্তিকে সব সামষ্টিক বর্ম থেকে আলাদা করে রাষ্ট্রযন্ত্রের সামনে একা ও নগ্ন করে ফেলা।

এতে এক ধরনের চরম ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়।

একদিকে থাকে রাষ্ট্র নামের এক প্রচণ্ড শক্তিশালী অতিকায় দানব, আর অন্যদিকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন কিছু ক্ষুদ্র মানুষ। রাষ্ট্র তখন ইচ্ছেমতো নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ কিংবা ধ্বংস করতে পারে। কাগজে-কলমে একে 'চুক্তি' বলা হলেও বাস্তবে এটা একতরফা জবরদস্তি।

বিচ্ছিন্ন মানুষ প্রতিরোধ ও পরিবর্তনে অক্ষম। যারা ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত, তারাই নিজেদের ভবিষ্যত গড়ে নিতে সক্ষম। তাই জুলুমের মোকাবিলায় কার্যকর রূপান্তর আনতে হলে বিচ্ছিন্নতাকে সমষ্টিতে রূপান্তর অপরিহার্য।

ক্ষমতার তিন পথ

সেই রূপান্তর কীভাবে হবে?

সমাজের আমূল পরিবর্তনের শক্তি মোটাদাগে তিন উৎস থেকে আসে: অস্ত্রের শক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি এবং গণশক্তি।

অস্ত্রের শক্তি: এটা ক্ষমতার আদিমতম ও সবচেয়ে জোরালো রূপ। আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল্লা বলেছেন,

... وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ...

'আমি নাযিল করেছি লোহা, যাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি...' [৭৪]

[৭৪] সূরা হাদীদ, ৫৭:২৫

কিন্তু আধুনিক যুগে এই শক্তি পুরোপুরি রাষ্ট্রের কবজায়। ম্যাক্স ওয়েবারের ভাষায় আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো 'বৈধ সহিংসতার একক কর্তৃত্ব'। বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়া ছাড়া এই একচেটিয়া কর্তৃত্ব খর্ব হওয়া প্রায় অসম্ভব।

প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি: আইন-আদালত, আমলাতন্ত্র, শিক্ষাব্যবস্থা, গণমাধ্যম, অর্থনীতির জাল, নির্বাচনের কাঠামো আর আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকতার বলয়—সবই প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষমতাটার মূল কাজই হলো সমাজের নিয়মকানুন, বৈধতা, সুযোগ-সুবিধা আর আদর্শের মানদণ্ডগুলো ঠিক করে দেওয়া।

উত্তর-ঔপনিবেশিক সেক্যুলার রাষ্ট্রে এই পুরো ব্যবস্থা কাজ করে সুনির্দিষ্ট একটি আদর্শিক ব্যাকরণ মেনে। এর ভেতরে ঢোকার শর্তই হলো, সেক্যুলারিসম ও লিবারেল ডেমোক্রেসির মূলনীতি মেনে নেওয়া।

যারা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে দেখেন, তারা এই কাঠামো থেকে বাদ পড়ে যান। যারা পরিচয় গোপন করে প্রবেশ করেন, তারা শেষ পর্যন্ত নিজেদের আদর্শ ধরে রাখতে পারেন না। এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভেতরে নিজস্ব এক ধরনের যুক্তি আর মনস্তত্ত্ব কাজ করে, যা শেষ পর্যন্ত ভেতরের মানুষগুলোকেই তার নিজের ছাঁচে বদলে দেয়।

গণশক্তি: এটা সেই উৎস, যেটাকে আমরা সবচেয়ে বেশি অবহেলা করি। অথচ যথাযথভাবে সংগঠিত হলে এটা অন্য শক্তিগুলোকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রথম দুটি রাস্তা বন্ধ। তাই ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রাথমিক পর্যায়ে সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পথ হলো গণশক্তি গড়ে তোলা।

গণশক্তি মানে কেবল সংখ্যা না।

বাংলাদেশে অসংখ্য বক্তার লাখ লাখ শ্রোতা আছে, কিন্তু এই জনসমষ্টি গণশক্তি হয়ে ওঠতে পারেনি। নেতৃত্ব, আদর্শিক স্বচ্ছতা আর অভিন্ন উদ্দেশ্য ছাড়া তৈরি হওয়া জমায়েত দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী।

দূর থেকে সাধারণ মানুষের নিষ্ক্রিয় সমর্থনও গণশক্তি না। গণশক্তির জন্য প্রয়োজন সক্রিয় সংহতি। মানুষের সমর্থনকে যখন সংগঠিত করে নির্দিষ্ট প্রকল্পের অধীনে সক্রিয় করা যায় এবং ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনের ময়দানে ধরে রাখা যায়, তখনই সমর্থন ক্ষমতায় রূপ নেয়—এবং সেটা গণশক্তিতে পরিণত হয়।

গণক্ষমতার কেন্দ্র

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীগণের দাওয়াহর সূচনা হয়েছিল মানুষের মন ও মগজ বদলে দেওয়ার মাধ্যমে। তাঁরা স্রেফ একটা দল বানাননি; বরং এমন এক জামাআহ গড়ে তুলেছিলেন, যাদের মধ্যে ছিল ইস্পাতকঠিন বন্ধন। এই সামাজিক বুননই এক সময় ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

যেকোনো সফল তাজদীদী আন্দোলনের পথও মোটাদাগে একই: দাওয়াহ, ইসলাহ, তাজদীদ, তামকীন এবং সবশেষে সম্প্রসারণ।

তাই আজকেও এই পথচলার শুরুটা হতে হবে তৃণমূল থেকে—নিজ নিজ পাড়ামহল্লা, গ্রাম, স্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র সমাজের কাছ থেকে যে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে, তা আবার সমাজের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। আমাদের যে সামাজিক আর নৈতিক জায়গাগুলো সেক্যুলার রাষ্ট্র জবরদখল করে রেখেছে, সেগুলো উদ্ধার করে গড়ে তুলতে হবে গণক্ষমতার কেন্দ্র। যেন সমাজের প্রতিটা স্তরে সর্বগ্রাসী হয়ে বসে থাকা এই দানবের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে, সমাজের মানুষ নিজের পায়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এর জন্য প্রয়োজন এমন এক অগ্রগামী কাফেলা, যারা মানুষের মধ্যে দক্ষ রাখালের ভূমিকা পালন করবে। যারা আধুনিকতার চূর্ণ করে ফেলা বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোকে একত্রিত করবে তাওহীদী বুনিয়াদের ওপর; সংগঠিত করবে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের প্রকল্পে।

অমোঘ ইমতেহান

ইসলামের পুনর্জাগরণের এই প্রকল্পে যারা শামিল হতে চান, বিশেষ করে শুরুর সময়টাতে, তাদের মধ্যে অবশ্যই কিছু গুণ থাকতে হবে। নিজের সবটুকু উজার করে দেওয়ার মতো একনিষ্ঠতা, কুরবানির মানসিকতা আর প্রচুর ধৈর্য বা সবর।

এগুলোও নববী দাওয়াহর মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

একই সাথে কুরআন ও ইতিহাস থেকে পাওয়া কমন প্যাটার্ন হলো, বিজয় দেওয়ার আগে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করেন, যাচাই করে নেন। তিনি দেখে নেন, বান্দা আসলে তাঁর জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকারে রাজি।

আল্লাহ বলেছেন,

> ‘আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথুকদেরকে।’[৭৫]

এবং

> ‘আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথিরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। তারা আর কিছুই বলেনি- শুধু বলেছে, “হে আমাদের পালনকর্তা! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদের দৃঢ় রাখো এবং কাফিরদের ওপর আমাদের সাহায্য করো।” অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখিরাতের সওয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।’[৭৬]

সত্যের পথে পরীক্ষা, ধৈর্য আর অবিচলতার গুরুত্ব নিয়ে খুব দামি কিছু কথা বলে গেছেন উস্তাদ সাইয়্যিদ কুতুব (রাহিমাহুল্লাহ)। তিনি বলেছেন:

> ‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব নিয়েছেন... যখনই তিনি কোনো সহীহ আন্দোলন দাঁড় করাবার ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি সেই আন্দোলনের অগ্রপথিকদের দীর্ঘ পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন। তাদের বিজয়কে বিলম্বিত করেন, তাদেরকে সংখ্যায় স্বল্প করেন এবং তাদের প্রতি লোকদের সমর্থনকে বিলম্বিত করেন।
>
> যতক্ষণ না তিনি জেনে নেন যে, তারা ধৈর্য ধরেছে, অবিচল থেকেছে, প্রস্তুত হয়েছে এবং শক্ত ভিত বোনার যোগ্য হয়েছে। বিশুদ্ধ, সচেতন এবং বিশ্বস্ত হয়েছে।
>
> ... বিশ্বাসীদের ভিত শক্ত ও শক্তিশালী হবার জন্য এ পরীক্ষা অত্যাবশ্যক।
>
> ... কঠিন পরিস্থিতিই দৃষ্টি থেকে অন্ধকার এবং অন্তর থেকে মরিচা দূর করে। ... তখন বিক্ষিপ্ত সকল ভাবনা আড়ালে চলে যায়, অন্তর শুধুই আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়...।

---

[৭৫] সূরা আনকাবুত, ২৯:১-৩

[৭৬] সুরা আলি ইমরান, ৩:১৪৬-১৪৮

> আর তখনই পর্দা সরে যায়, দৃষ্টি খুলে যায়, দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত দিগন্ত উন্মোচিত হয়... এ অবস্থাতেই কুরআনের আয়াত অন্তরে প্রতিধ্বনিত হয়,
>
> وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
>
> "আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের, যাদের ওপর বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"'[৭৭] [৭৮]

ঈমান বাঁচাতে কলুষিত সমাজ ছেড়ে গুহায় আশ্রয় নেওয়া আসহাবে কাহফ, স্বেচ্ছায় আগুনের পরিখায় ঝাপিয়ে পড়া সত্যে অবিচল সূরা বুরুজের সেই অকুতোভয় মুমিনগণ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)—আল্লাহ বারবার যাদেরকে আমাদের সামনে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, সবার মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পাবেন।

আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে তাঁদের জীবন ওলটপালট হয়ে গেছে। একবার পরীক্ষার পর যখন কিছুটা ছন্দ ফিরে এসেছে, তখন আবার এসেছে নতুন কোনো নির্দেশ। নতুন কোনো ঝড়। নীরব, নিস্তরঙ্গ, ছকে বাঁধা জীবনের বদলে তাঁরা বেছে নিয়েছেন চরম অসহায়ত্ব ও অনিশ্চয়তার জীবন।

এই পরীক্ষা মহান আল্লাহর পরিকল্পনারই অংশ। মুসআব ইবনু সা'দ (রাহিমাহুল্লাহ) তার বাবার কাছ থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাদ) বলেছেন,

> 'আমি প্রশ্ন করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল, মানুষের মাঝে কার বিপদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়?" তিনি বললেন, "নবীদের বিপদের পরীক্ষা, তারপর যারা নেককার তাদের, এরপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরীক্ষা।
>
> মানুষকে তার ধর্মানুরাগের অনুপাত অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। তুলনামূলকভাবে যে লোক বেশি ধার্মিক, তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি কেউ তার দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে, তাহলে তাকে সে মোতাবেক পরীক্ষা করা হয়।"'[৭৯]

---

[৭৭] সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৫৫-১৫৬

[৭৮] তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন

[৭৯] ইবনু মাজাহ, ৪০২৩

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> 'নিশ্চয়ই বড় প্রতিদান বড় পরীক্ষার সাথেই। আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন। অতঃপর যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি; আর যে তাতে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য থাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।'[৮০]

যারা সমাজকে বদলাতে চায়, তাঁদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তিল তিল করে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। কারণ, এ পথে চলতে গেলে পরীক্ষা আসবেই। নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা, ইখলাস, কুরবানি এবং ইহসান অর্জনের ক্রমাগত প্রচেষ্টা ছাড়া, মহান আল্লাহর সাথে বান্দার মজবুত সম্পর্ক ছাড়া—এ পথে টিকে থাকা কঠিন।

খুব চমৎকারভাবে এই পথের পরিচয় দিয়েছেন ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ)। তিনি বলেছেন:

> 'ওহে দুর্বল সংকল্পের অধিকারী! তুমি কোন পথে?
>
> এ তো সে পথ! যে পথে চলতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন আদম। নূহ কান্না করেছিলেন। ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। ইসমাইলকে জবেহ করার জন্য শোয়ানো হয়েছিল। সস্তা দামে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল ইউসুফকে। করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে জাকারিয়াকে। জবেহ করা হয়েছে সাইয়্যিদ ইয়াহইয়াকে। আইয়ূব রোগে ভুগেছেন। দাউদের কান্না সীমা অতিক্রম করেছে। নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছেন ঈসা। আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম।
>
> নানা দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট ভোগ করেছেন শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ। আর তুমি (এখনো) খেল-তামাশায় মত্ত!'[৮১]

মানুষ সাধারণত দ্রুত ফলাফল দেখতে চায়। কিন্তু এই পথটা যেমন কঠিন, তেমন লম্বা। কেবল আবেগ আর আগ্রহ এখানে যথেষ্ট না। তার সাথে থাকা চাই ধৈর্য, অধ্যবসায় আর ঈমানের মজবুত ভিত্তি।

যারা এ কাফেলায় শামিল হবে, তাঁদের ভেতর পরিবর্তনের আগুন থাকা খুব জরুরি। তবে সেই আগুন যেন হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে তারপর আবার নিমিষেই নিভে না যায়। এ আগুনকে জ্বলতে হবে দীর্ঘ সময়ের জন্য; এক নিরন্তর

---

[৮০] ইবনু মাজাহ, ৪০৩১

[৮১] আল-ফাওয়ায়িদ লি-ইবনিল কাইয়্যিম, ৪৫ পৃষ্ঠা

সংকল্প হিসেবে। বুকের ভেতরে এক সযত্নে বয়ে বেড়াতে হবে, যাতে আগুনের আলোকে পৌঁছে দেওয়া যায় এক অন্তর থেকে বহু অন্তরে।

আর আগুন মাত্রই পোড়ায়। এই আগুনও পোড়াবে। অনেক যন্ত্রণার মুখে দাঁড় করিয়ে দেবে। কিন্তু মহান আল্লাহর ফয়সালা না আসা পর্যন্ত এই দহন আর কষ্টকে সঙ্গী করেই আমাদের পথ চলতে হবে।

আর যারা শেষ পর্যন্ত অবিচল থাকবে, তাদের জন্য আমাদের রবের প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট:

> 'নিশ্চয়ই যারা বলে, "আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ", অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় কোরো না, চিন্তা কোরো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোনো। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং তোমরা যে জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করো, তোমাদের জন্য সেখানে তা-ই আছে।'[৮২]
>
> আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, 'আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।'

[৮২] সুরা ফুসসিলাত, ৪১:৩০-৩১

খাঁচা ভাঙার সূত্র

নববী দাওয়াহর এই বৈশিষ্ট্যগুলো সমাজ পরিবর্তনের ইলাহী সূত্র।

এই সূত্রগুলো যখন বাস্তবে যথাযথভাবে প্রয়োগ হয়, তখন হক ও বাতিলের মধ্যে একটা স্পষ্ট বিভাজন দেখা দেয়। বাতিলের মুখোশ সরে যায়। হক স্বমহিমায় সামনে আসে। আর জাহিলিয়াতের কাঠামোর সাথে শুরু হয় অনিবার্য দ্বন্দ্ব।

এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনটা বিষয় ঘটতে থাকে:

- **মেরুকরণ:** সমাজে হক ও বাতিলের পক্ষ স্পষ্ট হয়ে যায়
- **মনোজগতে বিপ্লব:** মানুষের চিন্তাজগতে মৌলিক পরিবর্তন
- **সামাজিক শক্তি:** হকের পক্ষে একটা দৃশ্যমান শক্তি গড়ে ওঠে

এই তিনটা পরস্পর জড়িত এবং এগুলোর মধ্য দিয়েই কাঙ্ক্ষিত সেই বুনিয়াদ ক্রমশ দৃশ্যমান হতে শুরু করে।

মেরুকরণ

নবীদের দাওয়াহ কোনো সমাজে প্রবেশ করার মুহূর্ত থেকেই এক কাঠামোগত বিশৃঙ্খলা বা systemic disruption তৈরি করে। হকের দাওয়াহ যখন জাহিলি কাঠামোর শেকড় নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তখন সমাজে ফাটল ধরে অবধারিতভাবে।

কুরাইশ নবী ﷺ সম্পর্কে বলেছিল, তিনি ভাইয়ে ভাইয়ে বিভেদ করছেন, পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক নষ্ট করছেন, গোত্রের ঐক্য ধ্বংস করছেন। আধুনিক ভাষায় বললে, তিনি সমাজের 'শান্তি ও স্থিতিশীলতা' নষ্ট করে 'বিশৃঙ্খলা' তৈরি করছেন।

কিন্তু কুরাইশদের চাওয়া স্থিতিশীলতা ছিল জাহিলিয়াতের অধীনে স্থিতিশীলতা। শিরক ও কুফরকে মেনে নিয়ে পাওয়া 'শান্তি'। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) এ-ধরনের স্থিতিশীলতা আর শান্তির মিথ্যা আবরণ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন।

নবীদের দাওয়াহ মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনানোর ছিল না, এতে ছিল সমাজ ও শাসনের আমূল পরিবর্তনের ডাক। তাঁরা দুনিয়াতে মানুষের সামনে হুজ্জাহ কায়েম করেছেন এবং বিদ্যমানতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকা পঙ্কিলতাগুলোকে চ্যালেঞ্জ করেছেন প্রকাশ্যে।

নবীদের এই দাওয়াহ সমাজকে এক গভীর সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। মানুষের সামনে থেকে কেড়ে নেয় 'নিরপেক্ষ' থাকার বিলাসিতা। সমাজকে এমন এক বিন্দুতে নিয়ে যায়, যেখানে মানুষকে হয় হক অথবা বাতিল—যেকোনো এক পক্ষ বেছে নিতে হয়।

আর এই মেরুকরণই হলো সমাজ পরিবর্তনের প্রথম এবং অপরিহার্য শর্ত।

এই মেরুকরণ মহান আল্লাহর চাওয়া। জাহিলিয়াত এবং তাগুতি ব্যবস্থার সামনে সত্য বলার ফলে বিভক্তি আসবেই, বিশৃঙ্খলা হবেই। এর কোনো বিকল্প নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত হক ও বাতিলের সীমারেখা স্পষ্ট না হবে, ততক্ষণ হক ও বাতিল একসাথে মিশে থাকবে। আর এই মিশে থাকা মানেই হলো বাতিলের আধিপত্য।

ইসলামী ইনকিলাবের বুনিয়াদ গড়তে হলে এই মেরুকরণকে প্রধান দ্বন্দ্বের ওপর দাঁড় করাতে হবে। এর মাধ্যমে ইসলাম ও সেক্যুলার ব্যবস্থার সংঘাত সমাজের মূল প্রশ্ন হিসেবে হাজির হবে। আর কেবল তখনই মানুষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হবার সাহস পাবে।

মেরুকরণই ইসলামী জীবনব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষাকে তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে মুক্ত করে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় রূপ দেবে।

মনোজগতে বিপ্লব

বিপ্লবের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন হয় ময়দানে, কিন্তু শুরুটা হয় মানুষের মনোজগতে। মানুষের চিন্তার ধরন যখন বদলাতে শুরু করে, তখন অবধারিতভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে। ইতিহাসের প্রতিটা বড় বিপ্লব আসলে সেই চিন্তারই ফসল, যা মানুষের মগজে আগেই এক অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়ে ফেলেছিল।

আমাদের সমাজে সেক্যুলার-প্রগতিশীল গোষ্ঠী মানুষের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা আর কল্পনার জগতকে দখল করে রেখেছে। তারা তাদের স্লোগানগুলোকে গণমানুষের অবচেতন মনে কমনসেন্স হিসেবে গেঁথে দিতে পেরেছে। মানুষ যখন

ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, তখন নিজের অজান্তেই সেক্যুলার ফ্রেমওয়ার্কের ভেতরে ভাবে। ইসলাম কিংবা শরীয়াহর প্রশ্ন সেখানে স্থান পায় না।

এ বাস্তবতা আমাদের স্বীকার করতে হবে।

এই মানুষগুলো আদর্শিকভাবে সেক্যুলার না। তারা ইসলামকে ভালোবাসে। কিন্তু দেশ ও জাতির ভবিষ্যত নিয়ে ভাবার সময় তাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার জায়গাতে ইসলাম প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে না।

সেক্যুলাররা যেভাবে তাদের প্রকল্পগুলোকে মানুষের মগজে গেঁথে দিতে পেরেছে, আমরা শরীয়াহর দাবিকে সেভাবে একটা অনিবার্য প্রয়োজন হিসেবে মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারিনি। এটা তাদের সাফল্য, আমাদের ব্যর্থতা।

স্রেফ বিদ্যমান ব্যবস্থার সমালোচনা করে সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়া যায় না। নেতৃত্ব দিতে হলে বিকল্প হিসেবে এমন কোনো ভিশন সামনে রাখতে হয়, যার জন্য মানুষ নিজেকে উজাড় করে দিতে প্রস্তুত হবে। আর তার জন্য আগে মানুষকে বোঝাতে হয় যে, বিকল্প সম্ভব।

তাই ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রকল্পের অন্যতম প্রধান কাজ হলো ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে একটা বিমূর্ত ধারণা থেকে বের করে এনে, বাস্তব সমাধান হিসেবে পেশ করা।

জঙ্গল যখন অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে যায়, তখন দাবানলের দরকার হয়। কিন্তু নতুন করে বীজ বোনা না হলে দাবানল শেষে শুধু ধ্বংসস্তূপই পড়ে থাকে। ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য শুধু ভাঙার জযবা থাকলে চলবে না, গড়ার কারিগরিও জানতে হবে।

আজ মানুষ যখন জুলুম ও না-ইনসাফির প্রতিকার খুঁজতে যায়, সে অবধারিতভাবে গতানুগতিক রাজনীতির আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। কারণ, মানুষের চিন্তার কম্পাস ভুল দিকে মুখ করে আছে। যদি আমরা বিজয় চাই, তবে এই কম্পাসকে এমনভাবে ঘুরিয়ে দিতে হবে, যেন তারা আদল ও ইনসাফ বলতে ওহীর বিধানকেই চিনতে শেখে।

অন্যদিকে মানুষ যদি ইসলামকে কেবল ‘আসমানের ওপরের আর যমীনের নিচের’ বিষয় হিসেবে দেখে, তাহলে ইসলামী ইনকিলাব তাদের কাছে একটা তাত্ত্বিক বিলাসিতা হিসেবেই থেকে যাবে। যাপিত জীবনের বাস্তব সমাধান হিসেবে ইসলামের কথা তারা চিন্তা করতে পারবে না। এমন অবস্থায় ইসলামী ইনকিলাবের প্রকল্প সফলভাবে দাঁড় করানো অসম্ভব; এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

তাই কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের পূর্বশর্ত হলো, মানুষের মনোজগতে সেই বিপ্লবের বীজ বুনে দেওয়া। চিন্তার কম্পাস পালটে দেওয়া। সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও জনপরিসরকে প্রভাবিত করে 'গ্রহণযোগ্য রাজনীতি'র সীমানাকে দ্বীন ইসলামের দিকে টেনে আনা।

আমাদের প্রয়োজন রাজনীতি এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারে সামষ্টিক চিন্তার প্যারাডাইম শিফট। চিন্তার জগতে এই পরিবর্তন ছাড়া সমাজে ও শাসনের স্থায়ী রূপান্তর আশা করা যায় না।

সামাজিক শক্তি

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কীভাবে সেক্যুলার রাষ্ট্র ইসলামকে খাঁচায় বন্দি করে রেখেছে। ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জনপরিসরে আসতে চাইলে হয় বিদ্যমান কাঠামোর সাথে আপস করতে হয়, নয়তো প্রান্তিকতা মেনে নিয়ে হতে হয় জনবিচ্ছিন্ন।

এই খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসার উপায় হলো, সামাজিক শক্তি অর্জন করা।

কিন্তু সামাজিক শক্তি কী?

বিপ্লবের মতো সামাজিক শক্তিও এমন একটা শব্দ, যা শুনলে পরিচিত মনে হয়। আমরা সবাই নিজের মতো করে এর একটা অর্থ ধরে নিই। অনেকে মনে করেন, প্রচুর সম্পদ, প্রতিষ্ঠান বা বিপুল জনসমর্থন থাকাটাই সামাজিক শক্তি।

বাস্তবতা ভিন্ন। কোনো জনগোষ্ঠী সংখ্যায় বেশি বা দেশের বিপুল সম্পদের মালিক হয়েও রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে চূড়ান্ত কোণঠাসা হয়ে থাকতে পারে।

রাষ্ট্র এবং সমাজবিজ্ঞানে সামাজিক শক্তির সুনির্দিষ্ট অর্থ এবং সংজ্ঞা আছে।

বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জিন শার্প-এর মতে:

> 'সামাজিক শক্তি হলো এমন সব ধরনের প্রভাব ও চাপপ্রয়োগের সক্ষমতার সমষ্টি, যা (সমাজের) কোনো এক গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর ওপর প্রয়োগ করে। এই শক্তি প্রয়োগ করা হয় অন্যদের আচরণকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে, অথবা সামষ্টিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সেই গোষ্ঠীর নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে।'[৮৩]

---

[৮৩] Sharp, Gene. *How nonviolent struggle works.* Albert Einstein Institution, 2013.

অর্থাৎ, সামাজিক শক্তি হলো নিজের চারপাশের পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করার ক্ষমতা। এটা কেবল সামষ্টিকতা না, বরং সামষ্টিকতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের সামর্থ্য। সামাজিক প্রভাব, আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক বয়ান, চাপ প্রয়োগের ক্ষমতা—সবই সামাজিক শক্তির অংশ।

তবে ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রকল্পে সামাজিক শক্তির একটা বাড়তি মাত্রা আছে।

এখানে এই শক্তি শুধু নিজেদের স্বার্থ রক্ষা বা সীমিত দাবি আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। বরং এ শক্তি অর্থবহ হয়ে ওঠবে, যখন তা হবে জনপরিসরে দৃশ্যমান, বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে আপসহীন, শরীয়াহর অনুগামী এবং সুনির্দিষ্ট ইনকিলাবি প্রকল্পের অধীনে সংগঠিত।

সামাজিক শক্তি অর্জনের পথ প্রশস্ত হবে, যখন মেরুকরণ এবং মনোজগতে বিপ্লব—এ দুটো পরিবর্তন একসাথে ঘটবে।

এ প্রক্রিয়াগুলো একে অপরের পরিপূরক।

মেরুকরণ হক ও বাতিলের সীমারেখা স্পষ্ট করে দেয়। আর মনোজগতের বিপ্লব পালটে দেয় মানুষের চিন্তার কেন্দ্র। মানুষ তখন দুনিয়াকে ইসলামের চোখে দেখতে শুরু করে। সহানুভূতিশীল দর্শক থেকে সে তখন দ্বীনের সচেতন অংশীদারে পরিণত হতে চায়।

ঠিক তখনই তৈরি হয় সুসংগঠিত, সচেতন এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ গণশক্তি। আর সঠিক আদর্শ, নেতৃত্ব আর প্রকল্পের অধীনে গড়া গণশক্তিই সামাজিক শক্তির কেন্দ্র।

ব্যাপারটা এভাবে দেখুন।

এখন আপনি দর্শকের কাতারে। সমাজে বা জাতীয় জীবনে যা হয়, তা নিয়ে আনন্দ বা দুঃখপ্রকাশের বাইরে তেমন কিছু করার ক্ষমতা আপনার নেই। কোনো বিষয় যত তীব্রভাবেই আপনাকে স্পর্শ করুক না কেন, সে বিষয়ে সত্যিকার অর্থে কোনো ভূমিকা রাখার সামর্থ্য নেই আপনার।

আপনি দাঁড়িয়ে আছেন মাঠের বাইরে।

সামাজিক শক্তি অর্জনের অর্থ হলো ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রকল্প তার বিপ্লবী ইশতেহার নিয়ে জনপরিসরে হাজির হতে পারা।

দর্শকের কাতার থেকে নেমে আপনার খেলোয়াড় হয়ে ওঠা।

আর এটাই ইসলামের চারপাশে বানানো খাঁচা ভেঙে ফেলার অর্থ।

***

ইনকিলাব এক দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া।

কৃষক যমীনে দাঁড়িয়েই ফসল আশা করে না। সে জানে তাকে লাঙ্গল দিতে হবে, বীজ বুনতে হবে, পানি দিতে হবে। পাড় করতে হবে নানা ধাপ। তারপর, রাব্বুল আলামীন চাইলে ফসল আসবে।

ঠিক তেমনি, কাজের এই ময়দানে নববী দাওয়াহর শিক্ষাগুলো জীবন্ত করে তুললেই কেবল কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন শুরু হবে।

হক আর বাতিলের তাবু আলাদা হবে, মানুষের চিন্তার কেন্দ্র পাল্টাতে শুরু করবে, তৈরি হবে সামাজিক শক্তি। এই তিনটা যখন এক বিন্দুতে এসে মিলবে, তখন সম্পন্ন হবে বুনিয়াদ গড়ার প্রাথমিক পর্ব।

ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রকল্প তখন রূপান্তরিত হতে পারবে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনে। যে আন্দোলন ধাপে ধাপে কওমকে নিয়ে যাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষ এক হবে। দক্ষ রাখাল তাঁদের পথ দেখাবে।

শুরু হবে মুসলিমবঙ্গের দিকে দীর্ঘ যাত্রা।

কিন্তু তার আগে আমাদের বুনিয়াদ গড়তে হবে।

অধ্যায় ৪

অগ্রপশ্চাৎ

১৪৫৩ সালের এপ্রিল।

কনস্ট্যান্টিনোপলের বিশাল প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একুশ বছরের সুলতান মুহাম্মাদ। সামনে এক কঠিন ধাঁধা। শহরটা শুধু পাথরের দেয়াল দিয়েই ঘেরা না, এর প্রাণভোমরা গোল্ডেন হর্ন বন্দরকে সিলগালা করে রাখা হয়েছে বিশাল এক লোহার শেকল দিয়ে। ওই বন্দরে ঢুকতে না পারলে কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয় অসম্ভব।

বাঘা বাঘা সব বিজেতা বারবার এই প্রতিরক্ষা ব্যূহের কাছে এসে হার মেনে ফিরে গেছে। এখন মুহাম্মাদও সেই একই ফাঁদে আটকা।

অভিজ্ঞ উপদেষ্টারা সাফ জানিয়ে দিল, লোহার শেকল ডিঙানো অসম্ভব। ফিরে চলুন। তাদের চোখে সুলতান তখনো নিছকই এক স্বপ্নবিলাসী জেদি তরুণ, যিনি বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে চাইছেন।

কিন্তু মুহাম্মাদ আর দশজন সাধারণ মানুষের চোখে দুনিয়াকে দেখছিলেন না। তাঁর দৃষ্টি ছিল ইতিহাসের পাঠ নেওয়া দক্ষ রণকৌশলীর।

মাত্র চৌদ্দ বছর আগের ঘটনা। ভেনিশিয়রা পাহাড় ডিঙিয়ে আস্ত নৌবহর নামিয়ে এনেছিল লেক গার্দার বুকে। তারও বহু আগে, করিন্থের ইস্থমাস পেরোতে প্রাচীন গ্রিকরা ডাঙা দিয়ে জাহাজ টেনে নিয়েছিল।[১] ইতিহাস আর সমরবিদ্যার তুখোড় ছাত্র মুহাম্মাদের কাছে এসব নজির অজানা ছিল বলে মনে হয় না।

[১] করিন্থের ইস্থমাস (Isthmus of Corinth): গ্রিসের মূল ভূখণ্ড ও পেলোপনিস উপদ্বীপের সংযোগকারী সরু স্থলভাগ, যার ওপর দিয়ে প্রাচীনকালে জাহাজ টেনে এক সাগর থেকে অন্য সাগরে পার করা হতো।

সাধারণ মানুষের কাছে এসব নিছক ইতিহাসের মজার গল্প। কিন্তু সুলতান মুহাম্মাদের জহুরির চোখ হয়তো সেখানেই খুঁজে নিয়েছিল বিজয়ের অভাবনীয় সূত্র। তিনি মূল রহস্যটা ধরতে পেরেছিলেন। শত্রুর নিয়ম মেনে নিলেই কেবল বাধাটা পেরোনো অসম্ভব। কিন্তু নিয়মটা যদি পালটে দেওয়া যায়?

সবাই যখন পানির দিকে তাকিয়ে আছে, মুহাম্মাদ তখন নজর দিলেন ডাঙার দিকে। তিনি ঠিক করলেন, শত্রুর নিয়মে খেলবেন না।

২২শে এপ্রিলের রাত।

সুলতান মুহাম্মাদ পাশ কাটালেন সেই 'অসম্ভব' শেকলটাকে। পানি দিয়ে না, ডাঙা দিয়ে। হাজার হাজার সৈন্য মিলে গালাতার খাড়া, এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের ওপর দিয়ে পেতে দিল চর্বি মাখানো কাঠের গুড়ি। ভোরের আলো ফোটার আগেই সত্তরটা উসমানী যুদ্ধজাহাজ পাহাড় বেয়ে পিছলে নিচে নেমে এলো।

কেল্লায় অবরুদ্ধ খ্রিষ্টানরা ঘুম ভেঙে দেখল এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। উসমানী নৌবহর এসে দাঁড়িয়েছে তাদের সুরক্ষিত বন্দরের ঠিক মাঝখানে!

'অলীক কল্পনা' এক রাতেই পালটে গেল জলজ্যান্ত বাস্তবে।

সুলতান মুহাম্মাদ কোনো জাদুর কাঠি পাননি, স্রেফ ইতিহাসের পাতায় লুকিয়ে থাকা একটা ব্যবহারিক প্রমাণকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন। কনস্ট্যান্টিনোপলকে দখল করে বানিয়েছিলেন ইস্তাম্বুল। আর সেই সুবাদে ইতিহাসের পাতায় খোদাই করে নিয়েছিলেন নিজের জায়গা; বিজয়ী মুহাম্মাদ, সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ নামে।

সেতুবন্ধন

১৪৫৩ সালে লোকে যাকে বলেছিল পাগলামি, আমরা এখন সেটাকে বলছি মাস্টারস্ট্রোক। ইতিহাসের পাতায় এই ছকটা পুরোনো। সফলতা আসার আগে মানুষ বরাবরই গতানুগতিকতার গণ্ডির বাইরের চিন্তাকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয়।

আগের অধ্যায়ে আমরা যা কিছু আলোচনা করলাম, অনেকের কছে তা হয়তো অবাস্তব লাগতে পারে। মনে হতে পারে—বুনিয়াদ ও ইনকিলাব, সামাজিক শক্তি আর সামাজিক আন্দোলনের কথাগুলো স্রেফ তাত্ত্বিকতা। ঈমানী জাগরণ থেকে সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক শক্তি গড়ার আলাপটা অনেকের কাছে অলীক স্বপ্নের মতো শোনাতে পারে।

কিন্তু আমরা যা বলছি, তা অবাস্তব কিছু না। বরং এই যমীনের ইতিহাসেই সেই প্রুফ অফ কনসেপ্ট আছে, যা আমাদের দাবির সাথে মিলে যায়। নববী দাওয়াহর নকশাকে কাজে লাগিয়ে সমাজ রূপান্তরের জ্বলজ্বলে দলিল বাংলার ফরায়েজী আন্দোলন। ইসলামী পুনর্জাগরণ কীভাবে একটা ঘুণে ধরা সমাজকে ভেতর থেকে পাল্টে দিতে পারে, এই আন্দোলন তার অনন্য দৃষ্টান্ত।

হাজী শরীয়তউল্লাহ এবং দুদু মিয়া এমন সময়ে কাজ শুরু করেছিলেন, যখন বাংলার মুসলিমদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ঈমানী শক্তি প্রায় ভেঙে পড়েছিল। এ অবস্থায় তাঁদের গড়া আন্দোলন কেবল ধর্মীয় সংস্কারে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং শূন্য থেকে শুরু করে গড়ে তুলেছিল ক্ষমতার এক বিকল্প কেন্দ্র। ব্রিটিশ রাজের ভেতরেই তাঁরা এমন এক ছায়াশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা সমকালীন কর্মকর্তাদের ভাষাতেই হয়ে ওঠেছিল 'রাষ্ট্রের ভেতরে আরেক রাষ্ট্র'।

সামাজিক শক্তির পর্যায় পার হয়ে ফরায়েজীরা পৌঁছে গিয়েছিল দুর্বার এক সামাজিক আন্দোলনে। এক অর্থে, হাজী শরীয়তউল্লাহ এবং দুদু মিয়া এই জনপদে মুসলিমবঙ্গ নির্মাণের প্রথম কারিগর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ফরায়েজী আন্দোলন দ্বীনের তাজদীদের মাধ্যমে বুনিয়াদ তৈরির এক সফল উদাহরণ। একইসাথে চূড়ান্ত ইনকিলাব পর্যন্ত পৌঁছাতে তাঁদের যে ব্যর্থতা, তা-ও আমাদের জন্য এক বড় শিক্ষা।

তবে এই তাজদীদী প্রকল্পকে তার প্রকৃত মহিমায় বুঝতে হলে কলোনিয়াল ইতিহাস চর্চার বাক্স থেকে বের হয়ে, এই আন্দোলনের সত্যিকারের চেহারাটা আমাদের চিনে নিতে হবে।

চশমা বদল

ফরায়েজী আন্দোলনকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেউ একে শুধু কৃষিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক আন্দোলন হিসেবে দেখেছেন। কেউ বলেছেন, এটা ধর্মীয় আন্দোলন, যার মধ্যে কিছু আর্থ-সামাজিক মাত্রা থাকলেও, এর রাজনৈতিক চরিত্র ছিল না। মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদরা এখানে কেবল শ্রেণিসংগ্রাম আর কৃষক বিদ্রোহ খুঁজে পেয়েছেন। এই লড়াইয়ের যে একটা গভীর ইসলামী বুনিয়াদ ছিল, তাদের বিশ্লেষণে সেটা তেমন গুরুত্ব পায়নি। আধুনিক গবেষণাগুলোতেও ফরায়েজী আন্দোলনকে মূলত কৃষিভিত্তিক আন্দোলন হিসেবে দেখানো হয়।

তাজদীদী আন্দোলনগুলোকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রায়ই এ-ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। বিশেষ করে পশ্চিমা ধাঁচের গবেষণাগুলোতে। গবেষকরা জটিল সব ঘটনার একটা অতি সরলীকৃত, অনেক সময় একমাত্রিক ছবি আঁকেন। কেউ এগুলোকে স্রেফ ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে দেখেন। যেখানে ধর্মের সংজ্ঞা আর সীমানা নেওয়া হয় ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা আর বুঝের আলোকে।

কেউবা আবার জোর করে পুরো ব্যাপারটাকে একটা সেক্যুলার ছাঁচে ফেলে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। যেখানে এসব আন্দোলনের ইসলামী ভিত্তি, ইসলাহ (সংস্কার) এবং তাজদীদ (পুনর্জাগরণ) এর দিকগুলো বেমালুম গায়েব হয়ে যায়।

এ-ধরনের একপেশে বা সংকীর্ণ ব্যাখ্যার শিকার হয়েছেন আরবের মুওয়াহহিদুন, আফ্রিকার ফুলানী, সুদানের মাহদিয়া, লিবিয়ার সানুসিয়া, ভারতবর্ষের বারাসাত, তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া এবং ফরায়েজীরাসহ আরও অনেকে আন্দোলন। একই ধরনের প্রবণতা আধুনিক ইসলামী আন্দোলনগুলোকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

এ-ধরনের ব্যাখ্যা একদিকে যেমন তাজদীদ বা ইসলামী পুনর্জাগরণকে বুঝতে ব্যর্থ, তেমনি অন্যদিকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক মাত্রাগুলো আমলে নিতেও অক্ষম।

তারা ধর্ম বলতে যা বোঝেন, সেটা গড়ে ওঠেছে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে। আন্দোলনগুলো যখন এই চেনা ছাঁচে ধরা দেয় না, তখন তারা একে পুরোপুরি সেক্যুলার মোড়কে দেখেন, নয়তো এমন একটা সংকীর্ণ ধর্মীয় গণ্ডিতে আটকে ফেলেন, যেখানে রাজনীতি কিংবা অর্থনীতির মতো কোনো কিছুর জায়গা নেই।

তারা যে জিনিসটা একদমই ধরতে পারেন না, সেটা হলো ইসলামে ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন আর শাসন বিচ্ছিন্ন না। দ্বীনের পুনর্জাগরণ মানে তসবীহ হাতে মাসজিদের এক কোণে বসে থাকা না। এটা সমাজকে ওহীর আলোতে আমূল বদলে দেওয়ার প্রক্রিয়া।

বাংলার ফরায়েজী আন্দোলন

১৭৫৭-এর ২৩শে জুন, পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের সাথে সাথে মুসলিমদের হাত থেকে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে গেল। শুরু হলো লাঞ্ছনার লম্বা অধ্যায়।

বিজয়ের পর ফিরিঙ্গিরা শুরু করল শুদ্ধি অভিযান। প্রশাসন আর সেনাবাহিনী থেকে মুসলিমদের সরিয়ে দিল পুরোপুরি। সেখানো বসালো এই যমীনে তাদের সবচাইতে অনুগত মানুষদের; কলকাতার সেইসব বেনিয়া আর হিন্দু এলিটদের, যারা কোম্পানির সাথে আগে থেকেই আঁতাত করে রেখেছিল। সাদা চামড়ার প্রভুদের আশীর্বাদ পেয়ে রাতারাতি এই মানুষগুলোই হয়ে ওঠল এদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।[২]

এরপর ওরা নজর দিল জমির দিকে। ফিরিঙ্গিরা জানত, একটা জাতির আর্থিক আর সামাজিক ভিত্তিকে ধ্বংস না করে, কেবল গায়ের জোরে তাদের বেশিদিন দাবিয়ে রাখা যায় না। তাই পলাশীর পরের বছরগুলোতে মুসলিমদের জমি দখল করতে শুরু করল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৭৯৩-এ নিয়ে এলো কুখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। রাতারাতি তৈরি করল অনুগত নতুন হিন্দু জমিদার শ্রেণি।[৩]

মোঘল আমলে প্রভাবশালী মুসলিম পরিবারগুলোকে লাখেরাজ বা করমুক্ত জমি দেওয়া হয়েছিল, যা দিয়ে চলত আমাদের মাসজিদ, মাদরাসা, ওয়াকফ আর খানকাহগুলো। ফিরিঙ্গিরা একে একে সেইসব সম্পত্তি দখল করে নিল।[৪]

পরপর এই ধাক্কাগুলোর ফলে মুসলিমদের সামাজিক আর অর্থনৈতিক কাঠামোটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। আর্থিক ভিত হারিয়ে পঙ্গু হয়ে গেল আমাদের শিক্ষা আর সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো।[৫]

এরপর শুরু হলো সাধারণ কৃষকদের ওপর নারকীয় জুলুম। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নতুন জমিদারদের দিল লুটপাটের লাইসেন্স। সাধারণ মানুষের ওপর তারা ইচ্ছেমতো খাজনা বসাতে শুরু করল। এমনকি জমিদার বাড়ির ছেলেমেয়ের বিয়ে

---

[২] Ali, Muhammad Mohar. History of the Muslims of Bengal: Muslim Rule in Bengal: (600-1170 / 1203-1757). Islamic Foundation Bangladesh, 2003, pp. 656-683

[৩] Spear, Percival. A History of India vol. II. Penguin books, 1990

[৪] Mallika, E. Āra. British policy and the Muslims in Bengal, 1757-1856. Bangla Academy, 1977.

[৫] Ali, History of the Muslims of Bengal, 1B:32–39, 113–46.

কিংবা পূজার খরচও তারা আদায় করত গরিব কৃষকের কাছ থেকে।[৬]

ঈমানী দিক থেকে বাংলার মুসলিমদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। হিন্দু আর বৌদ্ধদের সাথে শত শত বছর থাকতে থাকতে কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক শিক্ষা মুসলিমরা ভুলতে বসেছিল। সমাজে ঢুকে পড়েছিল এমন সব প্রথা-প্রচলন আর বিশ্বাস, যা তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক।

পণ নেওয়া ও বিধবা বিয়ে বন্ধের মতো রীতিগুলো সমাজে শেকড় গেড়ে বসেছিল। বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করার জন্য মানুষ হিন্দু পঞ্জিকা দেখত, মেয়ের প্রথম ঋতুস্রাবের সময় বাড়ির সামনে পুঁতে দিত কলাগাছ, পীরদের মনে করত আল্লাহ আর মানুষের মাঝখানে মধ্যস্থতাকারী। এমনকি হোলি, শিবরাত্রি আর রথযাত্রার মতো উৎসবেও অবলীলায় অংশ নিত মুসলিমরা।[৭] বিদআহ, কুফর আর শিরক ছড়িয়ে গিয়েছিলে সমাজ জুড়ে।

হাজী শরীয়তউল্লাহ

এই পরিস্থিতিতে ১৮১৮ সালে দ্বীন, কওম ও যমীনের স্বার্থে এগিয়ে এলেন ইতিহাসের এক কিংবদন্তী, হাজী শরীয়তউল্লাহ। ১৭৮১-তে ফরিদপুরে জন্ম নেওয়া এই মানুষটি প্রায় কুড়ি বছর কাটিয়েছিলেন মক্কায়। ইলম সাধনায়। এটা ছিল এমন এক সময়ে, যখন মক্কা ও মদীনা ছিল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের মুওয়াহহিদুন বা 'ওয়াহাবী' আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণে। বিশিষ্ট ফরায়েজী গবেষক ড. আহসানউল্লাহ ফয়সালের মতে, হাজী শরীয়াতুল্লাহর চিন্তায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল এই আন্দোলন।

মক্কা থেকে ফিরে হাজী শরীয়াতউল্লাহ যখন দেখলেন, তাঁর কওমের মানুষ শিরক ও বিদআহর গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি শুরু করলেন এক সংস্কার আন্দোলন; যা ইতিহাসে ফরায়েজী আন্দোলন নামে পরিচিত।

ফরায়েজী আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বিশুদ্ধ তাওহীদের ওপর জোর দেওয়া আর কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি নিখুঁত আনুগত্য তৈরি করা। আরও অনেক তাজদীদী আন্দোলনের মতোই ফরায়েজীরা মুসলিমদের ইসলামের প্রথম প্রজন্মগুলোর অর্থাৎ সালাফুস সালিহীনের আদর্শে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানায়।

---

[৬] দেখুন Day, Lal Behari. Govinda Sámanta: Or the History of a Bengal Ráiyat. Macmillan, 1874. pp. 256-262

[৭] Ullah, Muhammad Ahsan. "Ideology of The Faraizi Movement of Bengal." PhD diss., Aligarh Muslim University, 2001.

মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়া কুফর, শিরক ও বিদআহর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয় এই আন্দোলন।[৮]

প্রচলিত প্রথা আর কুসংস্কার বাদ দিয়ে কালিমা, নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ—ইসলামের এই পাঁচটি ফরজ পালনের ওপর হাজী শরীয়তউল্লাহ বিশেষভাবে জোর দেন। এ কারণে তাদের নাম হলো ফরায়েজী। *ফরায়েজী* শব্দটি এসেছে ফারাইদ (فَرَائِض) থেকে যা ফারীদাহ (فَرِيضَة)-এর বহুবচন; যার অর্থ ইসলামের অপরিহার্য ফরজ বিধানসমূহ।[৯]

দ্বন্দ্ব ও বিস্তার

হাজী শরীয়তউল্লাহর এই ইসলাহ বা সংস্কারের প্রকল্প খুব দ্রুত তাঁকে জমিদার আর একদল ধর্মীয় নেতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের খরচ তোলার জন্য মুসলিম কৃষকদের ওপর যে খাজনা চাপিয়ে দেওয়া হতো, হাজী সাহেব তার বিরুদ্ধে শক্তভাবে প্রতিবাদ জানালেন। জমিদাররা দ্রুতই বুঝে ফেলল, শরীয়তউল্লাহ স্রেফ একজন ধর্মীয় নেতা না, রাজনৈতিকভাবেও তিনি তাদের জন্য হুমকি হয়ে ওঠছেন।[১০]

ফরায়েজীদের দমানোর জন্য জমিদাররা তখন দুটো নোংরা কৌশল কাজে লাগাল। একদিকে তারা প্রচার করতে শুরু করল, শরীয়তউল্লাহর এই দাওয়াহ আসলে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে এক বিশাল ষড়যন্ত্র।[১১] অন্যদিকে, তারা কিছু অনুগত মৌলভীকে দিয়ে ফাতাওয়া জারি করাল, ফরায়েজীদের এই শিক্ষা নাকি ইসলামবিরোধী। সাধারণ কৃষকদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে এই আন্দোলন থেকে তাদের দূরে রাখাই ছিল জমিদারদের মূল উদ্দেশ্য।[১২]

কিন্তু এতসব বাধার পরও আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল। ব্রিটিশদের নথিপত্র বলছে, ১৮৪০ সালের মধ্যেই ফরায়েজীদের সংখ্যা ৮০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[১৩] সামসময়িক কিছু সূত্রমতে, আসল সংখ্যাটা ছিল তিন লাখের

---

[৮] Ahmed, Rafiuddin. The Bengal Muslims, 1871-1906: A Quest for Identity. Oxford University Press, 1996. p. 65.

[৯] Ullah, Muhammad Ahsan. "Ideology of the faraizi movement of Bengal.

[১০] Calcutta Review. Vol. 1. University Press, 1846, p. 215–16.

[১১] Bandyopadhyay, Brajendranath. "Sambadpatre sekaler katha.", Vol. 3, Bangiya Sahitya Parishad, 1940, p. 311-312.

[১২] Ullah, Ideology

[১৩] Bengal Judicial Proceedings. (April 7, 1847). No. 98-100

কাছাকাছি।[১৪] পরের কয়েক দশক জুড়ে ফরায়েজীদের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকল। ১৮৯০-এর দশক নাগাদ ফরায়েজী আন্দোলনের অনুসারীর সংখ্যা দাঁড়াল দশ লক্ষের বেশি।[১৫]

ফরায়েজীদের অধিকাংশই ছিল গ্রামীণ কৃষক, তাঁতি এবং জেলে। তবে কিছু মুসলিম জমিদার, ব্যবসায়ী, স্কুল শিক্ষক এবং আলিমও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।[১৬] এমনকি ব্রিটিশ প্রশাসনের ভেতরে থাকা কিছু পুলিশ সদস্যও ছিলেন এই আন্দোলনের অংশ।[১৭]

আন্দোলনের শক্ত ভিত গড়ে দিয়ে ১৮৪০ সালে হাজী শরীয়তউল্লাহ ইন্তেকাল করলেন। নেতৃত্বে এলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহসিন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া। তিনি ছিলেন একজন ক্ষুরধার মস্তিষ্কের নেতা। তাঁর হাত ধরেই ফরায়েজী আন্দোলন তাদের স্বর্ণযুগ পার করে।

দুদু মিয়ার পর আন্দোলনের হাল ধরেন তাঁর ছেলে আবদুল গফুর নয়া মিয়া। ১৮৮৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পর আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে। তবে এর রেশ থেকে যায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত।[১৮]

ধর্মীয় সংস্কার

হাজী শরীয়তউল্লাহর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ঈমান ও আমলের সংস্কারের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে সালাফুস সালিহীনের বিশুদ্ধ জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনা। তাই তিনি তাঁর দাওয়াতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন তাওহীদের ওপর। এটিই ছিল তাঁর দাওয়াহর মূল ভিত্তি।

হাজী শরীয়তউল্লাহ তাঁর অনুসারীদের শেখান—যদি কোনো বিশ্বাস, আচার কিংবা লোকজ রীতি তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে সেটা কোনোভাবেই গ্রহণ করা যাবে না। ঠিক একইভাবে, যেসব প্রথা কিংবা ইবাদাতের তরিকা কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশনার সাথে মিলবে না, বাদ দিতে হবে সেগুলোও।

---

[১৪] নীল কমিশনের সামনে দেওয়া সাক্ষ্যতে এক সাক্ষীর অনুমান ছিল, ফরায়েজীদের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। Minutes of Evidence (henceforth MoE), Indigo Commission Report, 1861, answer no. 3979.

[১৫] Annual General Report, Dacca Division, 1878-79, General Department Proceedings, Nov. 1879.

[১৬] Hunter, William Wilson. A Statistical Account of Bengal-Vol. V. Vol. 5. Tufts Press, 2010.

[১৭] Bengal Judicial Proceedings. (August 10, 1857). No. 662.

[১৮] Ullah, Ideology

বাংলার মুসলিমদের সেইসময়কার বাস্তবতায় হাজী শরীয়তউল্লাহর দাওয়াহ ছিল ইসলামী চেতনার পুনর্গঠন এবং পুনর্জাগরণের এক প্রকল্প।

সাধারণত ফরায়েজী আন্দোলনের এই ধর্মীয় দিক নিয়েই সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়। কিন্তু এ আন্দোলনের আরও বেশ কিছু দিক ছিল, যা অনেকেরই অজানা।

সমাজ সংস্কার

ফরায়েজী আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম সমাজে জমে যাওয়া জঞ্জাল সাফ করার ভার নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিল। হাজী শরীয়তউল্লাহ খুব ভালোভাবে বুঝেছিলেন যে, একটা জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের নিজস্ব পরিচয় থাকে। তাই তিনি মুসলিম সমাজকে কুসংস্কার, অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান এবং অন্য ধর্ম (বিশেষ করে হিন্দুদের) থেকে আসা বিভিন্ন সংস্কার ও প্রথা থেকে মুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

অনুসারীদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে সংস্কৃতি; সব জায়গায় ভিন্নতা বজায় রাখতে। আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন মাজার-সংস্কৃতি আর পীরদের প্রতি অন্ধভক্তির বিষাক্ত জাল থেকে মানুষকে বের করে আনতে।[১৯]

সংস্কারমূলক এই প্রচেষ্টাগুলোর অন্যতম লক্ষ্য ছিল, মুসলিম সমাজের একটা স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করা। যেন বাংলার মুসলিমরা নিজেদের আলাদা আত্মপরিচয়সম্পন্ন জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

সমাজে তখন আশরাফ-আতরাফ নামের কৃত্রিম বিভাজন তৈরি করে রাখা হয়েছিল। একদল নিজেদের উঁচু বংশের মনে করত, কারণ তাদের ধারণা ছিল তারা আরব, তুর্কি কিংবা আফগান রক্ত নিয়ে জন্মেছে। এরা হলো আশরাফ।

বাকিরা আতরাফ। ধারণা করা হতো, এরা নীচু জাতের হিন্দু বা বৌদ্ধদের বংশধর।

আশরাফরা সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আতরাফদের সাথে মেলামেশা করত না, তাদেরকে নীচু জাত মনে করত।[২০] এই বিভাজনের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক ছিল না, এটা ছিল হিন্দুদের বর্ণপ্রথার একটা সরাসরি প্রভাব।

---

[১৯] দেখুন, Khan, Muin-ud-Din Ahmad. History of the Fara'idi Movement in Bengal, 1818-1906. Pakistan Historical Soc., 1965.

[২০] Ahmad, Imtiaz. "The Ashraf-Ajlaf Dichotomy in Muslim Social Structure in India1." The Indian Economic & Social History Review 3, no. 3 (1966): 268-278.

হাজী শরীয়তউল্লাহ এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করলেন।[২১] তিনি শেখালেন, মানুষ হলো চিরুনির দাঁতগুলোর মতো। একটা চিরুনির গোড়ার দিকে প্রতিটা দাঁত একই সমতলে দাঁড়িয়ে থাকে; মানুষও ঠিক তেমন।[২২]

কেউ জন্মের কারণে উঁচু বা নিচু হয় না। ইসলামে মানুষের মর্যাদা বংশ, সম্পদ বা গায়ের রঙ দিয়ে ঠিক হয় না; মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি এখানে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি।[২৩]

ফরায়েজী আন্দোলন সমাজকে গড়ে তুলছিল দ্বীন ইসলামের সাম্যের ধারণার ভিত্তিতে। তারা একে অপরকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করত। এই ইনসাফের নীতি ব্রিটিশ প্রশাসনেরও নজর কেড়েছিল। তৎকালীন বেঙ্গল পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট ফরায়েজীদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল:

> '...তারা নিজেদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠা করেছিল... তারা এক হয়ে থাকত, বিপদের সময় একে অপরকে সহায়তা করত। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু অবস্থানে থাকা ব্যক্তির স্বার্থকেও তারা সবচেয়ে নিচু অবস্থানে থাকা ব্যক্তির স্বার্থের সমান মনে করে...'[২৪]

তবে সংস্কারের পথ মসৃণ ছিল না। যেকোনো বড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই যা হয়, এখানেও তা-ই হলো। যারা পুরোনো প্রথাকে অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায়, যারা এগুলো থেকে লাভবান হয়, তারা বিরোধিতা শুরু করল।

ফরায়েজী আন্দোলনের ফলে সাধারণ কৃষক, জেলে আর তাঁতিদের মধ্যে জাগরণ তৈরি হচ্ছিল। মুসলিম জমিদারদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ এই দাওয়াহর জনপ্রিয়তাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল।[২৫] এর পেছনে ছিল গভীর মনস্তাত্ত্বিক আর অর্থনৈতিক কারণ।

চলমান সামাজিক বৈষম্যের সুবিধাভোগীরা ফরায়েজীদের ইনসাফের নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিল। ফলে দেখা গেল, ফরায়েজীরা কেবল হিন্দুদের না,

---

[২১] Choudhury, Nurul Hossein. "Faraizi Movement and Zamindars of Nineteenth Century Bengal: The Story of a Peasant Movement." Journal of International Studies 9 (2013): 113–28.

[২২] Miyan, Pir Dudu. Bangladesh Faraizi Jarmter Adarasha

[২৩] 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান সে-ই, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।'— তরজমা, সূরা আল-হুজুরাত (৪৯:১৩)

[২৪] Bengal Judicial Proceedings, April 7, 1847, No.99

[২৫] Sarkar, Jagadish Narayan. Islam in Bengal (Thirteenth to Nineteenth Century). Ratna Prakashan, 1972.

বরং অনেক প্রভাবশালী মুসলিম জমিদার আর বিদ্যমানতাকে আঁকড়ে থাকা মৌলভীদের প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে পড়ল। তারা প্রচার করতে শুরু করল, হাজী শরীয়তউল্লাহর এই সংস্কার নাকি 'ইসলামের ওপর আক্রমণ!'

কিন্তু এত কিছুর পরও আন্দোলনকে থামিয়ে রাখা গেল না। সাধারণ কৃষক, তাঁতি আর জেলেরা প্রথমবারের মতো অনুভব করতে পারল যে, তাদেরও একটা স্বতন্ত্র পরিচয় আছে, আছে আত্মমর্যাদা। তারা মাথা উঁচু করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শিখল।

হাজী শরীয়তউল্লাহ তাদেরকে স্বপ্ন দেখালেন ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে এমন এক নতুন সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার, যা হবে জুলুমমুক্ত ও ইনসাফের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলার মুসলিম সমাজে এক গভীর পরিবর্তনের সূচনা করে এই আন্দোলন।

সংগঠন

ফরায়েজী আন্দোলন হুট করে গজিয়ে ওঠা কোনো অগোছালো ব্যাপার ছিল না। তাঁদের ছিল সুসংহত সাংগঠনিক কাঠামো। এই কাঠামো ফরায়েজী খেলাফত ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এর মাধ্যমেই বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা কয়েক লক্ষ অনুসারীদের তদারকি হতো।

এই সংগঠনের বর্ণনা ওঠে এসেছে ডক্টর মুইনউদ্দীন খান ও ডক্টর আহসানউল্লাহ ফয়সালের মতো গবেষকদের আলোচনায়। তারা দেখিয়েছেন, ফরায়েজী খেলাফত ব্যবস্থাটা গড়ে ওঠেছিল অনেকটা চার স্তরের পিরামিডের মতো করে।

বোঝার সুবিধার জন্য আমরা এই পিরামিডকে নিচ থেকে ওপরের দিকে এভাবে দেখা যেতে পারে:

- **প্রথম স্তর: গাঁও বা গ্রাম পর্যায়।** পিরামিডের একদম গোড়ায় ছিল সাধারণ ফরায়েজী পরিবারগুলো। মোটামুটি তিনশ থেকে পাঁচশ পরিবার নিয়ে গঠিত হতো একটি গ্রাম বা 'গাঁও'। প্রতিটি গাঁওয়ের দায়িত্বে থাকতেন একজন 'গাঁও খলীফা'। তিনি শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই দিতেন না, বরং বিপদাপদে সাধারণ মানুষের পাশে থাকতেন। জনকল্যাণ তহবিলের জন্য চাঁদা তোলা, মাসজিদ বা মক্তব তৈরি করা, ইমাম নিয়োগ এমনকি বিয়ে বা জানাযার আয়োজনের মতো বিষয়গুলোও তদারকি করতেন তিনি। অর্থাৎ, তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের সাথে নিবিড় যোগাযোগ ছিল তাঁর।[২৬]

---

[২৬] এখানে 'গ্রাম' বা 'গাঁও' শব্দটি আভিধানিক বা ভাষাগত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, বরং একে একটি প্রশাসনিক বা সাংগঠনিক 'ইউনিট' বা একক হিসেবে ধরা হয়েছে।

- **দ্বিতীয় স্তর: সার্কেল বা গির্দ।** দশ বা তার বেশি গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো একটি 'গির্দ' বা সার্কেল। এর প্রধান ছিলেন 'সার্কেল খলীফা'। তাঁর কাজ ছিল আরও একটু বড় পরিসরে। গ্রামগুলোর কাজ ঠিকঠাক চলছে কিনা, তিনি তা দেখভাল করতেন। বছরে অন্তত একবার পরিদর্শন করতেন প্রতিটি গ্রাম। তবে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল একটা দক্ষ লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলা। এই বাহিনীর সদস্যদের কাছে লাঠি, বর্শা আর মাঝে মাঝে হালকা আগ্নেয়াস্ত্রও থাকত।[২৭]

- **তৃতীয় স্তর: উচ্চতর খলীফা ও মজলিশে শূরা।** সার্কেল খলীফাদের ওপরে থাকতেন 'উচ্চতর খলীফা'রা। তাঁরা ছিলেন আন্দোলনের মূল নীতিনির্ধারক। তাঁদের নিয়ে গঠিত হতো 'মজলিশে শূরা' বা পরামর্শ পরিষদ। পুরো পূর্ববঙ্গকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে একেকজন উচ্চতর খলীফার হাতে তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সংগঠনের মূল নেতা যখন কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, এই পরিষদের সাথে পরামর্শ করতেন।

- **চতুর্থ স্তর: উস্তাদ।** পিরামিডের একদম শীর্ষে ছিলেন ফরায়েজীদের প্রধান নেতা। তাঁকে বলা হতো 'উস্তাদ'। তিনিই ছিলেন এই বিশাল সংগঠনের মূল চালিকাশক্তি। পুরো বাংলার আনাচেকানাচে ছড়িয়ে থাকা বিশাল নেটওয়ার্ক পরিচালিত হতো তাঁর নেতৃত্বে।[২৮]

ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত এই পিরামিডের প্রতিটি স্তরে দায়িত্ব ভাগ করা ছিল।

মজবুত এই সাংগঠনিক কাঠামোর ফলে ফরায়েজীরা আর আগের মতো ব্রিটিশ প্রশাসনের সামনে বিচ্ছিন্ন অসহায় মানুষ হিসেবে থাকল না। তারা পরিণত হলো দৃঢ়, ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী এক গোষ্ঠীতে।

ব্রিটিশ কর্মকর্তা অ্যাশলে ইডেন মন্তব্য করেছিলেন, ফরায়েজী কৃষকদের একটি 'পূর্ণাঙ্গ সংগঠন' ছিল, এবং সাংগঠনিক কাঠামোর কারণে তাঁরা কেবল কলকাতার বাজার সম্পর্কেই অবগত ছিল না, বরং স্থানীয় পরিস্থিতিও ছিল তাদের নখদর্পনে।[২৯]

সুসংগঠিত এই কাঠামো ফরায়েজীরা এক দৃঢ়, ঐক্যবদ্ধ এবং সুশৃঙ্খল গোষ্ঠীতে পরিণত করে। তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠে অসাধারণ সংহতি এবং সামাজিক শক্তি।

---

[২৭] Bengal Judicial (Criminal) Proceedings. April 30, 1839. No. 66-70। ব্রিটিশদের নথিতে এই বাহিনীতে হিন্দু বা খ্রিষ্টান সদস্যদের উপস্থিতির কথাও বলা হয়েছে, যদিও এ তথ্য নিয়ে কিছুটা সন্দেহ আছে। Trial of Dudu Miyan, op. cit., p. 65.

[২৮] Khan, 1965, op. cit., p. 275-280

[২৯] MoE, answer no. 3629.

গণআন্দোলন

ঔপনিবেশিক শাসন, নীলকর এবং জমিদারদের জুলুমের মোকাবিলায় ফরায়েজীদের দীর্ঘমেয়াদি কৌশল ছিল এক দিকে সামাজিক শক্তি অর্জন, অন্য দিকে দমনপীড়নের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিরোধ।

তাদের এই প্রতিরোধ কখনো ছিল খাজনা দিতে অস্বীকার, কখনো ছিল অসহযোগ আন্দোলন, আবার কখনো বা সীমিত মাত্রার সশস্ত্র প্রতিরোধ।

জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

ফরায়েজী আন্দোলনের উত্থান ঘটেছিল এমন এক সময়ে, যখন বাংলার সাধারণ মানুষ চরম অর্থনৈতিক নিপীড়নের শিকার হচ্ছিল। স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনে সমাজের এই দুঃখ-দুর্দশার প্রতিফলন ঘটেছিল।

হাজী শরীয়তউল্লাহ মানুষকে অন্যায় ও জুলুমের খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিতে বলেছিলেন। অভাবী মানুষ দলে দলে তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। ফলে জমিদারদের সঙ্গে হাজী শরীয়তউল্লাহর সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা ব্রিটিশরাও এই লড়াইয়ে হস্তক্ষেপ করতে দেরি করে না।[৩০]

কিন্তু হাজী শরীয়তউল্লাহ দমে যাওয়ার পাত্র ছিলেন না। খাজনাবিরোধী এই আন্দোলনকে তিনি দাঁড় করালেন একটা শক্তিশালী যুক্তির ওপর। তিনি বললেন; জমির প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ, কাজেই জমিদাররা নিজের ইচ্ছেমতো খাজনা চাপিয়ে দেওয়ার কোনো অধিকার রাখে না। জমিদারদের চাপিয়ে দেওয়া খাজনা নিছক জুলুম ও নিপীড়ন।[৩১]

পরে তাঁর ছেলে দুদু মিয়া এই অবস্থানকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। বাংলার কৃষকদের মুখে তিনি তুলে দিলেন এক ঐতিহাসিক স্লোগান— ‘লাঙ্গল যার, যমীন তার!’[৩২]

খাজনা এড়াতে এবং জমিদারদের কবল থেকে বাঁচতে হাজী শরীয়তউল্লাহ সাধারণ মানুষকে খাসমহলে বসতি গড়ারও আহ্বান জানালেন। খাসমহল ছিল নতুন জেগে ওঠা চরাঞ্চল, আইনগতভাবে এগুলো ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকত। ফরায়েজীরা এইসব জমি দখল করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করল।[৩৩]

---

[৩০] Bengal Judicial Proceedings. April 3, 1832. No. 6.

[৩১] Wise 1883, p. 24.

[৩২] Bengal Judicial Proceeding, October, 1870, No. 31.

[৩৩] Taylor, 1840, p.8; and Wise 1883, p. 37

হাজী শরীয়তউল্লাহর এই পদক্ষেপ ছিল একইসাথে বুদ্ধিদীপ্ত ও বৈপ্লবিক। জমিদারদের কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যানের পাশাপাশি তিনি পরোক্ষভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের বৈধতাকেও চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।[৩৪]

নীল বিদ্রোহ ও কৃষক বিদ্রোহ

ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণের আরেক কুখ্যাত স্তম্ভ, নীলচাষের বিরুদ্ধেও সক্রিয়ভাবে লড়েছিল ফরায়েজীরা। নীলচাষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে ফরায়েজীরা গ্রহণ করে সামাজিক বয়কট এবং সামাজিক সংহতির কর্মসূচি। কোনো কৃষক যদি ভয়ে বা লোভের কারণে নীলকরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতো, তবে তাকে সমাজচ্যুত করত তারা।[৩৫]

ব্রিটিশদের এক প্রতিবেদনের বক্তব্য অনুযায়ী, নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জোট গঠন করেছিল ফরায়েজীরা। মুসলিম কৃষকরা কুরআনের ওপর হাত রেখে শপথ নিয়েছিল, সম্মিলিত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা নীলকরদের সঙ্গে কোনো আপস বা চুক্তি করবে না।[৩৬]

বয়কট বা অসহযোগের পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি প্রতিরোধে নেমেছিল, যা কৃষক বিদ্রোহের রূপ নেয়। ১৮৩৭, ১৮৪৪ এবং ১৮৪৭ সালে ফরায়েজীদের নেতৃত্বে একাধিক কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। এর ফলে পুরো পূর্ব বাংলাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে দুদু মিয়ার খ্যাতি।[৩৭]

কৃষকদের এই আন্দোলনের ধারা অব্যাহত থাকে ১৮৭০-এর দশক পর্যন্ত। সে সময়কার ফরায়েজী নেতা নয়া মিয়া ব্যক্তিগতভাবে বেশ কয়েকটি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।[৩৮]

এই লড়াইগুলোতে ফরায়েজীরা অন্য ধর্মের মানুষের সাথেও ঐক্য গড়ে তোলে। নীলকরদের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ অনেক হিন্দু গোয়ালাকে ফরায়েজীরা নীল বিদ্রোহে

---

[৩৪] Mujeeb, Mohammad. Social reform among Indian Muslims. Vol. 1. Delhi School of Social Work, University of Delhi, 1968, p. 15

[৩৫] Dutt, Romesh Chunder. The Peasantry of Bengal: Being a View of Their Condition Under the Hindu, the Mahomedan and the English Rule, and a Consideration of the Means Calculated to Improve Their Future Prospects. Thacker, Spink & Company, 1874.

[৩৬] MoE, answer no. 2962 and 3072

[৩৭] Wise 1883, p. 23; Hunter, 2010, p. 51, 199-200.

[৩৮] Sengupta, Kalyan Kumar. "Agrarian Disturbances in 19th Century Bengal." The Indian Economic & Social History Review 8, no. 2 (1971): 192-212. Sen, 1907, p. 102–3, 108–10

যুক্ত করেছিল। ফরায়েজীরা সচেতনভাবে একটা নীতি মেনে চলত—অন্য ধর্মের মানুষের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো নাক গলাত না। বরং জমিদার আর নীলকরদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের যে ক্ষোভ, সেটাকে কাজে লাগিয়ে বাড়াত গণআন্দোলনের তীব্রতা।[৩৯]

এই ধারাবাহিক প্রতিরোধের ফলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার নীল কমিশন গঠনে বাধ্য হয়।[৪০] ফরায়েজীদের এই সংগ্রাম ছিল জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার নিপীড়িত মানুষের গণপ্রতিরোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সংঘর্ষ, সংগ্রাম

ফরায়েজীরা সংঘর্ষ থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু জালিমরা তাঁদের সহিংসতায় জড়িয়ে ফেলে। নীলকর আর জমিদারদের অবর্ণনীয় অত্যাচার রুখতে আত্মরক্ষা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই ফরায়েজীরা লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করে। এটা ছিল ছিল জালিমের সহিংসতার বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের অংশ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের সহিংসতা ছিল আত্মরক্ষামূলক কিংবা প্রতিপক্ষের নিপীড়নের প্রতিক্রিয়া।

নীলকররা বাংলার মানুষের ওপর পৈশাচিক অত্যাচার চালাত। কৃষকদের বেঁধে চোখে-নাকে মরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেওয়া, বেধড়ক পেটানো, দাড়ির ওপর কর বসানো, এমনকি মুসলিম নারীদের অপহরণ; তাদের অপরাধের ফিরিস্তি লম্বা।

এমনই এক কুখ্যাত নীলকর সাহেবের নাম ছিল ডানলপ। গোমস্তার সাথে মিলে কৃষকদের ওপর সে ভয়াবহ নির্যাতন চালাত। তাদের জুলুম যখন সব সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন ফরায়েজীরা আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না। তারা ডানলপের কারখানায় হামলা চালিয়ে তার গোমস্তাকে খতম করল।[৪১]

---

[৩৯] Iqbal, Iftekhar. “The Political Ecology of the Peasant: The Faraizi Movement between Revolution and Passive Resistance.” In The Bengal Delta: Ecology, State and Social Change, 1840–1943, edited by Iftekhar Iqbal, 67–92. Cambridge Imperial and Post-Colonial Studies Series. London: Palgrave Macmillan UK, 2010.

[৪০] Roy, Asim. “Impact of Islamic Revival and Reform in Colonial Bengal and Bengal Muslim Identity: A Revisit.” South Asia: Journal of South Asian Studies 22, no. sup001 (January 1, 1999): 39–77.

[৪১] Beveridge, Henry. The district of Bakarganj: its history and statistics. Trübner & Company, 1876, p. 399.

জয় নারায়ণ ঘোষ নামে আরেক জমিদারের বিরুদ্ধে ফরায়েজীদের প্রতিরোধের ঘটনার পর ব্রিটিশ পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট যা লিখেছিলেন, তা থেকে ফরায়েজীদের প্রতিবাদের নৈতিক ভিত্তিটা বোঝা যায়। তার ভাষায়—

> 'তাদের (ফরায়েজীদের) উদ্দেশ্য লুটপাট ছিল না, বরং তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল জুলুম ও নিপীড়নের প্রতিশোধ নেওয়া। বিচারশেষে দোষী সাব্যস্ত হবার পর নিজেদের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা হিসেবে তারা যে আবেদনপত্র জমা দিয়েছে, তার এক-দশমাংশও যদি সত্য হয়, তাহলে আরও বড় এবং ব্যাপক বিশৃঙ্খলা কেন ঘটেনি সেটাই বরং বিস্ময়ের ব্যাপার... তাদের বক্তব্যের সার্বিক সত্যতা নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তাদের মর্যাদা ধূলিসাৎ করতে, তাদের ধর্ম এবং তাদের নারীদের সম্মানহানির ক্ষেত্রে যা কিছু করা সম্ভব, তার সবই এই জমিদাররা করেছে।'[৪২]

জালিম জমিদারদের বিরুদ্ধেও ফরায়েজীরা রুখে দাঁড়িয়েছিল। এক জমিদার যখন মুসলিম কৃষকদের দুর্গা আর কালীপূজার জন্য খাজনা দিতে বাধ্য করছিল, তখন দুদু মিয়া তাঁর লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে সরাসরি সেখানে হাজির হলেন। ফরায়েজীদের প্রতিরোধের মুখে প্রতাপশালী সেই জমিদার শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল।[৪৩]

ফরায়েজীরা তাঁদের সামাজিক শক্তিকে কাজে লাগাতে জানত। ডানলপ হত্যাচেষ্টার মামলায় ফরিদপুর কোর্টে যখন দুদু মিয়ার বিচার হচ্ছিল, তখন কোর্টের পাশের নদীতে হাজির হয়েছিল প্রায় তিন হাজার নৌকা। প্রতিটা নৌকাভর্তি লাঠি হাতে ফরায়েজী। রায় যদি দুদু মিয়ার বিপক্ষে যায়, তবে তারা কোর্ট ভেঙে তাকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে।

সেইদিন আদালত দুদু মিয়াকে খালাস দিতে বাধ্য হয়েছিল। অনেকে বলেন, বিদ্রোহের ভয়েই ব্রিটিশ প্রশাসন এই রায় দিয়েছিল।[৪৪]

ফরায়েজী আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বৃহত্তর মুসলিম প্রতিরোধের সাথেও যুক্ত ছিল। দুদু মিয়ার বয়স যখন মাত্র বারো বছর, তখনই তাঁকে পাঠানো হয়েছিল বারাসাত বিদ্রোহের কিংবদন্তি নেতা তিতুমীরের সাথে দেখা করতে।

ব্রিটিশ নথির বক্তব্য অনুযায়ী, সৈয়দ আহমেদ শহীদের তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনের মুজাহিদদের নিয়মিত সাহায্য পাঠাত ফরায়েজীরা।[৪৫] এর জন্য

---

[৪২] *Calcutta Review*, Vol. I, 1844, p. 216.

[৪৩] Khan, 1965, p. 38-39

[৪৪] MoE, answer no. 3979.

[৪৫] দৈনিক এক মুষ্টি চাল এবং অন্যান্য সহায়তার মাধ্যমে তাদের এই চাঁদা সংগ্রহের বিবরণ পাওয়া যাবে

ফরায়েজীরা এক চমৎকার সিস্টেম তৈরি করেছিল। প্রতিটি ফরায়েজী পরিবার প্রতিদিন রান্নার আগে এক মুঠো করে চাল আলাদা করে তুলে রাখত। লক্ষ পরিবার থেকে যখন এক মুঠো করে চাল নেওয়া হতো, তখন তা পরিণত হতো প্রতিরোধের নীরব অর্থনীতিতে। সংগৃহীত অর্থ আর সম্পদ দিয়ে মুজাহিদদের রসদ জোগাতেন ফরায়েজীরা।

১৮৫৭ সালের মহাঅভ্যুত্থানে দুদু মিয়ার অংশগ্রহণের আগ্রহ ছিল স্পষ্ট। বলা হয়ে থাকে তিনি দাবি করেছিলেন, তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য পঞ্চাশ হাজার মানুষ প্রস্তুত হয়ে আছে। যেদিকে তিনি বলবেন, সেদিকেই তারা এগিয়ে যাবে।

এই বিপদের আঁচ পেয়েই ব্রিটিশরা দুদু মিয়াকে গ্রেফতার করে বন্দি করে রাখে। কিন্তু নেতা বন্দি হলেও আন্দোলন থেমে থাকেনি। ফরায়েজী খলীফারা তখনো বিদ্রোহীদের জন্য অর্থ আর অস্ত্র জোগাড়ের কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন গোপনে।[৪৬]

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি চ্যালেঞ্জ

অধিকাংশ গবেষক ফরায়েজী আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকটি এড়িয়ে গেছেন। অন্যদিকে, যারা ফরায়েজীদের নিছক কৃষক আন্দোলন হিসেবে দেখেন, তারা মনে করেন ফরায়েজীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সূচনা দুদু মিয়ার সময়ে। কিন্তু ডক্টর আহসানউল্লাহ তাঁর গবেষণায় অন্যরকম বাস্তবতা তুলে ধরেছেন।

তিনি দেখিয়েছেন, শুরু থেকেই এই আন্দোলনের ভেতরে রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল। ফরায়েজীরা কেবল ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করেনি, বরং তারা ইসলামী শাসনব্যবস্থার এক বিকল্প রূপরেখার ধারণা দিয়েছিল।[৪৭] তাদের এই রাজনৈতিক অবস্থানের সবচেয়ে বড় এবং অকাট্য প্রমাণ হলো বাংলাকে 'দারুল হারব' ঘোষণা করা।

যখন কোনো ভূমিতে মুসলিমদের কর্তৃত্ব এবং ইসলামের শাসন থাকে, ফিকহের পরিভাষায় তখন তাকে বলা হয় দারুল ইসলাম। অন্যদিকে দারুল হারব বলা

নিম্নোক্ত উৎসগুলোতে: "Census of India, 1901, Bengal, p. 75, Sedition committee Report, 1918, p. 175.; SRBG., XLIf Trial of AhmaUullah 1866, p. 138., Rafiuddin, The Bengali Muslims p. 43, Hunter, p43, India Muslmans, p.92.

[৪৬] বারাসাত বিদ্রোহ, বালাকোট যুদ্ধ, ওহাবি আন্দোলন এবং ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের সঙ্গে ফরায়েজীদের সংযোগ নিয়ে প্রাথমিক উৎসের ভিত্তিতে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: Ullah, 2001, p. 206-212, 209.

[৪৭] এই মতবাদগুলোর বিস্তারিত আলোচনা এবং পরবর্তীকালের ফরায়েজীরা নিজেদের সম্পর্কে যা দাবি করতেন, তার একটি রূপরেখা জানতে দেখুন: Ullah, 2001, p. 182-183

হয় এমন যেকোনো ভূমিকে, যেখানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। একে দারুল কুফর-ও বলা হয়।[৪৮]

হানাফি মাযহাবের একটা নির্দিষ্ট ব্যাখ্যার ভিত্তিতে হাজী শরীয়তউল্লাহ্ ঘোষণা করলেন, ব্রিটিশ শাসিত বাংলা দারুল হারব। আর যতক্ষণ না এখানে ইসলামী শাসন ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, ততক্ষণ এই ভূমিতে জুমুআ এবং ঈদের নামাজ পড়া বৈধ হবে না।[৪৯]

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, ব্রিটিশ শাসিত বাংলাকে দারুল হারব ঘোষণা করার পেছনে একটা স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা ছিল। শরীয়তউল্লাহ্ এর মাধ্যমে কার্যত তার অনুসারীদের বলছিলেন—যদি তোমরা পুরোপুরিভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরতে চাও, তাহলে ব্রিটিশদের শাসন মেনে নেওয়া চলবে না। এ শাসন প্রত্যাখ্যান করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে হবে।

---

[৪৮] Ali, Shaheen Sardar, and Javaid Rehman. "The concept of Jihad in Islamic international law." Journal of Conflict and Security Law 10, no. 3 (2005): 321-343.

[৪৯] উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবার পর একটা প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। এই ভূমির ব্যাপারে হুকুম কী হবে? এ ব্যাপারে সবচেয়ে বিখ্যাত মত পাওয়া যায় ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম আলিমদের অন্যতম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহেলভীর পুত্র শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহেলভী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে। ১৮০৩ সালের একটি বহুল চর্চিত ফাতাওয়াতে তিনি প্রথমবারের মতো বলেন, ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত উপমহাদেশ দারুল ইসলাম থেকে দারুল হারবে পরিণত হয়েছে। পরের বেশ কিছু ফাতাওয়াতেও তিনি এই মত দিয়েছেন। একই মত গ্রহণ করেন ইমাম সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদ এবং মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ রাহিমাহুমুল্লাহ-ও। এর ভিত্তিতে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনে শুরু করেন তাঁরা।

হাজী শরীয়তউল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর ফরায়েজী আন্দোলনও একই মত গ্রহণ করে। তবে হাজী শরীয়তউল্লাহ-এর মত ছিল, ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন উপমহাদেশ কেবল দারুল হারব-ই নয়, বরং এখানে জুমুআ এবং ঈদের জামাআত আয়োজন করাও বৈধ না।

ড. মুহাম্মাদ মোহর আলীর দেখিয়েছেন, জুমুআ এবং ঈদের জামাআত সংক্রান্ত এই মতটি শুধু ফরায়েজীদের ছিল না। বরং কলকাতা মাদরাসার শিক্ষক মৌলভী মুহাম্মাদ ওয়াজিহ এবং কলকাতার 'কাদ্বীউল কুদ্দাত' মাওলানা মুহাম্মাদ ফজলুর রাহমানের মতো আরও অনেকেই হানাফি মাযহাবের একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ মত গ্রহণ করেছিলেন, যদিও তারা সরাসরি উপমহাদেশ দারুল হারব ঘোষণা করেননি। ড. মোহর আলীর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Ali, 1988, p. 313-314.

তবে সে সময়কার এবং অতীত ও বর্তমানের অধিকাংশ হানাফিদের মত হলো,

"সাধারণ অবস্থায় যখন সুলতান (রাষ্ট্রপ্রধান) থাকেন এবং তিনি জুমুআর ব্যবস্থাপনা করেন, তখন জুমুআ সহীহ হওয়ার জন্য সুলতান বা নায়েবে সুলতানের উপস্থিতি কিংবা তাদের অনুমতি শর্ত। অন্যথায় জুমুআ সহীহ্ হয় না। তবে সুলতান না থাকা বা সুলতানের জুমুআ ছেড়ে দেওয়ার মতো বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়। তখন মুসলিমদের জন্য নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে ইমাম বানিয়ে জুমুআ আদায় করা ফরজ। পক্ষান্তরে অন্য তিন মাযহাবে কোনো অবস্থায়ই জুমুআ সহীহ হওয়ার জন্য সুলতানের অনুমতি শর্ত নয়।' হানাফি মাযহাবের ইমামগণের উদ্ধৃতিসহ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: https://tinyurl.com/4zyxn6hb

উল্লেখ্য শাহ আবদুল আযীয, সাইয়্যিদ আহমাদ শহিদ, শাহ ইসমাইল শহীদসহ তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়ার অন্যান্য নেতা এবং অনুসারী ভারতবর্ষকে দারুল হারব মনে করলেও জুমুআ ও ঈদের জামাআত আদায় করতেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শাহ আবদুল আযীয এবং তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়ার সাথে ফরায়েজীদের অবস্থানের পার্থক্য পাওয়া যায়।

বাংলাকে দারুল হারব ঘোষণা, তাই একদিকে ছিল ব্রিটিশ শাসনের সার্বভৌমত্বের দাবির প্রত্যাখ্যান, অন্যদিকে বাংলায় দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার মৌন আহ্বান।[৫০]

এটা ছিল তাদের এক দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক অবস্থান, যা কুফরের শাসন হটিয়ে এই যমীনে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করেছিল।

রাষ্ট্রের ভেতর আরেক রাষ্ট্র

ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে বিকল্প এক সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছিল ফরায়েজীরা। গড়ে তুলেছিল ছায়াশাসন ব্যবস্থা। এর প্রধান ভিত্তি ছিল তাঁদের স্থাপন করা শরীয়াহ আদালত।

এই আদালতগুলো ছিল ফরায়েজীদের সাংগঠনিক কাঠামোর অন্যতম চমকপ্রদ দিক। হাজী শরীয়তউল্লাহর সময়ে শুরু হলেও, এগুলোকে অন্য রকম এক উচ্চতায় নিয়ে যান দুদু মিয়া।

গবেষক জেমস ওয়াইযের মতে, ১৮৮০-এর দশকে শুধু ঢাকা জেলাতেই ২২টি ফরায়েজী আদালত চালু ছিল। পঞ্চায়েতের আদলে তৈরি এসব আদালতে স্থানীয় গাঁও খলীফারা হানাফি ফিকহ অনুযায়ী বিচার করতেন।

ফরায়েজীরা ঔপনিবেশিক আদালত এড়িয়ে চলত।[৫১] তাঁদের সব মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হতো নিজস্ব শরীয়াহ আদালতেই।[৫২] স্থানীয় আদালতের রায়ে কেউ খুশি না হলে তিনি ক্রমান্বয়ে সার্কেল খলীফা, উচ্চতর খলীফা এবং সবশেষে সংগঠনের প্রধান বা 'উস্তাদ'-এর কাছে আপিল করতে পারতেন।[৫৩]

শরীয়াহ আদালতের পাশাপাশি দাওয়াহ, যাকাত ও সাদাকাহ সংগ্রহ, সদস্যদের সামরিক প্রশিক্ষণ আর মাসজিদ-মক্তব গড়ার মতো কাজগুলো চলত ঘড়ির কাঁটার মতো নিখুঁতভাবে।

ফরায়েজীরা কার্যত রাষ্ট্রের ভেতরে আরেক রাষ্ট্র তৈরি করেছিল।[৫৪] ব্রিটিশ প্রশাসন এই সমান্তরাল শাসন দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। হেনরি

---

[৫০] Ashraf, Mujeeb. "Muslim attitudes towards British rule and western culture in India." Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delhi (1982), p. 147.

[৫১] Hafiz Malik, Muslim Nationalism in India and Pakistan, Washington publishing office Press, Washington, Ratna Prakashan, Calcutta, pp.201-202

[৫২] Wise, 1883, p.25; Trial of Dudu Miyan

[৫৩] Wise, 1883, p.23. See also, Trial of Dudu Miyan

[৫৪] Malik, Hafeez. "Moslem nationalism: in India and Pakistan." (1963), p. 201-202

বেভারিজ, এক ব্রিটিশ কর্মকর্তা, ফরায়েজীদের প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিল, দুদু মিয়া বাংলার 'প্রকৃত শাসক'। বাকেরগঞ্জে তার দাপট 'যেকোনো বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়েও বেশি'।[৫৫]

ব্রিটিশ সরকার দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে, লোকেরা তাঁর কাছে দরখাস্ত পেশ করছে, বিচার চাইছে। আর তিনি স্বাধীন শাসকের মতো আচরণ করছেন।[৫৬] নয়া মিয়ার সময়কার ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট নবীন চন্দ্র সেন লিখেছিলেন—

> 'নয়া মিয়া কার্যত ব্রিটিশ শাসনের ভেতরেই একটি পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করেছেন।'[৫৭]

ফরায়েজীদের এ-ধরনের নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিটিশ আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে স্বায়ত্তশাসন অর্জন এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা। এর ফলে মুসলিম সমাজে ব্রিটিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপও কমে এসেছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্র যে ক্ষমতাগুলো সমাজের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, ফরায়েজীরা চেয়েছিল সেগুলো আবারও সমাজের কাছে ফিরিয়ে আনতে। এটা ছিল কলোনিয়াল শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক ধরনের সামষ্টিক প্রতিরোধ। ক্ষমতার বিকল্প কেন্দ্র তৈরির দুর্দান্ত মহড়া।

***

বাংলার ফরায়েজী আন্দোলনকে অনেক ঐতিহাসিক উপমহাদেশের প্রথম সংঘবদ্ধ তাজদীদী আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৫৮] এটি ছিল বাংলার ইতিহাসের অন্যতম সফল কৃষক বিদ্রোহ। এমনকি যে অসহযোগ আন্দোলনের কথা বললেই আজ আমরা মোহনদাস গান্ধীর কথা ভাবি, তারও বহু আগে এই বাংলায় প্রথম সার্থক অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন হাজী শরীয়তউল্লাহ।

ফরায়েজী আন্দোলনে ছিল বাংলার মুসলিমদের ঈমান-আকীদাহ-আমলের সংস্কার এবং স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রকল্প। এই আন্দোলন ছিল হিন্দু জমিদার শ্রেণির সামাজিক আধিপত্য আর ফিরিঙ্গিদের ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলিমদের গণপ্রতিরোধ।

---

[৫৫] Beveridge, 1876, p. 87.

[৫৬] Trial of Dudu Miyan

[৫৭] Sen, 1907, p.84

[৫৮] Ahsan Ullah, "Ideology of the Faraizi Movement," abstract.

সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে গণআন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিরোধ এবং রাষ্ট্রের ভেতরে আরেক রাষ্ট্র গড়া তোলার মাধ্যমে ফরায়েজীরা সামাজিক শক্তি অর্জনের স্তর পার হয়ে সামাজিক আন্দোলনের স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল। এ আন্দোলন সামাজিক শক্তি অর্জন, গণশক্তি নির্মাণ এবং সামাজিক আন্দোলনের সফল উদাহরণ।

এটি ছিল এই কওম আর এই যমীনের মানুষের এমন এক লড়াই, যেখানে দ্বীন ও দুনিয়ার দাবি, হাকুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ এক সাথে এসে মিশেছিল।

কৌশল প্রশ্ন

ফরায়েজীদের আন্দোলন-সংগ্রামের কৌশল নিয়ে একটা প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ—ফরায়েজীরা কেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ বা সশস্ত্র সামরিক সংগ্রাম শুরু করলেন না?

একটু ভেবে দেখুন, ফরায়েজীরা কিন্তু ব্রিটিশ শাসিত বাংলাকে দারুল হারব ঘোষণা করেছিল। তাঁরা জমিদার, নীলকর এবং অনেক ক্ষেত্রে কলোনিয়াল প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ করেছিল সরাসরি। তিতুমীরের বারাসাত বিদ্রোহ থেকে শুরু করে তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়ার মুজাহিদদের ঘাঁটি; সবখানেই তাঁরা সাহায্য পাঠাত। ১৮৫৭-এর মহাঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়ার জন্যও দুদু মিয়া প্রস্তুত ছিলেন।

তাহলে ফরায়েজীরা কেন নিজেরা সশস্ত্র পথে এগোলেন না?

ফরায়েজী উৎসগুলোতে এ নিয়ে সরাসরি কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে ইতিহাসের পাতা থেকে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

১৮৩১ সালে ছয় মাসের ব্যবধানে প্রথমে বালাকোটে সাইয়্যিদ আহমাদ আর তারপর বারাসাতে তিতুমীর পরাজিত এবং শহীদ হন। হয়তো এ দুটো ঘটনা ফরায়েজীদের সিদ্ধান্তের পেছনে ভূমিকা রেখেছিল। সম্ভবত হাজী শরীয়তউল্লাহ উপসংহার টেনেছিলেন, সেই সময়ের বাস্তবতায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বাংলা ছিল অনুপযুক্ত। প্রশিক্ষণহীন সাধারণ মানুষকে নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জেতা সম্ভব না।[৫৯]

যদি তাই হয়ে থাকে, তবে এই উপসংহার ফরায়েজীদের একার না।

তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়ার প্রধান দুই নেতা, সৈয়দ আহমাদ বেরেলভী এবং শাহ মুহাম্মাদ ইসমাইল ১৮৩১ সালে বালাকোটে শহীদ হয়ে যান। তারপর বেশ ক' বছর ছত্রভঙ্গ থাকে এই আন্দোলন।

১৮৪০-এর দশকে এ আন্দোলনকে আবার জাগিয়ে তোলেন সাদিকপুরের মাওলানা উইলায়াত আলী এবং তাঁর ভাই মাওলানা ইনায়াত আলী। উইলায়াত আলী ছিলেন সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদের ঘনিষ্ঠ খলীফা। আলী ভাইয়েরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

---

[৫৯] দেখুন: Ullah, 2001, p. 206-212, 209.

১৮৪৫ থেকে ১৮৭১—টানা ছাব্বিশ বছর তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়ার এই অংশটি প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশরা ২০টি সামরিক অভিযান চালায়। সব মিলিয়ে মোতায়েন করে ৬০,০০০ এর বেশি সেনা। তবু মুজাহিদীনের প্রতিরোধ চলমান থাকে। তারা একের পর এক ব্রিটিশ আক্রমণ মোকাবিলা করেন। অনেক লড়াইয়ে বিজয়ী হন। ব্রিটিশ নথিপত্রে এই আন্দোলনের ব্যাপারে লেখা হয়, *'...এরা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক স্থায়ী হুমকি।'*[৬০]

এ আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে আম্বালা, পাটনা, মালদহসহ বিভিন্ন জায়গায় মামলা দায়ের করা হয়, যেগুলো ওয়াহাবী ট্রায়ালস নামে কুখ্যাত। এসব মামলায় তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়ার নেতাদের ফাঁসি ও যাবজ্জীবন সাজা দেওয়া হয়। অনেককে নির্বাসনে পাঠানো হয় জনমানবহীন আন্দামানে।

দুর্বার এই জিহাদী আন্দোলনের সামরিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ারের দুর্গম, পাহাড়ি অঞ্চলগুলো। যেখানে পশতুন গোত্রগুলোর আনাগোনা। বিশেষ করে সিত্তানার দুর্গম পাহাড়ে। পুরো হিন্দুস্তান থেকে সেখানে অর্থ ও লোকবল পাঠানো হতো। অন্যদিকে আন্দোলনের রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল পাটনার সাদিকপুর।

বাংলায় তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনের উপস্থিতি ছিল। এ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা মাওলানা ইনায়াত আলী দীর্ঘদিন পূর্ব বাংলায় দাওয়াতি কাজ করেছেন। বাংলা থেকে অর্থ এবং জনবল পাঠানো হয়েছে সিত্তানার সামরিক ঘাঁটিতে। উইলিয়াম হান্টারের বিখ্যাত বই 'দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমানস' (The Indian Musalmans)-এ এর বিভিন্ন চমকপ্রদ বর্ণনা ওঠে এসেছে। ফরায়েজীদের ঘর থেকে তোলা মুঠো চাল সম্ভবত এই মুজাহিদদের কাছেই পৌঁছানো হতো।

কিন্তু বাংলায় উপস্থিতি এবং কার্যক্রম থাকা সত্ত্বেও তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেনি। অর্থাৎ বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলন না করা কেবল ফরায়েজীদের সিদ্ধান্ত ছিল না, এটা ছিল তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়ারও অবস্থান।

দুটি আন্দোলনই সম্ভবত একই উপসংহারে পৌঁছেছিল: ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য বাংলা অনুপযুক্ত। দুর্গম, সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং গোত্রকেন্দ্রিক সমাজ হবার কারণে সিত্তানা ছিল দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত অঞ্চলে। কিন্তু এ বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলায় ছিল না।

---

[৬০] W. W. Hunter, *The Indian Musalmans: Are They Bound in Conscience to Rebel against the Queen?* (London: Trübner & Co., 1871), 20.

তাছাড়া ব্রিটিশদের তুলনায় ফরায়েজীদের সামরিক শক্তি প্রায় ছিল না বললেই চলে। সেনাবাহিনী গঠনের মতো সামর্থ্যও তাঁদের ছিল না। পাশাপাশি বাংলার মুসলিম সমাজের ঈমান, আকীদাহ এবং আমলের অবস্থা ছিল শোচনীয়।

এসব কারণেই হয়তো হাজী শরীয়তউল্লাহ সশস্ত্র সংগ্রামের বদলে সামাজিক শক্তি এবং সামাজিক আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

প্রথমে দাওয়াহর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের সংস্কার ও দ্বীনের পুনর্জাগরণ। সামাজিক শক্তি অর্জন এবং গণশক্তি নির্মাণ করে জুলুমের প্রতিরোধ।

তারপর সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকল্প কেন্দ্র বানিয়ে 'রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র' গড়ার দীর্ঘমেয়াদি কৌশল।

সামসময়িক বাস্তবতার আলোকে তাঁর সিদ্ধান্ত যথাযথ ছিল বলেই মনে হয়।

বিপ্লব প্রশ্ন

ফরায়েজীরা সামাজিক শক্তি অর্জনে এবং সামাজিক আন্দোলন হিসেবে সফল হয়েছিল। কিন্তু এ আন্দোলন বিপ্লবের স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। একথাও সত্য।

ফরায়েজীরা কেন পারল না?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে বাংলার ইতিহাসের গণ্ডি থেকে চোখ সরিয়ে। আমাদের তাকাতে হবে ইতিহাসের বিশাল ক্যানভাসের দিকে। খুঁজে বের করতে হবে ঐ ছক, যা হাজার হাজার বছর ধরে সমাজ পরিবর্তনের গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে।

পরিবর্তনের ইলাহী রূপরেখা

কুরআন এবং নবীদের জীবনী থেকে সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার একটা ছক দেখতে পাওয়া যায়। একে আমরা মোটাদাগে তিন পর্যায়ে ভাগ করতে পারি:

- **দাওয়াহ ও হুজ্জাহ:** শুরুর পর্যায়। এই সময়ে কোনো সম্প্রদায়ের কাছে তাওহীদ ও রিসালাতের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। দাওয়াহর মাধ্যমে সমাজের ওপর হুজ্জাহ কায়েম হয়। এই পর্যায়ে হক-বাতিলের লড়াই আদর্শিক। এ লড়াই চলে মানুষের মন ও মগজে, সমাজের চিন্তা ও চেতনায়।

- **মেরুকরণ:** হক ও বাতিল যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন সমাজে ভাঙন ধরে। মানুষ দুই ভাগ হয়ে যায়। এক দল; তা যত ছোট বা দুর্বলই হোক, ঈমানের পক্ষে। আরেক দল কুফর আর জাহিলিয়াতের পক্ষে।

- **ফয়সালা:** সেই চূড়ান্ত পর্যায় যখন দুই পক্ষ আর সহাবস্থানে থাকতে পারে না। জাহিলিয়াতের অনুসারী আর তাওহীদের অনুসারীরা মুখোমুখি চলে আসে। এই পর্যায়ে একটা ফয়সালা আবশ্যক হয়ে ওঠে।

ফয়সালা বা চূড়ান্ত মীমাংসার রূপ সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী বদলায়।

কওমে নূহ, আদ কিংবা সামুদের সময়ে নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) সত্যের বার্তা পৌঁছে দিয়ে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেন। মানুষ হয় দাওয়াহ গ্রহণ করত, নয়তো প্রত্যাখ্যান করত। ঈমানকে অস্বীকার করা লোকেরা নবীদের বিতাড়িত

করত, এমনকি হত্যার চেষ্টা চালাত। এসময় অবাধ্য কওমের ওপর চূড়ান্ত ফয়সালা আসত সরাসরি ইলাহী আযাবের মাধ্যমে।

তবে মুফাসসিররা বলছেন, তাওরাত নাযিলের পর থেকে আযাবের মাধ্যমে কোনো জাতিকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ধারা স্থগিত হয়ে যায়।[৬১] তখন থেকে হক পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি সংগঠিতভাবে জাহিলি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই এবং তাওহীদের ভিতের ওপরে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও নবীদের অনুসারীদের ওপর আসে।

ফয়সালার প্রক্রিয়ার সবচাইতে পূর্ণাঙ্গ এবং সফল উদাহরণ দেখা যায় সাইয়্যিদুল মুরসালিন নবীজি মুহাম্মাদ ﷺ–এর নুবুওয়াতের জীবনে। মক্কার তেরো বছরে তিনি সত্য পৌঁছে দিয়েছেন, হুজ্জাহ কায়েম করেছেন, গড়ে তুলেছেন মুমিনদের জামাআহ; আগামীর ইসলামী সভ্যতার বুনিয়াদ।

মদীনায় হিজরতের পর তামকীন বা শাসনকর্তৃত্ব এসেছে, একটা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্ত্বা (polity) দাঁড়িয়েছে, দাওয়াহ পেয়েছে নতুন পরিসর। তারপর জিহাদের মাধ্যমে এসেছে সম্প্রসারণ এবং জাহিলিয়াতের ওপর চূড়ান্ত বিজয়ের ফায়সালা।

তাজদীদের ছক

ইতিহাসের সফল তাজদীদী আন্দোলনগুলো মোটাদাগে এই নকশাই অনুসরণের চেষ্টা করেছে।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ)-এর শুরু করা মুওয়াহহিদুন আন্দোলনের শুরুটা হয়েছিল দাওয়াহ ও শিক্ষার মাধ্যমে। আপসহীন তাওহীদের আকীদাহর মজবুত বুনিয়াদ গড়ে ওঠার পরই কেবল এই আন্দোলন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের পর্যায়ে যায়।

আফ্রিকায় শাইখ উসমান বিন ফুদি (রাহিমাহুল্লাহ)-এর গড়া সোকোতো আন্দোলনের ছকও একই রকম: বছরের পর বছর গ্রামে গ্রামে ঘুরে দাওয়াহ, মানুষ তৈরি, জামাআহ গড়া; বুনিয়াদ নির্মাণ। তারপর হিজরত ও জিহাদের মধ্য দিয়ে জাহিলি ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে নতুন ইসলামী সালতানাতের জন্ম।

বিখ্যাত মুরাবিতুন আন্দোলনের শুরুটাও হয়েছিল নির্জন মরুভূমিতে রিবাতের কঠোর শৃঙ্খলা আর নৈতিক পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে। একনিষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল এক আদর্শিক বুনিয়াদ তৈরির পরই কেবল এই আন্দোলন রাজনৈতিক বিজয় ও

---

[৬১] তাফসীর ইবনে কাসীর, তাফসীর আস-সাদী, সূরা কাসাস (২৮-৪৩)

সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে অগ্রসর হয়। তারপর মরক্কো থেকে আন্দালুস পর্যন্ত সমস্ত বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একীভূত করে গড়ে ওঠে এক বিশাল আন্তঃমহাদেশীয় সালতানাত।

এ উদাহরণগুলোতে আমরা বারবার দুটো ধাপ দেখতে পাই।

প্রথমে শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও প্রস্তুতি। তারপর সংঘাত, প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ।

প্রথম ধাপ দাওয়াহ, মেরুকরণ ও হুজ্জাহ-এর। পরের ধাপ ফায়সালার।

এই আন্দোলনগুলো সফল হয়েছিল, কারণ তারা উপলব্ধি করেছিল যে, এ দুটো ধাপ একে অপরের পরিপূরক।

প্রতিটি সফল বিপ্লবী আন্দোলনকে এ দুটো ধাপ পার হতে হয়। ধার্মিক কিংবা সেক্যুলার—বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার বহু চিন্তাবিদ এই জায়গায় মোটাদাগে একমত।

দুই ধাপের সমীকরণ

সমাজকে হুট করে এক ঝটকায় বদলে দেওয়া যায় না। বিপ্লব স্রেফ স্বতঃস্ফূর্ত অগ্ন্যুৎপাত বা হঠাৎ ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণ না। রাস্তাঘাটে লক্ষ মানুষের মিছিলে নামলে, কিংবা হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেই বিপ্লব হয়ে যায় না।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ) যখন বলেছিলেন, ভেঙে দাও সব ব্যবস্থা, তখন তিনি বুঝেছিলেন—জুলুমের কাঠামো ভেঙে ইলাহী নিযাম প্রতিষ্ঠা করতে হলে, আগে নতুন মানুষ তৈরি করতে হবে। গড়তে হবে নতুন সমাজের ভিত।

বিপ্লবের চূড়ান্ত লড়াইয়ের আগে প্রয়োজন দীর্ঘ প্রস্তুতি। আগে মানুষের মনমগজে এবং সমাজের শেকড়ে কাজ করতে হয়। তারপর ওপরের কাঠামো ধসানো যায়।

বিপ্লব আগায় দুটো স্তরে।

- **বুনিয়াদি স্তর:** দীর্ঘমেয়াদি আদর্শিক ও সামষ্টিক প্রস্তুতির স্তর। এ স্তরের কাজ হলো আদর্শের প্রচার, সমাজের মেরুকরণ এবং সামাজিক শক্তি গড়ে তোলা। ধীরে ধীরে প্রতিপক্ষের ভিত দুর্বল করা, তার সামাজিক আধিপত্য ভাঙা এবং সমাজের ভেতর থেকেই বিকল্প কাঠামোর নিউক্লিয়াস গড়ে তোলা। এটা বিপ্লবের ভিত্তি তৈরির পর্যায়। মানুষের চিন্তার কম্পাস বদলানোর লড়াই।

- **ইনকিলাবি স্তর:** মোকাবিলা, সংঘাত ও ফায়সালার স্তর। এ স্তরের কাজ পুরোনো ব্যবস্থাকে হটিয়ে ক্ষমতা ও শাসনের নতুন কাঠামো গড়া।

বিভিন্ন ধারার চিন্তাবিদরা এই স্তরগুলোকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। শব্দগুলো আলাদা, তবে মূল কাঠামো মোটাদাগে এক।

বুনিয়াদ থেকে ইনকিলাব

বুনিয়াদের স্তরের সংগ্রামকে কখন ইনকিলাবি সংগ্রামে রূপান্তর করতে হবে, এটা যেকোনো বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর একটা।

উপযুক্ত সময়ের আগে ইনকিলাবি স্তরে ঢুকলে বিপ্লবী আন্দোলন প্রচণ্ড বাধা, দমন, এবং নির্যাতনের মুখোমুখি হবে। বুনিয়াদ নড়বড়ে হলে আন্দোলন একেবারে ভেঙেও পড়তে পারে।

কারণ, একবার ইনকিলাবি সংগ্রামের স্তরে ঢুকে গেলে, আর আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া যায় না। এটা একমুখী রাস্তা। বিদ্যমান কাঠামোর সাথে সম্পর্কটা তখন আমূল বদলে যায়। তারপর আর সহাবস্থান থাকে না; থাকে অস্তিত্বের লড়াই। হয় বিজয় অথবা বিলুপ্তি।

তাই বুনিয়াদ হলো পরিবর্তন, প্রস্তুতি ও শক্তি সঞ্চয়ের সেই দীর্ঘ প্রক্রিয়া, যা ছাড়া চূড়ান্ত ফায়সালা আনা সম্ভব না। পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়া ইনকিলাবি সংগ্রামে নামার ফলে দেখা দেবে নৈরাজ্য, আপস অথবা প্রতিবিপ্লব।

অন্যদিকে খুব বেশি দেরি হলে বিপ্লবের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। আন্দোলন তখন ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে, অথবা আটকা পড়ে যাবে গতানুগতিক রাজনীতির ফাঁদে।

আদর্শ নির্বিশেষে ইতিহাসের সফল বিপ্লবী আন্দোলনগুলো সঠিক সময়ে এবং সঠিক পদ্ধতিতে বুনিয়াদকে শাসনকর্তৃত্ব (তামকীন) এবং বিপ্লবে (ইনকিলাব) রূপান্তর করতে পেরেছে।

মূল্যায়ন: ফরায়েজী আন্দোলন

ফরায়েজী আন্দোলনের কাছে ফিরে আসা যাক।

হাজী শরীয়তউল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) আর দুদু মিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বাংলার মুসলিম সমাজে দ্বীনের পুনর্জাগরণ এনেছিলেন। নতুন পরিচয়, আদর্শ, নৈতিক

শক্তি আর সাংগঠনিক কাঠামো মিলে তৈরি করেছিলেন মজবুত ভিত। ফিরিঙ্গি শাসন ও জমিদারদের বিপরীতে দাঁড় করিয়েছিলেন নিজেদের বিকল্প কাঠামো।

মোটকথা, বুনিয়াদি স্তরে যা যা অর্জন করা সম্ভব, তার প্রায় সবটাই তাঁরা করে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কেবল বুনিয়াদ তৈরি করে শাসনব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলা যায় না। এতে শাসনব্যবস্থার সামাজিক ভিত আলগা হতে পারে, কিন্তু একে সম্পূর্ণভাবে হটাতে হলে ইনকিলাব অপরিহার্য।

ফরায়েজীরা ঠিক এই জায়গাটাতে এসে আটকে গিয়েছিলেন। বুনিয়াদি স্তরের সংগ্রামকে তাঁরা ইনকিলাবি সংগ্রামে পরিণত করতে পারেননি। তাঁরা স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিরোধ গড়েছিলেন ঠিকই; কিন্তু সেটাকে এমন কোনো বিস্তৃত রূপ দিতে পারেননি, যা ঔপনিবেশিক ক্ষমতাকে স্থায়ীভাবে উৎখাত করবে।

মুসলিম সমাজের জন্য তারা এক শক্ত ঢাল গড়েছিলেন, কিন্তু ক্ষমতার দুর্গ ভেঙে শত্রুকে বিতাড়িত করার মতো তলোয়ার বানাতে পারেননি। তাদের তামকীন বা শাসনকর্তৃত্ব অর্জনের কোনো প্রকল্প ছিল না।

আর এ কারণেই সামাজিক আন্দোলন হিসেবে সফলতার চূড়ায় পৌঁছালেও তাঁদের হাতে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব ধরা দেয়নি। এবং এই ব্যর্থতাই তাঁদের আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। একসময় তাঁদের বিস্তৃত কাঠামো স্থবির হয়ে গেছে।

আর এমন হওয়াই স্বাভাবিক।

মাথার ওপর যদি একটা শত্রু রাষ্ট্র বহাল তবিয়তে টিকে থাকে, তবে তার নিচে বানানো বিকল্প কাঠামো, তা যত মজবুতই হোক না কেন, অনন্তকাল টিকে থাকতে পারবে না। একসময় না একসময় দানব তাকে পিষে ফেলেই।

ফরায়েজীরা কেন ইনকিলাবি স্তরে যেতে পারলেন না?

সেটা কি নেতৃত্বের কোনো ভুল ছিল? কৌশলগত গড়মিল ছিল? নাকি তারা যখন সরাসরি চ্যালেঞ্জ করার পর্যায়ে পৌঁছলেন, তখন উপযুক্ত পরিস্থিতি ছিল না?

এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে আলাদা এবং বিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন, যা করার সুযোগ এখানে নেই। তবে এই পুরো আলোচনা আমাদের সামনে খুব দামি একটা শিক্ষা স্পষ্ট করে দেয়:

সামাজিক আন্দোলন হিসেবে সফলতা মানেই বিপ্লবের সফলতা না।

কোনো আন্দোলন বুনিয়াদ তৈরিতে সফল হলেও, ইনকিলাবের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে পারে।

ইতিহাসের আয়নায় বর্তমান

ফরায়েজী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের সাথে আমাদের বর্তমানের বেশ কিছু মিল আছে।

ফরায়েজী আন্দোলন হয়েছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর পটভূমিতে, আমরা আছি উত্তর-ঔপনিবেশিক বা পোস্ট-কলোনিয়াল রাষ্ট্রের অধীনে। এ দুই কাঠামোর মৌলিক সাদৃশ্য নিয়ে আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি।[৬২]

ফরায়েজীরা এমন এক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, যার ভিত্তি তাওহীদ, ইসলাহ ও তাজদীদ। আজকের প্রেক্ষাপটেও বাংলাদেশকে মুসলিমবঙ্গ হয়ে ওঠতে হলে, পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করার তাজদীদী দাওয়াহর কোনো বিকল্প নেই। অস্তিত্ব রক্ষা এবং নতুন সভ্যতা গড়ার এই লড়াইয়ে সফল হতে হলে আমাদের দাঁড়াতে হবে তাওহীদের মজবুত ভিতের ওপরেই।

ফরায়েজী আন্দোলনের উত্থান এমন এক ক্রান্তিকালে, যখন মুসলিম সমাজ সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিঃশেষিত ছিল। সমাজকাঠামো ভেঙে পড়েছিল। আজকের কাঠামোগত ইসলামবিদ্বেষ ও জনপরিসরে ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের কোণঠাসা অবস্থার সাথে সেই ইতিহাসের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

ফরায়েজীদের দুই প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল হিন্দু জমিদার শ্রেণি এবং ব্রিটিশ শাসন। আমাদের সময়ে 'হিন্দু জমিদারের' ভূমিকায় আছে সেক্যুলার প্রগতিশীল গোষ্ঠী, কালচারাল এলিট এবং দিল্লির আধিপত্য। অন্যদিকে ব্রিটিশ শক্তির ধারাবাহিকতা হিসেবে আজ আমাদের শাসন করছে পোস্ট-কলোনিয়াল সেক্যুলার রাষ্ট্র এবং নেপথ্যের আন্তর্জাতিক যায়নবাদী-ক্রুসেডার শক্তি।

তৎকালীন মুসলিম সমাজে হিন্দুয়ানি প্রভাব যেমন ব্যাপক ছিল, আজও আমাদের সমাজে অনেকটা একই মাত্রার সাংস্কৃতিক আগ্রাসন দৃশ্যমান। আজও মুসলিম ঘরের সন্তানেরা দলবেঁধে হিন্দুদের উৎসবে যাচ্ছে। কেউ এর বিরোধিতা করলে উল্টো সেটাকে বলা হচ্ছে 'সাম্প্রদায়িকতা'। ঘরে ঘরে চলছে বলিউডের সিনেমা আর হিন্দি সিরিয়ালের অন্ধ অনুকরণ। সাথে যুক্ত হয়েছে পশ্চিমা অপসংস্কৃতির প্রভাব।

[৬২] অধ্যায় ২ দ্রষ্টব্য

ভ্যালেন্টাইন্স ডে, থার্টি ফার্স্ট নাইটের মতো উৎসব বহু দশক যাবত ব্যাপকভাবে উদযাপিত হচ্ছে। স্মার্টফোনের কল্যাণে পশ্চিমের জঘন্য থেকে জঘন্যতম সোশ্যাল মিডিয়া ট্রেন্ডগুলো দিনে দিনে আমাদের সমাজে পৌঁছে যাচ্ছে। ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম থেকে আমদানি করা লিভ টুগেদার এবং এলজিবিটির মতো অবক্ষয়ও।

সেই সময়কার মুসলিম সমাজে হিন্দু সমাজ থেকে আসা বিভিন্ন ধ্যানধারণা এবং সামাজিক প্রচলনকে 'মুসলিম রূপ' দেওয়ার প্রবণতা ছিল। হিন্দুদের বর্ণপ্রথার (Caste System) অনুকরণে আশরাফ-আতরাফ বিভাজন তৈরি হয়েছিল।

আজকের সমাজে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদকে 'মুসলিম রূপ' দেওয়ার প্রবণতা প্রবল। জাতীয়তাবাদকে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ', গণতন্ত্রকে 'ইসলামী গণতন্ত্র' কিংবা নারীবাদকে 'ইসলামী নারীবাদ' বানানোর নিরন্তর চেষ্টা ইসলামপন্থীদের জ্ঞানতাত্ত্বিক গোলামির বহিঃপ্রকাশ।

ফরায়েজীরা বাংলাকে দারুল হারব মনে করতেন, তবে তিতুমীর কিংবা তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়ার মতো ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁরা জিহাদ করেননি। সেই সময়কার বাস্তবতায় তাঁদের কৌশল ছিল সামাজিক শক্তি অর্জন এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে জালিম ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।

আজকের বাস্তবতায় জাহিলিয়াতকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রত্যাখ্যান করাই ঈমানের দাবি। আল্লাহর আইন বনাম গাইরুল্লাহর আইনকে সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত করা ঐতিহাসিক আবশ্যকতা। একইসাথে বুনিয়াদি স্তরে সামাজিক শক্তি এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলাই কার্যকর রণকৌশল; সশস্ত্র সংঘাত না।

ঐতিহাসিক দূরত্ব

ফরায়েজী আন্দোলনের সংগ্রামের সাথে আমাদের বর্তমান লড়াইয়ের গভীর ঐতিহাসিক ও আদর্শিক সম্পর্ক আছে। তবে কিছু মৌলিক পার্থক্যের দিকও আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ফরায়েজী আন্দোলনের এমন অনেক দিক আছে, যা বর্তমানের জটিল প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতার সাথে মানানসই না।

এই আন্দোলন ছিল মূলত গ্রামীণ সমাজভিত্তিক; কিন্তু বর্তমানে টেকসই আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে শহর এবং গ্রাম দু' দিকেই মনোযোগ দেওয়া জরুরি। বিশেষ করে গত একশো বছরে এই ভূখণ্ডের বেশিরভাগ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলোর পেছনে শহুরে মধ্যবিত্ত অন্যতম প্রধান চলকের ভূমিকায় ছিল।

ফরায়েজীরা বৃহত্তর মুসলিম সমাজের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলেন। ফিকহের বিভিন্ন সূক্ষ্ম দিক নিয়ে তাঁরা অন্যদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আজকের অস্তিত্বের সংকটের সময়ে এ-ধরনের তর্কে জড়ানো হবে আত্মঘাতী।

ফরায়েজী আন্দোলন ব্যক্তি, পরিবার এবং সংগঠনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছিল। কিন্তু বর্তমানে কোনো ইনকিলাবি আন্দোলন সফল হতে হলে তা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর গণ্ডিতে আবদ্ধ হলে চলবে না।

দল বা সংগঠন থাকবে, নেতাও নিঃসন্দেহে থাকবেন, কিন্তু সফল হতে হলে একে সামগ্রিক রূপ নিতে হবে। কোনো একক ব্যক্তি বা সংগঠনের প্রকল্পের বদলে, কওমের প্রকল্প হিসেবে এটাকে দাঁড়াতে হবে।

***

প্রায় দু'শো বছরের পুরোনো কোনো মডেলই শতভাগ অপরিবর্তিতভাবে বর্তমানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব না, উচিতও না। অতীতের শিক্ষা এবং বর্তমানের যথাযথ বিশ্লেষণের আলোকেই ভবিষ্যতের পথ ও পদ্ধতি বেছে নিতে হয়। তাই ফরায়েজীদের হুবহু অনুকরণ কাম্য না।

তবে ফরায়েজীদের উদাহরণ আমাদের জন্য প্রুফ অফ কনসেপ্ট। তাঁরা প্রমাণ করে গেছেন, একটা মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়া কওমও চাইলে প্রবল প্রতিপক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধের বুনিয়াদ তৈরি করতে পারে।

নববী দাওয়াহর ছাঁচে দ্বীনের পুনর্জাগরণের মাধ্যমে যে সামাজিক শক্তি অর্জন এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, ফরায়েজী আন্দোলন তার প্রমাণ।

এবং এটা এই মাটি এবং মানুষের মধ্য থেকেই ওঠে আসা দৃষ্টান্ত।

পাশাপাশি ফরায়েজীদের ইতিহাসে আছে কড়া হুঁশিয়ারিও।

ফরায়েজীদের অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়েছে, কোনো আন্দোলন যদি ইনকিলাবি স্তরে যেতে না পারে, যদি তামকীন বা শাসনকর্তৃত্ব অর্জনে ব্যর্থ হয়, তবে সেই আন্দোলন একদিন ভেঙে পড়তে বাধ্য।

বুনিয়াদ যত মজবুতই হোক না কেন, ইনকিলাব ছাড়া শত্রুর ক্রমাগত আগ্রাসনের মুখে তা একসময় আলগা হয়ে আসবেই।

বুনিয়াদ হলো অপরিহার্য পূর্বশর্ত, ইনকিলাব হলো চূড়ান্ত বাস্তবায়ন।

ফরায়েজীরা আমাদের বুনিয়াদ গড়ার পথ দেখিয়ে গেছেন; ইনকিলাবের সেই অসম্পূর্ণ যাত্রা সম্পন্ন করার দায়িত্ব আমাদের।

অধ্যায় ৫

জিজ্ঞাসা

যে কোনো নতুন উদ্যোগের শুরুতে অবধারিতভাবে কিছু জিজ্ঞাসার জন্ম হয়।

আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা একটা নতুন যাত্রার রূপরেখা দেখেছি: দ্বীনের পুনর্জাগরণের বুনিয়াদ থেকে শুরু করে সামাজিক শক্তি, তারপর সামাজিক আন্দোলন, শেষে ইনকিলাব।

স্বাভাবিকভাবেই কিছু প্রশ্ন আসে।

কেউ কেউ মনে করেন, দ্বীনের পুনর্জাগরণের মাধ্যমে সামাজিক শক্তি, সামাজিক আন্দোলন, বিপ্লব; এসব আগেকার যুগে হয়তো সম্ভব ছিল, কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে আর বাস্তবসম্মত না।

আবার অনেকে বলেন, সমাজ পরিবর্তন, জাতীয় জীবনের বিনির্মাণ, ইনকিলাব—যাই বলি না কেন, শেষ পর্যন্ত এগুলো রাজনীতির সাথেই জড়িত। আর রাজনীতি বলতে বেশির ভাগ মানুষ নির্বাচনী রাজনীতিকেই বোঝে। তাছাড়া সামাজিক শক্তি গড়ে তোলার মতো কাজগুলো গণতান্ত্রিক নির্বাচনী রাজনীতির মাধ্যমেও করা যেতে পারে। তাহলে এই পথে কেন হাঁটতে হবে?

আরও কেউ কেউ বলেন, ধরে নিলাম সবই হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইনকিলাব হবে কীভাবে?

এসব সংশয়ের গোঁড়ায় কখনো থাকে নির্ভেজাল বাস্তববাদিতা, কখনো অনিশ্চয়তার আশঙ্কা, আবার কখনো গতানুগতিকতাকে আঁকড়ে ধরার প্রবণতা।

তবে উৎস যা-ই হোক, প্রতিটি জিজ্ঞাসাই গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো নিয়ে নির্মোহ আলোচনা প্রয়োজন।

মোটাদাগে এখানে মূল প্রশ্ন তিনটা:

প্রথমত, এই পথ কি এখনো চলার উপযুক্ত?

সামাজিক শক্তি, সামাজিক আন্দোলন, বুনিয়াদ ও ইনকিলাব—এগুলো কি আধুনিক যুগে আদৌ সম্ভব? নাকি এগুলো ইতিহাসের পাতায় ফেলে আসা ঘটনা কেবল, যা এখন অকার্যকর?

দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রকে এড়িয়ে যাওয়া কেন?

কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের জন্য গণতান্ত্রিক নির্বাচনী রাজনীতিকে কেন পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হবে না? সামাজিক আন্দোলনের মতো দীর্ঘ, অনিশ্চিত পথ কেন?

তৃতীয়ত, গন্তব্যে পৌঁছানোর পদ্ধতিটা ঠিক কী?

ধরে নিলাম বুনিয়াদ তৈরি হলো, সামাজিক শক্তি গড়ে ওঠল, তৈরি হলো সামাজিক আন্দোলন। কিন্তু তারপর? পুরোনো ব্যবস্থা ভেঙে নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াটা আসলে কী? ইনকিলাব কীভাবে ঘটে?

এ অধ্যায়ের আলোচনা প্রথম দুটো প্রশ্নের উত্তর নিয়ে।

তৃতীয় প্রশ্ন নিয়ে কথা বলব পরের অধ্যায়ে।

গণআন্দোলন

প্রথম প্রশ্নটা দিয়ে শুরু করি।

আমাদের মনে একটা ধারণা গেঁথে গেছে, রাজনীতি মানেই নির্বাচন আর সংসদ। অনেকে মনে করেন, গণআন্দোলন হয়তো আগে কাজ করত, কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের নজরদারি, প্রযুক্তি আর সামরিক শক্তির সামনে গণআন্দোলন অচল। আধুনিক বিশ্বে একমাত্র বাস্তবসম্মত পথ হলো সংসদীয় গণতন্ত্র।

কিন্তু এই ধারণাগুলো ইতিহাসের সাথে একেবারেই মেলে না।

নির্বাচনী গণতন্ত্রের এই জৌলুস খুব বেশিদিনের না। বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন তার 'The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century' বইয়ে দেখিয়েছেন:

- ১৯২৫ সালের দিকে পৃথিবীতে নির্বাচনী গণতন্ত্র ছিল ২৯টি দেশে,
- ১৯৬২-এর দিকে ৩৬টি দেশে,
- ১৯৯০ এর দিকে সংখ্যাটা ছিল ৬০।[১]

মাথায় রাখুন, ১৯৯০ সালে মোট দেশের সংখ্যা ছিল ১৮০ টির মতো। তার মানে, আজ থেকে স্রেফ ৩৫ বছর আগেও পৃথিবীর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ দেশে নির্বাচনী গণতন্ত্র চালু ছিল।

তথ্যটা নিয়ে একটু ভাবুন।

আজ রাজনীতি বললেই আমরা ভাবছি নির্বাচনী গণতন্ত্রের কথা। অথচ মাত্র ৩০-৪০ বছর আগেও পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে এই ব্যবস্থা ছিলই না।

তাহলে ওইসব দেশে কি তখন রাজনীতি ছিল না? আন্দোলন ছিল না? হক আদায়ের দাবি কি ছিল না মানুষের মুখে?

অবশ্যই ছিল। গণতন্ত্রের আলাপ আসার বহু আগে থেকেই মানুষ জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আন্দোলন করেছে। রক্ত দিয়েছে। ব্যালট পেপারের যুগ শুরু হবার অনেক, অনেক আগে থেকেই পৃথিবীতে আন্দোলন-সংগ্রাম, বিপ্লব ও বিদ্রোহ

---

[১] Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), 17–18, 25–26.

হয়ে এসেছে। কাজেই রাজনীতিকে নির্বাচনী গণতন্ত্রের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আটকে ফেলার আধুনিক চেষ্টাটা ঐতিহাসিক বিচারে একেবারেই ভিত্তিহীন।

সংসদীয় ব্যবস্থার বাইরে যে বিশাল ও জীবন্ত জগত রয়েছে, সেটাই রাজনীতির আদি এবং অকৃত্রিম ভাষা।

গণআন্দোলনের রাজনীতি

সংসদীয় ব্যবস্থার বাইরের এই বিশাল জগতটাকে আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তায় নানা আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অ্যাকাডেমিক আলাপে এই রাজনীতির বিভিন্ন নাম দেখা যায়। যেমন:

- **সংসদ-বহির্ভূত রাজনীতি:** ইউরোপে একে প্রায়ই এক্সট্রা-পার্লামেন্টারি পলিটিক্স (extra-parliamentary politics) বলা হয়। মানে নির্বাচনী ও সংসদীয় ব্যবস্থার বাইরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড।[২]
- **কন্টেনশাস পলিটিক্স:** রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে, চার্লস টিলি ও সিডনি টারোর কাজের সূত্র ধরে, একে কন্টেনশাস পলিটিক্স (contentious politics) বলা হয়। এর মধ্যে পড়ে আন্দোলন, অসহযোগ, গণঅভ্যুত্থান কিংবা বিপ্লবের মতো ঘটনাগুলো।[৩] সোজা কথায়, যেখানে মানুষ তার হক আদায়ের জন্য সরাসরি সংঘাত বা বিরোধে জড়ায়।
- **সামাজিক আন্দোলনের রাজনীতি:** অনেকে একে সোশ্যাল মুভমেন্ট পলিটিক্স (social movement politics) বা সামাজিক আন্দোলনের রাজনীতিও বলেন। যেখানে নাগরিকরা স্রেফ ভোটার হয়ে বসে থাকে না, বরং সম্মিলিতভাবে কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্যে রাজপথে চাপ সৃষ্টি করে।[৪]
- **সামষ্টিক পদক্ষেপের রাজনীতি:** এই ধরনের রাজনীতিকে সামষ্টিক পদক্ষেপ বা collective action-এর ধারণা দিয়েও ব্যাখ্যা করা হয়।[৫]

---

[২] Moises Arce and Wonik Kim, "Globalization and Extra-Parliamentary Politics in an Era of Democracy," *European Political Science Review* 3, no. 2 (2011): 253–255

[৩] Charles Tilly and Sidney Tarrow, *Contentious Politics*, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 2015).

[৪] Tarrow, Sidney. *Power in movement.* Cambridge university press, 2022.

[৫] Mancur Olson, *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965), 1–16.

- **বিদ্রোহী রাজনীতি:** সাম্প্রতিক সময়ে, এই ধরনের রাজনীতিকে ডাকা হচ্ছে ইনসারজেন্ট পলিটিক্স (insurgent politics) বা বিদ্রোহী রাজনীতি নামে। এই পরিভাষা ওইসব তৃণমূল আন্দোলনকে বোঝায়, যা প্রচলিত ব্যবস্থার নৈতিক আর রাজনৈতিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে। বিদ্রোহ শব্দটা এখানে ব্যবহার হয় রূপান্তরের প্রতিশ্রুতি হিসেবে।[৬]

এই প্রতিটা পরিভাষা ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরলেও তাদের মূল সুর এক।

গণমানুষের সুসংবদ্ধ শক্তি এই রাজনীতির চালিকাশক্তি। এই রাজনীতি জোট আর ভোটের অংকে সময় নষ্ট করে না। ডিপ স্টেইট কিংবা বিদেশি শক্তির করুণা ভিক্ষা করে না। তোয়াক্কা করে না নিয়মতান্ত্রিকতার। ক্ষমতার মসনদ কাঁপিয়ে তোলে গণমানুষের সম্মিলিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে।

আমাদের আলোচনায়, গণমানুষের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের এই পদ্ধতিকে আমরা বলব গণআন্দোলনের রাজনীতি।

গণআন্দোলনের রাজনীতি

বিভিন্ন জাতি আর ভূখণ্ডের ভাগ্য বদলে দেওয়া বড় বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো ব্যালট বাক্স বা সংসদের আলাপের মধ্য দিয়ে আসেনি। এসেছে ময়দানে, রাজপথে, কল-কারখানায়, ক্ষেতখামারে অসংখ্য মানুষের সম্মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

আর এর গোঁড়ায় ছিল গণশক্তি; নিয়মতান্ত্রিকতার প্রথাগত কাঠামোর বাইরে গড়ে ওঠা এক বিশাল ঢেউ, যা তীব্র আঘাতে জুলুমের মসনদ উল্টে দেয়।

গণআন্দোলনের রাজনীতির যাত্রা তাই শুরু হয় তৃণমূল থেকে। নির্দিষ্ট কোনো এলিট শ্রেণির স্বার্থের বদলে কওম ও যমীনের বিশ্বাস, বাস্তবতা এবং প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় আন্দোলনের ভিত্তি।

এ রাজনীতির প্রকাশভঙ্গি বিচিত্র ও বহুমুখী। কিছু পদ্ধতি অহিংস, কিছু পদ্ধতি সহিংস, কিছু এই দুইয়ের মিশ্রণ। তবে এর মূল শক্তি লুকিয়ে আছে সাধারণ মানুষকে সক্রিয় ও ঐক্যবদ্ধ করে পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তোলার মধ্যে।

---

[৬] Tomba, Massimiliano. *Insurgent universality: An alternative legacy of modernity.* Oxford University Press, 2019; Edward Hon-Sing Wong, "Insurgent Politics against the Backdrop of Hong Kong's Existential Crisis," *LAOMS* (blog), published September 25, 2019

কমিউনিটি অর্গানাইজিং আর তৃণমূল ক্যাম্পেইন থেকে শুরু করে শ্রমিকদের ধর্মঘট, ডাইরেক্ট অ্যাকশন থেকে শুরু করে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন, এবং অহিংস প্রতিরোধ থেকে শুরু করে গণঅভ্যুত্থান, বৈপ্লবিক সংগ্রাম, এমনকি সশস্ত্র বিদ্রোহ—সবই গণআন্দোলনের উদাহরণ।[৭]

বাঁকবদলের ইতিহাস

আধুনিক ইতিহাসের বড় বড় বাঁকবদলের কয়টা নির্বাচন আর সংসদের মাধ্যমে এসেছে, বলুন তো?

আজ যেসব রাষ্ট্রকে সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শ হিসেবে দেখা হয়, খুঁজে দেখুন তো তাদের নিজেদের ইতিহাস কী বলে?

আধুনিক সাধারণতন্ত্র বা রিপাবলিকের প্রধান দুই উদাহরণ হলো অ্যামেরিকা আর ফ্রান্স। দুটো দেশেই রিপাবলিক কায়েম হয়েছে তীব্র গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে আসা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে।

অ্যামেরিকা ব্রিটিশদের গোলামি থেকে মুক্তি পেয়েছে সাত বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে। ফ্রান্স রাজতন্ত্রকে ছুড়ে ফেলে রিপাবলিক কায়েম করেছে রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থানের হাত ধরে। কোনোটাই ভোটের মাধ্যমে হয়নি।

আরও গভীর পরিবর্তনের দিকে তাকান। রাশিয়া আর চীনের বিপ্লব, কিউবার বিপ্লব, ইরানের শিয়া বিপ্লব—যেখানেই এক ব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলে নতুন ব্যবস্থা এসেছে, যেখানেই আমূল পরিবর্তন এসেছে, একটাও ব্যালট বাক্সের হিসাবে হয়নি। আফগানিস্তানে দু'বার ইসলামী ইমারতও প্রতিষ্ঠা হয়েছে ব্যালটের বদলে বুলেট দিয়ে।

প্রতিটা ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে গণঅভ্যুত্থান, সশস্ত্র বিদ্রোহ বা জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। ঔপনিবেশিক আমলেও গোলামির শেকল ভাঙার জন্য যখনই সত্যিকারের প্রতিরোধ গড়ে ওঠেছে, তা হয়েছে গণমানুষের উত্তাল আন্দোলনের মধ্য দিয়েই।

নিয়মতান্ত্রিকতার সীমানা ভেঙেই ইতিহাস তার পথ তৈরি করে নিয়েছে।

---

[৭] রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বে ব্যবহৃত contentious politics ধারণার অনুসরণে গণআন্দোলন বলতে এমন সকল সংগঠিত সামষ্টিক পদক্ষেপকে বোঝায়, যেখানে নাগরিকরা ক্ষমতাকাঠামোর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য দাবি উত্থাপন করে। এই পরিসরের মধ্যে অহিংস অসহযোগ যেমন থাকতে পারে, তেমনি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সশস্ত্র বিদ্রোহও থাকতে পারে, যদি তা সংগঠিত গণভিত্তিক দাবির রূপ ধারণ করে। দেখুন: Charles Tilly and Sidney Tarrow, *Contentious Politics*, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 2015); Giugni, Marco. "Modern Protest Politics." *Encyclopedia of European Social History from 1350* (2001): 311-331.

সংস্কার

বিপ্লব দুর্লভ, বহু যুগেও হয়তো একটা মেলে না। বেশিরভাগ মানুষ বিপ্লবের ঝুঁকি নিতে চায় না, তারা সংস্কারের নিরাপদ পথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

কিন্তু আধুনিক সময়ের অর্থবহ সংস্কারগুলোও কি নির্বাচনী গণতন্ত্রের ফসল?

বাস্তবতা হলো, সংস্কারের ক্ষেত্রেও বারবার সফলতা এসেছে সেই গণআন্দোলনের পথ ধরেই।

আশির দশকের শেষে চেকোস্লোভাকিয়া আর হাঙ্গেরিতে কমিউনিস্ট শাসনের পতন ঘটেছিল তীব্র গণআন্দোলনের তোড়ে। নব্বইয়ের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী শাসনের অবসান হয়েছিল দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, যার অর্ধেকটা ছিল সশস্ত্র লড়াই আর বাকিটা রাজপথের আন্দোলন।

২০০৮ সালে নেপালের জনগণ ২৪০ বছরের পুরোনো রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে রিপাবলিক গঠন করতে পেরেছিল এক দশকের রক্তক্ষয়ী গেরিলা যুদ্ধ আর গণঅভ্যুত্থানের মিশেলে। ২০২২ সালে শ্রীলংকার গোটাবায়া রাজাপাকসে পালিয়ে গিয়েছিল গণআন্দোলনের চাপে।

ফিলিস্তিনে দখলদার যায়নবাদী শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দেওয়া প্রথম ইন্তিফাদার (১৯৮৭-১৯৯৩) সময় তরুণরা ভোটকেন্দ্রের লাইনে দাঁড়ায়নি। তারা এগিয়েছিল গণপ্রতিরোধের পথে। আরব বসন্তে একাধিক তাগুত শাসকের পতন সংসদের খেজুরে আলাপের মধ্য দিয়ে হয়নি। রাজপথের আন্দোলন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে।

যেসব সংস্কারমূলক অর্জনের কৃতিত্ব নির্বাচিত সরকারকে দেওয়া হয়; যেমন সমাজকল্যাণমূলক নানা সংস্কার, সেগুলোও বহু বছরের শ্রমিক আন্দোলন ও জনগণের চাপের ফসল।

অ্যামেরিকার কৃষ্ণাঙ্গরা ভোটাধিকারসহ বিভিন্ন অধিকার অর্জন করেছে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে। শ্রমিকদের জন্য আট ঘণ্টার কর্মদিবস, শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা—এ ধরনের সংস্কারগুলো এসেছে শ্রমিক আন্দোলনের পর। প্রতিটি অধিকার আদায় করতে হয়েছে রক্ত দিয়ে, ঘাম দিয়ে, তীব্র আন্দোলন করে।

আধুনিক যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলোর পেছনেও মূল শক্তি ছিল গণআন্দোলনের রাজনীতি।

বাংলাদেশ

এই বাস্তবতার সাক্ষ্য পাওয়া যায় আমাদের ইতিহাস থেকেও।

গত সাত দশকে এ ভূখণ্ডের গতিপথ বদলে দেওয়া বড় পরিবর্তনগুলোর কোনটা নির্বাচনের মাধ্যমে এসেছে, বলুন?

৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, ৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, ২০২৪-এর জুলাই গণঅভ্যুত্থান—কোনোটিই নিয়মতান্ত্রিকতার সীমার ভেতরে ছিল না।

ঔপনিবেশিক আমলেও এই ভূমিতে আমরা একের পর এক গণআন্দোলনের উদাহরণ দেখতে পাই।

দখলদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ফকির মজনু শাহ'র বিদ্রোহ আর শহীদ তিতুমীর ও তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়ার জিহাদে। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদাহরণ পাওয়া যায় ১৮৫৭-তে। আর ফরায়েজীদের সামাজিক আন্দোলন নিয়ে তো এরই মধ্যে আমরা আলোচনা করেছি।

ইংরেজরা উপমহাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন আনার বহু আগে থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষরা গণআন্দোলনের মাধ্যমে তাঁদের আযাদীর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

অতীতে যেমন ছিল, তেমনি আজও গণআন্দোলন কার্যকর। বৈপ্লবিক রূপান্তর কিংবা সংস্কার—দুটো ক্ষেত্রেই আন্দোলন-সংগ্রাম কার্যকরী, আর নির্বাচনী রাজনীতি ব্যর্থ।

পরিবর্তনের প্রতিটি ঐতিহাসিক ক্ষণে ফায়সালা হয়েছে লড়াইয়ের ময়দানে কিংবা রাজপথে। সংসদীয় আপসকামিতা লাঞ্ছনা ছাড়া আমাদের আর কিছুই দিতে পারেনি।

বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের আন্দোলন

বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক ইতিহাসও একই সাক্ষ্য দেয়।

এদেশে ইসলামপন্থীদের আন্দোলন-সংগ্রামের যেসব অর্জন আছে, আংশিক অথবা পূর্ণাঙ্গ, সবই এসেছে রাজপথের আন্দোলনে। শাইখুল হাদীস (রাহিমাহুল্লাহ), মুফতি আমিনী (রাহিমাহুল্লাহ), আল্লামা আহমদ শফী (রাহিমাহুল্লাহ)-দের নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলনগুলোর সবই ছিল গণশক্তির বহিঃপ্রকাশ। সবই হয়েছে রাজপথে।

সফলতা যখন এসেছে, যতটুকু এসেছে, তা এসেছে গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

অন্যদিকে যখনই নির্বাচনী রাজনীতির চোরাবালিতে পা রাখা হয়েছে, তখনই এসেছে নৈতিক বিপর্যয়। সফেদ পোশাকের মানুষদের গায়ে কালো দাগ লেগেছে। এমন সব লোকেদের সাথে এমন সব আপস করতে হয়েছে, যা ইসলামের মহৎ আদর্শ এবং উলামায়ে কেরামের শান-মর্যাদার সাথে কোনোভাবেই যায় না। স্বীকৃতি দিতে হয়েছে সেক্যুলার ব্যবস্থাকেও।

এই তিক্ত বাস্তবতাগুলোকে আবেগ বা বাগাড়ম্বর দিয়ে ঢাকা যাবে না।

আধুনিক যুগেও প্রাসঙ্গিক

সফলতার দিক থেকে গণআন্দোলনের সঙ্গে নির্বাচনী রাজনীতির আসলে তুলনাই হয় না। স্রেফ নির্বাচনের মাধ্যমে গত দেড়শ বছরে পৃথিবীর কোথাও কোনো অর্থবহ সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তন আসেনি। সংসদীয় রাজনীতি পরিবর্তনের বাহক হতে পারে না, গণআন্দোলনের ফলাফলকে খাতা-কলমে বৈধতা দিতে পারে বড়জোর।

অন্যদিকে, গণআন্দোলনের রাজনীতির মাধ্যমে এসেছে বহু পরিবর্তন, এসেছে বহু প্রতীক্ষিত বিপ্লব। গণতান্ত্রিক রাজনীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যাবার পরও এর প্রাসঙ্গিকতা বা কার্যকারিতা কমেনি। বরং জুলুমের সর্বগ্রাসী কাঠামোর বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের রাজনীতি এখনো মাজলুমের প্রতিরোধের পথ।

প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে আন্দোলনের ধরন পাল্টায়, কোনো আন্দোলন অতীতের উদাহরণের সাথে হুবহু মেলে না। কৌশল নতুন হয়, পদ্ধতি ভিন্ন হয়। কিন্তু মানুষের অদম্য প্রতিরোধের চেতনা অপরিবর্তিত থাকে। আধুনিক প্রযুক্তি গণআন্দোলনকে অসম্ভব করেনি। আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান আর নেইপামের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের কৃষকেরা লড়েছে হাতে খোদা সুড়ঙ্গ দিয়ে। মাটির নিচে গড়ে তুলেছে ২৫০ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ নেটওয়ার্ক। তারপর হারিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে।

আফগানিস্তানের মেষপালক আর কৃষকেরা প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়নের হেলিকপ্টার গানশিপ, আর তারপর মার্কিন হেলফায়ার মিসাইল আর এআই-চালিত টার্গেটিং সিস্টেমের বিরুদ্ধে পাহাড়ি কৌশল কাজে লাগিয়ে দু দুটো যুদ্ধে জিতে দেখিয়েছে।

ইসরায়েলের আইরন ডোম, এআই চালিত নজরদারি, ফেশিয়াল রেকগনিশান আর সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সীমান্তব্যবস্থাকে ফিলিস্তিনের মুজাহিদরা পরাস্ত করেছেন কখনো হাতে বানানো মিসাইল, কখনো সুড়ঙ্গ অথবা কখনো প্যারাগ্লাইডার দিয়ে।

২০২৪-এর জুলাইয়ে হাসিনার কাছে ছিল ডিজিটাল নজরদারি, পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবি-সেনাবাহিনী। পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র তার বশে ছিল। তাকে সরাসরি সহায়তা করছিল ভারতীয় গোয়েন্দারা। হেলিকপ্টার থেকে শুরু করে এপিসি, মেশিনগান থেকে শুরু করে স্নাইপার, নিয়মিত সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে গুণ্ডাবাহিনী—সব মোতায়েন করেছিল সরকার। তারপরও লক্ষ মানুষের স্রোতে হাসিনার রাষ্ট্রযন্ত্র অবশ হয়ে পড়েছিল। পরাজিত হয়েছিল।

প্রতিটা ক্ষেত্রে একই প্যাটার্ন। প্রতিপক্ষের হাতে ছিল অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, বিশাল বাজেট, স্যাটেলাইট নজরদারি। কিন্তু প্রতিবারই সাধারণ মানুষ—কৃষক, জেলে, ছাত্র—নতুন পথ খুঁজে নিয়েছে। ভূখণ্ডের জ্ঞান, স্থানীয় সমর্থন, সৃজনশীল কৌশল, উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি প্রমাণ করেছে যে, প্রযুক্তি শক্তিশালী হলেও মানুষের মনোবল আরও শক্তিশালী।

কংক্রিটের ফাঁক গলে যেমন ছোট্ট চারাগাছ আলোর সন্ধানে বেরিয়ে আসে, শেকড় গেড়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি জুলুমের সবচেয়ে শক্ত কাঠামোর ফাঁক গলেও প্রতিরোধ মাথা তুলে দাঁড়ায়।

প্রতিটা যুগের অত্যাচারীরা ভেবেছে তারা চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছে, প্রতিরোধের সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে। আর প্রতিটা যুগের মাজলুমেরা প্রমাণ করেছে, মানুষের আত্মমর্যাদা আর আযাদীর স্পৃহা অর্থ আর যন্ত্রের চেয়ে শক্তিশালী।

গণশক্তিই বরাবর বিপ্লবের হাতিয়ার ছিল এবং থাকবে।

গণআন্দোলন কি গণতান্ত্রিক?

অনেকে বলেন, যেগুলোকে গণআন্দোলন বলা হচ্ছে, এগুলো আসলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামেরই প্রক্রিয়া। নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশ নেওয়া দলগুলোও অহরহ ঘেরাও, বিক্ষোভ, ধর্মঘটের মতো কর্মসূচি দিয়ে থাকে। কাজেই গণআন্দোলন আর গণতন্ত্রকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই।

ভুল ধারণা।

লক্ষ্য করুন, এখানে গণতন্ত্রকে কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে?

এ-ধরনের আন্দোলন-সংগ্রামকে যখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ বলা হয়, তখন গণতন্ত্রের খুব ব্যাপক, খুব ঝাপসা এবং ঢিলেঢালা সংজ্ঞা দেওয়া হয়। বলা হয়—

> যেসব আন্দোলন গণমানুষের দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, যেখানে সাধারণ জনগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করে, ক্ষমতার কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে, সেগুলো গণতান্ত্রিক। কারণ জনগণের সচেতনতা, ক্ষমতায়ন আর সক্রিয় অংশগ্রহণের মতো বিষয়গুলো গণতন্ত্রের অংশ।

এই সংজ্ঞা মেনে নিলে যেকোনো আদর্শের আন্দোলনকে ‘গণতান্ত্রিক’ বলা সম্ভব। এমনকি যেসব আদর্শকে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু বলা হয়, সেগুলোকেও।

জার্মানির নাৎসি পার্টির আন্দোলনে গণমানুষের সম্পৃক্ততা ছিল। তারা তৃণমূল থেকে মানুষকে সংগঠিত করেছিল। তাদের আন্দোলনে ছিল সমাজের সামষ্টিক কষ্ট আর কল্যাণের কথা। বিভিন্ন প্রান্তিক ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী প্রাথমিকভাবে তাদের সমর্থনও দিয়েছিল। গণমানুষকে রাজপথে নামিয়ে তারা বিদ্যমান কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

অর্থাৎ, নাৎসিরা গণআন্দোলনের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল।

ওপরের যুক্তি অনুযায়ী নাৎসি আন্দোলন তাহলে ‘গণতান্ত্রিক’ হবার কথা। কিন্তু কেউই এটা বলে না।

একই কথা খাটে মুসোলিনির ইতালীয় ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রেও। তারাও গণসংগঠন, গণসমাবেশ, রাজপথের আন্দোলনকে ব্যবহার করেছিল।

কিন্তু নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট আন্দোলনকে কেউ গণতান্ত্রিক বলে না। উল্টো তাদের বলে গণতন্ত্রবিরোধী।

এখানে ব্যাপারটা কী ঘটছে, খেয়াল করুন।

একবার সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে পদ্ধতিকে সামনে রেখে:

> গণসম্পৃক্ততা আছে?
>
> তাহলে গণতান্ত্রিক।

আরেকবার সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে আদর্শকে সামনে রেখে:

> আদর্শ গণতান্ত্রিক না?
>
> তাহলে আন্দোলন গণতান্ত্রিক না।

এটা বুদ্ধিবৃত্তিক অসততা।

ফরায়েজীরা কর দিতে অস্বীকার করেছিল, খাসমহল দখল করেছিল, আদালত ঘেরাও করেছিল, আন্দোলন করেছিল নীলকরদের বিরুদ্ধে। অথচ ফরায়েজীরা গণতন্ত্র কী, তা-ই জানতেন না। সংসদে প্রতিনিধি পাঠানো, নির্বাচন, জনগণের সার্বভৌমত্ব—এসব ধারণা তাদের চিন্তার জগতে ছিল না।

তারা চাইতেন ইসলামী শরীয়াহ, উদার গণতন্ত্র বা বহুত্ববাদ না।

তাহলে কোন যুক্তিতে আপনি এ আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক বলবেন?

কোনো পদ্ধতির জনপ্রিয়তা বা গণসম্পৃক্ততা তাকে 'গণতান্ত্রিক' বানায় না। একই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করার অর্থ এই না যে, দুই আন্দোলনের আদর্শ বা লক্ষ্য এক হবে।

কর্মসূচির সাদৃশ্যই যদি মূল কথা হয়, তাহলে কোনো দল যদি রাজতন্ত্র বা নব্য-সামন্তবাদী শাসন কায়েমের লক্ষ্যে মিটিং-মিছিল, ঘেরাও, অবরোধ, ধর্মঘট ইত্যাদির আয়োজন করে, সেটাকে কি গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলা হবে?

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গেরিলা যুদ্ধ করেছে। আফগানিস্তানের তালিবানও গেরিলা যুদ্ধ করেছে। এর মানে কি তালিবান কমিউনিস্ট? বা কমিউনিস্ট পার্টি ইসলামী?

কোনো বদ্ধ উন্মাদও কি একথা বলবে?

বলবে না।

ঠিক একইভাবে কেউ গণতন্ত্রের আদর্শ নিয়ে ঘেরাও কর্মসূচি দিতে পারে, কেউ একই কর্মসূচি দিতে পারে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর আদর্শ নিয়ে। এতে করে তারা এক হয়ে যাচ্ছে না।

আসলে ঘেরাও, ধর্মঘট, অসহযোগ, মিছিল—এগুলোকে গণতান্ত্রিক বা অগণতান্ত্রিক বলাটাই এক ধরনের ক্যাটেগরি এরর। এগুলো রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামের পদ্ধতি মাত্র। যেকোনো রাজনৈতিক শক্তি এগুলো ব্যবহার করতে পারে। তারা গণতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট, ফ্যাসিস্ট, রাজতন্ত্রী হোক, অথবা ইসলামপন্থী।

কাজেই ইসলামপন্থীরা যখন গণআন্দোলনের কথা বলেন, এর অর্থ এই না যে, তারা 'গণতান্ত্রিক' হয়ে যাচ্ছেন। এর অর্থ তারা কার্যকর রাজনৈতিক পদ্ধতি ব্যবহার করছেন, যা যেকোনো আদর্শের মানুষ ব্যবহার করতে পারে এবং করেছে।

গণআন্দোলন আর গণতন্ত্র এক না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপরীতধর্মী।

গণতন্ত্র প্রশ্ন

এবার আসা যাক দ্বিতীয় প্রশ্নের আলোচনায়।

সামসময়িক রাজনৈতিক চিন্তা গণতন্ত্রের ছকে বন্দি।

ইসলামের নামে রাজনীতি করা দলগুলোর বেশিরভাগের বদ্ধমূল বিশ্বাস হলো, রাষ্ট্র বা সমাজ বদলাতে হলে আগে সংসদে ঢুকতে হবে। নির্বাচনে জিতে ধাপে ধাপে ক্ষমতায় যেতে হবে। তারপর ঘটবে রাষ্ট্রের রূপান্তর।

এই অতি সরল চিন্তার ওপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন দল নির্বাচনী রাজনীতিকে দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে।

তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে: মুসলিমবঙ্গের লক্ষ্য অর্জনে আমরা কেন এই পথ ব্যবহার করার কথা বলছি না? গণতন্ত্রের মাধ্যমে কি কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্ভব না?

না, সম্ভব না।

গণতান্ত্রিক রাজনীতির মধ্য দিয়ে সামাজিক শক্তি, সামাজিক আন্দোলন এবং ইসলামী ইনকিলাবের লক্ষ্য অর্জন করা যাবে না। ইসলামের পুনর্জাগরণের বুনিয়াদ গড়া যাবে না। বরং এই পথে হাঁটলে ইসলামী আন্দোলন তার লক্ষ্য ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে।

এই অবস্থানের পেছনে চারটা মৌলিক কারণ আছে:

- আদর্শিক এবং প্রায়োগিক, দু'দিক থেকেই গণতন্ত্র ঈমান ও তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে মৌলিক আকীদাগত এবং শারঈ আপত্তি আছে।
- মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্র উপনিবেশবাদের পরিশীলিত রূপ, আর পশ্চিমে কর্পোরেট এলিটদের তৈরি নয়া সামন্তবাদ। জনগণের ক্ষমতায়নের কথা বললেও গণতন্ত্র মূলত মানুষকে নিয়ন্ত্রণের কাঠামো।
- নির্বাচন ও সংসদীয় রাজনীতির মাধ্যমে সর্বোচ্চ বিদ্যমান কাঠামোর সংস্কার সম্ভব, বৈপ্লবিক রূপান্তর সম্ভব না। অর্থাৎ, গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

- নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিপ্লবী আন্দোলনের সম্ভাবনা, গতি ও সামর্থ্যকে শুষে নেয়। আন্দোলনের আদর্শ ও লক্ষ্য বদলে দেয়, বিদ্যমান ব্যবস্থার আধিপত্যকে আরও মজবুত করে। শেষমেশ আন্দোলনকে বিপ্লবী শক্তি থেকে পরিণত করে বিদ্যমান কাঠামোর পাহারাদারে।

গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যানের জন্য স্রেফ আকীদাহগত আপত্তি যথেষ্ট।

তর্কের খাতিরে সেই প্রসঙ্গ যদি সরিয়েও রাখা হয়, তবু কৌশলগত ও প্রায়োগিক বাস্তবতার নিরিখে বাকি তিন কারণে এই পথ বর্জন করা অপরিহার্য।

এই চারটা দিক নিয়েই আমরা আলোচনা করব। তবে তার আগে গণতন্ত্র কী, তা স্পষ্ট করা জরুরি।

গণতন্ত্র কী?

গণতন্ত্র নিয়ে আলোচনার গতানুগতিক কিছু ছক আছে।

প্রথম এবং সবচাইতে পরিচিত ছকটা অনেকটা এরকম—

> ‘গণতন্ত্রের জন্ম প্রাচীন গ্রিসে। গণতন্ত্র শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Demos এবং Kratia এর মিশেলে। Demos অর্থ জনগণ এবং Kratia অর্থ হলো শাসন। অর্থাৎ গণতন্ত্র অর্থ হলো জনগণের শাসন...’

আলোচনা এভাবে এগোয়।

এক সময় রাজতন্ত্রের সাথে গণতন্ত্রের পার্থক্যের বয়ান আসে। এক পর্যায়ে অবধারিতভাবে হাজির হয় অ্যাবরাহাম লিংকনের সেই বিখ্যাত উক্তি: ‘গণতন্ত্র হলো জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার, জনগণের জন্য সরকার।’[৮]

এ-ধরনের আলোচনার কিছু উপকারিতা আছে। কিন্তু গণতন্ত্র আসলে কী, এর মূল দাবিগুলো কী, এবং এই প্রক্রিয়া ঠিক কীভাবে কাজ করে, তা বোঝার জন্য এই পদ্ধতি খুব একটা কার্যকরী না।

---

[৮] ১৬তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট অ্যাবরাহাম লিংকনের বিখ্যাত উক্তি। মার্কিন গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১৮৬৩ সালের গেটিসবার্গ ভাষণে দেওয়া বক্তব্যের অংশ। এই উক্তি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সমাদৃত হলেও অ্যাকাডেমিক আলোচনাতে সাধারণত গণতন্ত্রের টেকনিক্যাল সংজ্ঞা (technical definition) হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। লিংকনের এই বক্তব্যকে গণতন্ত্রের পক্ষে একটি রেটোরিকাল এবং আকাঙ্ক্ষামূলক (aspirational) বক্তব্য হিসেবে দেখা হয়। ব্যবহারিক মানদণ্ড হিসেবে না।

ইসলামের মাপকাঠিতে গণতন্ত্রের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের জন্য ওপরের এই আবরণ ছিঁড়ে আরও গভীরে যাওয়া জরুরি।

গতানুগতিক আলোচনার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, গণতন্ত্রের নির্দিষ্ট কোনো অংশের ওপর ফোকাস করে সংজ্ঞা দেওয়া। যেমন—

সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক: গণতন্ত্র হলো সংখ্যাগুরুর শাসন। অধিকাংশ যা চাইবে, সেটাই হবে।

নির্বাচনকেন্দ্রিক: গণতন্ত্র শাসক বাছাই করার প্রক্রিয়া। নিয়মিত, নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হাতবদল।

তুলনামূলক: গণতন্ত্র হলো রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদির বিকল্প। অন্য ব্যবস্থায় জনগণের কথা বলার জায়গা থাকে না, গণতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিচালনায় 'নাগরিকের অভিপ্রায়ের প্রতিফলন' ঘটে।

সার্বভৌমত্বকেন্দ্রিক: গণতন্ত্র এমন একটি শাসনব্যবস্থা, যেখানে 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকানা জনগণের।

প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক: এটা এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে সংসদ, বিচারব্যবস্থা আর নির্বাচন কমিশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো নির্দিষ্ট ছকে জনগণের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা আর ভারসাম্যই এই সজ্ঞায় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

মূল্যবোধকেন্দ্রিক: গণতন্ত্র এমন একটা কাঠামো, যেখানে কিছু নির্দিষ্ট মূল্যবোধ কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকে। যেমন- ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতপ্রকাশের অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, নারী-পুরুষের সমতা, সংখ্যালঘু অধিকার ইত্যাদি।

এভাবে একেকটা দিক দিয়ে পুরো কাঠামোকে ব্যাখ্যা করার সমস্যা হলো, এতে করে অনেক কিছু আড়ালে থেকে যায়। গণতন্ত্রের পুরো চেহারাটা ধরা পড়ে না। এবং বেশ কিছু অস্পষ্টতা তৈরি হয়।

এই সব সংজ্ঞাই কি একইসাথে সঠিক? সব যদি একই জিনিসের পরিচয় হয়, তাহলে গণতন্ত্র আসলে কোনটা? নাকি গণতন্ত্র আদতে এক বহুরূপী ধারণা, যার কোনো একক ও সুনির্দিষ্ট রূপ নেই?

সংজ্ঞার গোলমাল

ওপরে বলা সংজ্ঞাগুলোর প্রধান ত্রুটি হলো, এগুলো রিডাকশনিস্ট। অতি সরলীকরণের দোষে দুষ্ট। এর প্রতিটা নিয়েই শক্ত আপত্তির সুযোগ আছে।

নির্বাচনকেন্দ্রিক সংজ্ঞার কথা ধরা যাক। অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আধুনিক গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে পৃথিবীর কোনো দায়িত্বশীল রাজনৈতিক তাত্ত্বিক বা অ্যাকাডেমিক কিন্তু বলেন না যে, গণতন্ত্র = নির্বাচন। তারা বলেন, নির্বাচন গণতন্ত্রের অংশ, কিন্তু এটাই পুরো ছবিটা না।

শাসনে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনের দাবিও চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। অনেক দেশেই ক্ষমতার আসল চাবিকাঠি থাকে ডিপ স্টেইট অথবা বিদেশি প্রভুদের হাতে।[৯] জনগণের প্রতিনিধিত্বের আড়ালে চলে দেশি-বিদেশি কায়েমি স্বার্থের মহড়া। শাসনের গতিপথ ঠিক করে অনির্বাচিত নানা ক্ষমতার বলয়। জনগণ সেখানে অপ্রাসঙ্গিক।

আবার সংসদের বাইরে প্রশাসনিক আদেশ, এক্সিকিউটিভ অর্ডার, গোপন সমঝোতা ইত্যাদির মাধ্যমেও শাসনের অনেক কিছু ঠিক হয়ে যায়। ক্ষমতার এই জটিল সমীকরণে প্রায়ই হারিয়ে যায় 'জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন'-এর পরিপাটি ছবিটা।

'জনগণের সার্বভৌমত্ব'-এর দাবিও গোলমেলে। এই দাবি গণতন্ত্রের একচেটিয়া না। আধুনিক ইতিহাসের বহু কট্টর জাতীয়তাবাদী বা উগ্র-ডানপন্থী আন্দোলনও নিজেদের জনগণের সার্বভৌমত্বের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করেছে।

ইতালির ফ্যাসিস্ট আন্দোলন কিংবা জার্মানির নাৎসিবাদের মতো বহু কর্তৃত্ববাদী শক্তি বারবার বলেছে, তারা জনগণের অভিপ্রায়ই বাস্তবায়ন করছে। আর নিরেট সত্য হলো, নিজ নিজ দেশের জনগণ আসলেই তাদের সমর্থন দিয়েছিল। তবু কেউ এদের গণতান্ত্রিক বলে না, বরং উল্টোটাই বলে।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মত-এর আলাপও ধোপে টেকে না।

ধরুন, কোনো দেশের বেশিরভাগ মানুষ রায় দিল, তাদের দেশে দাসপ্রথা বৈধ। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কি তখন এ সিদ্ধান্তকে গণতান্ত্রিক রায় হিসেবে শ্রদ্ধা করবে? নাকি বর্বর বলে নিন্দা জানাবে?

---

[৯] **ডিপ স্টেইট (Deep State)** বলতে রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে বিদ্যমান অনির্বাচিত ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোকে বোঝানো হয়। যেমন: আমলাতন্ত্র, গোয়েন্দা সংস্থা, সামরিক এস্টাবলিশমেন্ট, প্রভাবশালী কর্পোরেট গোষ্ঠী।

পাশ্চাত্যের অনেকে ভারতে আরএসএস আর বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকে অগণতান্ত্রিক বলে সমালোচনা করে। কিন্তু বিজেপি তো নির্বাচনে জিতেই ক্ষমতায় এসেছে। তাহলে সমালোচনা কেন?

সমালোচকরা বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের মত সবসময় ঠিক হয় না। গণপিটুনির সময় বিশজন মিলে একজনকে পেটায়। ভোট নিলে সেখানে ফলাফল খুনের পক্ষে যাবে। তার মানে কি গণপিটুনি ভালো কিছু? অবশ্যই না।

তাই শুধু সংখ্যাগুরুর সমর্থন থাকলেই সেটাকে গণতন্ত্র বলা যাবে না, নির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধ গ্রহণ করতে হবে। গণতন্ত্র কেবল মেজোরেটেরিয়ান হলে চলবে না, লিবারেল হতে হবে।

একই কথা বলা হয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করে নেওয়া ইসলামী দলগুলোর ক্ষেত্রেও। অ্যামেরিকার বিখ্যাত থিংক ট্যাংক র‍্যান্ড কর্পোরেশন তাদের প্রতিবেদনে যেমন বলেছিল, মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো দলগুলো যদি সত্যিকার অর্থে 'সিভিল ডেমোক্রেটিক' হয়ে ওঠতে চায়, তাহলে তাদের লিবারেল ডেমোক্রেসি চর্চা করতে হবে।[১০]

সোজা কথায়, পশ্চিমা বিশ্বের কাছে গণতান্ত্রিক দল হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে স্রেফ নির্বাচনে দাঁড়ালেই হবে না, লিবারেল মূল্যবোধগুলোও গ্রহণ করতে হবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকেই, পশ্চিমা গণতান্ত্রিক মহলে অ্যামেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্প আর হাঙ্গেরির ভিক্টর অরবানদের তীব্র সমালোচনা দেখা যায়। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট পেলেও এরা লিবারেল আদর্শের সীমানা পুরোপুরি মানে না।

---

[১০] Angel Rabasa, Cheryl Benard, Lowell H. Schwartz, and Peter Sickle, *Building Moderate Muslim Networks* (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2007), 67. সম্ভবত এই প্রেসক্রিপশনের জেরেই আমাদের দেশে আগে যারা শুধু নির্বাচন করত, তাদের কেউ কেউ এখন 'ইসলামী আন্দোলনের' নামে গানবাজনা, ফ্রি-মিক্সিং, মেয়েদের পাশে বসিয়ে সংবাদ সম্মেলন থেকে শুরু করে মিছিল করাকেও জায়েজ বানিয়ে নিয়েছে।

উল্লেখ্য, 'মডারেট মুসলিম' (moderate Muslims) বা 'মডারেট ইসলামিস্ট' (moderate Islamists) নিয়ে এটাই পশ্চিমা বিশ্বের একমাত্র সংজ্ঞা না। বেশ কিছু প্রভাবশালী পলিসি আলোচনা ও অ্যাকাডেমিকদের লেখায় 'মডারেট' বলে গণ্য হবার মাপকাঠি কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। সেখানে মডারেট ইসলামিস্ট হবার শর্ত ধরা হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ ও স্বীকৃতি প্রদানকে। এক্ষেত্রে পশ্চিমা অর্থে লিবারেল বা উদারনৈতিক মূল্যবোধের সাথে পুরোপুরি একমত হওয়াকে শর্ত রাখা হয়নি।

দেখুন: Jillian Schwedler, "Can Islamists Become Moderates? Rethinking the Inclusion–Moderation Hypothesis," *World Politics* 63, no. 2 (April 2011): 347–376; Khalil al-Anani, *The Myth of Excluding Moderate Islamists in the Arab World* (Washington, DC: The Saban Center at Brookings Institution, 2010); Shadi Hamid, *Temptations of Power: Islamists and Illiberal Democracy in a New Middle East* (Oxford: Oxford University Press, 2014).

অন্যদিকে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সংজ্ঞা 'চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স' বা ভারসাম্য রক্ষার কথা বলে। নির্বাচনে কে জিতল সেটা মুখ্য না; সংসদ, আদালত, আমলাতন্ত্র, নির্বাচন কমিশন ও গণমাধ্যম কতটা স্বচ্ছ, ভারসাম্যপূর্ণ ও স্বাধীন, তাই মূল প্রশ্ন।

তবে এখানেও প্রশ্ন থাকে।

এই প্রতিষ্ঠানগুলো কি আসলেই জনগণের প্রতিনিধি, নাকি ক্ষমতার বলয়ের হাতে নিয়ন্ত্রিত? পর্যাপ্ত অর্থ এবং প্রভাব থাকলে এসব প্রতিষ্ঠানকে 'হ্যাক' বা বশ করা খুব একটা কঠিন না।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের নামে কার্যত ডিপ স্টেইট, কর্পোরেট স্বার্থ, কিংবা বৈদেশিক শক্তির যৌথ খেলা চলে। প্রতিষ্ঠানগুলো তখন পরিণত হয় নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রাংশে, যা ব্যবহৃত হয় কেবল শক্তিশালীদের স্বার্থে।

অন্ধের হস্তীদর্শন

কাজেই গণতন্ত্রের বহুল ব্যবহৃত সংজ্ঞাগুলোর কোনোটাই এর বাস্তবতাকে পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে পারে না। একেকটা একেক দিককে বড় করে দেখায়। কেউ একে দেখে স্রেফ প্রক্রিয়া হিসেবে, কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হিসেবে, আবার কেউবা দেখে মূল্যবোধের চশমায়।

কিন্তু এর কোনোটাই গণতন্ত্রের পুরো বাস্তবতাকে ধারণ করে না। অনেক ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞাগুলো একটা আরেকটার সাথে সাংঘর্ষিক।

ব্যাপারটা অনেকটা অন্ধের হাতি দেখার মতো। কারও কাছে হাতি মানে লেজ, কারও কাছে শুড়, কারও কাছে পা, কারও কাছে দাঁত। নিজ নিজ জায়গায় কথাগুলো হয়তো ভুল না, কিন্তু সামগ্রিক সত্য বোঝাতে ব্যর্থ।

আসলে সমস্যা হলো, গণতন্ত্র একটা পলিসেমিক কনসেপ্ট।[১১] এক নাম, হাজারো রূপ। ক্ষমতা আর প্রয়োজনের তাগিদে এই শব্দের অর্থ ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। অনেক ক্ষেত্রে বদলে যায় এর ক্যাটাগরি বা শ্রেণিও। কখনো গণতন্ত্রকে বলা হয় শাসনব্যবস্থা, কখনো রাজনৈতিক দর্শন, আবার কখনো নিছক একটা প্রক্রিয়া।

---

[১১] **পলিসেমিক (Polysemic):** এমন একটি ধারণা বা শব্দ, যার একাধিক অর্থ বা ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রেক্ষাপটভেদে এর অর্থের পরিবর্তন হতে পারে।

নানা রকম সংজ্ঞার আড়ালে লুকিয়ে থাকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও স্বার্থ। ক্ষমতাকেন্দ্রগুলো নিজেদের সুবিধামতো একেক সময় একেক সংজ্ঞা ব্যবহার করে। যখন দরকার তখন গণতন্ত্র মানে ভোট, অন্য সময়ে লিবারেল মূল্যবোধ। আবার কখনো স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের সুশাসন।

এজন্যই দেখা যায় একই সময়ে, একই প্রেক্ষাপটে, বিভিন্ন দেশ, দল কিংবা সংস্থা একেকভাবে গণতন্ত্রের দাবি করে। আর অন্যের দাবিকে বাতিল করে।

কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতার নামে গদি দখল করে, কেউ লিবারেল বুলি আউড়ে অন্যকে হঠাতে চায়। কেউ আবার গণতন্ত্র রক্ষার নামে সামরিক হস্তক্ষেপ বা বিদেশি নিষেধাজ্ঞাও জায়েজ করে।

এই খণ্ড-বিখণ্ড সংজ্ঞার গোলকধাঁধায় শুরুর প্রশ্নগুলো অমীমাংসিতই থেকে যায়—কোনো ব্যবস্থাকে 'গণতান্ত্রিক' বললে ঠিক কী বোঝানো হয়? গণতন্ত্রের মূল দাবিগুলো কী? এই পদ্ধতি ঠিক কীভাবে কাজ করে?

গণতন্ত্র: বৈশিষ্ট্য

শরীয়াহর মানদণ্ডে হোক কিংবা স্ট্র্যাটেজি; গণতন্ত্রের মূল্যায়ন করতে হলে এর সীমানা আর বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট থাকা জরুরি। কিন্তু এর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে লেগে আছে বিশাল গোলমাল। তাহলে করণীয় কী?

এই গোলকধাঁধা থেকে বের হবার পথ হলো, তত্ত্ব সরিয়ে বাস্তবতার দিকে তাকানো। এমন মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্যের তালিকা করা, যা দেখলে বোঝা যাবে গণতন্ত্র আসলে কী, আর ঠিক কোথায় এর সাথে আমাদের দ্বিমত।

বিশ্বজুড়ে অ্যাকাডেমিক আলোচনা আর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মানদণ্ড অনুযায়ী, একটা শাসনব্যবস্থাকে 'গণতান্ত্রিক' হবার স্বীকৃতি পেতে হলে অন্তত ৭টি বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়: [১২]

---

[১২] এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো গণতন্ত্র নিয়ে অ্যামেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট এ. ডাল এর গবেষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ডাল গণতন্ত্রকে কোনো নির্দিষ্ট বা একক কাঠামোর বদলে বরং একটা 'পলিআর্কি'—বহুকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে শাসক ও জনগণের মাঝে প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক এবং সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তার মতে, একটি শাসনব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলার জন্য অন্তত কিছু ন্যূনতম শর্ত পূরণ হওয়া জরুরি। নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা শাসন, নিয়মিত ও সুষ্ঠু নির্বাচন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, বিকল্প তথ্যের উৎস, সংগঠন গঠনের অধিকার এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের মতো উপাদানগুলোকে তিনি গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেন।

এই প্রেক্ষিতে, আরও একজন প্রভাবশালী চিন্তাবিদের কথা উল্লেখযোগ্য, স্যামুয়েল হান্টিংটন। গণতন্ত্র নিয়ে তার পূর্বোল্লিখিত বিখ্যাত গবেষণা The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century বইটিতে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন, কোন বৈশিষ্ট্যগুলো থাকলে কোনো একটা শাসনব্যবস্থাকে

১। নিয়মিত ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন এবং শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর।

২। প্রতিটি নাগরিকের সমান ভোটাধিকার।

৩। আইনপ্রণয়নের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব আইনসভার হাতে ন্যস্ত।

৪। সংবিধানিক কাঠামোর সর্বোচ্চ অবস্থান এবং আইনের শাসন।[১৩]

৫। ক্ষমতার বিভাজন এবং ভারসাম্য; প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা।

৬। নাগরিক অধিকার, মতপ্রকাশ এবং সংগঠনের স্বাধীনতা।

৭। লিবারেল মূল্যবোধ; যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সংখ্যালঘুর অধিকার ইত্যাদি।[১৪]

এর মধ্যে শেষ তিনটা নিয়ে বিতর্ক আছে।

যেমন- ক্ষমতার বিভাজন ও ভারসাম্য, অনেক ক্ষেত্রেই স্রেফ কাগুজে কথা। কেবল তৃতীয় বিশ্ব না, পাশ্চাত্যের দেশগুলোতেও এই মেকানিসম প্রায়ই অচল। এই ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক লিট্রেচারে ওঠে এসেছে।[১৫]

ন্যূনতম অর্থে গণতান্ত্রিক বলা যায়। তার বিশ্লেষণের লক্ষ্য ছিল, কীভাবে একনায়কতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে রূপান্তর ঘটে তা বোঝা। আর সেটা বোঝার জন্য তাকে গণতন্ত্রের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট করতে হয়েছে। অর্থাৎ তিনিও কিছু 'ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য' দিয়ে গণতন্ত্রকে চিহ্নিত করেছেন। হান্টিংটনের মতে, নিয়মিত, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং নাগরিকের মতপ্রকাশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা হলো ঐসব নূন্যতম মৌলিক উপাদান, যেগুলো ছাড়া গণতন্ত্র হয় না। একইসাথে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো গণতন্ত্র সংক্রান্ত প্রধান প্রধান অ্যাকাডেমিক ও নীতিনির্ধারক সংস্থা—যেমন Freedom House, Polity IV Project এবং V-Dem Index—এই সংস্থাগুলোর বিশ্লেষণ কাঠামোর সাথেও খাপ খায়। এদের মূল্যায়নেও গুরুত্ব পায়: নির্বাচন কতটা প্রতিযোগিতামূলক ও সুষ্ঠু, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কতটা কার্যকর, আইনপ্রণয়ন প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ, এবং বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা জবাবদিহিমূলক।

বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition (New Haven: Yale University Press, 1971); Coppedge, Michael, et al. V-Dem Codebook v12 (Gothenburg: V-Dem Institute, 2022); Freedom House, Freedom in the World 2024 (Washington DC: Freedom House, 2024); Monty G. Marshall and Keith Jaggers, Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2020 (Vienna, VA: Center for Systemic Peace, 2021); Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991).

[১৩] বিভিন্ন দেশে এই কাঠামোর রূপ ভিন্ন হতে পারে। কোথাও সংবিধান ও বিচারব্যবস্থা সংসদের সীমা নির্ধারণ করে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই আইনপ্রণয়নের বৈধতা মানব-রাষ্ট্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকেই উৎসারিত হয়।

[১৪] অনেক সময় এগুলোকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধও বলা হয়।

[১৫] পশ্চিমা গণতন্ত্রে ক্ষমতার বিভাজন ও ভারসাম্যের ব্যর্থতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: Bruce Ackerman, *The Decline and Fall of the American Republic* (Harvard University Press, 2010); Eric A. Posner and Adrian Vermeule, *The Executive Unbound: After the Madisonian Republic* (Oxford University Press, 2010)। এছাড়া দলীয় রাজনীতির প্রভাবে ক্ষমতার ভারসাম্য কীভাবে অকেজো হয়ে পড়ে, সে বিষয়ে দেখুন: Daryl J. Levinson and Richard H. Pildes, "Separation of Parties, Not Powers," *Harvard Law Review* 119, no. 8 (2006): 2311–2386. এসকল তাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন যে, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষমতা ক্রমশ অনির্বাচিত আমলাতন্ত্র ও শক্তিশালী নির্বাহী বিভাগের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

নাগরিক অধিকার, মতপ্রকাশ ও সংগঠনের স্বাধীনতাও অনেক ক্ষেত্রে কেবল কাগজে-কলমে মেলে। বহু দেশেই আরোপ করা হয় নানা সীমানা। তবু এর জন্য এসব দেশকে ডেমোক্রেসির তালিকা থেকে মুছে ফেলা হয় না।

সিঙ্গাপুর কিছু সূচকে বিশ্বের শীর্ষ ২৫ শতাংশ দেশের মধ্যে পড়ে। আবার গণমাধ্যম, সংগঠন ও সমাবেশের স্বাধীনতায় তলানিতে।[১৬] তবু সিঙ্গাপুরকে সাধারণত অগণতান্ত্রিক বলা হয় না। বলা হয় 'ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র' বা 'হাইব্রিড রিজিম'। কাছাকাছি আলাপ আছে তুরস্ক নিয়েও।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়েও মতভেদ প্রচুর। পশ্চিমা মানদণ্ডে অত্যন্ত জরুরি হলেও অনেক দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় এগুলো অপ্রাসঙ্গিক। এমন দেশ আছে, যেখানে গণতন্ত্রের বাকি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, কিন্তু যেগুলোকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলা হয়, তার অনেক কিছুই অনুপস্থিত।

পাশ্চাত্য তখন এসব দেশের 'গণতান্ত্রিক' পরিচয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করে। অন্যদিকে দেশের সরকার নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে দাবি করে। যেমনটা ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

আইনসভা, সংবিধান ও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব

এইসব বাস্তবতার আলোকে বলা যায়, ওপরের ৭টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শেষ তিনটির ক্ষেত্রে কিছুটা বিচ্যুতি থাকলেও কোনো শাসনব্যবস্থাকে শর্তসাপেক্ষে গণতান্ত্রিক বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রথম চারটা বৈশিষ্ট্য ছাড়া স্বীকৃতি অসম্ভব।

এই চার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তিন আর চার নম্বর নিয়ে আলোচনা সবচাইতে কম।

আইনপ্রণয়নের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব আইনসভার হাতে ন্যস্ত থাকা।

সংবিধানিক কাঠামোর সর্বোচ্চতা এবং আইনের শাসন।

আমাদের আলোচনার জন্য এ দুটোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এগুলো স্রেফ বৈশিষ্ট্য না, বরং গণতন্ত্রের বুনিয়াদ। এগুলো এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এদের বাদ দিলে এর পুরো কাঠামো ধসে পড়ে। কিন্তু গণতন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকায় সাধারণত এগুলো নিয়ে আলাদাভাবে কেউ কথা বলে না।

---

[১৬] International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *Democracy Tracker: Singapore* (Global State of Democracy platform, accessed June 2025).

শুধু গণতন্ত্র নয়, আধুনিক যেকোনো রাষ্ট্রব্যবস্থারই গোড়ার কথা হলো—আইন তৈরির চূড়ান্ত ক্ষমতাটা এখানে থাকে মানুষের গড়া রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের হাতে। আইন এখানে কোনো আসমানি উৎস থেকে আসে না। পশ্চিমের নানা তত্ত্ব, দর্শন, আর বিভিন্ন দেশের সমাজ ও রীতির মিশ্রণে আইনি কাঠামো তৈরি হয়। একারণে অধিকাংশ দেশের আইনে ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ কিংবা হাল আমলের মার্কিন সিস্টেমের ছাপ দেখা যায়।

নাৎসি জার্মানি, ফ্যাসিস্ট ইতালি, চীন কিংবা উত্তর কোরিয়ার মতো মডেলেও আক্ষরিক অর্থে (de jure) আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের।[১৭] তবে কার্যত (de facto) শাসক বা শাসক দল আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, সংসদের কাছ থেকে আসে অনুমোদনের সিলটা।

কিন্তু সব ক্ষেত্রেই আইন বানানোর একচ্ছত্র অধিকার ও স্বাধীনতা মানুষের। এই প্রক্রিয়া চলে সাংবিধানিক কাঠামোর ভেতরে। সংবিধানই এখানে চূড়ান্ত রেফারেন্স।[১৮] সংসদ তার সীমা অতিক্রম করলে সেই আইনও বাতিল হয়ে যেতে পারে।[১৯]

কাজেই আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো এই বিশ্বাস যে, আইন, ন্যায়বিচারের ধারণা এবং শাসনব্যবস্থা মানুষ তৈরি করবে। এগুলো পরিবর্তনযোগ্য, বিতর্কযোগ্য। যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তনশীল সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে গঠিত। আসমানি কোনো নির্দেশনা বা কাঠামোর এখানে স্থান নেই।

এখানেই ইসলামের আপত্তির শুরু।

[১৭] এখানে সংসদ শব্দটা আইনসভা/legislature বোঝাতে ব্যবহৃত। বিভিন্ন ব্যবস্থায় এর নাম National Assembly/People's Congress/Supreme People's Assembly ইত্যাদি হতে পারে।

[১৮] যুক্তরাজ্যে কোনো লিখিত একক সংবিধান নেই (uncodified constitution)। সংসদ সার্বভৌম (Parliamentary Sovereignty)। অর্থাৎ, পার্লামেন্ট কোনো সংবিধানের অধীন নয়। তবে এটিও কার্যত একটি সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে চলে—রাজা, আদালত, ঐতিহ্যগত বিধান, মানবাধিকার আইন ইত্যাদির মাধ্যমে।

[১৯] বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ অনেক সংসদীয় গণতন্ত্রে সুপ্রিম কোর্ট (বা সাংবিধানিক আদালত) যে সাংবিধানিক সীমা ও ব্যাখ্যা নির্ধারণ করে, তা কার্যত সংসদের ওপরও প্রযোজ্য ও বাধ্যতামূলক। এই অর্থে সংবিধান সংসদের ওপর অগ্রাধিকার পায়।

গণতন্ত্র: ইসলামের আপত্তি

গণতন্ত্রের স্বরূপ এখন আমাদের সামনে পরিষ্কার। এই ব্যবস্থার মূলে আছে এক বিশেষ দাবি—সার্বভৌমত্ব জনগণের। এই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে, প্রতিনিধি সংসদে যায়, আইন বানায় এবং সেই আইনের ভিত্তিতে শাসন চলে। পুরো নকশা নিয়ন্ত্রিত হয় সংবিধানের কাঠামোর ভেতর।

এই পুরো ব্যাপারটা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক।

ইসলাম বলে, শাসনব্যবস্থা ও আইন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। মানুষ বিচার করে, তবে শরীয়াহর আলোকে। সে নিজের মতো করে নতুন শরীয়াহ তৈরি করতে পারে না।

মহান আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং মালিক। সমস্ত সৃষ্টিকে তিনিই সুবিন্যস্ত করেছেন এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত করছেন। সমস্ত অস্তিত্বকে তিনি আশ্রয় দেন, টিকিয়ে রাখেন। মহান আল্লাহই রিযিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক। মানুষ পরিচালনার বিধানও তিনিই নির্ধারণ করেন।

মহান আল্লাহ এখানে কোনো অস্পষ্টতা রাখেননি। তিনি বলেছেন,

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

> ‘মনে রাখবে—সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও তাঁর। মহাবিশ্বের অধিপতি আল্লাহ, বরকতময়।’[২০]

এ আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন, তিনি যেমন একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, ইবাদাত পাবার একমাত্র অধিকারী, তেমনি আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রেও কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বহুবার ঘোষণা করেছেন, হুকুম বা বিধান দেওয়ার একচ্ছত্র অধিকার শুধুমাত্র তাঁর। এই বিষয়ে কোনো ধোঁয়াশা নেই।

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

> ‘আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত করো।’[২১]

---

[২০] সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৫৪

[২১] সূরা ইউসুফ, ১২:৪০

أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

'বিচার-ফায়সালা তো তাঁরই এখতিয়ার। তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।'[২২]

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

'তারা কি জাহিলি যুগের ফায়সালা চায়? বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম ফয়সালাকারী আর কে আছে?'[২৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন:

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

'সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা অনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার ফায়সালা করুন। আপনার কাছে যে সত্য এসেছে, তা বাদ দিতে তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না।'[২৪]

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'না, তোমার রবের কসম! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ফায়সালাকারী মানবে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে, সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে পূর্ণ সম্মতিতে তা মেনে নেবে।'[২৫]

এই আয়াতগুলো সরাসরি ঘোষণা করছে ফায়সালাকারী বা আইনদাতা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। যারা আল্লাহর বিধান অস্বীকার করে, তারা জাহিলিয়াতের শাসনকেই গ্রহণ করছে।

বিধান ও শাসনের বিষয়টা সুনিশ্চিতভাবে আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহকে একমাত্র বিধানদাতা হিসেবে স্বীকার করা তাওহীদের অপরিহার্য শর্ত।

---

[২২] সূরা আল-আনআম, ৬:৬২

[২৩] সূরা আল-মায়িদা, ৫:৫০

[২৪] সূরা আল-মায়িদা, ৫:৪৮–৪৯

[২৫] সূরা নিসা, ৪:৬৫

কিন্তু আধুনিক গণতন্ত্র এই অধিকারটি রাষ্ট্র বা জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়। সার্বভৌমত্বের এই হাতবদল সরাসরি স্রষ্টার অধিকারে সৃষ্টির ভাগ বসানো।

আসমান ও যমীনে এক ইলাহ

নিজেদের যারা সেক্যুলার বলে পরিচয় দেয়, তাদের অনেকে ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম অনুসরণের দাবি করে। আবার একইসাথে শাসনব্যবস্থা থেকে ইসলামকে ছেঁটে ফেলতেও তারা বদ্ধপরিকর। তারা বলে: 'আমরা আল্লাহকে মানি, নামাজ-রোজা করি, কিন্তু রাষ্ট্র চলবে মানুষের মর্জিতে।'

এটা যৌক্তিক অবস্থান না।

যে আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, ছায়াপথ-নীহারিকা থেকে শুরু করে কোয়ান্টাম জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সবকিছুকে নিয়মে বেঁধেছেন, তিনিই সমাজ ও শাসনের জন্য বিধান দিয়েছেন।

প্রথমটার স্বীকৃতি দিলে, পরেরটাকে অস্বীকার করবেন কীভাবে?

মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনার দাবি করার পর, শাসনের ক্ষেত্রে মানবরচিত ব্যবস্থাকে গ্রহণ করার অর্থ আসমানে আল্লাহকে ইলাহ মেনে যমীনে আল্লাহর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

> 'তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।'[২৬]

আসমানে যিনি ইলাহ, যমীনেও তিনিই ইলাহ। তিনি শুধু মাসজিদে মালিক নন, বিচার ও শাসনের ক্ষেত্রেও মালিক।

এই বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। এটা ঈমান ও কুফর, তাওহীদ ও শিরকের বিভাজন করে দেয়। কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধানকে পাশ কাটিয়ে নতুন আইন তৈরি করা সরাসরি আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল।[২৭]

---

[২৬] সূরা আল-যুখরুফ, ৪৩:৮৪

[২৭] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, অধ্যায় ৩।

সামসময়িক আলিমগণের বক্তব্য

ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা শাসন করা ইসলামী আকীদাহর একটা মৌলিক বিষয়। পাশাপাশি এটা সমাজ ও শাসনের ক্ষেত্রে ইসলামের বুনিয়াদি অবস্থান। বিষয়টা ঐচ্ছিক না, আবশ্যক।

মানুষ, সংসদ বা রাষ্ট্র কোনো অবস্থাতেই এমন কর্তৃত্ব দাবি করতে পারে না, যা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। যুগে যুগে আলিমরা একে ঈমানের প্রশ্ন হিসেবেই তুলে ধরেছেন।

বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ *আদ্বওয়াউল বায়ান* এর লেখক আল্লামা আশ-শানকীতি (রাহিমাহুল্লাহ) সূরা আন-নিসার ৬০ নং আয়াতের তাফসীরে বলেছেন:

> '...আল্লাহ তাআলা সূরা নিসায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, যারা আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইনে বিচার প্রার্থনা করে, তারা নিজেদের মুমিন দাবি করায় আল্লাহ তাআলা আশ্চর্যবোধ করেছেন... তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করা সত্ত্বেও মৌখিকভাবে তাদের ঈমানের দাবি এমন চূড়ান্ত পর্যায়ের মিথ্যা, যাতে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না।'[২৮]

তিনি আরও বলেছেন:

> 'সুস্পষ্ট নুসুস দ্বারা প্রমাণিত সন্দেহাতীত সত্য হলো, যারা শয়তানের প্রণীত ও মানুষের মুখ দ্বারা প্রকাশিত মানবরচিত আইনের অনুসরণ করে ওই আইনের বদলে, যার রচয়িতা হলেন আল্লাহ এবং যা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) মুখে—তাদের কুফর এবং শিরকের ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ নেই, শুধু ওই ব্যক্তি ছাড়া যার দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং যাকে তিনি ওহীর উজ্জ্বল আলো থেকে বঞ্চিত করেছেন।'[২৯]

তাফসীরুস সাদী'র লেখক আল্লামা সাদি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

> '...তাগুত হলো প্রত্যেক ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা বিচার ফায়সালা করে; অথচ তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল তাগুতকে অস্বীকার করার... ঈমানের দাবি হলো, আল্লাহর আইনের প্রতি আত্মসমর্পণ এবং সকল বিষয়ে আল্লাহকেই বিচারক ও বিধানদাতারূপে মেনে নেওয়া। সুতরাং যে নিজেকে মুমিন বলে দাবি করবে, আবার আল্লাহর হুকুমের ওপর তাগুতের হুকুমকে প্রাধান্য দেবে, সে ঈমানের দাবিতে মিথ্যাবাদী।'[৩০]

---

[২৮] আদ্বওয়াউল বায়ান, ৩/২৫৯, দারুল ফিকর, বৈরুত।

[২৯] আদ্বওয়াউল বায়ান, ৪/৯১-৯২।

[৩০] তাফসীরুস সাদি, ১/১৮৪, মুআসসাসাতু রিসালা, বৈরুত

মিশরের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আহমাদ শাকির (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

> 'মুসলিমদের ভূমিতে কাফির, মুশরিক, ইউরোপীয়দের আইন দিয়ে শাসন করা কীভাবে সঠিক হতে পারে? এসব আইন তাদের খেয়ালখুশি আর মিথ্যা মতামতের ওপর নির্ভরশীল। এগুলোকে তারা ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করে...
>
> ইতিহাসে এর আগে মুসলিম উম্মাহ এমন ভয়াবহ সমস্যায় পড়েনি। একমাত্র ব্যতিক্রম তাতারদের যুগ। ইসলামের শত্রু চেঙ্গিস খানের আবিষ্কৃত আইনকে অষ্টম শতাব্দীর আলিম হাফিয ইবনু কাসীর কতটা কঠিন ভাষায় রদ (খণ্ডন) করছেন, তা তো দেখতেই পেলেন।[৩১] একই কথা কি আজ চতুর্দশ হিজরি শতাব্দীতে এসেও প্রযোজ্য হওয়ার কথা না?
>
> বরং এখনকার মুসলিমদের অবস্থা আরও খারাপ। ইয়াসিকের প্রণেতা ছিল এমন এক কাফির, যার কুফর সুস্পষ্ট। আর আজকের বেশির ভাগ মুসলিম জাতি এমনসব সংবিধান আত্মস্থ করে নিয়েছে, যেগুলোর সাথে ইয়াসিকের কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু সেগুলো প্রণয়ন করে মুসলিম দাবিদাররা... এসব মানবরচিত আইন যে চরম কুফর, তা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট...।'[৩২]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর রিসালাহগুলোতে বলেন:

> '(কুফরের) পঞ্চম প্রকারটি সবচেয়ে মারাত্মক। নিঃসন্দেহে এটি শরীয়াহর বিধানের গোঁয়ার বিরুদ্ধাচার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি বিদ্রোহ। তা হলো, শরীয়াহ আদালতের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আলাদা আদালত স্থাপন, এর জন্য আলাদা বিধান প্রণয়ন, এসব বিধানের আনুগত্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া ও এগুলোর তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা।

---

[৩১] তাতারদের ব্যাপারে ইমাম ইবনু কাসীরের বক্তব্য: '...জাহিলি যুগের আরবরা এভাবে নিজেদের মনগড়া ও অজ্ঞতাপূর্ণ বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করত। মঙ্গোলরা (তাতার) একই কাজ করে তাদের রাজা চেঙ্গিস খানের বানানো ইয়াসিক সংবিধানের মাধ্যমে। এই ইয়াসিকের কিছু আইন ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুসলিমসহ অনেকের থেকে ধার করে এনে বানানো। বাকিটা তার নিজের খামখেয়ালি মতামত। তার বংশধরদের মাঝে এর অনুসরণ নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর ওপর একে তারা প্রাধান্য দেয়। এ রকম আচরণকারীরা কাফির। যতক্ষণ না তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিধানে ফিরে এসে ছোট-বড় সকল বিষয়ে সে অনুযায়ী বিচার করছে, সে পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।' তাফসীরু ইবনি কাসীর, ৩/১২২-১২৩, আশ-শাব সংস্করণ। এবং তিনি বলেছেন: 'খাতামুন নাবীয়্যীন মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ শরীয়াহকে যে অগ্রাহ্য করে, রহিত হয়ে যাওয়া কোনো বিধানের দ্বারস্থ হয়, সে কাফির। তাহলে ইয়াসিকের দ্বারস্থ হওয়া এবং কুরআন-সুন্নাহর ওপর একে অগ্রাধিকারদাতার কী অবস্থা হবে? যে কেউ এমনটি করবে, মুসলিমদের ঐকমত্যে কাফির সে...।' আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৩/১১৯।

[৩২] উমদাতুত তাফসীর, ৪/১৭৩-১৭৪। আরও দেখুন শারহুত তাহাবিয়াহর ওপর তাঁর ব্যাখ্যা, পৃ. ২৫৮, মিসর, ১৩৭৩ হিজরি সংস্করণ এবং আল-মাকতাবুল ইসলামী সংস্করণের পৃ. ৩৬৪, ৪র্থ প্রকাশ।

শরীয়াহ্ আদালত যেমন আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে, ওইসব আদালত গড়ে ওঠেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধার করে আনা আইনকানুনের মিশেলে। ফ্রেঞ্চ আইন, অ্যামেরিকান আইন, ব্রিটিশ আইনের পাশাপাশি মুসলিম দাবিদার বিদআতি ফিরকাগুলো থেকেও রসদ নিয়েছে তারা।

এর চেয়ে বড় কুফর আর কী হতে পারে? কালিমা শাহাদাতের এর চেয়ে বড় বিরোধিতা আর কী হতে পারে? আমাদের বক্তব্যের দলিল সুলভ ও সুবিদিত। এখানে আলাদা করে উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই...।'[৩৩]

কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যের পাশাপাশি এই সমস্ত আলিম এবং আরও অনেকের বক্তব্য[৩৪] থেকে এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহর বিধানের জায়গায় মানুষের বিধান প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের জায়গা থেকে কেবল অবৈধ না; বরং ঈমান ও তাওহীদের বিপরীত অবস্থান।

গণতন্ত্রসহ সকল সেক্যুলার শাসন ঠিক এ কাজটাই করে। অতএব, যেকোনো সেক্যুলার শাসনব্যবস্থার সাথে ইসলামের সংঘাত অনিবার্য।

আকীদাহগত আপত্তি

ইসলামের আকীদাহগত অবস্থান থেকে গণতন্ত্রসহ সকল সেক্যুলার শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ৪টা মৌলিক আপত্তি আছে। যেকোনো মানবচরিত ব্যবস্থায় এ বিষয়গুলো পাওয়া যায়:

১। আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা শাসন।

২। আল্লাহর শরীয়াহকে বাতিল করে মানুষের তৈরি দর্শনের ভিত্তিতে নতুন আইনি ব্যবস্থা প্রণয়ন, সেটিকে টিকিয়ে রাখা এবং তা সবার ওপর বাধ্যতামূলক করা।

৩। আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন, তা হালাল করা এবং হালালকে হারাম করা।

৪। মানুষকে মানবরচিত শাসনের অধীনে বিচার চাইতে বাধ্য করা।

---

[৩৩] তাহকীমুল কাওয়ানীন।

[৩৪] দেখুন: আহমদ মুহাম্মদ শাকির, *হুকমুল জাহিলিয়্যাহ* (কায়রো: মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৯৯২); ড. উমর আবদুর রহমান, কালিমাতুল হাক্ক ১ম সংস্করণ (কায়রো: দারুল ই'তিসাম, ১৯৮৭), এবং বিশেষ করে আবদুর রাহমান ইবনু সালিহ আল-মাহমুদ, *অপরিহার্য শরীয়াহ*, 1st ed. (ইলমহাউস পাবলিকেশন, ২০২৪); লেখক এই গবেষণাধর্মী বইতে আলোচ্য বিষয়ের ওপরে বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি আধুনিক ও প্রাচীন বিভিন্ন রচনার রেফারেন্স এনেছেন।

এই চারটি বিষয়ের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে ঈমান ও তাওহীদের পরিপন্থী। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশ নিয়ে এগুলো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না। যারাই সংসদে যাবে, তাদেরকে এ কাজগুলোর অংশ হতে হবে। বিষয়গুলো তারা এড়াতে পারবে না। আজ পর্যন্ত কেউ পারেনি।

এখানেই শেষ না।

শরীয়াহসম্মত উপায়ে যারা দ্বীন কায়েমের ডাক দেয়, সংসদের সদস্যরা সামষ্টিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। প্রয়োজনে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে, রাষ্ট্র, সংবিধান আর মানবরচিত আইনের দোহাই দিয়ে তাদের দমন করে।

তুলনা করে দেখুন, এর চেয়ে অনেক কম অপরাধের কারণে যাকাত দিতে অস্বীকার করা গোত্রগুলোকে সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) কাফির ঘোষণা করেছিলেন।

কাজেই সংসদীয় গণতন্ত্র এমন এক পদ্ধতি, যা আদর্শিকভাবে এবং প্রায়োগিকভাবে তাওহীদ ও ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক। যারা সংসদে যায়, তারা ধীরে ধীরে এই তাগুতি ব্যবস্থার ধারক-বাহক হয়ে ওঠে।

গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের মূল দ্বন্দ্ব শাসক বাছাই, ভোটব্যবস্থা বা নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়ে না। এই দ্বন্দ্বের শেকড় লুকিয়ে আছে মৌলিক কিছু প্রশ্নের মধ্যে:

- বিধানদাতা কে?
- আইনের উৎস কী?
- শাসনের ভিত্তি ঠিক কী হবে?

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রথম ও প্রধান আপত্তির জায়গা। এই আপত্তিগুলো কেবল গণতন্ত্রের জন্যে না, বরং যেকোনো সেক্যুলার শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

গণতন্ত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে ইসলামের অবস্থান

আমরা আগেই বলেছি, গণতন্ত্রের কিছু ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো ছাড়া একটা শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলা যায় না। ইসলামের মৌলিক আপত্তি দুটো বিষয়ে—সংসদের আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে সংবিধানের অবস্থান।

গণতন্ত্রকে যখন কুফরি ব্যবস্থা বলা হয়, তখন এই কারণেই বলা হয়।

নিয়মিত নির্বাচন, শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর, ভোটাধিকার, ক্ষমতার বিভাজন ও ভারসাম্যের মতো বিষয়গুলোর কারণে গণতন্ত্রকে ইসলামবিরোধী বলা হয় না।

ধরুন, কোনো ভূখণ্ড শরীয়াহ অনুযায়ী শাসিত হয়।

সেখানে যদি শরীয়াহর শর্ত মেনে, বাছাই করা ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ভোটের মাধ্যমে একজনকে শাসক বানানো হয়, তাহলে সেটাকে কেউ কুফরি বলবে না। শাসক নির্বাচনের এই প্রক্রিয়া নিয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু কেউ বলবে না যে, এটা ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক।

একইভাবে, ক্ষমতার ভারসাম্য বা ক্ষমতার বিভাজন যদি শরীয়াহর সীমানার মধ্যে থাকে, তাহলে সেটা হালাল-হারামের প্রশ্ন না, বরং উত্তম ও অনুত্তমের বিষয়।

আর ক্ষমতার হস্তান্তর শান্তিপূর্ণভাবে হওয়াই কাম্য, এ ব্যাপারে সবাই এক মত।

মূল্যবোধ প্রশ্ন

আধুনিক গণতন্ত্রে যে বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি প্রচার পায়—মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সংখ্যালঘুর অধিকার—সেই জায়গাগুলোতে ইসলামের সাথে একটি প্রকট বৈপরীত্য দেখা যায়। তবে এই দ্বন্দ্ব অধিকার থাকা নিয়ে না, বরং সেই অধিকারের সংজ্ঞা আর সীমানা নিয়ে।

এখানে মূল প্রশ্ন হলো, এসব অধিকারের সংজ্ঞা ও মানদণ্ড কে ঠিক করবে?

ইসলাম বলে, প্রত্যেক মাখলুকের ন্যূনতম কিছু অধিকার আছে, যাকে হাক্কুল ইবাদ বলা হয়। এই অধিকারগুলো মহান আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। শাসক বা আদালতের কাজ হলো স্রেফ এগুলোর বাস্তবায়ন।

কোনো রাষ্ট্র, সংসদ, আদালত, সংবিধান কিংবা আন্তর্জাতিক সংগঠন এখানে চূড়ান্ত কর্তৃত্বের দাবিদার হতে পারে না।

আল্লাহ যা কিছুকে বৈধ বা উত্তম কাজ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, সেটাকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বা অন্য কোনো অজুহাতে সীমাবদ্ধ করা যায় না। সেটা জালিম শাসকের সামনে হক কথা বলা হোক, কিংবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ।

একইভাবে, ইসলাম যা কিছুকে হারাম করেছে, সেগুলোকে 'অধিকার' নাম দিয়ে বৈধতা দেওয়ার সুযোগ নেই।

আধুনিকতার অবস্থান ঠিক এর বিপরীত।

আধুনিকতা বলে, অধিকার ও স্বাধীনতার উৎস মানুষ। মানুষই ঠিক করবে কী তাদের অধিকার, কী তাদের স্বাধীনতা। মানুষের খেয়ালখুশি, রুচি, তত্ত্ব আর দর্শনই হবে মানদণ্ড। যিনা, অশ্লীলতা, ইসলাম অবমাননা, বিকৃত যৌনতা বা লিঙ্গ পরিবর্তন—মানুষ চাইলে অধিকার হতে পারে সবই।

মূল দ্বন্দ্ব এ জায়গাতে।

> ইসলাম বলে, অধিকার আসে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে।
>
> আধুনিকতা বলে, অধিকার আসে আসে মানুষের তৈরি কাঠামো আর আইন থেকে।

শাসনের ভিত্তি, আইনের উৎস, অধিকারের সংজ্ঞা—সবকিছুতেই ইসলাম ও গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে দুই বিপরীত মেরুতে।

আইনপ্রণয়ণ: একটি সংশয়

এখানে অনেকে একটা প্রশ্ন করেন, আইন বানানো যদি ঈমান ও তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে কি ট্রাফিক আইন বা প্রশাসনিক নিয়মকানুনও কুফরি বিধান? এসব মানা কি আল্লাহর আইনের বদলে অন্য আইন মানার শামিল?

যদি তাই হয়, তাহলে তো কোনো নিয়মই বানানো যাবে না। শরীয়াহ দ্বারা চালিত দেশেও ট্রাফিক আইন মানা যাবে না। সেক্ষেত্রে শাসন চলবে কীভাবে?

কেউ কেউ আবার এটাকে ভিত্তি বানিয়ে আরেকটা দাবি করে বসেন। বলেন:

যেহেতু ট্রাফিক আইন বা প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা বানানো শরীয়াহবিরোধী না, সেহেতু বিচার-শাসনের ক্ষেত্রেও মানুষের বানানো আইন বৈধ হতে পারে। সমাজের কল্যাণের জন্য তৈরি সব ব্যবস্থাই বৈধ।

শাসক যদি মুখে ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তাহলে তার বানানো আইনে শরীয়াহবিরোধী কিছু থাকলেও তা প্রয়োজনের খাতিরে গ্রহণযোগ্য।

আলিমগণ এই সংশয়ের উত্তর দিয়েছেন, আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন। এ প্রশ্ন নিয়ে আল্লামা আশ-শানকিতির আলোচনার সারমর্ম হলো:

> 'আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক শাসন ও বিচারব্যবস্থা এক জিনিস; আর শরীয়াহর পরিপন্থী না এমন প্রশাসনিক নিয়মকানুন, সম্পূর্ণ ভিন্ন

জিনিস। শৃঙ্খলা, জনকল্যাণ ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য শরীয়াহর সীমা মেনে প্রশাসনিক বিধি তৈরি করা বৈধ। খুলাফায়ে রাশিদুনের যুগে এর দৃষ্টান্তও আছে।

উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সৈনিকদের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির রেকর্ড রাখার জন্য নাম নিবন্ধন চালু করেছিলেন, মক্কায় সাময়িক কারাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বা আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এমন কিছু করেননি। কিন্তু যেহেতু এগুলো শরীয়াহ লঙ্ঘন করে না, তাই তা বৈধ এবং গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু যখন কেউ আল্লাহর নির্ধারিত বিধান বাদ দিয়ে নিজে আইন তৈরি করে, তখন পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা। উত্তরাধিকার, তালাক, কিংবা শরীয়াহ নির্ধারিত শাস্তির বিধানের জায়গায় যখন অন্য আইন চালু করা হয়, তখন তা আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করার নামান্তর। এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর হুকুমের জায়গায় নিজের হুকুম প্রতিষ্ঠা করে। এটা সুস্পষ্ট কুফরি।

সুতরাং, প্রশাসনিক বিধান আর শরীয়াহবিরোধী শাসনব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। একটি শরীয়াহসম্মত এবং ইসলামের মাকাসিদের (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; অন্যটি আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহ এবং স্পষ্ট কুফরি।

ইসলামী শরীয়াহ বাদ দিয়ে মানুষের ওপর অন্য সিস্টেম চাপিয়ে দেওয়া মানেই আসমান-যমীনের রবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা।'[৩৫]

এই পার্থক্যকে আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন শাইখ আবদুর রহমান ইবনু মাহমুদ। তিনি দেখিয়েছেন, কোনটা কুফরি ব্যবস্থা আর কোনটা বৈধ প্রশাসনিক বিধান, সেটা দুটো প্রশ্নের জবাব থেকে যাচাই করা সম্ভব।

এ প্রশ্ন দুটো হলো:

কর্তৃত্বের প্রশ্ন: শাসন ও আইনপ্রণয়নের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব কার হাতে? রাষ্ট্রে কি এমন কোনো ব্যক্তি, কাউন্সিল বা কমিটি আছে, যাদের অনুমোদন ছাড়া আইন পাশ হয় না এবং তারা চাইলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বিধানের বিপরীত আইনও কার্যকর হয়?

নাকি সেই রাষ্ট্রে প্রচলিত সিস্টেম ও আইনের ভিত্তি হলো আল্লাহর শরীয়াহ এবং সবাই তা মানতে বাধ্য?

---

[৩৫] শাইখের বক্তব্যের প্যারাফ্রেইসিং

> **সাংঘর্ষিকতার প্রশ্ন:** শাসনব্যবস্থায় কি এমন কিছু আছে, যা শরীয়াহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক?

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর থেকে সহজেই নিছক প্রশাসনিক ব্যবস্থা আর আইন ও শাসনব্যবস্থার পার্থক্য করা সম্ভব।

'ইসলামী গণতন্ত্র'?

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে আরেকটা আলাপ চলে আসে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া ইসলামী দলগুলোর অনেকে 'ইসলামী গণতন্ত্র' নামের এক বস্তুর কথা বলেন। তারা বলেন:

> 'তারা জনগণের সার্বভৌমত্ব বিশ্বাস করেন না, এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করেন। গণতন্ত্রকে তারাও মৌলিকভাবে হারাম বা কুফরি মনে করেন। এ পদ্ধতি তারা গ্রহণ করেছেন ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। নিয়্যাত ঠিক থাকলে, এই ব্যবস্থার ভেতর দিয়েও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।
>
> যেভাবে তারা এই পদ্ধতি ব্যবহার করছেন, তাতে শরীয়াহর দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই।'

আমরা বিশ্বাস করি, এই দলগুলোর অনেকেই নেক নিয়তে এই পথ বেছে নিয়েছে এবং তারা সত্যিই আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু সমস্যা তাদের নিয়্যাত নিয়ে না, সমস্যা গণতন্ত্রের ভেতরে।

সংসদ বনাম আল্লাহর বিধান

যেমনটা আমরা দেখলাম, সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের অর্থ হলো অবধারিতভাবে এমন কিছু কাজের অংশীদার হওয়া, যা ইসলামী আকীদাহর মূল ভিত্তির সাথে সাংঘর্ষিক।

যারা সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশ নিচ্ছে, তারা সবাই স্বেচ্ছায় এমন এক সত্ত্বার (সংসদ বা আইনসভা) অংশ হচ্ছেন, যা নিচের কাজগুলো করে—

- আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা শাসন।

- আল্লাহর শরীয়াহকে বাতিল করে ইসলামী শরীয়াহর সাথে সাংঘর্ষিক আলাদা আইনি ও শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করা, টিকিয়ে রাখা এবং বাধ্যতামূলক রাখা।
- আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হালাল করা এবং হালালকে হারাম করা।
- মানুষকে মানবরচিত শাসনের অধীনে বিচার চাইতে বাধ্য করা।

এ বিষয়গুলো তারা এড়াতে পারছেন না। অথচ এর প্রত্যেকটি ইসলামী আকীদাহর মূল ভিত্তির সাথে সাংঘর্ষিক।

পাশাপাশি, সাংসদ হিসেবে তাদের এমন এক সংবিধান রক্ষা ও বাস্তবায়নের শপথ নিতে হচ্ছে, যা সরাসরি নিজেকে সর্বোচ্চ আইন হিসেবে ঘোষণা করে, আল্লাহর আইনের চেয়ে উত্তম হবার দাবি করে এবং যা এই পুরো শাসনব্যবস্থার ভিত্তি!

তারা কেবল নিজেরা এই কাঠামোর অংশ হচ্ছেন না, সাধারণ মুসলিমদেরও এই কাঠামোর সাথে যুক্ত হতে আহ্বান করছেন, ভোট দিয়ে বা সদস্য হওয়ার মাধ্যমে। এবং অনেক সময়ই ঈমান ও তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক এই প্রক্রিয়ার অংশ হওয়াকে ইসলামী দায়িত্ব, এমনকি ইবাদাতও বানিয়ে ফেলছেন।

সুতরাং, এই দলগুলোর যতই নেক নিয়্যাত থাকুক, গণতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের জায়গা থেকে যে মৌলিক আপত্তি আছে, সেগুলো এখানে দূর হচ্ছে না। সংসদীয় গণতন্ত্রের সাথে জড়িয়ে থাকা ঈমান ও তাওহীদ ভঙ্গকারী ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দিকগুলো কেউই এড়িয়ে যেতে পারছেন না।

এটাই তথাকথিত ইসলামী গণতন্ত্রের ব্যাপারে প্রথম এবং প্রধান আপত্তি।

শূরা?

গণতন্ত্রের পক্ষে আরেকটা বহুল প্রচলিত যুক্তি হলো:

ইসলামে শূরার ধারণা আছে। আর গণতন্ত্র অনেকটা শূরার মতোই।

অনেকে আবার ইতিহাস থেকে কিছু ঘটনার উদাহরণ টেনে ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের সামঞ্জস্য দেখাতে চান। রাজতন্ত্রের তুলনায় গণতন্ত্র ইসলামের কাছাকাছি—এমন যুক্তিও দেওয়া হয়।

কিন্তু শূরার ধরন, গঠন, প্রয়োগ ও পরিসর গণতন্ত্র থেকে একেবারেই আলাদা। এই দুটোর ভেতর মৌলিক পার্থক্য আছে।

- যদু-মধু-রাম-শাম সবাইকে নিয়ে শূরা হয় না। কেউ চাইলেই শাসকের শূরার সদস্য হয়ে যেতে পারে না বা এর জন্য ক্যাম্পেইন করতে পারে না। শূরার সদস্য বাছাই করা হয় যোগ্যতা অনুযায়ী। শূরায় অংশগ্রহণ সাধারণত যোগ্য, প্রভাবশালী ও প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সীমিত থাকে। ফিকহি পরিভাষায় এ-ধরনের মানুষকে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ' বলা হয়।
- শূরা কখনো শরীয়াহর সীমানার বাইরে যেতে পারে না, শরীয়াহকে বদলাতে পারে না বা শরীয়াহবিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আইনপ্রণয়ন তো দূরের কথা।
- শূরার মত পরামর্শস্বরূপ, চূড়ান্ত না। শাসক সেটা মানতে বাধ্য নন।

কোনো অর্থেই এর সাথে গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে মেলানো যায় না।

শাসক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মানুষের সম্মতি বা মতামত নেওয়ার যেসব উদাহরণ ইতিহাস থেকে দেখানো হয়, তার কোনোটাই সংসদীয় নির্বাচনের সাথে মেলে না।

পাশাপাশি কিছু খলীফার ক্ষেত্রে জনগণের মত নেওয়া হয়েছে এ কথা যেমন সত্য, তেমনিভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনে জনে মতামত নেওয়া হয়নি, এ কথাও সত্য।

আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পরবর্তী খলীফাকে নিজেই মনোনীত করেছিলেন। পরের খলীফা কে হবেন, উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সেটা ঠিক করার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন ছয়জন সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) নিয়ে গঠিত ছোট শূরা পর্ষদকে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খলীফা ও শাসকরা জনগণের সরাসরি মতামত ছাড়াই শাসনক্ষমতা গ্রহণ করতেন। সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়্যুবী কিংবা মুহাম্মাদ আল ফাতিহ'র মতো তুমুল নন্দিত শাসকরাও ক্ষমতায় এসেছেন জনগণের মত না নিয়েই।

উমাইয়্যা, আব্বাসী, উসমানী শাসনের সময় ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে বংশানুক্রমিকভাবে। আলিমগণ এ পদ্ধতিকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন, কিন্তু এ কারণে কোনো খলীফা বা শাসককে অবৈধ বলা হয়নি।

শাসক নির্বাচনে সবার মত নিতে হবে, এটা ইসলামী শাসনের অনিবার্য শর্ত না। এর সাথে গণতন্ত্র, নির্বাচন, সংসদ আর আইনপ্রনয়ণের মিল কোথায়?

মিল খোঁজার ভুল পদ্ধতি

জনমত গ্রহণ বা শূরার নামে গণতন্ত্রকে জায়েজ করার এই চেষ্টাগুলো আসলে খুবই দুর্বল। এবং এ-ধরনের সব 'যুক্তি'র পেছনে একটা অভিন্ন প্রবণতা কাজ করে—

- প্রথমে ইসলামী ইতিহাসের কোনো ঘটনার সাথে আধুনিক কোনো বিষয়ের সামান্য কিছু মিল খুঁজে বের করা
- তারপর সেই সামান্য মিলের ওপর ভিত্তি করে গোটা ব্যবস্থাকেই ইসলামসম্মত বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা

সামান্য মিল থেকে পুরো সিস্টেম জায়েজ করার চেষ্টা—এটা অনেকটা অংকের ভুল উত্তরকে সঠিক ধরে নিয়ে জোর করে হিসেব মেলানোর মতো।

এমন করতে গেলে অনেক কিছু জোড়াতালি দিয়ে মেলাতে হয়। প্রাসঙ্গিক বহু বাস্তবতা এড়িয়ে যেতে হয় ইচ্ছাকৃতভাবে। শরীয়াহর বহু স্পষ্ট বিধানকে উপেক্ষা করতে হয়। যে ঘটনাকে দলিল হিসেবে হাজির করা হয়, তার প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য ও শরঈ মূল্যায়ন—কোনোটাই পূর্ণভাবে বিবেচনা করা হয় না।

এ-ধরনের আলাপ শুধু বিশ্লেষণের দিক থেকে না, বরং পদ্ধতিগতভাবেও ত্রুটিপূর্ণ। শরীয়াহ, কৌশলগত, রাজনৈতিক, অ্যাকাডেমিক—কোনো মাপকাঠিতেই এসব আলাপ টেকে না।

***

তথাকথিত ইসলামী গণতন্ত্রের পক্ষে দেওয়া অন্যান্য যুক্তিগুলোও এভাবে খণ্ডন করা সম্ভব।[৩৬] তবে মৌলিক আকীদাহগত আপত্তির পর অন্যান্য আলাপ গৌণ।

তাছাড়া গণতন্ত্র মানে নির্বাচন না। কাজেই এসব কল্পিত সাদৃশ্য দেখিয়ে নির্বাচনের সাথে শূরা বা জনমত গ্রহণের মিল যদি দেখানোও যায়, তবু গণতন্ত্র নিয়ে

[৩৬] ড. ইয়াদ কুনাইবী, *ইসলাম প্রতিষ্ঠা: সমকালীন ভাবনায় সৃষ্ট ভ্রান্তি নিরসন*, (ঢাকা: শব্দতরু, ১ম প্রকাশ: ২০২০); Abu Muhammad al-Maqdisi, *Democracy: A Religion!* [Ad-Dimuqratiyya Din], (Trans. Abu Muhammad al-Maleki)

মৌলিক আপত্তিগুলোর সমাধান হয় না। বিশেষ করে সংসদে যাবার পর ঈমান ও তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো কেউ এড়াতে পারে না। এবং সেক্যুলার ব্যবস্থায় তা এড়ানো সম্ভবও না।

যেখানে তাওহীদ ও ঈমানের সীমানা ভাঙা অনিবার্য, সেখানে কৌশলের যুক্তি খাটে না।

অন্তত ইসলামপন্থীদের জন্য, গণতন্ত্র থেকে বিরত থাকার জন্য কারণ হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিৎ।

গণতন্ত্রের ভ্রান্তিবিলাস

গণতন্ত্র নিয়ে আপত্তি কেবল আকীদাহর জায়গা থেকে না। আদর্শিক, রাজনৈতিক এবং কাঠামোগত—প্রতিটা দিক থেকেই গণতন্ত্র ব্যর্থ।

প্রথমত, প্রাচ্যে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঘটেছে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের মাধ্যমে। আজও এটা কাজ করে উত্তর-ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে।

দ্বিতীয়ত, যেখানে গণতন্ত্র সবচেয়ে পরিণত, সেই পশ্চিমা বিশ্বে এটি পরিণত হয়েছে অভিজাততন্ত্রে। জনগণের শাসনের নামে সেখানে চলে অল্প কিছু মানুষের নিয়ন্ত্রণ।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্র এমন নাগরিক তৈরি করে, যারা প্রতিরোধ করতে পারে না। নৈতিক ও সামাজিক সব শেকড় থেকে উপড়ে ফেলে এই ব্যবস্থা এমন এক সত্তা তৈরি করে, যে আনন্দের দাস, প্রতিরোধে অক্ষম।

এগুলো স্রেফ বাস্তবায়নের ত্রুটি না, বরং এটাই এই ব্যবস্থার আসল চরিত্র। আর এই চরিত্রের কারণেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মুসলিমবঙ্গের প্রকল্পের জন্য অনুপযুক্ত।

প্রাচ্যে গণতন্ত্র: নব্য উপনিবেশবাদী হাতিয়ার

গণতন্ত্র কোনো নিরপেক্ষ, সর্বজনীন শাসনব্যবস্থা না। এটা ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীদের এমন এক অস্ত্র, যা দখল ও দমনকে বৈধতা দেওয়ার জন্যে সভ্যতা আর স্বাধীনতার মোড়কে রফতানি করা হয়েছে।

এই ব্যবস্থা ছড়িয়েছে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের মাধ্যমে, আর টিকে আছে নব্য উপনিবেশবাদের মাধ্যমে।

উপনিবেশগুলোতে গণতন্ত্র কীভাবে চালু হয়েছে, মনে করিয়ে দেওয়া যাক।

- প্রায় ১৫০ বছরের শোষণ আর লুটপাটের পর ফিরিঙ্গিরা ১৯১৯ সালে ভারতে 'ডায়ারকি' (Dyarchy) চালু করে। স্থানীয়দের হাতে অল্প কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতা দেয়। নীতিনির্ধারণ ও সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত

নেওয়ার ক্ষমতা রাখে নিজেদের কবজায়। বাস্তব ক্ষমতা জনগণের হাতে আসে না। এই ছদ্ম-স্বাধীনতার বদৌলতে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনগুলোকে ভাঙা ও দুর্বল করা আরও সহজ হয়।[৩৭]

- ফরাসিরা আলজেরিয়ায় নির্বাচন দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে ভোট দিতে পারত কেবল শ্বেতাঙ্গ সেটলাররা। আলজেরিয়ার মানুষকে ভোট দেওয়ার জন্য এমন সব শর্ত দিয়েছিল, যেগুলো মেনে নেওয়ার অর্থ ছিল ইসলাম ত্যাগ করা।[৩৮]
- আফ্রিকার বহু অঞ্চলে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সংস্কারের নামে পশ্চিমা শক্তিগুলো গৃহপালিত স্থানীয় অভিজাত শ্রেণি তৈরি করেছিল। কিছু নেটিভকে নিজেদের মতো করে গড়ে তুলেছিল তারা। তবে তাদের হাতেও প্রকৃত ক্ষমতা দেয়নি।[৩৯]

পুরো ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, আপনাকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরটা আপনার না, আপনি এটা বানাননি, চাইলে এখান থেকে বের হতেও

---

[৩৭] ১৯১৯ সালের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুসারে, শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য ও কৃষির মতো কিছু 'হস্তান্তরিত বিষয়' (Transferred subjects) ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে দেওয়া হয়। অর্থ, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ ও ভূমি রাজস্বের মতো 'সংরক্ষিত বিষয়গুলো' (Reserved subjects) ব্রিটিশ গভর্নর আর তাঁর পর্ষদের হাতে থাকে। গভর্নরের আইন ভেটো দেওয়ার ক্ষমতাও থাকে। সেসময় নির্বাচনী যোগ্যতা নির্ধারিত হতো সম্পত্তি, কর, পেশাগত অবস্থা বা শিক্ষাগত মানদণ্ড অনুযায়ী। ফলে প্রাপ্তবয়স্কদের মাত্র ৩–৭% যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

[৩৮] ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে আলজেরিয়ার মুসলিমরা ফরাসি 'প্রজা' (subject) হিসেবে বিবেচিত হতো, 'নাগরিক' হিসেবে নয়। ১৮৬৫ সালের সেনেটাস-কন্সাল্ট আইন অনুযায়ী, মুসলিমদের ফরাসি নাগরিকত্ব পেতে হলে তাদের ইসলামী পারিবারিক আইন (যেমন বিবাহ, উত্তরাধিকার ও অভিভাবকত্ব) পরিত্যাগ করতে হতো। আলজেরীয় মুসলিমদের কাছে এটি ছিল তাদের দ্বীনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশকে বিসর্জন দেওয়ার শামিল। তৎকালীন আলিমগণ এটিকে রিদ্দা (ধর্মত্যাগ) হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। আলজেরীয়রা দ্বীন ত্যাগ করে ভোটাধিকার অর্জনের পথ বর্জন করে। উল্লেখ্য, ইউরোপীয় সেটলারদের জন্য এমন কোনো শর্ত ছিল না।

দেখুন: Ageron, Charles-Robert. Modern Algeria: A History from 1830 to the Present. Translated by Michael Brett. London: Hurst & Company, 1991; Shepard, Todd. The Invention of Decolonization. Ithaca: Cornell University Press, 2006; Stora, Benjamin. Algeria, 1830–2000: A Short History. Translated by Jane Marie Todd. Ithaca: Cornell University Press, 2001.

[৩৯] ব্রিটিশরা যেমন নাইজেরিয়ার মতো উপনিবেশে *indirect rule* চালু করে স্থানীয় প্রধান ও শিক্ষিত এলিটদের প্রশাসনিক কাঠামোয় যুক্ত করেছিল। কিন্তু নীতিনির্ধারণের চূড়ান্ত ক্ষমতা গভর্নর ও ঔপনিবেশিক দফতরের হাতেই রাখে। ফরাসি শাসনে পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগালের *Four Communes*-এ সীমিত নাগরিকত্ব ও প্রতিনিধিত্বের সুযোগ থাকলেও বাস্তবে গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্ব এবং প্যারিসের নিয়ন্ত্রণই সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করত। এই দুই কাঠামো মিলিয়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এক ধরনের নেটিভ এলিট শ্রেণি গড়ে তোলে, যারা শাসনের মধ্যস্থতাকারী ছিল, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতার মালিক ছিল না। দেখুন: Alice L. Conklin, *A Mission to Civilize: The Republican Idea of Empire in France and West Africa, 1895–1930* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1997); Mahmood Mamdani, *Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996).

পারবেন না। তবে ইচ্ছে হলে সোফাটা একটু ডানে বা বাঁয়ে সরিয়ে রাখতে পারবেন। চেয়ারগুলো আগপিছ করতে পারবেন।

এই হলো উপনিবেশগুলোতে চালু হওয়া গণতন্ত্রের বাস্তবতা। এই হলো নেটিভদেরকে দেওয়া ফিরিঙ্গিদের খেলনা স্বাধীনতা।

ঔপনিবেশিকতার ধারাবাহিকতা

ঔপনিবেশিক শেকড় টিকে আছে আজও। আমরা এখনো সেই পুরোনো ভাষাতেই কথা বলি, পুরোনো ছকেই ভাবি, আর সেই পুরোনো কাঠামোর দাসত্বেই আটকে আছি।

আজকের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সংবিধানগুলো ঔপনিবেশিক ছাঁচে গড়া। আইনগুলো লেখা এমন এক বিজাতীয় ভাষায়, যার সঙ্গে কওম ও যমীনের স্মৃতি, ইতিহাস আর মূল্যবোধের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

এখনো সবকিছু চলে মোটাদাগে ঔপনিবেশিক আমলের দণ্ডবিধি, পারিবারিক আইন আর সংসদীয় কাঠামোতেই। বেশি থেকে বেশি হলে, পুরোনো ঔপনিবেশিক আইনের বদলে হাল আমলের ফিরিঙ্গি আইন নকল করে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে এসব রাষ্ট্রের এলিটরা। আমাদের নিজস্ব পরিচয় এখানে অপাঙক্তেয়।

রাষ্ট্রযন্ত্র আর রাজনীতিবিদদের আচরণেও সেই উপনিবেশআমলের দমনমূলক ভাবনাই ঘুরেফিরে আসে। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে আমলাতন্ত্র ও পুলিশ প্রশাসন জনগণের সেবকের বদলে শাসক আর নিপীড়কের ভূমিকা পালন করে। আর পাকিস্তান ও মিশরের মতো রাষ্ট্রগুলোতে সেনাবাহিনীকে আমরা দেখি পশ্চিমা স্বার্থ রক্ষার সবচেয়ে নির্দয় হাতিয়ার হয়ে ওঠতে।

প্রকৃত ক্ষমতাধর কারা?

আধুনিক গণতন্ত্র মুখে যতই স্বাধীনতা আর অধিকারের কথা বলুক, তার রূহ এখনো পশ্চিমা কাঠামোয় বন্দি। আজকের তথাকথিত 'স্বাধীন' রাষ্ট্রগুলোতেও গণতন্ত্র কার্যত দেশীয় এলিট আর বিদেশি স্বার্থের আঁতাতে গড়া কাঠামো হিসেবে কাজ করে। IMF, World Bank-এর মতো সংস্থা কিংবা আঞ্চলিক মোড়লদের ইশারাতেই তৈরি হয় রাষ্ট্রের বাজেট, অর্থনীতির গতিপথ, উন্নয়ন নীতিমালা, এমনকি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের রূপরেখা।

কে নির্বাচনে জিতছে, কে ক্ষমতায় আসছে, সেটা অনেক সময়ই খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না। সরকার শপথ নেওয়ার আগেই বিদেশি পরামর্শক, এনজিও আর তথাকথিত নাগরিক সমাজের আলোচনার টেবিলে নীতিমালাগুলো চূড়ান্ত হয়ে যায়।

পররাষ্ট্রনীতি আর জাতীয় নিরাপত্তার মতো স্পর্শকাতর বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয় আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোর কথামতো। কোথায় করিডোর হবে, কোথায় সামরিক ঘাঁটি বসবে, কোন বন্দর দেওয়া হবে কাকে, কোন জোটে যোগ দেওয়া হবে কিংবা জাতিসংঘে কী ভোট পড়বে—এসব সিদ্ধান্ত আসে দূতাবাসের নির্দেশ, সামরিক অনুদান অথবা গোপন চুক্তির শর্ত মেনে। নির্বাচিত সরকার কেবল ঘোষণার কাজটা করে, সিদ্ধান্ত আসে বাইরে থেকে।

এর অসংখ্য উদাহরণ আছে। শুধু এশিয়া কিংবা আফ্রিকাতে না, খোদ পশ্চিমেই।

২০১৫ সালে গ্রিসের অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী এবং অর্থনীতিবিদ ইয়ানিস ভারুফাকিস। ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক বৈঠকে তিনি বলেছিলেন, নতুন সরকার আগের ঋণের শর্তগুলো পুনর্বিবেচনা করতে চায়। এটাই জনগণের স্পষ্ট চাওয়া, তাদের দেওয়া ম্যান্ডেট। জার্মান অর্থমন্ত্রীর জবাব ছিল, 'নির্বাচনের ফলে অর্থনৈতিক নীতি বদলাতে পারে না।[৪০]

এই কথা থেকে গণতন্ত্রের বাস্তবতা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। নির্বাচিত সরকার যখন দেশের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সামরিক কিংবা পররাষ্ট্র নীতি স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করতে পারে না, তখন সেই দেশকে স্বাধীন বলা যায় কোন অর্থে? আর একে জনগণের শাসন বলা যায় কোন মুখে? আর ভোটেরই বা কী মূল্য তখন?

আপনি জনগণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাতার পর পাতা রচনা লিখতে পারেন, বক্তৃতা দিতে পারেন গলার রগ ফুলিয়ে। কিন্তু বাস্তবতা হলো গণতন্ত্র আপনাকে ড্রাইভিং সিটে বসিয়ে স্টিয়ারিং ধরতে দেয়। কিন্তু গাড়ি চলে অটোপাইলটে।

পথ, গন্তব্য, গতিসহ সব কিছু ঠিক করে দেয় অন্য কেউ।

---

[৪০] Yanis Varoufakis, *Adults in the Room: My Battle with Europe's Deep Establishment* (London: The Bodley Head, 2017)

সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার

ঔপনিবেশিক যুগের মতো আজও গণতন্ত্র পশ্চিমের আদর্শিক ও সাম্রাজ্যবাদী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পশ্চিমা আগ্রাসনে প্রাণ হারিয়েছে পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষ। এই বিশাল হত্যাযজ্ঞের বড় অংশটাই চলেছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে।[৪১] উপনিবেশবাদের আনুষ্ঠানিক বিদায়ের পরও এই স্লোগানের আড়ালে চলেছে দখলদারি, নিষেধাজ্ঞা আর শাসক পরিবর্তনের প্রজেক্ট।

গণতন্ত্র এখানে একইসাথে আগ্রাসনের অজুহাত এবং হাতিয়ার। অন্য যেকোনো শক্তি সামরিক হামলা চালালে সেটা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব ঠিক একই কাজ করলে সেটাকে 'গণতন্ত্র রক্ষা' বা 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা'র অভিযান। পশ্চিমা বিশ্ব যেন আপনার কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে 'স্বাধীনতা' বেছে নিতে বলে।

এর সাথে ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের অদ্ভুত মিল আছে। যেমনটা আমরা এরই মধ্যে আলোচনা করেছি, আগে ওরা সভ্যতা বিলাতে দখলদারি চালাত। আর এখন গণতন্ত্র, অধিকার আর স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য বোমা ফেলে।

ফিরিঙ্গিস্রেন্ট্রিক

গণতন্ত্র আগাগোড়া ইউরোসেন্ট্রিক। এর জন্ম পশ্চিমের সুনির্দিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে। এখানে সমাজের মূল একক ব্যক্তি, ধর্ম স্রেফ ব্যক্তিগত বলয়ে সীমাবদ্ধ। আর ইউরোপীয় দুনিয়াদর্শনই চিন্তার একমাত্র বৈধ পদ্ধতি।

গণতন্ত্রে প্রতিটা মানুষ এক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক একক, যে নিজের স্বার্থ অনুযায়ী ভোট দেবে। কিন্তু বহু সমাজে মূল একক ব্যক্তি না, বরং পরিবার, সম্প্রদায় বা উম্মাহ। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সম্মিলিতভাবে।

---

[৪১] Andre Vltchek, Exposing Lies of the Empire (2015)। এছাড়া মার্কিন সামরিক ও সিআইএ হস্তক্ষেপের ইতিহাসের জন্য দেখুন: William Blum, Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II (Common Courage Press, 2003); এবং যুদ্ধের বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতির বিশ্লেষণের জন্য দেখুন: John Tirman, The Deaths of Others: The Fate of Civilians in America's Wars (Oxford University Press, 2011)। ৯/১১-পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্তত ৪.৫–৪.৭ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। এসব যুদ্ধকে 'গণতন্ত্র', 'নিরাপত্তা' আর শান্তি রক্ষার নামে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। দেখুন, Costs of War Project, Watson Institute for International and Public Affairs, Brown University, "Human Costs

গণতন্ত্র এইসব অবস্থানকে 'সাম্প্রদায়িক', 'পূর্বরাজনৈতিক' বা 'পশ্চাদপদ' বলে নাকচ করে দেয়। । ইউরোপীয় দুনিয়াদর্শনকে 'সর্বজনীন' তকমা দিয়ে সারা বিশ্বে চাপিয়ে দেয়। এটা সেই পুরোনো জ্ঞানতাত্ত্বিক সহিংসতার হাল আমলের সংস্করণ।

হাকিমিয়্যাহ, শরীয়াহ, হিসবাহ এবং জিহাদের মতো ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রীয় ধারণাগুলোকে গণতন্ত্র 'অনুপযুক্ত' বলে প্রত্যাখ্যান করে।

আমরা আগেই বলেছি, ইসলামকে জনপরিসরে প্রতিষ্ঠা করার পথে প্রতিবন্ধকতা অনেক। সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা, জ্ঞানতাত্ত্বিক গোলামি আর চিন্তার দাসত্ব—প্রতিটি মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে একেকটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এর সাথে যুক্ত হয়েছে কাঠামোগত ইসলামবিদ্বেষ আর উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের খাঁচা।

গণতন্ত্র এই বাধাগুলোর কোনোটাকেই ভাঙতে পারে না; বরং এগুলোকে আরও মজবুত করে। এটা সেক্যুলার আধিপত্য আর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণকে দীর্ঘস্থায়ী করার কলকবজা।

এটা এমন এক কাঠামো, যা তৈরি হয়েছে আমাদের প্রতিপক্ষের সভ্যতাগত নকশা বাস্তবায়নের জন্য। এর ভাষা, দর্শন, মানদণ্ড সবকিছুই তৈরি হয়েছে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যা আমাদের বিশ্বাস, ইতিহাস ও সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন।

আমাদের যখন প্রয়োজন বি-উপনিবেশীকরণ, গণতন্ত্র তখন আমাদের দেয় নব্য উপনিবেশীকরণ। যেখানে প্রয়োজন দ্বীন, কওম আর যমীনের স্বার্থ বাস্তবায়ন, সেখানে গণতন্ত্র আমাদের ফেলে দেয় আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক শক্তির স্বার্থ ও স্থানীয় এলিটদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের পাকচক্রে।

গণতন্ত্র উপনিবেশের সবচেয়ে উন্নত ও পরিশীলিত রূপ।

পাশ্চাত্যে গণতন্ত্র: নয়া সামন্তবাদ

অনেকে আপত্তি করতে পারেন।

বলতে পারেন, ওপরে বলা সমস্যাগুলোর দায় গণতন্ত্রের না। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল। এখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং প্রতিষ্ঠানের অভাব আছে। তাছাড়া এসব দেশে অপরিপক্ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি, শিক্ষার ঘাটতি আর বহির্বিশ্বের হস্তক্ষেপের মতো নানা সমস্যা থাকে।

তাই সমস্যা গণতন্ত্র না। সমস্যা এসব দেশের গণতন্ত্রের প্রয়োগে, বাস্তবায়নে।

ঠিক আছে, ধরে নিলাম প্রাচ্যে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে, কারণ গণতন্ত্র এখানে আরোপিত ও বিকৃত।

তাহলে এবার তাকানো যাক সেই দিকে, যেখানে গণতন্ত্রের জন্ম।

আসুন যাচাই করি, পশ্চিমে গণতন্ত্র তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরেছে কিনা।

জনগণের শাসন?

পশ্চিমে গণতন্ত্রের পথে কোনো বাহ্যিক বাধা নেই। এখানে গণতন্ত্র গড়ে ওঠেছে নিজস্ব মাটিতে, শতাব্দীর অভিজ্ঞতায়। এখানে আছে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষিত নাগরিক, মুক্তগণমাধ্যম। ঔপনিবেশিক বিকৃতি নেই, বহিঃশত্রুর হস্তক্ষেপ নেই।

যদি গণতন্ত্র কোথাও সফল হয়, তাহলে এখানেই হওয়ার কথা।

কিন্তু পশ্চিমে কি সত্যিই জনগণের শাসন এসেছে?

উল্টোমুখী স্বৈরতন্ত্র

পশ্চিমা গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো সেখানে সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা পাওয়া যায় পরাধীনতা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে। নাগরিকরা নিজেদের স্বাধীন ভাবলেও তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তের সীমানা থেকে আগে থেকেই ঠিক করা।

সম্মতি উৎপাদন: নিয়ন্ত্রিত এই স্বাধীনতার রহস্য বুঝতে হলে তাকাতে হবে নোয়াম চমস্কি আর মাইকেল প্যারেন্টির মতো চিন্তাবিদদের গবেষণার দিকে। তারা দেখিয়েছেন, আধুনিক গণতন্ত্রে জনমত স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত হয় না, বরং উৎপাদন করা হয়। মিডিয়া, প্রোপাগান্ডা আর সংস্কৃতির সূক্ষ্ম কারিগরি মানুষের চিন্তাকে নির্দিষ্ট ছকে বন্দি করে ফেলে।[৪২]

মনস্তাত্ত্বিক এই কারিগরির কলাকৌশল নিয়ে আজ থেকে একশো বছরেরও বেশি আগে খোলামেলা আলাপ করে গেছেন পাবলিক রিলেশন্সের স্থপতি বলে খ্যাত এডওয়ার্ড বার্নেইস। তার বিখ্যাত বই 'প্রোপাগান্ডা'তে তিনি দেখিয়েছেন, নিছক

[৪২] Michael Parenti, *Inventing Reality: The Politics of News Media* (St. Martin's Press, 1986) এবং Edward S. Herman and Noam Chomsky, *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media* (Pantheon, 1988).

যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে মানুষের চিন্তাকে বশ করা কঠিন, তারচেয়ে ঢের সহজ হলো মানুষের অবচেতন মনের ওপর কাজ করা। ভয়, লোভ, সামাজিক স্ট্যাটাস আর দলভুক্ত হওয়ার জন্য মানুষের যে আদিম আকাঙ্ক্ষা, সেগুলোকে উসকে দিতে পারলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সহজ।[৪৩]

এ প্রসঙ্গে বার্নেইস তার বইয়ের শুরুতেই একটি বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন—

> 'জনসাধারণের সংগঠিত অভ্যাস ও মতামতকে সচেতন এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা একটি গণতান্ত্রিক সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যারা সমাজের এই অদৃশ্য কর্মপদ্ধতিকে নিপুণভাবে পরিচালনা করেন, তারাই মূলত একটি 'অদৃশ্য সরকার' গঠন করেন, যা আমাদের দেশের প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী।'[৪৪]

এই 'অদৃশ্য সরকার' তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে মানুষের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা তথ্য আর সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে। কোন বিষয়গুলোকে বারবার সামনে আনা হবে, কোন সত্যগুলো আড়াল করা হবে কৌশলে, আর কোন ব্যাখ্যাকে স্বাভাবিক বলে চালিয়ে দেওয়া হবে, সেই ফ্রেইম তৈরি করাটাই এখানে আসল খেলা। এটাই হলো সম্মতি উৎপাদনের কারিগরি।

মিডিয়া আর সংস্কৃতি এখানে এক অদৃশ্য ফিল্টার হিসেবে কাজ করে। তৈরি করে অজস্র ফ্রেইমের গোলকধাঁধা, যা মানুষের ভাবনার সীমানাকে ছোট করে ফেলে। মানুষ চাইলেও এর বাইরে ভাবতে পারে না। সাজানো এই মেনু থেকে যা-ই সে বেছে নেয়, দিনশেষে তা কায়েমি শক্তির স্বার্থরক্ষা করে।

নির্বাচনের পাতানো খেলা: জনমতের এই বন্দিদশা সবচেয়ে প্রকট হয় নির্বাচনের সময়।

নির্বাচন মানেই টাকার খেলা। কাগজে-কলমে একটা ছোট শহরের স্কুলটিচারও মার্কিন সেনেটে যেতে পারে, হতে পারে অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অ্যামেরিকার মতো রাষ্ট্রে কর্পোরেট ডোনার, যায়নবাদী লবি কিংবা মিলিটারি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের আশীর্বাদ ছাড়া ক্ষমতার উঁচু পর্যায়ে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মানুষ নিজের পছন্দমতো শাসক বাছাই করছে, কিন্তু ব্যালটে কেবল তাদেরই নাম থাকে, ক্ষমতার মূল কাঠামো যাদের অনুমোদন দিয়েছে।

---

[৪৩] বার্নেইস ছিলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েডের ভাগ্নে, ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বকে বার্নেইস বিজ্ঞাপণ ও রাজনীতিতে প্রয়োগ করেছিলেন। Edward L. Bernays, Propaganda (New York: Horace Liveright, 1928)

[৪৪] প্রাগুক্ত, ৯

যার বাজেট যত বড়, যার 'নেটওয়ার্ক' যত শক্তিশালী, সে-ই কেবল জনতার সামনে 'বিকল্প' হয়ে ওঠার ছাড়পত্র পায়। এখানে ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকলেও, নীতিনির্ধারণের আসল চাবিকাঠি যাদের হাতে, সাধারণ মানুষের স্বার্থের সাথে তাদের যোজন যোজন দূরত্ব।

গণতন্ত্রের নাট্যমঞ্চ: প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শেলডন উলিন একে বলেছেন 'ইনভার্টেড টোটালিটারিয়ানিসম' বা উল্টোমুখী স্বৈরতন্ত্র। এখানে মানুষের সামনে গণতন্ত্রের কিছু প্রতীক দাঁড় করিয়ে রাখা হলেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আসল ক্ষমতা থাকে অনির্বাচিত গোষ্ঠীর হাতে। নির্বাচিত নেতারা তাদেরই এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে।[৪৫]

নতুন এই স্বৈরতন্ত্র পুরোনো আমলের ফ্যাসিবাদের মতো প্রকাশ্য দমনপীড়ন চালায় না। বরং বিজ্ঞাপন, বিনোদন আর ব্র্যান্ডিং দিয়ে মানুষকে এক ধরনের ঘোরের মধ্যে আটকে রাখে। জনগণের শাসনের ছদ্মবেশে চলে কর্পোরেট স্বৈরতন্ত্র। সম্মতিই এখানে শোষণের প্রধান স্তম্ভ।

এই বাস্তবতাকে আরও স্পষ্ট করেছেন হাল আমলের জনপ্রিয় দার্শনিক স্লাভো যিযেক। তার মতে গণতন্ত্র এক আদর্শিক মায়াজালের মতো, যে আমাদের ততক্ষণ বাছাই করার স্বাধীনতা দেয়, যতক্ষণ আমাদের পছন্দ বিদ্যমান সিস্টেমের সীমানার ভেতরে থাকে।[৪৬]

পশ্চিমা গণতন্ত্র আসলে এক ধরনের মঞ্চনাটক। যার গল্প, চরিত্র, সংলাপ, সবই আগে থেকে লেখা। রাজনীতিবিদরা এখানে স্রেফ অভিনেতা, কর্পোরেট লবি চিত্রনাট্যকার, রাষ্ট্রযন্ত্র পাহারাদার, আর সম্মতি উৎপাদনের কারিগরেরা হলো পরিচালক।

জনগণ এখানে কেবলই দর্শক।

নয়া সামন্তবাদ

উলিন তো কেবল স্বৈরতন্ত্র বলেছেন, কিন্তু অনেক গবেষকের মতে এই ব্যবস্থা আসলে এক ধরনের নব্য সামন্ততন্ত্র (Neo-feudalism)।

পুরোনো সামন্তবাদের সবচেয়ে ওপরের স্তরে ছিল রাজা, অভিজাত শ্রেণি আর জমিদাররা। নয়া সামন্তবাদে সেই জায়গা দখল করেছে মেগা কর্পোরেশন,

[৪৫] Sheldon S. Wolin, *Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism* (Princeton University Press, 2008).

[৪৬] Slavoj Žižek, *First as Tragedy, Then as Farce* (London: Verso, 2009).

রাজনৈতিক এলিট, টেক-বিলিয়েনেয়ার আর সেলিব্রিটিরা। আর এই কাঠামোর একদম নিচতলায় পড়ে আছে সাধারণ মানুষ।

আগে প্রজারা খাজনা দিত জমির জন্য। এখন মানুষ কর দেয়, প্রোডাক্ট কেনে, কনটেন্ট গেলে; নাগরিক হবার বৈধতা পায় ভোক্তা হবার শর্তে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ইয়ানিস ভারুফাকিস এই বাস্তবতার নাম দিয়েছেন Technofeudalism—প্রযুক্তিনির্ভর সামন্ততন্ত্র।

এখানে শাসন চলে অ্যালগরিদম, তথ্য আর প্রযুক্তি-প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। মানুষের এখন নিরলস ডিজিটাল মজুর। তার প্রতিটা ক্লিক, প্রতিটা তথ্য আর আর স্ক্রল করে কাটানো প্রতিটা সেকেন্ড নয়া সামন্তবাদের ভিতকে মজবুত করে।[৪৭]

প্রযুক্তিনির্ভর এই সামন্ততন্ত্র কেবল কর্পোরেট জমিদারদের হাতে ক্ষমতা পুঞ্জীভূত করে না, রাষ্ট্রকেও দেয় নজিরবিহীন ক্ষমতা। কর্পোরেট প্ল্যাটফর্মগুলো যোগান দেয় নজরদারি আর মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার; রাষ্ট্র যোগান দেয় তার আইনি বৈধতা আর দমনপীড়নের শক্তি।

দুইয়ে মিলে নিয়ন্ত্রণের এমন এক কাঠামো তৈরি করে, যা দ্রুততম সময়ে বিশাল পরিসরে চাপিয়ে দেওয়া যায়, স্বাভাবিকতার মোড়কে।

এই কাঠামোর চেহারা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দেখা গেছে কোভিডের সময়। করোনা আমাদের দেখিয়েছে আধুনিক রাষ্ট্র চাইলে কত সহজে সব 'অধিকার' কেড়ে নিতে পারে। গোপনীয়তা, চলাফেরা, জনসমাবেশ, এমনকি ইবাদাতের স্থান—চোখের পলকে রাষ্ট্র স্থগিত করতে পারে সব কিছু।

আজ থেকে স্রেফ একশো বছর আগেও শাসকরা এ কাজগুলো করতে পারত না। আর মানুষও তা মেনে নিত না। অথচ গুটিকয় ব্যতিক্রম ছাড়া আধুনিক সমাজ নির্দ্বিধায় এসব মেনে নিয়েছে। কারণ পুরো আয়োজনটা হাজির করা হয়েছে 'বিজ্ঞান', 'জনস্বাস্থ্য' আর 'জনকল্যাণ'-এর মোড়কে। এই ফ্রেইমে প্রশ্ন তোলার জায়গা নেই। দ্বিমত করা মানেই আপনি 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' অথবা 'নিরাপত্তার ঝুঁকি'।

---

[৪৭] বর্তমান বৈশ্বিক ব্যবস্থাকে 'নব্য সামন্ততন্ত্র' (Neo-feudalism) হিসেবে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইয়ানিস ভারুফাকিসের কাজ সবচেয়ে আলোচিত। দেখুন: Yanis Varoufakis, *Technofeudalism: What Killed Capitalism* (Bodley Head, 2023)। এই ব্যবস্থার সমাজতাত্ত্বিক ও কাঠামোগত বিশ্লেষণের জন্য আরও দেখুন Jodi Dean, "Neofeudalism: The End of Capitalism?," *Los Angeles Review of Books*, May 12, 2020; এবং প্রযুক্তি ও সার্ভেইল্যান্সের মাধ্যমে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism* (PublicAffairs, 2019)।

গণতন্ত্রকে সবসময় পুরোনো জামানার রাজতন্ত্র বা সামন্তবাদের বিপরীতে অধিকার আর স্বাধীনতার যুগ হিসেবে জাহির করা হয়। কিন্তু আধুনিক গণতন্ত্র নিয়ন্ত্রণের যে কাঠামো গড়ে তুলেছে, তা পুরোনো আমলের দমনের চেয়েও অনেক বেশি কার্যকরী। এ ব্যবস্থা সরাসরি হুকুমের ভাষায় কথা বলে না, কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ। আধুনিক গণতন্ত্র যা করেছে, মধ্যযুগের রাজারা তা কল্পনাও করতে পারত না।

তবে নিয়ন্ত্রণের এই কাঠামো সবার জন্য সমান না। সাধারণ মানুষের জন্য এক নিয়ম, আর সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সেট নিয়ম এলিটদের জন্য।

ডিজিটাল সামন্তপ্রভু

নব্য সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ ২০২৪ সালের মার্কিন নির্বাচনে ইলন মাস্কের ভূমিকা।

২৫০ মিলিয়ন ডলার (আমাদের হিসাবে প্রায় ২,৯৫০ কোটি টাকা), একটা তুমুল জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, আর অ্যালগরিদমের নিয়ন্ত্রণ—এই তিন অস্ত্র দিয়ে ইলন মাস্ক বদলে দেয় মার্কিন রাজনীতির মোড়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের স্থপতি ছিল মাস্ক।[৪৮]

ট্রাম্প জেতার পরপরই মাস্কের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'বিশেষ উপদেষ্টা বডি'। হোয়াইট হাউসে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে মাস্ক। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে সামরিক আর মহাকাশ গবেষণাজনিত পলিসিগুলোও পড়ে তার প্রভাবের আওতায়।[৪৯]

এভাবে কয়েকশো কোটি ডলার আর ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে একজন ব্যক্তি। সবকিছু হয় বৈধ এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরে। 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রেও' টাকা আর মিডিয়া দিয়ে নির্বাচনের ফল বদলানো যায়।

---

[৪৮] ২০২৪ সালের নির্বাচনে মাস্ক ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থনে 'আমেরিকা পিএসি' (America PAC)-এর মাধ্যমে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেন। ২০২২ সালে ৪৪ বিলিয়ন ডলারে 'এক্স' কিনে নেওয়ার পর তিনি ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট পুনর্বহাল করেন এবং প্ল্যাটফর্মটির অ্যালগরিদম ব্যবহার করে রিপাবলিকান প্রচারণা জোরদার করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: *"Inside the Trump-Musk Relationship,"* The New York Times, February 5, 2025; "Elon Musk Spent More Than $290 Million on the 2024 Election," CNN, February 1, 2025, www.cnn.com.

[৪৯] Campaign Legal Center, "Elon Musk Has Grown Even Wealthier Through Serving Trump's Administration," *Campaign Legal Center* (blog), accessed February 20, 2026

তবে এর পেছনেও ক্ষমতার আরও গভীর একটা স্তর আছে, সেই স্তরে বিচরণ করে পিটার থিলের মতো লোকেরা।

গোয়েন্দা-সামরিক-কর্পোরেট চক্র

পিটার থিল যখন তার কোম্পানি 'প্যালান্টির' প্রতিষ্ঠা করে, তখন প্রথম বিনিয়োগ আসে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র কাছ থেকে।[৫০] ভদ্রলোক আরেক টেক-বিলিয়েনেয়ার। পেপাল-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা, ফেসবুকের একেবারে শুরুর দিকের বিনিয়োগকারী। পাশাপাশি মার্কিন গোয়েন্দা ও সামরিক কাঠামোর পছন্দের লোক। শোনা যায়, একসময় এফবিআই'র ইনফর্ম্যান্ট হিসেবেও কাজ করেছে সে।[৫১]

থিলের ক্ষমতার প্রমাণ মেলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেইডি ভ্যান্সের উত্থান থেকে। একসময় থিলের কোম্পানিতেই চাকরি করত ভ্যান্স। ২০২২ সালে সে যখন সেনেটর পদে নির্বাচনে দাঁড়াল, থিল তখন তার নির্বাচনী তহবিলে ঢালে ১৫ মিলিয়ন ডলার। জোগাড় করে দেয় আরও অনেক ধনকুবের দাতাদের সমর্থন আর অর্থায়ন।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ভ্যান্সকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার পেছনেও বড় ভূমিকা ছিল থিলের। ২০১৬ সালে ট্রাম্প যখন প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হয়েছিল, তখনো তার নির্বাচনী ক্যাম্পেইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাতাদের একজন ছিলেন এই পিটার থিল।[৫২]

এ বিনিয়োগে ভালো মুনাফাও পেয়েছে সে।

ট্রাম্প-ভ্যান্স জুটি হোয়াইট হাউসে ঢোকার পর একের পর এক সরকারি টেন্ডার পেতে শুরু করে থিলের কোম্পানি প্যালান্টির। শুধু পেন্টাগনের কাছ থেকেই

---

[৫০] প্যালান্টিরের প্রথম দিকের অর্থায়ন এসেছিল সিআইএ'র (CIA) ভেঞ্চার ক্যাপিটাল শাখা 'ইন-কিউ-টেল' (In-Q-Tel) থেকে। দেখুন: openDemocracy, "Palantir, the NHS and the Federated Data Platform: Peter Thiel's Bid to Scale a Surveillance Model Globally," *openDemocracy*, accessed February 20, 2026

[৫১] পিটার থিল ও এফবিআই-এর মধ্যকার গোপন সহযোগিতার সম্পর্কের বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধানের জন্য দেখুন: 'Peter Thiel, FBI Informant,' *Insider* (September 25, 2023)।

[৫২] Antonio Pequeño IV, "J.D. Vance and Peter Thiel: What to Know About the Relationship Between Trump's VP Pick and the Billionaire," *Forbes*, July 16, 2024; The billionaire who fueled JD Vance's rapid rise to the Trump VP spot," *CBS News*, July 16, 2024.

বাগিয়ে নেয় প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের বেশি কন্ট্রাক্ট। মাত্র ছয় মাসের মধ্যে প্যালান্টির-এর শেয়ারের দাম বেড়ে যায় প্রায় ১৪০%। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পায় থিলের সাথে জড়িত অন্তত এক ডজন ব্যক্তি।

সব কিছুই হয় আইন মেনে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ভেতরে।

ভালো কথা, প্যালান্টির-এর অন্যতম গ্রাহক হলো ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। ২০২৩ সাল থেকে গাযায় চলা গণহত্যায় যে এআই-নির্ভর টার্গেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছিল, তার প্রযুক্তি ও সফটওয়্যার যোগান দিয়েছিল এই কোম্পানি। কর্পোরেট প্রযুক্তি, সামরিক দমননীতি, গোয়েন্দা সংস্থা আর দখলদারিত্ব—এভাবেই একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠেছে।

ইলন মাস্ক গণতান্ত্রিক রাজনীতির ওপর মিডিয়া আর অর্থের নিয়ন্ত্রণটা দেখায়। আর পিটার থিল স্পষ্ট করে দেয় রাজনীতিতে গোয়েন্দা সংস্থা আর সামরিক কাঠামোর প্রভাবের দিকটা।

তবে এ দুটোকে ছাড়িয়ে যায় নিয়ন্ত্রণের আরেকটা স্তর। এ জগতের খোঁজ মেলে জেফরি এপস্টিনের গল্প থেকে।

এসপিওনাজ ও এপস্টিন

জেফরি এপস্টিন। ইহুদি এই ধনকুবেরের নামের সাথে মিশে আছে ক্ষমতা, ব্ল্যাকমেইল আর রাষ্ট্রের ওপর নিয়ন্ত্রণের ভয়ংকর এক গল্প।

ক্যারিবিয়ান সাগরে লিটল সেইন্ট জেমস নামে একটা দ্বীপের মালিক ছিল এপস্টিন। এই দ্বীপে পৃথিবীর তাবৎ প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, সেলেব্রিটি, প্রযুক্তি জগতের রথী-মহারথী, উচ্চপদস্থ আমলা আর ক্ষমতা কাঠামোর সাথে জড়িত লোকদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসত সে। আয়োজন করত উদ্দাম সব পার্টির। থাকত অঢেল মদ, নারী, ড্রাগস। থাকত আরও 'বিশেষ কিছু'।

এপস্টিন নারী ও শিশুদের ব্যবহার করত ফাঁদ হিসেবে। ক্ষমতাসীনদের সুযোগ করে দিত তাদের সাথে 'একান্তে সময় কাটানোর'। গোপনে ভিডিও করত সেইসব ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড। তারপর সেই ভিডিও হয়ে যেত জীবনভর ব্ল্যাকমেইলের হাতিয়ার। একবার কেউ এই জালে ধরা পড়লে সারাজীবনের জন্য সে এপস্টিন বা তার পেছনের অদৃশ্য শক্তির হাতের পুতুল হয়ে যেত।

এপস্টিনের প্রমোদ দ্বীপের অতিথিদের তালিকায় ছিল বিল ক্লিনটন, প্রিন্স অ্যান্ড্রু, ডোনাল্ড ট্রাম্প, বিল গেটস থেকে শুরু করে স্টিফেন হকিংসের মতো লোকেরাও।

অনেকে মনে করেন, এই পুরো অপারেশনের পেছনে ছিল ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। এপস্টিনকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমের ক্ষমতাবানদের ব্ল্যাকমেইলের জালে আটকাত ইসরায়েলিরা।

২০১৯ সালে মানব পাচার ও শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার হয় এপস্টিন। বিচার শেষ হবার আগেই জেলে মারা যায় রহস্যজনকভাবে। সরকারিভাবে বলা হয় আত্মহত্যা। কিন্তু প্রায় সব সিরিয়াস বিশ্লেষক মনে করেন, এটা ছিল পরিকল্পিত হত্যা। যার উদ্দেশ্য, তার পেছনের খেলোয়াড়দের পরিচয় গোপন রাখা।[৫৩]

জেফরি এপস্টিনের ঘটনা আমাদের সামনে একটা অন্ধকার জগতের ছবি তুলে ধরে। যে জগতে একসাথে মিলেমিশে যায় যৌনবিকৃতি, হত্যা, ব্ল্যাকমেইল, গোয়েন্দা সংস্থা আর বিশ্বরাজনীতি।

প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এপস্টিন একা না। তার মতো আরও অনেকে এখনো কাজ করে যাচ্ছে।[৫৪]

***

মাস্ক, থিল, এপস্টিন—তিনজন একই কাঠামোর তিন স্তরের বাসিন্দা।

তবে এই গল্প কেবল এই তিনজনের একার না। একই ছাঁচে পশ্চিমা বিশ্বজুড়ে প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে বহু টেক-বিলিয়েনেয়ার, কর্পোরেট মালিক ও ধনকুবের। কখনো সরাসরি, কখনো ছায়ার আড়ালে।

---

[৫৩] এপস্টিনের মানবপাচার নেটওয়ার্ক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতার প্রাথমিক আইনি তথ্যের জন্য দেখুন: *United States v. Jeffrey Epstein*, Case No. 19-cr-490 (S.D.N.Y. 2019)। এছাড়া, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) কর্তৃক অবমুক্ত করা নতুন কয়েক লক্ষ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ নথিপত্র এবং এ সংক্রান্ত অফিশিয়াল স্টেটমেন্টের জন্য দেখুন বিচার বিভাগের এই আর্কাইভ: https://www.justice.gov/epstein। এই চক্রের নেপথ্য কাহিনি উন্মোচনে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য দেখুন: Julie K. Brown, *Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story* (HarperCollins, 2021)।

[৫৪] অন্যদিকে, এপস্টিনের এই চক্রের সাথে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা (মোসাদ) ও পশ্চিমা ইন্টেলিজেন্সের যোগসাজশ, এবং কীভাবে যৌনতাকে ব্ল্যাকমেইলের হাতিয়ার হিসেবে বিশ্ব রাজনীতিতে ব্যবহার করা হয়, তার পর্যালোচনার জন্য দেখুন: Whitney Webb, *One Nation Under Blackmail: The Sordid Union Between Intelligence and Crime that Gave Rise to Jeffrey Epstein* (Trine Day, 2022)। লেখিকা এই দুই খণ্ডের গবেষণায় দেখিয়েছেন, এপস্টিন কোনো বিচ্ছিন্ন অপরাধী ছিল না; বরং সে ছিল গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মদদপুষ্ট একটি বৃহত্তর 'ব্ল্যাকমেইল নেটওয়ার্ক'-এরই অংশ, যার কারণে কারাগারে তার মৃত্যুও অত্যন্ত সন্দেহজনক।

গোয়েন্দা সংস্থা, দেশি-বিদেশি লবি, থিংক ট্যাংক, মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স, টেক জায়ান্ট—সবাই এ জালের অংশ। প্রেসিডেন্ট হোক বা প্রধানমন্ত্রী, শেষ পর্যন্ত যে-ই ক্ষমতায় আসে, আসে এই চক্রের আনুগত্য স্বীকার করেই।

জনতার চোখের আড়ালে ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এক ছায়াকাঠামো, আর সেখানে বিচরণ করে নব্য সামন্তপ্রভুরা।

অবধারিত অলিগার্কি

মাস্ক, থিল, এপস্টিনের গল্প শুনে মনে হতে পারে, এগুলো সাম্প্রতিক বিচ্যুতি, বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপব্যবহার। কিন্তু না, এটা গণতন্ত্রের কাঠামোগত সমস্যা।

গণতন্ত্রে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ অল্প কিছু মানুষের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে; এ কথা আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগেই বলে গিয়েছিলেন বেশ কিছু প্রভাবশালী সমাজবিজ্ঞানী।

ইতালীয় সমাজবিজ্ঞানী ভিলফ্রেডো প্যারেটোর নাম অনেকেই শুনেছেন। ভদ্রলোকের তৈরি 'প্যারেটো এফিশিয়েন্সি' এবং 'প্যারেটো প্রিন্সিপাল'-এর মতো কনসেপ্টগুলো আজও অর্থনীতি, মার্কেটিংসহ অনেকগুলো ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা সরাসরি তার নাম শোনেননি, তারাও তার আবিষ্কৃত কনসেপ্টের সাথে পরিচিত। বিখ্যাত ৮০-২০ নীতি এসেছে ভিলফ্রেডো প্যারেটোর কাছ থেকেই।

প্যারেটো দেখিয়েছিলেন ৮০-২০ নীতি (৮০% ফলাফল আসে ২০% কারণ থেকে) শুধু ব্যবসা বা অর্থনীতিতে না, ক্ষমতা কাঠামোতেও প্রযোজ্য। কোনো সমাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠের কথামতো শাসন চলে না। ক্ষমতা সবসময় একটা ক্ষুদ্র অভিজাত গোষ্ঠীর হাতে থাকে। গণতন্ত্র এই বাস্তবতা বদলায় না, বরং একে আরও সূক্ষ্মভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। শাসন চলে জনগণের নামে, কিন্তু জনগণকে বাদ দিয়ে।[৫৫]

একই উপসংহারে পৌঁছেছিলেন প্যারেটোর সামসময়িক গ্যাইটানো মস্কা। তার মতে, গণতন্ত্র আসলে একটা মুখোশ। ক্ষমতাবান শ্রেণি তাদের শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন বয়ান তৈরি করে। 'গণতন্ত্র মানে জনগণের

[৫৫] **ভিলফ্রেডো প্যারেটো (১৮৪৮-১৯২৩)** ছিলেন একজন প্রখ্যাত ইতালীয় সমাজবিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও অর্থনীতিবিদ, যিনি রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানে 'এলিট তত্ত্ব' (Elite Theory)-এর অন্যতম জনক হিসেবে স্বীকৃত। দেখুন, Vilfredo Pareto, *The Mind and Society* [Trattato di Sociologia Generale] (1916)

শাসন,' 'জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন'—এগুলো হলো সেইসব বয়ানের অংশ। বয়ানগুলোর কাজ হলো বাস্তবতাকে আড়াল করে এলিট গোষ্ঠীর শাসনকে বৈধতা দেওয়া। ক্ষমতার কাঠামোকে টিকিয়ে রাখা।[৫৬]

জনগণের শাসন আসলে মিথ, কল্পকথা; যার বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই।

বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট মিচেলস এই বাস্তবতার নাম দিয়েছিলেন 'আইরন ল অফ অলিগার্কি' (Iron Law of Oligarchy)—অলিগার্কির লৌহ নিয়ম।[৫৭]

তার গবেষণা দেখায়, যেকোনো সংগঠন শুরুতে যতই গণতান্ত্রিক হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা অলিগার্কি বা অভিজাততন্ত্রে পরিণত হয়। অল্প কিছু মানুষ সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। মিচেলসের ভাষায়, 'সংগঠন মানেই অলিগার্কি।' এটা কেবল ট্রেড ইউনিয়ন বা রাজনৈতিক দলের জন্য সত্য না, পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর গণতন্ত্র যেহেতু নিজেই এক সংগঠিত কাঠামো, তাই এখানেও এই প্রবণতা অনিবার্য।[৫৮]

গণতন্ত্র অবধারিতভাবে অভিজাততন্ত্রে পরিণত হয়। মাস্কা, থিল, এপস্টিনের গল্প এই তত্ত্বের সর্বশেষ প্রমাণ।

পশ্চিমা বিশ্বে গণতন্ত্রের মুখোশ আছে, কিন্তু ক্ষমতা অভিজাতদের হাতে কেন্দ্রীভূত। তারাই রাজনীতিবিদদের বাছাই করছে, অর্থায়ন করছে, তৈরি করে দিচ্ছে নেটওয়ার্ক। তারাই পলিসিকে প্রভাবিত করছে, আইন পাশ করাচ্ছে, সরকারি কন্ট্রাক্ট হাতিয়ে নিচ্ছে এবং নিজেদের লোকজনকে বসাচ্ছে প্রশাসনে। তারাই ঠিক করছে কোন ইস্যু সামনে আসবে, জনমত কোন দিকে যাবে, কাকে দেবতা বানিয়ে পূজা করা হবে, আর কাকে দেখানো হবে অসুর হিসেবে।

---

[৫৬] **গ্যাইটানো মস্কা (১৮৫৮-১৯৪১)** ছিলেন ইতালীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, আইনজ্ঞ এবং প্যারেটোর সামসময়িক 'এলিট স্কুল অফ সোসিওলজি'-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা। দেখুন: Gaetano Mosca, *The Ruling Class*, trans. Hannah D. Kahn (New York: McGraw-Hill, 1939) (orig. *Elementi di scienza politica*, 1896)

[৫৭] **রবার্ট মিচেলস (১৮৭৬-১৯৩৬)** জার্মান-বংশোদ্ভূত ইতালীয় সমাজবিজ্ঞানী। ম্যাক্স ওয়েবারের ছাত্র এবং আধুনিক রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ। দেখুন: Robert Michels, *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*, trans. Eden and Cedar Paul (New York: Free Press, 1962) (orig. 1911)

[৫৮] Oligarchy: অভিজাতন্ত্র বা গুটি কয়েক মানুষের শাসন। রবার্ট মিচেলস শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেই শীর্ষ নেতৃত্ব বা আমলাতান্ত্রিক স্তরকে বোঝাতে, যারা কাঠামোগত কারণেই (যেমন- দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দক্ষতার অজুহাতে) সাধারণ সদস্যদের পাশ কাটিয়ে সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে নেয়। মূলত, ইতালীয় সমাজবিজ্ঞানের এই তিন মহারথী একই রাজনৈতিক বাস্তবতার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেছেন—প্যারেটো যাকে বলেছেন 'এলিট' (Elite), মস্কা তাকে বলেছেন 'ক্ষমতাসীন শ্রেণি' বা রুলিং ক্লাস (Ruling Class), আর মিচেলস তাকেই আখ্যা দিয়েছেন 'অলিগার্কি' (Oligarchy) হিসেবে। সমাজের অতি-ক্ষমতাধর, সম্পদশালী এবং নীতিনির্ধারক শাসক শ্রেণিকে পবিত্র কুরআনে 'আল-মালা' (المَلَأ) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যুগে যুগে 'আল-মালা' নিজেদের কায়েমি স্বার্থ ও আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে নবী-রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) দাওয়াহর সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছে।

পশ্চিমা বিশ্বে নির্বাচন এমন এক ঘোড়দৌড়, যেখানে সব ঘোড়ার মালিক আসলে এক। যেই জিতুক না কেন, লাগাম থাকে সেই একই হাতে।

সাধারণ মানুষের অবস্থা কার্যত প্রজার মতো। নির্বাচনের মাধ্যমে তারা শাসকের চেহারা পাল্টাতে পারে, কিন্তু নীতি পাল্টাতে পারে না। ভোটের এই স্বাধীনতা হলো কোকাকোলা আর পেপসি, ম্যাকডোনাল্ডস আর কেএফসির মধ্যে বাছাই করার স্বাধীনতা।

মখমলের শেকল

পশ্চিমা গণতন্ত্র যদি সত্যিই অলিগার্কি হয়, তাহলে প্রশ্ন আসে: জনগণ বিদ্রোহ করে না কেন? কেন তারা রুখে দাঁড়ায় না?

এই প্রশ্নের জবাব খোঁজার চেষ্টা করেছেন বহু চিন্তাবিদ, গবেষক এবং দার্শনিক। বিভিন্ন শাস্ত্রের বিশ্লেষণ শেষ পর্যন্ত দেখিয়েছে জনগণের এই নিষ্ক্রিয়তার সাথেও গভীর সম্পর্ক আছে গণতন্ত্রের। এ ব্যবস্থা এমন নাগরিক তৈরি করে, যারা প্রতিরোধ করতে পারে না, করতে চায়ও না।

সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট নিসবেট দেখিয়েছেন, কীভাবে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সমাজের মাঝখানের সব প্রতিষ্ঠানকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দুর্বল করে দেয়।

একসময় যে বিষয়গুলো জীবনের অর্থ ও পরিচয়ের ভিত্তি ছিল, ছিল সামাজিক সুরক্ষা আর রাজনৈতিক প্রতিরোধের ঢাল, তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে ব্যক্তির সাথে সরাসরি সম্পর্ক তৈরি করে রাষ্ট্র। সব শেকড় হারানো একাকী নাগরিক দানবীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের সামনে আসে দুর্বল, অরক্ষিত ও অসহায় হয়ে।[৫৯]

অ্যামেরিকান চিন্তাবিদ প্যাট্রিক ডিনিন তার *Why Liberalism Failed* বইয়ে এই প্রক্রিয়াকে আরও স্পষ্ট করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে লিবারেল গণতন্ত্র মানুষকে তার পরিবার, ধর্ম, নৈতিকতা এবং ঐতিহাসিক সব শেকড় থেকে আলাদা করে ফেলে। স্বাধীনতার নামে এমন এক ভোগবাদী সংস্কৃতি তৈরি করে, যেখানে মানুষ দুর্বল, একাকী, আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগপ্রবণ। বিচ্ছিন্ন এই 'নাগরিক' রাষ্ট্র কিংবা বাজারের মুখোমুখি হতে পারে না, চায়ও না। সে আরাম চায়, সংঘাত না।[৬০]

---

[৫৯] Robert A. Nisbet, *The Quest for Community: A Study in the Ethics of Order and Freedom* (Oxford University Press, 1953).

[৬০] Patrick J. Deneen, *Why Liberalism Failed* (Yale University Press, 2018).

এই বিচ্ছিন্নতার প্রভাব পড়ে মানুষের মনস্তত্ত্বে। দার্শনিক যিগমন্ট বাউম্যান বলেছেন, আধুনিকতা এমন এক ধরনের মানুষের জন্ম দেয়, যে ভোগে আসক্ত আর দায়দায়িত্বহীন। তার কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর তার সেই 'স্বাধীনতা' আরাম আর ভোগের মধ্যে সীমিত।[৬১]

আরও এক ধাপ এগিয়ে ঐতিহাসিক ক্রিস্টোফার ল্যাশ বলেছেন, এই ধরনের মানুষ এতটাই আত্মকেন্দ্রিক এবং মানসিকভাবে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে যে, সে আর প্রতিরোধ করতে পারে না। নৈতিক বা আদর্শিক কোনো কারণে সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়ানো তার কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়। সে সবসময় মানিয়ে নেওয়ার পথ বেছে নেয়।[৬২]

তবে এই নিষ্ক্রিয়তা কেবল মনস্তাত্ত্বিক না; এর পেছনে থাকে এক পরিকল্পিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রকল্প। আধুনিক পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষকে সরাসরি দমন করে না। মানুষকে সে শাসন করে সম্মতি আর মনোরঞ্জনের মাধ্যমে। সে তাকে আনন্দ দেয়, বিনোদন দেয়, দেয় নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি।

মানুষ তৃপ্ত এবং সেই তৃপ্তি তাকে এমনভাবে বন্দি করে যে, সে আর নিজেকে বন্দি বলে ভাবতেও শেখে না। সারাক্ষণ আমোদিত থাকা মানুষ নিপীড়িত বোধ করার ফুরসত পায় না। প্রতিরোধ আর বিদ্রোহের কথা তার মাথায়ই আসে না। কারণ স্বাধীনতার সত্যিকারের চেহারা কেমন, সেটাই সে ভুলে গেছে। সমাজতাত্ত্বিক হার্বার্ট মার্কিউস একে বলেছেন, 'আনন্দের মৃদু স্বৈরাচার' (soft tyranny of pleasure)।[৬৩]

নব্য জাহিলিয়াত

পশ্চিমা চিন্তাবিদরা যাকে বলেছেন মখমলের শেকল, নব্য সামন্তবাদ, বা আনন্দের স্বৈরাচার; উস্তাদ সাইয়্যিদ কুতুব (রাহিমাহুল্লাহ) বহু আগেই সেটাকে চিহ্নিত করেছিলেন 'নব্য জাহিলিয়াত' হিসেবে।

তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ *মাআলিম ফিত তারিক*-এ তিনি বলেছিলেন, আধুনিক জাহিলিয়াত মানুষকে আসমানি নির্দেশনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছুড়ে দেয়

[৬১] Zygmunt Bauman, *Liquid Modernity* (Polity Press, 2000); এবং *Consuming Life* (Polity Press, 2007).

[৬২] Christopher Lasch, *The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations* (W. W. Norton & Company, 1979).

[৬৩] Herbert Marcuse, *One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society* (Beacon Press, 1964).

অধঃপতনের অন্ধকার গহ্বরে। পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র তাকে পরিণত করে ভোগবাদী যন্ত্রে। বঞ্চিত করে আল্লাহর বিধানের অধীনে বাঁচার অধিকার থেকে।

কিন্তু মানুষের কাজ তো কেবল আনন্দের সন্ধান করা না। সে এক নৈতিক সত্তা, এক অনন্ত যাত্রার মুসাফির, যে উচ্চতর এক বিধানের কাছে দায়বদ্ধ। তার দায়িত্ব বাতিলের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা, জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, এবং দুনিয়াতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা।

নব্য জাহিলিয়াত প্রতিরোধের এই উপাদানগুলো ধ্বংস করে দেয়। মানুষের চিন্তা ও সত্তাকে খণ্ড খণ্ড করে তাকে পরিণত করে অসংখ্য মিথ্যা ইলাহের আজ্ঞাবহ দাসে।

এটা গণতন্ত্রের ব্যর্থতা না, বরং এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এটা এমন এক মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রকল্প, যার উদ্দেশ্যই হলো এমন জনগোষ্ঠী তৈরি করা, যারা সহজে শাসিত হবে। যারা রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় এবং অনুগত থাকবে।

উদারনৈতিকতা, পুঁজিবাদ এবং গণতন্ত্র মিলে এমন রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে তোলে, যা নিয়মতান্ত্রিকভাবে এ-ধরনের পোষমানা মানুষ উৎপাদন করে। গণতন্ত্র যত বেশি ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়, তত বেশি বশ্যতা নিশ্চিত করে।

গণতন্ত্র যে নাগরিক তৈরি করে, সে কখনোই বিপ্লব ঘটাতে পারে না। কারণ সে পরিবর্তনের ভাষা ভুলে গেছে, বিশ্বাস হারিয়েছে। আত্মসমর্পণকেই সে অমোঘ নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়েছে।

***

গণতন্ত্রের মৃত্যুঘণ্টা বাজছে এবং পশ্চিমা চিন্তাবিদরাই সেটা চিহ্নিত করেছেন। পশ্চিমের দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের গভীর আত্মসমালোচনা থেকে স্পষ্ট: জনগণের ক্ষমতায়নের যে প্রতিশ্রুতি গণতন্ত্র দিয়েছিল, বাস্তবে তা মানুষকে আরও বেশি একা, আরও বেশি দুর্বল, আরও বেশি নিয়ন্ত্রিত করে তুলেছে।

পশ্চিমা লিবারেল গণতন্ত্র জন্ম দিয়েছে এক নতুন অভিজাততন্ত্র, খুলে দিয়েছে কর্পোরেট সামন্তবাদের জন্য পথ, যেখানে রাজত্ব করে মাস্ক, থিল, এপস্টিনরা।

গণতন্ত্রকে ঘিরে থাকা অনেক পুরোনো মুগ্ধতা, অনেক মোহ, অনেক অজুহাত পশ্চিমা বিশ্বেই আজ ভেঙে পড়ছে। প্রাচ্যের অবস্থা আরও খারাপ। গণতন্ত্র এখানে পরিণত হয়েছে নব্য-উপনিবেশবাদের সবচেয়ে পরিশীলিত সংস্করণে।

দুই জায়গাতেই ফলাফল মৌলিকভাবে এক: জনগণের শাসনের নামে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ। জনগণের ক্ষমতায়নের নামে গণতন্ত্র আসলে মানুষকে প্রজা বানিয়ে রাখে।

এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমা গণতন্ত্রকে আদর্শ বা পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণের কোনো যুক্তি থাকে না। বরং ব্যর্থতার এই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি রোধ করাই অন্যতম করণীয় হয়ে দাঁড়ায়।

মুসলিমবঙ্গের জন্য আমরা যে রূপান্তরের কথা বলছি, তা কেবল ক্ষমতার হাতবদল না। অল্প কিছু সংস্কার না। এটা এক নতুন সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণের প্রকল্প। যেখানে ব্যালট বাক্স, সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিংবা কোনো দেশি-বিদেশি পার্থিব প্রভুর বদলে আইন, মূল্যবোধ আর কর্তৃত্বের উৎস হবে ওহী। এটা তাওহীদের ভিত্তিতে এমন এক শাসনব্যবস্থা কায়েম করার প্রকল্প, যা হবে আযাদ ও শক্তিশালী।

যেখানে গণতন্ত্রের বিকাশ সবচেয়ে পরিণত, সেখানেও যদি রাষ্ট্র চলে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ইশারায়, তবে বাংলাদেশের মতো দেশে এই পদ্ধতির মাধ্যমে কী আশা করা যায়?

সংখ্যাগরিষ্ঠতার মিথ আর জনগণের শাসনের কল্পকথার ওপর ভরসা করে কীভাবে ওহীকেন্দ্রিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখা সম্ভব?

গণতন্ত্র তার শ্রেষ্ঠ রূপেও এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে উপযুক্ত না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই রূপান্তর কেবল অসম্ভবই না, বরং এই পদ্ধতি গ্রহণ করা আত্মঘাতী। এতে করে মুসলিম সমাজে পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো কেবল মজবুত এবং দীর্ঘায়িত হবে।

বাস্তবতা হলো আকীদাহগত আপত্তি যদি না-ও থাকত, তবু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আমাদের প্রকল্পের জন্য আত্মঘাতী। এ অন্ধ গলি দিয়ে বিপ্লবের গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব না।

গণতন্ত্র হলো নিপুণ বশীকরণ, সম্মতির মাধ্যমে দাসত্ব।

গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা?

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যে ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি তা আনতে পারে না। এটা কেবল আদর্শিক কারণে না। বাস্তবতা এবং প্রায়োগিক দিক থেকেও এটা অসম্ভব।

সেক্যুলার ব্যবস্থা থেকে ইসলামী ব্যবস্থায় যাওয়াটা কেবল সরকার বদল না, বরং শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। এটা বৈপ্লবিক রূপান্তর। গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরে থেকে এই মাত্রার পরিবর্তন সম্ভব না।

বৈপ্লবিক রূপান্তর বলতে আমরা বোঝাচ্ছি এমন পরিবর্তন, যা বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোকে ভেঙে দিয়ে নতুন আদর্শের ওপর সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে।

এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি, আইন, শাসনের ধরন এবং জনগণের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কের সামগ্রিক রূপান্তর। প্রয়োজন বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামো আর তার আইনি ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ।[৬৪]

---

[৬৪] 'বৈপ্লবিক রূপান্তর'-এর সংজ্ঞাটি পলিটিকাল সায়েন্স এবং সোশিওলজির বিভিন্ন প্রভাবশালী তাত্ত্বিকের বিশ্লেষণের সংশ্লেষ। **থিডা স্ককপোল** বিপ্লবকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে, যা পুরনো কাঠামোকে ভেঙ্গে বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামো ও শ্রেণি সম্পর্কের মৌলিক রূপান্তর ঘটায়। **স্যামুয়েল হান্টিংটন** বিপ্লবের মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সমাজের প্রাধান্যশীল মূল্যবোধ, মিথ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও নেতৃত্ব কাঠামোর সহিংস ও যুগান্তকারী পরিবর্তনকে।

চামার্স জনসন দেখিয়েছেন, বিপ্লব হলো কোনো সমাজের মূল্যবোধ ও বৈধতার কাঠামোকে আমূল পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া; যার ফলে একটি নব-প্রতিষ্ঠিত আদর্শিক কাঠামো (normative order)-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও শাসনব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর ঘটে। **হান্না আরডেন্ট** বিপ্লবকে শুধুমাত্র বিদ্রোহ বা ক্ষমতা দখল নয়, বরং একটি সম্পূর্ণ নতুন রাজনৈতিক কাঠামোর (পলিটিকাল অর্ডার) ভিত্তি নির্মাণের প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। **মার্ক্সবাদী বিপ্লব তত্ত্ব** বিপ্লবের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে বিদ্যমান শ্রেণিভিত্তিক রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে সমাজকে শ্রেণিহীন বিন্যাসের দিকে এগিয়ে নেওয়াকে।

এই আলোচনায় ব্যবহৃত সংজ্ঞা ওপরের তাত্ত্বিকদের মূল অন্তর্দৃষ্টিসমূহের সমন্বয়ে গঠিত। এখানে 'বৈপ্লবিক রূপান্তর' বলতে নেতৃত্বের পরিবর্তনের বাইরে গিয়ে রাষ্ট্রের আদর্শিক ভিত্তি, আইনি কাঠামো, সমাজের ভিত্তিগত কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং জনরাষ্ট্র সম্পর্কের পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরকে বৈপ্লবিক রূপান্তরের নির্ণায়ক বলা হয়েছে। এই ব্যাখ্যায় কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি (সহিংস বা শান্তিপূর্ণ) কিংবা কোনো নির্দিষ্ট আদর্শিক ফ্রেইমওয়ার্ককে (যেমন শ্রেণি সংঘাত) বিপ্লবের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে বা সংজ্ঞার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি।

বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: Theda Skocpol, States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China (Cambridge: Cambridge University Press, 1979); Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven: Yale University Press, 1968); Chalmers Johnson, Revolutionary Change (Boston: Little, Brown and Company, 1966); Hannah Arendt, On Revolution (New York: Viking Press, 1963); V. I. Lenin, The State and Revolution (1917; repr., New York: International Publishers, 1932).

সংস্কার পুরোনো কাঠামো ঠিক রেখে সেটা মেরামত করে। বিপ্লব রাষ্ট্রের পুরোনো চরিত্র ধ্বংস করে দিয়ে নতুন রাজনৈতিক সত্তার ভিত্তি নির্মাণ করে।

ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, চীন, কিউবা, ইরান, আফগানিস্তান, সিরিয়া—সব ক্ষেত্রেই পুরোনো রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে নতুন রাষ্ট্র গড়ে তোলা হয়েছে। আর এর কোনোটিই নির্বাচনী প্রক্রিয়া বা সংসদীয় পন্থায় হয়নি।

গণতন্ত্র: সংস্কারবাদী যন্ত্র

সংসদীয় পদ্ধতিতে বিপ্লব সম্ভব না। কারণ গণতন্ত্র সহজাতভাবেই সংস্কারের পদ্ধতি। সে কেবল তার নিজের বেঁধে দেওয়া সীমানার ভেতরে মতভেদকে অনুমোদন দেয়। আর সেই সীমানাকে মেনে নিয়ে আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে বড়জোর কিছু সংস্কারমূলক পরিবর্তন আনা যায়। এখানে কাজ করতে হয় বিদ্যমান ব্যবস্থার মূল ভিত্তি আর গণ্ডিকে মেনেই।

গণতন্ত্র তখনই সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করে, যখন একটা ব্যবস্থার মূল বিষয়গুলো নিয়ে সব পক্ষ একমত হয়, আর সেই ব্যবস্থার ভেতরে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করে।

সহজ ভাষায়, গণতন্ত্র হলো 'সিস্টেমের মধ্যে পরিবর্তন' (change within the system)। এর মাধ্যমে এক সিস্টেম ভেঙে সম্পূর্ণ আলাদা আরেক সিস্টেমে যাওয়া সম্ভব না।

আমাদের নিজেদের ইতিহাসে আমরা দেখি, আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া, এরশাদ, হাসিনা—কাউকেই নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরানো যায়নি। এদের সরাতে হয়েছে সাংবিধানিক পথ ছেড়ে। কখনো গণঅভ্যুত্থান, কখনো বিদ্রোহ ও যুদ্ধ করে।

অথচ এগুলো কিন্তু বৈপ্লবিক রূপান্তর না। অর্থাৎ বিপ্লব তো দূরের কথা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কিংবা গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার মতো কাজও সংসদীয় পথে করা যায় না। এই পথে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা হবে, এমন চিন্তা শিশুসুলভ।

আমাদের দেশের সেক্যুলারদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। বিশ্বজুড়ে এই ধারার রাজনীতির যত উল্লেখযোগ্য অর্জন আছে, তার কোনোটাই সংসদীয় পথে আসেনি। বলশেভিক বিপ্লব, কিউবার বিপ্লব থেকে শুরু করে গণচীনের জনযুদ্ধ—প্রতিটাই বৈপ্লবিক পদ্ধতির উদাহরণ।

সমাজতন্ত্রের মতো পশ্চিমা আদর্শ, যার শেকড় নিহিত আধুনিকতার ওয়ার্ল্ডভিউতে, সেটা প্রতিষ্ঠা করতেই যদি বিপ্লব লাগে, তাহলে ইসলামী ব্যবস্থা কীভাবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে?[৬৫] বিশেষ করে আধুনিক পশ্চিমের ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে ইসলামের বিরোধটা যখন মৌলিক?

তাছাড়া গণতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে, সেই দেশি-বিদেশি শক্তিরা কখনোই বড় কোনো পরিবর্তন হতে দেবে না। নিজেদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে তারা সবসময় বর্তমান ব্যবস্থাকেই আঁকড়ে ধরে থাকবে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদের মোকাবিলা হবে কীভাবে?

যেমনটা আমরা এরইমধ্যে বলেছি, বাংলাদেশকে সেক্যুলার রাষ্ট্র থেকে তাওহীদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিমবঙ্গ হয়ে ওঠতে হলে গণতন্ত্র দিয়ে কাজ হবে না। এমনকি শুধু রাজনৈতিক বিপ্লবও এখানে যথেষ্ট না। আমাদের প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ সমাজবিপ্লব, যেখানে রাষ্ট্র আর শাসনব্যবস্থার পাশাপাশি আইন, সমাজ কাঠামো, মূল্যবোধ আর জীবনবোধেও আসবে আমূল পরিবর্তন।

সংসদের মরীচিকা

অনেকেই মনে করেন, যদি কোনো ইসলামপন্থী দল জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে সংসদে যায়, তাহলে তারা ইসলামী শাসন কায়েম করতে পারবে।

এটা ভুল ধারণা।

কেবল নির্বাচন বা সংসদের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে, ইতিহাসে এমন নজির নেই বললেই চলে। সংসদীয় ব্যবস্থা তৈরিই হয়েছে পুরোনো কাঠামোকে টিকিয়ে রাখার জন্য, বিদ্যমান কাঠামো ভেঙে নতুন কিছু গড়ার জন্য না।

বৈপ্লবিক রূপান্তর যখনই হয়েছে, তার সবই ঘটেছে নিয়মতান্ত্রিকতার কাঠামোর বাইরে। এমনকি গত দুই-আড়াইশো বছরে ঘটে যাওয়া যেসব রাজনৈতিক রূপান্তরের সাথে সংসদীয় প্রক্রিয়া যুক্ত ছিল, সেখানেও মূল পরিবর্তন গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আসেনি।

---

[৬৫] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আসিফ আদনান, 'আলো-অন্ধকার', *অবক্ষয়কাল* (ঢাকা: ইলমহাউস পাবলিকেশন, ২০২৪)।

এ-ধরনের ঘটনাগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

- পতন-পরবর্তী সংবিধানিক পুনর্গঠন (Post-Collapse Constitutional Refounding)
- রাষ্ট্র সংস্কার (State Reform)

প্রথমটা এমন পরিবর্তন, যেখানে গণআন্দোলনের ফসলকে সংসদে বসে আইনি রূপ দেওয়া হয়েছে; আর দ্বিতীয়টা হলো সেইসব রূপান্তর, যেখানে সংসদীয় পথে বিদ্যমান কাঠামোর সংস্কার এসেছে।

পতন-পরবর্তী সংবিধানিক পুনর্গঠন

এটা মূলত ঐ ধরনের পরিবর্তন, যেখানে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গভীর সংকটে পড়ে কার্যত ভেঙে পড়ে। তারপর নতুন সংবিধান তৈরি করে সেটাকে আবার চালু করা হয়।

এই ভাঙন ও রূপান্তর সাধারণত ঘটে গণঅভ্যুত্থান, সশস্ত্র সংঘাত বা অভ্যন্তরীণ ধ্বসের পর। নির্বাচন বা সংসদ পরে এসে সেই অর্জনের ওপর আনুষ্ঠানিকতার সীলমোহর মারে।

গণআন্দোলনের আলোচনাতে দক্ষিণ আফ্রিকা, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া আর নেপালের কথা বলেছিলাম আমরা। এই সবগুলো ঘটনা এই ক্যাটাগরিতে পরে।

অনেকে এগুলোকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রূপান্তরের উদাহরণ হিসেবে দেখাতে চান। কিন্তু এখানে পরিবর্তন সংসদীয় রাজনীতির মাধ্যমে আসেনি। গণআন্দোলনের অর্জনকে নির্বাচন বা গণপরিষদ বৈধতা দিয়েছে কেবল।

একটু তলিয়ে দেখা যাক:

- **দক্ষিণ আফ্রিকা:** কয়েক দশকের তীব্র আন্দোলনের পর নেলসন ম্যান্ডেলার এএনসি এক পর্যায়ে বর্ণবাদী শাসকগোষ্ঠীকে আলোচনার টেবিলে আসতে বাধ্য করে। কয়েক বছরের আলোচনা শেষে ভোটের পর নতুন সংবিধান রচনা আর বর্ণবাদহীন নয়া রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা হয়। মনে রাখা দরকার, অহিংস গণআন্দোলনের পাশাপাশি এএনসি সশস্ত্র সংগ্রামও চালিয়েছিল। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ম্যান্ডেলা নিজেই ছিলেন এএনসির সশস্ত্র শাখার প্রতিষ্ঠাতা।

- **চেকোস্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরি:** ১৯৮৯ সালে তীব্র গণআন্দোলনের মুখে চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট সরকার ধ্বসে পড়ে। 'ভেলভেট রেভ্যুলুশন' নামে পরিচিত এই আন্দোলনের পরই সংসদ, শাসনব্যবস্থা আর সংবিধানের পুনর্গঠন হয়। হাঙ্গেরির ঘটনা প্রায় একই রকম। সেখানেও গণআন্দোলনের মুখে কমিউনিস্ট শাসনের পতন ঘটে এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ তৈরি হয়।
- **নেপাল:** গণপরিষদ ২০০৮ সালে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত ঘোষণা করে, ২০১৫ সালে আসে নতুন সংবিধান। কিন্তু এই পরিবর্তনের ভিত্তি ছিল ১৯৯৬ থেকে চলা এক দশকের মাওবাদী জনযুদ্ধ আর ২০০৬–এর এপ্রিলের গণঅভ্যুত্থান।

ওপরের প্রতিটা উদাহরণে একই ছক চোখে পড়ে।

শুরুটা হয় সংকট দিয়ে; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক। কোনো-না-কোনো গভীর সংকটে পুরোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা হোঁচট খায়। ভাঙন দেখা দেয়, তৈরি হয় তীব্র গণআন্দোলন ও অস্থিরতা। এক পর্যায়ে পুরোনো কাঠামো আর চলতে পারে না। ধস নামে।

তারপর সেই শূন্যতা পূরণে আসে অন্তর্বর্তী পর্যায়। শুরু হয় নতুন বন্দোবস্তের পালা। গণপরিষদ, গণভোট কিংবা নির্বাচন এসে এই পরিবর্তনকে একটি আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়।

অর্থাৎ আগের ব্যবস্থার পতন হয় গণআন্দোলনের মাধ্যমে। তারপর গণভোট, গণপরিষদ ইত্যাদি সেই পরিবর্তনকে আইনি বৈধতার সিল দেয়।

এখানে দুটো বিষয় পরিষ্কার থাকা জরুরি:

প্রথমত, পতন-পরবর্তী সাংবিধানিক পুনর্গঠন পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব না।

এখানে পুরোনো রাষ্ট্রকাঠামোকে উপড়ে ফেলে নতুন আদর্শের ওপর শাসনকে দাঁড় করানো হচ্ছে। গণআন্দোলনের ফলে তৈরি হওয়া শূন্যতাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক আইনি কাঠামোয় আবদ্ধ করার প্রয়াস চলছে।

দ্বিতীয়ত, সাংবিধানিক পুনর্গঠন পরিবর্তন আনার কোনো স্বতন্ত্র পদ্ধতি না। গণআন্দোলন পরিবর্তন আনে। সংসদ এসে কেবল সেটার স্বীকৃতি দেয়। সংসদীয় পথ নিজে পরিবর্তন আনতে পারে না।

এ কারণেই গণআন্দোলন যতটুকু এগোতে পারে, সংবিধান তারচেয়ে একচুলও বেশি দিতে পারে না। আন্দোলন যেখানে গিয়ে থামে, নতুন কাঠামোও ঠিক

ওখানেই আটকে যায়। এমনকি অনেক সময় দেখা যায়, সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার চক্রে পড়ে গণআন্দোলনের অর্জন পেছনের দিকে চলে গেছে।

সোজা কথায়, সংসদ বিপ্লবের স্বীকৃতি দিতে পারে, কিন্তু বিপ্লবের জন্ম দিতে পারে না।

রাষ্ট্র সংস্কার

এবার আসা যাক ঐ ধরনের পরিবর্তনের আলাপে, যা জন্ম নেয় সংসদীয় প্রক্রিয়ার ভেতরে থেকে। এখানে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে গণপরিষদ বা গণভোটের মাধ্যমে নতুন সংবিধান রচনা হয়।

বিদ্যমান কাঠামোর ভেতরে থেকেই রাষ্ট্রের কিছু পরিবর্তন হয়।

কাছাকাছি সময়ে এই ধরনের পরিবর্তনের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ দেখা যায় ভেনিজুয়েলার হুগো শাভেয, বলিভিয়ায় ইভো মোরালেস এবং ইকুয়েডরে রাফায়েল কোরেয়ার ক্ষেত্রে।

তিনজনই বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসে নতুন করে সংবিধান লিখেছেন। জাতীয় পরিচয়কে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছেন, নতুন অধিকার যোগ করেছেন সংবিধানে।[৬৬]

এই ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট ছক দেখা যায়:

প্রথমে গতানুগতিক রাজনীতির ওপর থেকে জনগণের ভরসা উঠে যায়। গণঅসন্তোষ, অর্থনৈতিক সংকট দানা বাঁধে।

তারপর আবির্ভাব ঘটে ক্যারিশম্যাটিক কোনো নেতার। তাকে ঘিরে তৈরি হয় বিপুল প্রত্যাশা, নির্বাচনে আসে ভূমিধস বিজয়। এরপর শুরু হয় নতুন সংবিধান লেখার কাজ।

এ সবই কিন্তু বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে ঘটে। জনগণের বিপুল সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্রের আইনি কাঠামোর মধ্যেই কিছু সংস্কার নিয়ে আসে।

---

[৬৬] এই তিন নেতার শাসন ও রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে বিস্তর সমালোচনা রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য তাদের দল, মত বা শাসনামলের ভালো-মন্দ বিচার করা না, বরং গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতর দিয়ে কীভাবে রাষ্ট্র সংস্কারের রূপরেখা টানা যায়, তার একটি ঐতিহাসিক রেফারেন্স হিসেবেই তাদের আলোচনা এখানে এসেছে।

এই ধারায় পরিবর্তনের মাত্রা পতন-পরবর্তী পুনর্গঠনের চেয়েও কম। রাষ্ট্রযন্ত্রের আসল খুঁটি—বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন, আমলাতন্ত্র, এমনকি নিরাপত্তা সংস্থাগুলো—প্রায় আগের মতোই থেকে যায়।

এগুলো রাষ্ট্র সংস্কারের উদাহরণ, বিপ্লবের না।

এটাই সংসদীয় পদ্ধতিতে পরিবর্তনের সর্বোচ্চ সীমা।

অর্থাৎ ইসলামপন্থীরা সংসদীয় পথে হাঁটলে সর্বোচ্চ রাষ্ট্র সংস্কার পর্যন্ত যেতে পারবে। খুব বেশি হলে পাকিস্তানের মতো একটা সংবিধান জুটবে। যেখানে কাগজে-কলমে ইসলামের প্রচুর বুলি থাকবে, কিন্তু বাস্তবে শাসন চলবে ফিরিঙ্গি আইনে। কলকাঠি নাড়বে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র, পশ্চিমা প্রেসক্রিপশান আর সর্বগ্রাসী সেনাবাহিনী। যেখানে আল্লাহর দ্বীন এবং আইনের অবস্থান সর্বোচ্চ না।[৬৭]

এই পথে রাষ্ট্র ও শাসনকাঠামোর আমূল পরিবর্তন আশা করা আর মরীচিকার পেছনে ছোটা একই কথা।

[৬৭] পাকিস্তানের সংবিধানে অনেক ইসলামী বিষয় আছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঘোষণা আছে, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেওয়া আছে, কাউন্সিল অফ ইসলামিক আইডিওলজি (CII)-এর মতো প্রতিষ্ঠানও আছে। আছে ফেডারেল শরীয়াহ কোর্ট-ও। রাষ্ট্রের নামও ইসলামী জুমহুরিয়াহ, ইসলামী রিপাবলিক। কিন্তু দেশের আইনি ব্যবস্থা ব্রিটিশ কমন ল'র ভিত্তি ও কাঠামোতেই গড়া। কাগজে-কলমে শরীয়াহ কোর্ট (FSC) কোনো আইনকে ইসলামবিরোধী ঘোষণা করার ক্ষমতা রাখে। তবে ফেডারেল কোর্টের রায়ের ব্যাপারে আবার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায়। CII শুধু পরামর্শ দিতে পারে। বাস্তবে দেখা যায়, সেক্যুলার আদালত বা আইনপ্রণয়নকারী সংস্থাগুলো নিয়মিত ইসলামী বিধিবিধানকে পাশ কাটিয়ে যায় বা অগ্রাহ্য করে। বিশেষ করে ওইসব ক্ষেত্রে, যেখানে ইসলামী অবস্থান মৌলিক অর্থনৈতিক বা আইনি স্বার্থে আঘাত হানে। ইসলামী সংস্কার প্রস্তাবগুলো বছরের পর বছর ধরে আটকে থাকে, অথবা বাস্তবায়ন হয় নামকাওয়াস্তে। কাগজে-কলমে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের কথা আছে, কিন্তু ইসলামের ওপর ছড়ি ঘোরায় সেক্যুলার আইন, সেক্যুলার কর্তৃপক্ষ। এটা কোনো অর্থেই প্রকৃত ইসলামী শাসন না। নূন্যতম বিবেচনাসম্পন্ন কোনো মানুষ—সেক্যুলার কিংবা মুসলিম—পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে ভাবে না, এটা ইসলামী শাসন।

ব্রিটিশ কমন ল'-এর কাঠামোর ভেতরে ইসলামী আইন কীভাবে তার কার্যকারিতা হারায়, তার বিশ্লেষণের জন্য দেখুন: Martin Lau, The Role of Islam in the Legal System of Pakistan (Brill, 2006); এবং Matthew J. Nelson, In the Shadow of Shariʿah: Islam, Islamic Law, and Democracy in Pakistan (Columbia University Press, 2011)। সেক্যুলার আদালত কীভাবে ইসলামী বিধান পাশ কাটিয়ে যায় এবং সংস্কার প্রস্তাবগুলো আটকে থাকে, তার প্রায়োগিক প্রমাণের জন্য দেখুন: Tahir Wasti, The Application of Islamic Criminal Law in Pakistan (Brill, 2009); এবং Charles H. Kennedy, "Islamization and Legal Reform in Pakistan, 1979–1989," Pacific Affairs 63, no. 1 (1990): 62–77। পাকিস্তান রাষ্ট্রের 'ইসলামী' পরিচয় এবং রাষ্ট্রের সেক্যুলার বাস্তবতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব বুঝতে দেখুন: Farzana Shaikh, Making Sense of Pakistan (Columbia University Press, 2009)।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ইসলামপন্থীদের সংকট

ইসলামী দলগুলো যদি গণতান্ত্রিক পথেই হাঁটে, তাহলে তারা সর্বোচ্চ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে রাষ্ট্র সংস্কার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। তবে রাষ্ট্র সংস্কারের সীমিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গেলেও তাদের আগে বেশ কিছু কঠিন শর্ত পূরণ করতে হবে। এখানেও কিছু শক্ত জটিলতা আছে।

সাংগঠনিক বাস্তবতা ও জনসমর্থন

বাংলাদেশের কওমি মাদরাসাকেন্দ্রিক দলগুলো নির্বাচন করে অল্প কিছু আসনের লক্ষ্য নিয়ে। অন্যদিকে, সবচেয়ে পুরোনো দল জামায়াতে ইসলামী সুসংগঠিত হলেও, ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন। এই ধরনের কাঠামো ব্যাপক জনসম্পৃক্ততা ও নির্বাচনী রাজনীতির জন্য অনুপযুক্ত। যারা এসব দল সমর্থন করেন, তারা অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা মোট জনগোষ্ঠীর একটা ক্ষুদ্র অংশ।

ফলে বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলোর নির্বাচনী রাজনীতি অনেকটা কোটা বা ভোটব্যাংকের রাজনীতির মতো কাজ করে। কাঠামোগত কারণেই এদের পক্ষে ম্যাস পলিটিকাল পার্টিগুলোর মতো সমাজব্যাপী নির্বাচনী জনস্রোত তৈরি করা দুরূহ, যা দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাবার পূর্বশর্ত।

তাই দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেতে হলে এই দলগুলোর সাংগঠিক কাঠামো এবং রাজনীতির মডেলটা পাল্টাতে হবে।

নেতৃত্ব

ল্যাটিন অ্যামেরিকার দেশগুলোর উদাহরণ থেকে দেখা যায়, এ-ধরনের সংস্কারের জন্য ক্যারিশম্যাটিক নেতা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এমন কেউ, যিনি অন্তত মানুষের চোখে প্রথাবিরোধী হবেন। মানুষ মনে করবে তিনি ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। যিনি সমাজজুড়ে—কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভেতরে না—বিপুল জনসমর্থন তৈরি করতে পারবেন এবং সেই জনসমর্থনকে পরিচালিত করতে পারবেন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যে।

ইসলামী দলগুলো এমন কোনো নেতা তৈরি করতে পারেনি। অদূর ভবিষ্যতেও পারার সম্ভাবনা কম।

তাছাড়া নিজস্ব গণ্ডির বাইরে দলগুলো এমন কোনো ভিশন বা প্রতিশ্রুতির ভাষা তৈরি করতে পারেনি, যা সাধারণ মানুষকে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখাবে।

স্পষ্ট রূপরেখা

আরেকটা বড় সমস্যা হলো স্পষ্ট রূপরেখার অভাব। ল্যাটিন অ্যামেরিকায় যারা রাষ্ট্র সংস্কার করেছেন, তাদের নির্বাচনী প্রচারণার কেন্দ্রবিন্দুই ছিল নতুন সংবিধান অথবা নয়া রিপাবলিক।

হুগো শাভেয সরাসরি নয়া রিপাবলিক গড়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। তার দলের নামই ছিল পঞ্চম রিপাবলিক আন্দোলন। ইভো মোরালেস আর রাফায়েল কোরেয়া ঘোষণা দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় গেলে গণপরিষদ হবে, নতুন করে লেখা হবে সংবিধান।

জনগণের সামনে তারা একটা পরিষ্কার রোডম্যাপ আর পরিকল্পনা তুলে ধরেছিলেন। সেই ম্যান্ডেট নিয়েই তারা ক্ষমতায় গেছেন আর রাষ্ট্র সংস্কারে হাত দিয়েছেন। এ-ধরনের রূপান্তরের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করতে হলে উদ্দেশ্য ও পথ দুটোই স্পষ্টভাবে বলতে হয়।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলোর মধ্যে এই ধরনের স্পষ্টতা পাওয়া যায় না। এই ঘাটতির ফলে তাদের রাজনীতি আস্তে আস্তে সীমিত সংস্কার, বুলিসর্বস্ব বক্তব্য আর প্রতীকী অবস্থানের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়ছে।

নির্বাচনী রাজনীতির অর্থনীতি

বাংলাদেশে এমপি ইলেকশন করতে হলে কম করে হলেও কয়েক কোটি টাকা লাগে। এলাকাভেদে এই টাকার পরিমাণ ঠেকতে পারে ১৫-২০ কোটিতেও। বিপুল এই খরচ এড়িয়ে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জেতা অসম্ভব।

এ কারণেই চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, মাদক ব্যবসা বা জমি দখল বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বড় দলগুলো অপরাধীদের পোষে, তার কারণ হলো এরাই তাদের নির্বাচনী যন্ত্রের জ্বালানি।

টাকা আর পেশীশক্তির এই রাজনীতির মোকাবিলা ইসলামী দলগুলো কীভাবে করবে?

চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, মাদক, দখল—এসব কাজ ইসলামী দলগুলো করতে পারবে না। যদি কোনো দল এমন করে ফেলে, তাহলে সমর্থকরা তাদের ছেড়ে যাবে।

কিছু মানুষ হয়তো হালাল পথে এই পরিমাণ টাকা কামাতে পারে। কিন্তু ৩০০ আসনে, বা অন্তত ২০০ আসনে এমন লোক কি খুঁজে পাওয়া যাবে, যারা হালাল পথে ১৫-২০ কোটি টাকা আয় করেছে, সেই টাকা নির্বাচনের পেছনে উড়াতে রাজি আছে আর দলের আদর্শের সাথেও তারা একমত?

তাও সেটা আবার প্রতি পাঁচ বছর পর পর?

প্রেক্ষাপটের ফারাক

ল্যাটিন অ্যামেরিকার দেশগুলোতে এমন কিছু ঐতিহাসিক বা কাঠামোগত বাস্তবতা ছিল, যা বাংলাদেশের সাথে মেলে না।

ইকুয়েডর এবং বলিভিয়ার ক্ষেত্রে জাতিগত সংকট ছিল। সেখানে সংখ্যাগুরু জনগণ আদিবাসী, অথচ ক্ষমতার চাবি ছিল সংখ্যালঘু এলিটদের হাতে। এই ক্ষোভকে মোরালেস আর কোরেয়া কাজে লাগিয়েছিলেন।

অন্যদিকে ভেনিজুয়েলার সামরিক বাহিনীর একাংশ দীর্ঘদিন ধরে দেশের রাজনীতি নিয়ে ক্ষেপে ছিল। শাভেজ নিজে সাবেক সামরিক অফিসার হওয়ায় তিনি জানতেন কোথায় আঘাত করতে হবে। তার ব্যর্থ ক্যু-এর অতীতও তাঁকে একটা হিরো ইমেজ দিয়েছিল।[৬৮]

বাংলাদেশে এই বিষয়গুলো অনুপস্থিত। এখানকার সমাজ বা রাজনীতিতে এমন কোনো বড় ফাটল বা 'ফল্ট লাইন' নেই, যা ইসলামী দলগুলো ব্যবহার করতে পেরেছে।

সময়ের ফাঁদ

এগুলোর চেয়েও বড় সমস্যা হলো সময়। এই সিস্টেমের ভেতর আপনি যত বেশি সময় কাটাবেন, আপনার আদর্শিক ধার তত কমবে। এটা অনেকটা স্লো পয়যনিংয়ের মতো।

[৬৮] ১৯৯২ সালে হুগো শাভেজ তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে একটি ক্যু বা সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেন। সেটি ব্যর্থ হলেও এই ঘটনা তাঁকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলে এবং পরবর্তীতে নির্বাচনের পথ সুগম করে।

বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোর দিকে তাকালেই এটা স্পষ্ট হয়। তারা যত বেশি সময় এই ব্যবস্থায় থাকছে, ততই বিদ্যমান ব্যবস্থা ভেঙে ইসলাম কায়েমের চিন্তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এর বাইরে ইসলামের ব্যাপারে তাদের নানা ধরনের বিচ্যুতি ও শিথিলতা তো আছেই।

ল্যাটিন আমেরিকায় যারা রাষ্ট্র সংস্কারে সফল হয়েছেন, খেয়াল করলে দেখবেন, তারা দশকের পর দশক নির্বাচনী রাজনীতি করেনি। তারা তুলনামূলক দ্রুত সময়ের মধ্যে ক্ষমতায় এসেছে। আর দ্রুত এসেছে বলেই কিছু র‍্যাডিকাল বৈশিষ্ট্য তারা ধরে রাখতে পেরেছিল।

গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের সময়কাল আর বিপ্লবী ধার কমে যাওয়া, একে অপরের সমানুপাতিক। এটা এমন একটা বৈশিষ্ট্য, যা আদর্শভেদে বামপন্থী, ডানপন্থী, ইসলামপন্থী সবার মধ্যে দেখা যায়।[৬৯]

ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ইসলামী দলগুলো যত সময় কাটাবে, তত তাদের সংস্কারের ইচ্ছা ও সামর্থ্য কমতে থাকবে।

ক্ষমতায় আসার পর কী?

বাংলাদেশে কোনো ইসলামী দল বা ইসলামী দলগুলোর কোনো জোট দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জিতবে, এটা আপাতত অসম্ভাব্য। কিন্তু যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই কোনো ইসলামপন্থী দল বা জোট ভূমিধস বিজয় পেল, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেল; তারপর কী?

নির্বাচনী পথে রাষ্ট্র সংস্কারের প্রজেক্ট সবসময় কাজ করে না। এখানে সামান্য কিছু সাফল্যের নজির যেমন আছে, তেমনি আছে ব্যর্থতার লম্বা ইতিহাস।

ডিপ স্টেইটের ক্যু: ১৯৭০ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে লাতিন আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম সমাজতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট হলেন সালভাদর আলেন্দে। এসেই শ্রমিক অধিকার, জাতীয়করণ, সামাজিক সুরক্ষার মতো সংস্কারে হাত দিলেন।

---

[৬৯] ডানপন্থী, বামপন্থী কিংবা ইসলামপন্থী, যেকোনো অ্যান্টি-সিস্টেম দল কীভাবে দীর্ঘ সময় নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নিলে তাদের আদর্শিক ধার হারিয়ে ফেলে, তার বিস্তারিত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য দেখুন: Adam Przeworski, *Capitalism and Social Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985); Tjitske Akkerman, Sarah L. de Lange, and Matthijs Rooduijn, *Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe: Into the Mainstream?* (London: Routledge, 2016); Jillian Schwedler, *Faith in Moderation: Islamist Parties in Jordan and Yemen* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল দেশের ডিপ স্টেইট। সামরিক বাহিনী, বিচারব্যবস্থা, কর্পোরেট মিডিয়া আর বিদেশি শক্তিগুলো আলেন্দেকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল। শেষমেশ ১৯৭৩-এ জেনারেল পিনোশের সামরিক অভ্যুত্থানে আলেন্দে ক্ষমতাচ্যুত হলেন। এই ক্যু-কে সরাসরি সমর্থন করল অ্যামেরিকা।

এমন দৃষ্টান্ত আছে মুসলিম বিশ্বেও।

আলজেরিয়া ১৯৯২: ১৯৯২ সালে আলজেরিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট (FIS) সংসদীয় নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডে ৪৭.৩% ভোট পায়। ২৩১ আসনের মধ্যে ১৮৮টিই তাদের জেতার কথা। কিন্তু নির্বাচনের দ্বিতীয় রাউন্ডের ১০ দিন আগে সেনাবাহিনী নির্বাচন বাতিল করে দিল। নিষিদ্ধ ঘোষণা করল FIS-কে। এরপর শুরু হলো এক দশকের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ, যেখানে প্রাণ হারাল প্রায় দুই লাখ মানুষ।

তিউনিসিয়া ২০১১: আরব বসন্তের সময় বেন আলীর পতন হলো। নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোট পেল আন-নাহদা পার্টি, কিন্তু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না।

ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তারা সমঝোতা করল সেক্যুলার লিবারেলদের সাথে। নিজেদের ইসলামী এজেন্ডা আর পরিচয় বিসর্জন দিল। এই আদর্শিক আপস তাদেরকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেল, যেখানে অর্থবহ ইসলামী সংস্কার করা তো দূরের কথা, এমন চিন্তা করাও তাদের জন্য অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। ২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট কায়েস সাইদ ক্যু করে ক্ষমতা দখল করল। পার্লামেন্ট ভেঙে দিল। ২০২৩ সালে আন-নাহদার ৮১ বছরের বৃদ্ধ নেতা রশীদ ঘান্নুশিকে যেতে হলো জেলে।

মিশর ২০১২: মিশরেও আরব বসন্তের জোয়ারে ইসলামপন্থীদের জোট ক্ষমতায় এলো। প্রেসিডেন্ট হলেন মোহাম্মদ মুরসি। তিনি চেয়েছিলেন বিদ্যমান সেক্যুলার কাঠামোর ভেতরে থেকেই কিছু সংস্কার করতে।

কিন্তু সেনাবাহিনী, বিচার বিভাগ, মিডিয়া এবং দেশের সেক্যুলার-প্রগতিশীল শক্তিগুলো একজোট হয়ে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিল। কায়রোর রাবা স্কয়ারে এক দিনেই হত্যা করল ১৪০০ জনের বেশি মানুষকে। এই রক্তাক্ত ক্যু আর ম্যাসাকারকে সমর্থন দিল যুক্তরাষ্ট্র আর উপসাগরীয় দেশগুলো। আল-নূর পার্টির মতো সালাফি দলগুলোও পরে সেনাবাহিনীর পাশে দাঁড়াল।

এ নির্বাচনে ইসলামপন্থীদের দুটো জোট সব মিলিয়ে প্রায় ৭০% ভোট পেয়েছিল।[৭০]

[৭০] মুসলিম ব্রাদারহুডের ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টির নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক জোট পায় ৪৭.২% ভোট। আন-নূরের নেতৃত্বাধীন ইসলামিক ব্লক পায় ২৪.৭% ভোট।

তারপরও পশ্চিমা সমর্থিত ডিপ স্টেইটের ক্যু এক ধাক্কায় আরব বসন্তের অর্জন ধুলোয় মিশিয়ে দিল।

কাজেই নির্বাচনের মাধ্যমে সাংবিধানিক সংস্কারের চেষ্টা হলেও পশ্চিমা বিশ্ব এবং তাদের অনুগত ডিপ স্টেইট যেকোনো মুহূর্তে সেই ছক উল্টে দিতে পারে। পশ্চিমা বিশ্ব বলে, তারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রতি চরম শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যদি এমন কেউ ক্ষমতায় আসে, যারা তাদের স্বার্থের জন্য হুমকি, তখন তারা তাদের দমাতে উঠেপড়ে লেগে যায়।

কোনো ইসলামপন্থী দল বা জোট যদি কোনোমতে মুরসি বা আলেন্দের মতো পরিণতি এড়াতেও পারে, তখন তাদের মুখোমুখি হতে হবে আরেকটা দেয়ালের। আধুনিক সাংবিধানিক ভাষায় যাকে বলা হয় 'বেইসিক স্ট্রাকচার ডকট্রিন' (Basic Structure Doctrine) বা সংবিধানের মৌলিক কাঠামো নীতি। এই নীতি অনুযায়ী, সংবিধানের কিছু মৌলিক বা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য আছে, যা সংসদ চাইলেই পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে না।[৭১]

ফলে, কোনো ইসলামপন্থী দল সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য নিয়ে শরীয়াহভিত্তিক কোনো মৌলিক সংশোধন আনতে চাইলে, বিচার বিভাগ একে বেইসিক স্ট্রাকচার-এর পরিপন্থী ঘোষণা করে বাতিল করার এবং অসাংবিধানিক ও অবৈধ ঘোষণা করার পূর্ণ আইনি বৈধতা রাখে।

যদি কোনো অলৌকিক উপায়ে এই আইনি দেয়ালও ভেঙে ফেলা যায়, তবু শেষ রক্ষা হবে না। সংসদীয় ব্যবস্থায় পরের নির্বাচনে অন্য কোনো শক্তি ক্ষমতায় এসে একই কায়দায় সেই অর্জনকে বাতিল করে দিতে পারবে।

অর্থাৎ, গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতরের এই পুরো প্রকল্প বালির বাঁধের মতোই ক্ষণস্থায়ী।

নিয়মতান্ত্রিকতার সীমা: গণঅভ্যুত্থান ২০২৪

নিয়মতান্ত্রিকতার সীমাবদ্ধতার একটা ভালো উদাহরণ ২০২৪-এর জুলাই গণঅভ্যুত্থান।

---

[৭১] ১৯৭৩ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট *Kesavananda Bharati v. State of Kerala* (AIR 1973 SC 1461) মামলায় প্রথম এই নীতি প্রবর্তন করে। বাংলাদেশে এই নীতি সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে গ্রহণ ও প্রয়োগ করা হয় *Anwar Hossain Chowdhury v. Bangladesh* (1989 BLD (Spl) 1) — অষ্টম সংশোধনী মামলায়।

সরকার পতনের পর প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ পালিয়ে যায়, কিছু অংশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। বিপুল জনসমর্থন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসে। গণঅভ্যুত্থান সাংবিধানিক পুনর্গঠনের সুযোগ এনে দেয়।

অভ্যুত্থানের পক্ষের শক্তিদের সবচেয়ে সক্রিয় অংশটা গণপরিষদ গঠনের কথা বলে। বলে ১৯৭২-এর সংবিধানের কাঠামো থেকে বের হয়ে নতুন সংবিধান আর নয়া রিপাবলিক গড়ার কথা।

কিন্তু এটুকু কাজও সরকার করতে পারে না। বাধা হয়ে দাঁড়ায় ডিপ স্টেইট, বিশেষ করে সেনাবাহিনী এবং দেশের পুরোনো রাজনৈতিক শক্তিগুলো। শেষমেষ গণঅভ্যুত্থানের সব সম্ভাবনা গিয়ে ঠেকে অল্প কিছু সংস্কার কমিশনে। সেই সংস্কারও ল্যাটিন অ্যামেরিকার দেশগুলোর মতো কিছু হবে না, তা নিশ্চিত।

লক্ষ্য করুন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর কেউ কিন্তু সেক্যুলার রাষ্ট্রের কাঠামো থেকে বের হয়ে ইসলামী শাসন কায়েমের কথা বলেনি। লিবারেল-গণতান্ত্রিক ধারাতে থেকেই নতুন সংবিধান আর রিপাবলিকের কথা এসেছে। সেটাও হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে, প্রধান বিচারপতিকে একরকম ঘাড় ধরে নামানো হয়েছে। এমন একটা ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের পর যে কাজ করা সম্ভব হয়নি, সেটা স্রেফ নির্বাচনে জেতার পর হয়ে যাবে?

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা সরকার সেক্যুলার কাঠামোর ভেতরেই নয়া রিপাবলিক দূরের কথা, রাষ্ট্র সংস্কারও করতে পারল না। আর শুধু সংসদে গিয়ে সেক্যুলার রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বানিয়ে ফেলা যাবে?

এ-ধরনের আকাশকুসুম কল্পনা, ইসলামী বা সেক্যুলার, কোনো ধারারই কোনো সিরিয়াস চিন্তাবিদের জন্য শোভনীয় না।

***

রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলোর ইতিহাস আমাদের সামনে তিনটি সত্য স্পষ্ট করে:

প্রথমত, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বোচ্চ রাষ্ট্র সংস্কার সম্ভব। পুরোনো কাঠামোর ভেতরে থেকেই কিছু পরিবর্তন। যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল চরিত্র অপরিবর্তিত থাকে।

দ্বিতীয়ত, সাংবিধানিক পথে পুনর্গঠন সম্ভব, কিন্তু গণআন্দোলনের পর। সংসদীয় পদ্ধতি নিজে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারে না। সে কেবল আন্দোলনের অর্জনে আনুষ্ঠানিকতার সীলমোহর মারে।

তৃতীয়ত, পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব সবসময় নিয়মতান্ত্রিকতার কাঠামোর বাইরে ঘটেছে। গণঅভ্যুত্থান, সশস্ত্র সংগ্রাম, জনযুদ্ধ—এভাবেই বৈপ্লবিক রূপান্তর এসেছে।

গণতন্ত্র পরিবর্তনের পথ না, বিদ্যমানতা টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা। এই পথে সেক্যুলার রাষ্ট্রের যেটুকু সংস্কার হবে, তা দিয়ে ইসলামী শাসন কায়েম করা অসম্ভব।

ইসলামী শাসনের জন্য প্রয়োজন সেক্যুলার কাঠামোকে পুরোপুরি উপড়ে ফেলা এবং তাওহীদের ভিত্তিতে নতুন রাজনৈতিক সত্তা নির্মাণ। তাই বাংলাদেশকে মুসলিমবঙ্গ হয়ে ওঠতে হলে গণআন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবই একমাত্র সমাধান।

এই বাস্তবতা মেনে নেওয়া ছাড়া ইসলামপন্থীদের সামনে আর কোনো পথ নেই।

এমন কোনো রাষ্ট্র হয় না, যার মৌলিক দর্শন প্রতি পাঁচ বছর পরপর বদলায়। পাঁচ বছর লিবারেল ডেমোক্রেসি, তারপর পাঁচ বছর সমাজতন্ত্র, তারপর পাঁচ বছর ইসলামী শাসন—এভাবে কোনো রাষ্ট্র চলে না, চলতে পারে না। কোনো ব্যবস্থা বা সিস্টেম—যার নিজস্ব আদর্শিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে—কখনোই স্বেচ্ছায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো সিস্টেমের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না। ইতিহাসে এমন কোনো নজির নেই।

দুটো সাংঘর্ষিক বিষয়ে কখনো সহাবস্থান হয় না। কোনো একটার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এদের মধ্যে অবিরাম সংঘাত চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কোনো এক পক্ষ অন্য পক্ষকে দমন করে নিজ কর্তৃত্ব কায়েম করে।

তাই কেবল শাসক বা সংবিধান বদলে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। এক শাসনব্যবস্থাকে উৎখাত করে সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তির ওপর আরেকটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে বৈপ্লবিক রূপান্তর অপরিহার্য।

যারা এখনো মনে করেন, নির্বাচনে জিতে সংসদে গিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা যাবে, তারা হয় ইতিহাস পড়েননি অথবা জেনে-বুঝে নিজের সাথে প্রতারণা করছেন।

নিপুণ বশীকরণ

অনেকে হয়তো বলবেন—মানলাম সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিপ্লব হবে না। কিন্তু এর কিছু উপকারিতা তো আছে? এভাবে কিছু সংস্কার করা যায়, প্রভাব বাড়ে, রাজনীতির মাঠে টিকে থাকা যায়। কেউ যদি এসব উদ্দেশ্য নিয়ে এ পথে হাঁটে, তাতে কী সমস্যা?

এর উত্তরে আমাদের প্রথম কথা হলো, আমরা গণতন্ত্রের ব্যাপারে আকীদাহর জায়গা থেকে আপত্তির কথা মনে করিয়ে দেবো। আর দ্বিতীয়ত, এসব আপাত সুবিধার লোভই দিনশেষে বিপ্লবী আন্দোলনগুলোকে বিপথগামী করে।

নির্বাচনী রাজনীতির পথ বেছে নেওয়াটা শুধু কৌশলগত ভুল না, এটা এমন এক বিপজ্জনক বিভ্রান্তি, যা বিপ্লবী আন্দোলনকে তার মূল লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়।

পোষ মানানো বিপ্লবী

নির্বাচনী গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ বিপ্লবী আন্দোলনকে গৃহপালিত বানিয়ে ফেলে। নির্বাচন আর সংসদের রাস্তায় ওঠলে আন্দোলনগুলো প্রচলিত কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস হারিয়ে ফেলে। এ পথে আপাতদৃষ্টিতে কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, কিন্তু বিনিময়ে এই সিস্টেম আন্দোলকে তার অধীনস্ত করে ফেলে, শুষে নেয় তার বৈপ্লবিক রূপান্তরের সম্ভাবনা।

নির্বাচনী পদ্ধতি যারাই গ্রহণ করে নিয়েছে, এক পর্যায়ে তারা সবাই আবিষ্কার করেছে, এই পথ তাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করেছে। আপসে বাধ্য করেছে। বিপ্লবের বদলে তাদের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ভোটের লাভ-ক্ষতির হিসাব।

এটা নির্বাচনী গণতন্ত্রের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য। দুনিয়াজুড়ে বাম হোক বা ডান, এ ব্যাপারে সবার অভিজ্ঞতাই এক।

জার্মান ডানপন্থী আইনজ্ঞ কার্ল শ্মিট যেমনটা পর্যবেক্ষণ করেছেন, আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্র যেকোনো বৃহৎ সামষ্টিক প্রকল্প বা আদর্শকে ভোঁতা এবং শেষমেশ স্রেফ হাস্যকর বস্তুতে পরিণত করে।[৭২] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালিয়ান

[৭২] কার্ল শ্মিটের অবস্থানের বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য দেখুন টম সুনিচ-এর প্রবন্ধ: Tom Sunic, "Liberalism or Democracy? Carl Schmitt and Apolitical Democracy," *This World*, vol. 28 (1993)

ফ্যাসিস্টদের সমালোচনা করতে গিয়ে জুলিয়াস ইভোলা বলেছিলেন, ভোটের রাজনীতিতে গিয়ে তারা প্রকৃত চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে।[৭৩] ব্রিটিশ ফ্যাসিস্ট ওসওয়াল্ড মোসলির সোজাসাপ্টা কথা ছিল, 'ওই জং ধরা, ভাঙাচোরা পার্লামেন্ট দিয়ে কিচ্ছু হবে না।'[৭৪]

একই সুর শোনা যায় বামপন্থীদের মুখেও।

জার্মান সোশালিস্ট নেত্রী রোসা লুক্সেমবার্গ বামপন্থীদের সতর্ক করেছিলেন, 'নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ঢোকার অর্থ বিপ্লবকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিদ্যমান ব্যবস্থার ছিটেফোঁটা সংস্কারে সন্তুষ্ট থাকা।'[৭৫] বিখ্যাত ইটালিয়ান নিও-মার্ক্সিস্ট অ্যান্টনিও গ্র্যামশি বলেছেন, 'সংসদে কয়েকটা সিট দিয়ে এলিট শ্রেণি বিপ্লবী আন্দোলনগুলোকে লক্ষ্যচ্যুত করে দেয়।'[৭৬]

অ্যামেরিকান ক্রিটিকাল থিওরিস্ট হার্বার্ট মারকিউসার মতে লিবারেল-গণতন্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তি শুষে নেয়, গতিপথ বদলে দেয়, আর দাঁত উপড়ে ফেলে।[৭৭] অ্যামেরিকার বামপন্থীদের মধ্যে একটা কথা খুব চালু আছে, 'ডেমোক্রেট পার্টি হলো সামাজিক আন্দোলনগুলোর গোরস্থান।'[৭৮]

একবার সংসদীয় পথে পা রাখলে সবচেয়ে শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলনগুলোরও মৃত্যু ঘটে।

রাষ্ট্র যখন বিপ্লবীদের জয় করে

সংসদের রাস্তা কীভাবে বিপ্লবী আন্দোলনকে বশ মানায়, তা নিয়ে সবচেয়ে মোক্ষম কথা বলেছেন সমাজবিজ্ঞানের জনক বলে খ্যাত ম্যাক্স ওয়েবার। ওয়েবার সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের ব্যাপারে বলেছিলেন, 'যদি সোশালিস্টরা কখনো রাষ্ট্রযন্ত্রের অংশ হয়, তাহলে সোশ্যাল ডেমোক্রেসি শহর আর রাষ্ট্র জয়

---

[৭৩] Julius Evola, "Some Thoughts on Electoral Politics," trans. John Bruce Leonard, *Arktos*, September 10, 2023

[৭৪] Oswald Mosley, *A National Policy* (London: Macmillan, 1931); H. Hardcastle, "The Mosley Party. Old Fallacies Re-Furbished," *Labour Monthly* (1931)

[৭৫] Rosa Luxemburg, *Reform or Revolution* (1899)

[৭৬] Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (International Publishers, 1971)

[৭৭] Herbert Marcuse, *One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society* (Boston: Beacon Press, 1964)

[৭৮] "The Democratic Convention Aims for the Center and Spurns Progressives," *Truthout*, August 20, 2020

করে নিয়েছে, এমনটা হবে না। উল্টো দেখা যাবে, রাষ্ট্রই তাদেরকে জয় করে নিয়েছে।'[৭৯]

ডান, বাম, ফ্যাসিস্ট, মার্ক্সিস্ট—সবাই এখানে একমত: নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ঢোকা মানেই হলো আন্দোলনের ফোকাস, আদর্শ আর গতি বিসর্জন দেওয়া।

আমরা পশ্চিমা বাম ও ডানপন্থী এই তাত্ত্বিকদের রাজনৈতিক আদর্শ ও প্রকল্পগুলো প্রত্যাখ্যান করি। তবে তাদের এই পর্যবেক্ষণগুলো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, সংসদীয় পথ কীভাবে যুগে যুগে বিপ্লবী শক্তিকে নিঃশেষ করে গৃহপালিত বানিয়েছে।

সিস্টেমের ভেতরে ঢুকে সিস্টেম বদলানো যায় না। সিস্টেম তার জায়গায় অনড় থাকে। যারা সিস্টেমের ভেতরে ঢোকে, তারাই বদলে যায়।

এর বহু উদাহরণ আছে।

সংসদীয় পাহারাদার

জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্রেট পার্টি (SPD) একসময় পুঁজিবাদ উৎখাতের কথা বলত। কিন্তু তারা সংসদে যাবার পর ম্যাক্স ওয়েবারের কথাই সত্য প্রমাণিত হলো। তারা বনে গেল পুঁজিবাদের পাহারাদার।

১৯১৮ এর নভেম্বরে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে জার্মানিতে শ্রমিক ও সৈনিকরা বিদ্রোহ করে। কায়যার পালিয়ে যায়। রাষ্ট্রযন্ত্র টলে ওঠে। স্পার্টাসিস্ট লীগের নেতৃত্বে ১৯১৯-এর জানুয়ারিতে শ্রমিকরা বার্লিনের রাস্তায় নামে, পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দাবিতে।

ক্ষমতায় থাকা সোশ্যাল ডেমোক্রেটরা তখন কী করল? বিপ্লবীদের সমর্থন দেওয়া তো দূরের কথা, তারা উল্টো বিদ্রোহ দমন করতে সামরিক বাহিনী ও আর কট্টর ডানপন্থী ফ্রিকর্পসকে লেলিয়ে দিল। যারা একদিন বিপ্লবের বুলি আওড়াত, সংসদে যাওয়ার পর তারাই বিপ্লবীদের রক্ত ঝরাল।

ফ্রান্স ও ইটালির কমিউনিস্ট দলগুলো একসময় বিপ্লবের স্বপ্ন ফেরি করত। কিন্তু নির্বাচনী রাজনীতিতে ঢোকার পর তারা ধীরে ধীরে জোট রাজনীতির অংশ হয়ে পড়ল। বিপ্লবের স্বপ্ন বাদ দিল, আপস করল আদর্শেও। নির্বাচন তাদের পোষ

---

[৭৯] Max Weber, "Address to the Verein für Sozialpolitik," in *Schriften des Vereins für Sozialpolitik*, vol. 125 (1908), 296–97, quoted in Schorske, *German Social Democracy, 1905–1917*.

মানিয়ে ফেলল।[৮০]

পশ্চিমা বিশ্বে যেসব বামপন্থী দল সংসদীয় রাজনীতিতে ঢুকেছে, তাদের প্রায় সবাই সেই ব্যবস্থার স্থায়ী অংশে পরিণত হয়েছে, যে ব্যবস্থাকে তারা একসময় ধ্বংস করার কথা বলত।[৮১]

মুসলিম বিশ্বের ইসলামপন্থীদের পরিণতিও আলাদা না। দশকের পর দশক তারা নির্বাচনী রাজনীতির পেছনে কুরবানি করেছে, কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। কোনো দেশে ইসলামী শাসন তো আসেইনি, উল্টো তাদের নিজেদের আদর্শ আর পথ বদলে গেছে।

যে দলগুলো একদিন ইসলামী শাসনের স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, তাদের মুখে এখন গণতন্ত্র, মানবাধিকার আর কল্যাণরাষ্ট্রের বুলি। যারা আগে সংবিধানকে কুফরি দলিল বলত, তারাই পরে সেই সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়েছে, এর আনুগত্য ঘোষণা করেছে।

বিপ্লবের জায়গা দখল করেছে সংস্কারবাদ। এমনকি যারা এখনো বৈপ্লবিক রূপান্তর চায়, তাদের দমানোর জন্য বিদ্যমান সিস্টেমের সহযোগী হিসেবে মাঠে নেমেছে এককালের বিপ্লবীরাই।

বিপ্লবী শক্তি পোষ মানানোর এই ব্যাপারটা গণতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এটা এমন এক অদ্ভুত যন্ত্র, যার একদিকে বিপ্লবী ঢুকে, অন্যদিকে বের হয় সংস্কারবাদী। কোনো আন্দোলন এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যত বেশি সময় থাকে, তার বিপ্লবী চরিত্র তত নষ্ট হতে থাকে। একপর্যায়ে বিপ্লব পরিণত হয় কেবল ফাঁকা বুলি আর বিমূর্ত আলাপে।

যেসব সুবিধার লোভে আন্দোলনগুলো এই পথে পা বাড়ায়, তার দাম দিতে হয় আন্দোলনের রূহকে বিক্রি করে।

এই পরিণতি এড়ানোর একমাত্র উপায় হলো নির্বাচন আর সংসদের এই গোলকধাঁধা থেকে দূরে থাকা। বৈপ্লবিক পরিবর্তন চাইলে এই ফাঁদের বাইরে থেকেই আধিপত্যবিরোধী সংগঠন, বয়ান আর গণশক্তির ভিত্তি গড়তে হবে।

---

[৮০] Carl Boggs, The Impasse of European Communism (Westview Press, 1982); Donald Sassoon, *One Hundred Years of Socialism: The West European Left in the Twentieth Century* (I.B. Tauris, 1996)

[৮১] সংসদীয় রাজনীতিতে ঢুকে বামপন্থী বিপ্লবী দলগুলোর এই আদর্শিক বিচ্যুতির বিস্তারিত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য দেখুন: Adam Przeworski, *Capitalism and Social Democracy* (Cambridge University Press, 1985); এবং Ralph Miliband, *Parliamentary Socialism: A Study in the Politics of Labour* (1961)।

তা না হলে বিশাল মহীরুহ হবার স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করা আন্দোলনগুলো একসময় ড্রয়িংরুমের টবে সাজানো বনসাইয়ে রূপান্তরিত হবে।

নির্বাচনী রাজনীতি: গণক্ষমতার প্রতিপক্ষ

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, নির্বাচনী রাজনীতি আর গণআন্দোলনের মধ্যে অনেক মিল আছে। দুই পক্ষই মানুষের কাছে যায়, প্রচার চালায়, নেটওয়ার্ক তৈরি করে।

কিন্তু আসলে বিপ্লবের মনস্তত্ত্ব আর ভোটের রাজনীতির ডায়নামিকস একেবারেই আলাদা।

বিপ্লবী আন্দোলনের মূল কাজ হলো মানুষকে সচেতন ও সক্রিয় করা। সমাজে মেরুকরণ বাড়ানো। মানুষের একটা স্পষ্ট আদর্শিক দূরত্ব তৈরি করা। পুরোনো কাঠামোকে দুর্বল করে দেওয়া এবং ক্ষমতার বিকল্প কেন্দ্র গড়ে তোলা। অন্যদিকে, নির্বাচনী রাজনীতির মূল ফোকাস স্রেফ ভোট আর আসন বাড়ানো।

যারা নির্বাচন করে, তারা মানুষের সামনে এই ব্যবস্থার বাস্তবতা তুলে ধরে একে ঘৃণা করতে শেখায় না। মানুষকে বলে না যে, এ ব্যবস্থাকে অবৈধ ঘোষণা করতে হবে। তারা উল্টো বলে এই ব্যবস্থার ভেতরে ঢুকেই ক্ষমতায় যেতে হবে।

নির্বাচনী রাজনীতি বর্তমান ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করার বদলে তাকে বৈধতা দেয়। এই কাঠামোকে দুর্বল করার বদলে মজবুত করে।

দুই ধরনের রাজনীতির চিন্তা আর লক্ষ্য সম্পূর্ণ আলাদা।

রূপান্তর: নির্বাচনী রাজনীতিতে ঢোকার পর বিপ্লবীদের চারটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে:

প্রথমত, সময়চক্র বদল। নির্বাচন ঘুরে পাঁচ বছরের চক্রে। দলগুলোর সব চিন্তা, আর কৌশল ঠিক হয় এই চক্রকে কেন্দ্র করে। বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন লম্বা প্রস্তুতি। স্বল্পমেয়াদি ভোটের চক্র আর বিপ্লবের দীর্ঘমেয়াদি ছক—দুটো সাংঘর্ষিক।

দ্বিতীয়ত, লক্ষের বৈপরীত্য। বিপ্লবের জন্য ক্ষমতার বিকল্প কেন্দ্র গড়া অপরিহার্য। সংসদীয় পদ্ধতিতে এর ঠিক উল্টোটা হয়। ভোটে অংশ নেওয়া বিদ্যমান কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করে।

তৃতীয়ত, হিসাববদল। নির্বাচনী রাজনীতির নিজস্ব হিসেবনিকেশ থাকে। ভোটের হিসাব, জোটের হিসাব, ডিপ স্টেইটের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার হিসাব, বিদেশিদের পছন্দ-অপছন্দের হিসাব। চাইলেও এগুলো উপেক্ষা করা যায় না। আদর্শিক সংগ্রাম আর বিপ্লবের প্রস্তুতির বদলে এইসব হিসেবনিকেশই দলগুলোর সিদ্ধান্ত ঠিক করে দেয়।

চতুর্থত, ভূমিকা বদল। রাষ্ট্র সবসময় আনুগত্যকে পুরস্কৃত করে, অবাধ্যদের দেয় শাস্তি। সংসদের পথে ঢোকার পর দলগুলো নিজেরা তো বিদ্যমানতার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়ই না, উল্টো একই আদর্শের যারা সিস্টেম ভাঙতে চায়, তাদের সমালোচনা করে। প্রয়োজনে দমনেও নামে। পাশাপাশি নিজেদের সমর্থকদেরও বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে রাখে।

এসব কারণেই দেখবেন, বাংলাদেশে ইসলাম অবমাননা, রাসূল ﷺ-এর অবমাননা, এলজিবিটির সামাজিকীকরণের প্রচেষ্টা কিংবা ফিলিস্তিনের গণহত্যার মতো একেবারে সাদাকালো বিষয়গুলো নিয়েও ইসলামী দলগুলোর কাছ থেকে আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক যোগবিয়োগের পাথরের নিচে ঈমানি ও নৈতিক দায়িত্বগুলো চাপা পড়ে যায়।

নির্বাচনী রাজনীতি এবং বিপ্লবী আন্দোলন—দুটো আলাদা পথ।

এক পথ মানুষকে সক্রিয় করে, অন্য পথ নিষ্ক্রিয় করে। এক পথ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে, অন্য পথ বৈধতা দেয়।

দুটোকে এক মনে করা শুধু ভুল না, বিপজ্জনক ভুল।

নির্বাচনী ফাঁদ

নির্বাচন মানুষকে একটা বিভ্রমের মধ্যে রাখে। জনগণ মনে করে, ভোট দিয়ে তারা পরিবর্তনে অংশ নিচ্ছে। এতে এক ধরনের সস্তা আত্মতৃপ্তি তৈরি হয়। কিন্তু ক্ষমতার মূল কাঠামো যুগ যুগ ধরে একই থাকে; মৌলিক সমস্যাগুলোর কোনো সুরাহা হয় না। কিন্তু জনগণ ঠিকই পাঁচ বছরের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

ব্যাপারটা অনেকটা প্রেশার কুকারের মতো। মানুষের অসন্তোষ যখন চরমে পৌঁছায়, নির্বাচন তখন 'রিলিজ ভালভের' মতো কাজ করে। নির্বাচনের আচার-অনুষ্ঠান, আয়োজন ও অংশগ্রহণ মানুষের ভেতরে জমে থাকা উত্তেজনা আর ক্ষোভের শক্তি বের হবার পথ করে দেয়। তাদের মধ্যকার পরিবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ভোঁতা হয়ে যায়।

পরিবর্তনের স্বপ্ন ফেরি করে গণতন্ত্র বিদ্যমানতাকেই টিকিয়ে রাখে। অরাজবাদীদের সেই বিখ্যাত উক্তিটা শতভাগ সত্য:

'ভোট দিলে যদি কিছু বদলাতো, তাহলে ভোট দেওয়া অবৈধ হতো।'

এই পদ্ধতি একদিকে বিপ্লবী আন্দোলনকে পোষ মানায়, অন্যদিকে মজলুমকে আটকে রাখে অন্তহীন ফাঁদে।

বাম ও ডান—দু' ঘরানার তাত্ত্বিক ও নেতারাই এই বাস্তবতাকে চিহ্নিত করেছেন।

ভ্লাদিমির লেনিন গণতন্ত্রকে পুঁজিবাদী শ্রেণির হাতিয়ার আখ্যা দিয়েছিলেন, যার কাজই হলো সাংবিধানিক কাঠামোর ভেতরে আটকে বিপ্লবী শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করা।[৮২]

মাও সে তুং আরও সোজাসাপ্টা ভাষায় বলেছেন, অত্যাচারিত কখনো ভোট দিয়ে অত্যাচারীকে সরাতে পারে না। ইতিহাসে শোষিতের ভোটের কারণে কোনো শাসক ক্ষমতা ছাড়েনি।[৮৩]

একই ধরনের মন্তব্য পাওয়া যায় ডানপন্থীদের কাছ থেকেও।

ফ্যাসিস্টরা গণতন্ত্রকে দেখে দুর্বল ও ভাঙনপ্রবণ ব্যবস্থা হিসেবে, যা কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ। স্পেনের ফালাঞ্জিস্ট নেতা হোসে অ্যান্টোনিও প্রিমো রিভেরা গণতন্ত্রকে বলেছিলেন 'শক্তি অপচয়ের সম্ভাব্য নিকৃষ্টতম ব্যবস্থা'।[৮৪]

তার বিখ্যাত উক্তি ছিল, *'আমাদের স্পেন নির্বাচন দিয়ে তৈরি হবে না, তৈরি হবে হাতে বন্দুক তুলে নেওয়া কবিদের দ্বারা।'*[৮৫]

কার্ল মার্ক্স ধর্মকে জনগণের আফিম বলেছিলেন। কারণ 'পরকালের প্রতিদান'-এর আশ্বাস দিয়ে মজলুমকে নাকি দুনিয়ায় নিষ্ক্রিয় রাখা হয়। বাস্তবতা হলো, আধুনিক যুগের আফিম হলো এই গণতন্ত্র। এখানে ভোট আর সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মজলুমের চেতনাকে অবশ করে রাখা হয়।

---

[৮২] Vladimir I. Lenin, *The State and Revolution* (1917; repr., Moscow: Progress Publishers, 1964); *The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky* (1918; repr., Moscow: Progress Publishers, 1964)

[৮৩] Mao Zedong, "Problems of War and Strategy" (November 6, 1938), in *Selected Works of Mao Tse-tung*, vol. 2 (Peking: Foreign Languages Press, 1965); Editorial Departments of *Renmin Ribao (People's Daily)* and *Hongqi (Red Flag)*, "The Proletarian Revolution and Khrushchev's Revisionism," March 31, 1964, trans. *Beijing Review* 7, no. 14 (April 3, 1964)

[৮৪] José Antonio Primo de Rivera, *Anthology of Speeches and Quotes*, Internet Archive.

[৮৫] Opposition to Parliamentary Democracy," *Britannica*

মানুষকে বারবার বোঝানো হয়, 'ভোট দাও', তাহলেই পরিবর্তন আসবে। তাদের শেখানো হয়, ভোট দেওয়া কর্তব্য, নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব, এমনকি 'আমানত'।

জনগণও ফাঁদে পা দেয়। আঙুলে কালির দাগ দেখিয়ে গর্ব করে বলে, 'আমরা গণতান্ত্রিক দেশ।' যেন গণতান্ত্রিক হওয়াটাই সব সমস্যার সমাধান। যেন ভোট দিতে পারার আদৌ কোনো অর্থ আছে।

নির্বাচন শেষে যখন কিছুই বদলায় না, তখন নতুন প্রতিশ্রুতি আসে—'এই তো! পরের বার ঠিক দিনবদল হবে!'

এভাবে নির্বাচন মানুষকে পোষ মানানোর এক সূক্ষ্ম কাঠামো হিসেবে কাজ করে। এর আসল কাজ দুটো। নির্দিষ্ট সময় পর পর ক্ষমতার কাঠামোকে স্থিতিশীলতা ও বৈধতা এনে দেওয়া। আর জনগণের ক্ষোভ ও অসন্তোষকে বৈপ্লবিক রূপান্তরের দিকে যেতে না দিয়ে 'ধৈর্য ধরা' আর 'ধাপে ধাপে পরিবর্তনের' অন্তহীন চক্রে ঠেলে দেওয়া।

প্রতিবিপ্লবের হাতিয়ার

নির্বাচনের এই ফাঁদকে প্রয়োজনে অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। নির্বাচনের নামে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে গলা টিপে মারার কাজটা ইতিহাসে বারবার হয়েছে, সুচারুভাবে।

লক্ষ্য করে দেখবেন, গণঅভ্যুত্থান, জনযুদ্ধ কিংবা ব্যাপক আন্দোলনের তোড়ে যখনই আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়, ঠিক তখনই পশ্চিমারা নির্বাচনের আলাপ হাজির করে। এটা তারা গণতন্ত্রের প্রতি ভক্তির কারণে করে না। করে ভূরাজনৈতিক হিসেবনিকেশের জায়গা থেকে। এর সাথে জড়িয়ে থাকে ডিপ স্টেইটের স্বার্থের প্রশ্নও।

দ্রুত নির্বাচনের পেছনে মূল উদ্দেশ্য থাকে সংকটে থাকা নড়বড়ে শাসনব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করা, ক্ষমতার কেন্দ্রকে রক্ষা করা। আন্দোলনকে শান্ত করে নিজেদের স্বার্থ টিকিয়ে রাখা। আর এ পুরো ব্যাপারটাই হয় গণতন্ত্র আর জনগণের ক্ষমতায়নের দোহাই দিয়ে।

এর জলজ্যান্ত প্রমাণ দেখা যায় আরব বসন্তের সময় মিশরের গণঅভ্যুত্থানে।

মিশরে হাজার হাজার মানুষ রাজপথে জীবন বাজি রেখে হোসনি মুবারাকের পতন ঘটিয়েছিল। কিন্তু এরপরই পশ্চিমা শক্তিগুলি নির্বাচনের কথা বলতে শুরু করল। তোড়জোড় শুরু করল সেনাবাহিনী (SCAF)। রাজপথে থাকা তরুণদের তাগাদা দেওয়া হলো ব্যালটের দিকে ঝুঁকতে।

যেসব গণজমায়েত, এলাকাভিত্তিক কমিটি ও সমন্বয়ের প্ল্যাটফর্ম গণআন্দোলনের চালিকাশক্তি ছিল, তারা একে একে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। পুরোনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে উৎখাত করার জটিল আর দীর্ঘমেয়াদি কাজটা থেকে গেল অবহেলিত।

তারপর নির্বাচনে মুসলিম ব্রাদারহুড জিতল ঠিকই; কিন্তু সেনাবাহিনী, বিচার বিভাগ, পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থা; সব অক্ষত থেকে গেল। ফলে দুই বছরের মাথায় সামরিক অভ্যুত্থান করে পুরোনো কাঠামো আবার ক্ষমতা দখল করে নিল।

নেপালের বিপ্লবীরা সংসদে ঢুকেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র অপরিবর্তিত থাকায় ভূমি সংস্কারসহ যেসব পরিবর্তনের জন্য এত বছর ধরে তারা লড়াই করেছিল, সেগুলো আর আসলো না।

আশির দশকে এল সালভাদরে গৃহযুদ্ধ চলছিল। ক্ষমতা দখলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল বামপন্থী গেরিলাদের জোট। এসময় অ্যামেরিকানরা বারবার নির্বাচনের কথা বলতে শুরু করল। ডিক্লাসিফাইড দলিলপত্র থেকে জানা যায়, নির্বাচন নিয়ে তাগাদার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল 'বিপ্লবীদের রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা' করা আর অ্যামেরিকার স্বার্থগুলো রক্ষা করা।[৮৬]

সোজা কথায়, জনগণের ক্ষোভকে গণতন্ত্র নামের এক পুতুলনাচের বাক্সে বন্দি করে ফেলাই ছিল তাদের লক্ষ্য।

এই কৌশল আসলে বহু পুরোনো।

উপনিবেশের যুগে একই কৌশল মুন্সিয়ানার সাথে কাজে লাগাত ব্রিটিশরা। যখনই বড়সড় কোনো বিদ্রোহ দেখা দিত, তখনই তারা খুব কায়দা করে ঝুলিয়ে দিত নির্বাচনের মূলো। নির্বাচনমুখী হওয়ার পর আন্দোলন দুর্বল হয়ে যেত, থেমে যেত বিদ্রোহের গতি।

---

[৮৬] *Foreign Relations of the United States*, 1981–1988, vol. 1, Document 166, "Paper/Policy Memorandum [El Salvador]," Office of the Historian, U.S. Department of State; *Foreign Relations of the United States*, 1981–1988, vol. 1, Document 204, "Memorandum of Conversation," Office of the Historian, U.S. Department of State

১৯৫০-এর দশকে কেনিয়ার কিকুয়ু জনগোষ্ঠীর কৃষকরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে স্বাধীনতা আর ভূমি ফিরিয়ে নেওয়ার দাবিতে। ব্রিটিশরা প্রথমে নিষ্ঠুর দমনের পথ বেছে নেয়। প্রায় দেড় লাখ মানুষকে বন্দি শিবিরে আটকে রাখে। হত্যা করে হাজার হাজার মানুষকে। কিন্তু বিদ্রোহ থামে না।

তখন তারা কৌশল বদলায়। 'প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার' গঠনের প্রতিশ্রুতি দেয়। বলে, ১৯৫৭ সালে সীমিত নির্বাচন হবে আর ১৯৬৩-তে স্বাধীনতা।

বিদ্রোহীরা যুদ্ধ থামিয়ে আলোচনার টেবিলে আসে। আর সেই টেবিলেই আন্দোলনের মৃত্যু ঘটে। কাঙ্ক্ষিত জমি সংস্কার হয় না। পুরোনো অর্থনৈতিক কাঠামো অক্ষত থাকে। যোদ্ধারা প্রান্তিক থেকে যায়।

নির্বাচনের আলাপ আন্দোলনগুলোর মধ্যে এক ধরনের সাময়িক অন্ধত্ব তৈরি করে। দীর্ঘমেয়াদি রূপান্তরের লক্ষ্য থেকে সরে তারা তখন আটকে যায় নির্বাচনী স্বার্থের ফাঁদে।

বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই নির্বাচন হওয়ার অর্থ বিদ্যমান কাঠামো টিকে যাওয়া। জনগণ তখন শান্ত হয়ে ঘরে ফেরে, রাজপথ ফাঁকা হয়ে যায়; কিন্তু ডিপ স্টেইট ঠিকই ঘাপটি মেরে থাকে। রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা থাকে অক্ষুণ্ণ। পরিস্থিতি একবার শান্ত হলেই তারা আবার ফিরে আসে। ভরবেগ হারানো নিঃস্ব বিপ্লবীদের তখন আর কিছুই করার থাকে না।

বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

উজান-ভাটির রাজনীতি

একটা কথা আছে—politics is downstream from culture।

সমাজটা উজান, রাজনীতি ভাটি।

উজান থেকে পানি যেমন ভাটিতে গড়ায়, তেমনি সমাজের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি আর চিন্তাই ঠিক করে দেয় রাজনীতির গতিপথ। তাই দেখবেন, সমাজ বদলালে রাজনীতিবিদদের ভাষা বদলে যায়, বদলে যায় স্লোগান।

এজন্যেই বিপ্লব রাষ্ট্রযন্ত্রে শুরু হয় না। ওখানে গিয়ে শেষ হয়। শুরুটা হয় সমাজের মানুষের মনে, সংস্কৃতির গভীরে, বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে, গণমানুষের বীজতলায়।

তাই বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য রাজনীতির ময়দানে নামার আগে রাজনীতির সংজ্ঞাটা বদলাতে হয়। ভাঙতে হয় সীমানা। যতদিন না আপনি একটা নিজস্ব

বয়ান আর পাল্টা সংস্কৃতিতে দাঁড় করাচ্ছেন, ততদিন আপনাকে খেলতে হবে অন্যের মাঠে, অন্যের নিয়মে।

আর নির্বাচনী রাজনীতিতে ঢুকে সমাজের এই নিয়মকানুনকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। উল্টো দলগুলো ব্যস্ত থাকে ওই নিয়মের সাথে তাল মেলাতে।

নির্বাচনী রাজনীতিতে ঢোকা ইসলামপন্থীরা মানিয়ে নেওয়ার এক নিরন্তর চক্রে পড়ে যায়। আদর্শের জায়গায় আপস করে নিজেদের পরিবর্তন করে। ব্যক্তি বদলায়, সংগঠন বদলায়। মানিয়ে নিতে নিতে শেষমেশ চিন্তাটাও বদলে যায়। কারণ এই সিস্টেমে টিকে থাকার শর্তই হলো, সিস্টেমের মতো হয়ে যাওয়া।

তখন দাড়ির মাপ ছোট হয়, প্যান্ট লম্বা হয়। পর্দা যায়, মিউজিক আসে। শরীয়াহ বা খিলাফতের মতো শব্দগুলো হারিয়ে যায়। সামনে আসে 'কল্যাণরাষ্ট্র' বা 'ইনসাফের শাসনের' মতো আলাপ।

নির্বাচনী রাজনীতিতে ঢুকে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক আধিপত্য ভাঙার চেষ্টা তাই ভাটিতে দাঁড়িয়ে উজানে পানি ঠেলার মতো।

ইসলামী ইনকিলাবের জন্য প্রয়োজন সমাজ পরিবর্তন, সংস্কৃতি পাল্টানো, মনোজগতে বিপ্লব। বিদ্যমান ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামকে একটা পূর্ণাঙ্গ ও বিকল্প জীবনব্যবস্থা হিসেবে দাঁড় করানো।

নির্বাচনী রাজনীতিতে এসব তো হয়ই না, বরং উল্টোটা হয়।

ভোটের রাজনীতিতে অংশ নেওয়া মানেই হলো, বিদ্যমান কাঠামোর আধিপত্যকে আরও শক্তিশালী করা। গণতান্ত্রিক রাজনীতি অংশগ্রহণের প্রতিটি পদক্ষেপ ওই কাঠামোর স্বীকৃতি হিসেবে কাজ করে। সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে মজবুতি দেয়।

কেউ যখন একদিকে বলে, গণতন্ত্র কুফরি বা হারাম, মানবরচিত সংবিধান ইসলামপরিপন্থী, আবার অন্যদিকে সংসদে যাওয়ার জন্য সর্বশক্তি উজাড় করে দেয়, তখন এই স্ববিরোধিতা দেখে মানুষ কী ভাবে?

মানুষের মন একইসাথে দুটো বিপরীতমুখী অবস্থান ধরে রাখতে পারে না। যেকোনো একটা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। মানুষ মুখের কথা দেখে না, দেখে কাজ। সেটাই তাদের ওপর বেশি প্রভাব ফেলে।

এভাবে গণতন্ত্রের এবং বিদ্যমান সেক্যুলার ব্যবস্থার একটা প্রায়োগিক গ্রহণযোগ্যতা (functional acceptance) সমাজে তৈরি হয়ে যায়। নিজ হাতে নিজেদের আদর্শের কবর খোঁড়া হয়।

এই প্রায়োগিক গ্রহণযোগ্যতা শুধু বাইরের মানুষকে বিভ্রান্ত করে না, ইসলামপন্থীরা নিজেরাও বিভ্রান্ত হয়। অন্যের নিয়মে খেলতে খেলতে, খেলার নিয়ম একসময় তাদের চিন্তার অংশ হয়ে যায়।

গণতন্ত্রকে গ্রহণ করে নেওয়া ইসলামপন্থীরা একদিকে বলে: *গণতন্ত্র স্রেফ একটা কৌশল। এটা শুধু একটা প্রক্রিয়া।*

অন্যদিকে তারা আবার বলে: *মানুষ চাইলেই শরীয়াহ আসবে।*

এর মানে দাঁড়াল—আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন হবে কিনা, তা নির্ভর করছে জনগণের মেজাজ-মর্জির ওপর। এই চিন্তা ইসলাম থেকে আসেনি, এসেছে গণতান্ত্রিক বিশ্বাস থেকে, যেখানে জনগণের ইচ্ছাই শেষ কথা এবং বৈধতার উৎস।

অর্থাৎ মুখে তারা যতই একে 'কৌশল' বলুক, আচরণ ও চিন্তায় গণতন্ত্রকে তারা মূলনীতি হিসেবেই গ্রহণ করে নিয়েছে। গণতন্ত্রের যুক্তি আর কাঠামোর ভেতরেই তারা চিন্তা করছে।

সজ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে, তারা গণতন্ত্রকে আত্মস্থ করে ফেলেছে।

আর গণতন্ত্রও তাদেরকে হজম করে নিয়েছে।

নির্বাচনী রাজনীতি সেক্যুলার ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার বদলে উল্টো এর গ্রহণযোগ্যতা দেয়। ফলে ইসলাম ও সেক্যুলার ব্যবস্থার মধ্যকার বিভাজনের স্পষ্ট রেখা ঝাপসা হয়ে যায়।

নব্য জাহিলিয়াতের মূর্তি

এই আদর্শিক আত্মসমর্পণ কেন ঘটে?

কারণ গণতন্ত্র শুধু পদ্ধতি না, গণতন্ত্র আধুনিক জাহিলিয়াতের সবচেয়ে বড় মূর্তিগুলোর একটা।

লক্ষ্য করে দেখবেন, রাজনীতির প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষ একইসাথে এমন তিনটা ধারণা পোষণ করে, যেগুলো পরস্পরবিরোধী। মানুষ মনে করে:

- রাজনীতি খারাপ। রাজনীতি মানে ক্ষমতার খেলা, দুর্নীতি, হানাহানি।
- গণতন্ত্র ভালো। গণতন্ত্র মানে শুদ্ধতা, সভ্যতা, প্রগতি।
- রাজনীতি মানেই গণতান্ত্রিক রাজনীতি।

বিরোধটা চোখে পড়ার মতো।

গণতন্ত্র তো রাজনীতিরই একটা রূপ। রাজনীতি যদি নোংরা হয়, তবে গণতন্ত্র পবিত্র হয় কী করে? আর গণতন্ত্র যদি ভালো হয়, তবে রাজনীতিকে ঢালাওভাবে খারাপ বলা কেন?

কিন্তু অনেক মানুষ এই স্ববিরোধিতা নিয়েই থাকে। কারণ গণতন্ত্রকে তারা দেখে রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকা কিছু হিসেবে। রাজনীতি হয়েও গণতন্ত্র রাজনীতির সীমানা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

মানুষ সরকারের সমালোচনা করতে পারে, প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করতে পারে। কথা বলতে পারে দলগুলোর দুর্নীতি নিয়ে। এর জন্য বেশি থেকে দমনপীড়ন হয়, কিন্তু এগুলোকে কেউ অনৈতিক মনে করে না।

কিন্তু গণতন্ত্রকে প্রশ্ন করলে, গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করলে, সেটাকে অনৈতিক মনে করা হয়। সীমালঙ্ঘন মনে হয়।

আজকের দুনিয়ায় নিজেকে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে হলে কিছু বিষয়কে সর্বজনীন, ধ্রুব এবং ভালো হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। গণতন্ত্র তার অন্যতম। তাকে বিনাপ্রশ্নে গ্রহণ না করলে আধুনিক, সভ্য এবং প্রগতিশীল মানুষের কাতারে ওঠা যায় না।

গণতন্ত্র এমন একটা বিষয় হয়ে গেছে, যেটা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। গণতন্ত্র কেন ভালো, কেন কাম্য সেটা প্রমাণ করতে হয় না। বরং প্রমাণ চাইলে সন্দেহভাজন হতে হয়।

গণতন্ত্র বৈধতার সীমানা ঠিক করে। সে ঠিক করে দেয় কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল। কোনটা সভ্য মানুষের কাজ আর কোনটা অসভ্যতা। সে নিজেকে 'সর্বজনীন ভালো' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, বিকল্প চিন্তার সীমাও বেঁধে দেয়। গণতন্ত্র সবাইকে বিচার করে, কিন্তু তাকে বিচার করা যায় না।

এই যে সব কিছুর ওপরে, সব কিছু ছাড়িয়ে গণতন্ত্রের সুরক্ষিত অবস্থান, এটাই তার আধিপত্য আর পবিত্রতার সবচেয়ে বড় লক্ষণ।

প্রাচীন জাহিলিয়াতে মানুষ পাথরের মূর্তির সামনে মাথা নত করত। নিজ হাতে খোদাই করা প্রতিমাকে পবিত্র মনে করত। যার সমালোচনা করা যায় না, যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না।

আধুনিক জাহিলিয়াতে মানুষ মাথা নত করে ধ্যানধারণার মূর্তির সামনে। আর গণতন্ত্রের অবস্থান এই আধুনিক জাহিলি ব্যবস্থার হেজেমনিক কেন্দ্রে। সে এমন এক মূর্তি, যাকে প্রশ্ন করা যায় না, যার বিকল্প কল্পনা করা যায় না, যার পবিত্রতা সন্দেহাতীত।

মূর্তি আঁকড়ে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা হয় না। যেটা জাহিলি চিন্তার সবচেয়ে বহুল প্রচলিত স্তম্ভ, সেটাকে আঁকড়ে ধরে হেজেমনি ভাঙা যায় না। উল্টো নিজেকেই বদলে যেতে হয়।

গণতান্ত্রিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়েছে।

সংসদীয় রাজনীতি যে ইসলামপন্থীদের পোষ মানানোর সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র, তা পশ্চিমারা খোলাখুলিই আলোচনা করে। তাদের বহু গবেষণাপত্র আর পলিসি পেপারে বলা আছে: ভোটের বাক্সে ঢোকানোই হলো ইসলাপন্থীদের বশ করার উপায়। এতে করে ইসলামপন্থীদের দিক থেকে লিবারেল পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থার যে হুমকি, তা কমে আসে।

তারা জানে এটা ফাঁদ। এবং ফাঁদ হিসেবেই একে ব্যবহার করে।[৮৭]

বহু বছর বন্দি থাকার পর কিছু মানুষ কারাগারকে নিজের বাসাবাড়ি মনে করতে শুরু করে। জেলখানার নিয়মকানুন তাদের স্বাভাবিক মনে হয়। বাইরের জীবন তারা আর কল্পনাই করতে পারে না। ভয় পায়।

ইসলামপন্থীদের বিশাল অংশের অবস্থা এই বন্দিদের মতো। তারা মনে করছে, গণতন্ত্র ছাড়া রাজনীতি হয় না, নির্বাচন ছাড়া ইসলাম কায়েমের পথ নেই, আর গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করা অপরাধ।

মুসলিমদের চিন্তাকে এই অদৃশ্য কারাগারে আটকে ফেলতে পারাটাই বিদ্যমান কাঠামোর সবচেয়ে বড় বিজয়।

মরীচিকা বনাম মনযিল

একটা কথা অনেকেই বলেন: গণআন্দোলন আর নির্বাচন, দুটো একই গন্তব্যে পৌঁছানোর ভিন্ন ভিন্ন পথ। কেউ বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করতে চান, কেউ নির্বাচনের মাধ্যমে।

বাস্তবতা হলো, নির্বাচন আসলে ইসলাম আনার পথই না। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক গন্তব্যের দিকে নিয়ে যায়।

---

[৮৭] Angel M. Rabasa, Cheryl Benard, Peter Chalk, C. Christine Fair, Theodore Karasik, Rollie Lal, Ian Lesser, and David Thaler, *The Muslim World After 9/11* (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2004); Dalia Dassa Kaye, Frederic Wehrey, Audra K. Grant, and Dale Stahl, *More Freedom, Less Terror? Liberalization and Political Violence in the Arab World* (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2008)

যারা সংসদের পথ ধরছেন, তারা তুলনামূলক শান্ত, নিরুত্তাপ পথে একই লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছেন না। তারা কার্যত তাগুতি কাঠামোর ভেতরেই কিছু জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

আমরা গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করি আকীদাহর কারণে। আমরা গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করি তার কাঠামো, উৎস, উদ্দেশ্য এবং বাস্তব ভূমিকার কারণেও। গণতন্ত্র এমন এক সভ্যতাগত প্রকল্প, যার উদ্দেশ্য আমাদের আত্মপরিচয়কে মুছে দেওয়া, আমাদের দুর্বল করে রাখা, আমাদের বাতিলের গোলকধাঁধায় আটকে ফেলা।

এই পদ্ধতি ইসলামী আন্দোলনকে তার লক্ষ্য ও রূহ, দুটো থেকেই সরিয়ে দেয়। এই পথ ইসলামের পুনর্জাগরণের না, এটা সীরাতুল মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুতির পথ।

ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতিকে নির্বাচনী গণ্ডি থেকে মুক্ত করতে হবে। প্রচলিত রাজনৈতিক ময়দানের বাইরে গিয়ে তৈরি করতে হবে নতুন এক ময়দান। গড়ে তুলতে হবে এমন এক সামাজিক জাগরণ, যা সকল মিথ্যা ইলাহের আধিপত্যকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে।

মুসলিমবঙ্গ গড়তে হলে আমাদের খুঁজতে হবে ইনকিলাবের দিকদর্শন।

অধ্যায় ৬

দিকদর্শন

সেক্যুলার ব্যবস্থা সরিয়ে ইসলামী শরীয়াহ্ কায়েমের জন্য প্রয়োজনীয় বৈপ্লবিক রূপান্তর কীভাবে আসবে?

ইনকিলাব কীভাবে? কোন পদ্ধতিতে?

এখন আমরা সেই আলোচনাই করব।

তবে তার আগে কিছু ধারণা সংক্ষেপে আবারও পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। কারণ, এখানে এসে অনেকেই তালগোল পাকিয়ে ফেলেন।

বিপ্লব

বিপ্লব বা বৈপ্লবিক রূপান্তর বলতে আমরা বোঝাচ্ছি, বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামো ও আইনি ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে নতুন আদর্শিক ভিত্তির ওপর একটা শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্রের আদর্শিক ভিত্তি, আইনি ও সামাজিক কাঠামো এবং জনরাষ্ট্র সম্পর্কের পূর্ণাঙ্গ রূপান্তর।

আমরা বিপ্লব শব্দটাকে কোনো নির্দিষ্ট আদর্শের সাথে বেঁধে দিচ্ছি না। রাজতন্ত্রের বদলে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা, পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বদলে সমাজতন্ত্র কায়েম করা, সেক্যুলার শাসনের বদলে ইসলামী শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা—এগুলো সবই এই অর্থে বৈপ্লবিক রূপান্তর। যদিও আদর্শগুলো আলাদা।

এখানে মিলের জায়গাটা হলো, প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার রূপান্তরের পরই এই আদর্শগুলোর অনুসারীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা গড়তে পেরেছে। পরিবর্তনের একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া তাদের পাড়ি দিতে হয়েছে। এটাকেই বিপ্লব বলা হচ্ছে।

বিপ্লব হলো চূড়ান্ত মাত্রার রূপান্তর।

পুরোনো ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার পর একেক আন্দোলন একেক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে তাদের নতুন শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে। আমাদের আলোচনা এই আদর্শ নিয়ে না। আমরা এখানে কথা বলছি পুরোনো ব্যবস্থাকে সরিয়ে শাসনক্ষমতা অর্জনের প্রক্রিয়া আর পদ্ধতি নিয়ে।

বিপ্লব কী না

বিপ্লব কী, সেটার পাশাপাশি বিপ্লব কী না, সেটাও স্পষ্টভাবে জেনে রাখা ভালো।

- বিপ্লব কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ না। যুদ্ধ যেমন অনেক কারণে, অনেক আদর্শের জন্য হতে পারে, বিপ্লবও তেমনি নানা আদর্শের জন্য হতে পারে।
- বিপ্লব কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি না। অনেকে মনে করে, রাজপথে নেমে আন্দোলন করে সরকারকে ফেলে দেওয়া মানে বিপ্লব। আর অস্ত্র হাতে লড়াই করা হলো যুদ্ধ। এটা ভুল ধারণা। বিপ্লব হলো রাষ্ট্রকাঠামো, আইনি ব্যবস্থা এবং সমাজের মধ্যে আমূল রূপান্তর। রাজপথের আন্দোলন কিংবা সশস্ত্র লড়াই সেই রূপান্তর আনার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি।
- পদ্ধতিগুলো বাহন, বিপ্লব হলো গন্তব্য।
- বিপ্লব মানে নিছক সরকার পতন না। বিপ্লব যদি চূড়ান্ত গন্তব্য হয়, তাহলে সরকার পতন বড়জোর মাঝখানের একটা স্টেশন।

গণআন্দোলন

গণমানুষের সম্মিলিত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের সব পদ্ধতিই গণআন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত। গণআন্দোলন আগায় চলমান ক্ষমতাকাঠামোর বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে। আর

এই প্রতিরোধ হয় তথাকথিত ‘নিয়মতান্ত্রিকতা’র ফ্রেইমের (যেমন সংসদীয় রাজনীতির) বাইরে।

অসহযোগ আন্দোলন, ধর্মঘট, অবরোধ, ঘেরাও থেকে শুরু করে জনগণের সশস্ত্র লড়াই, বিদ্রোহ কিংবা জনযুদ্ধ; সবই গণআন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত।

যদিও এ বিষয়গুলো নিয়ে আগে আলোচনা হয়েছে, তবু এখনের এই ঝালিয়ে নেওয়াটা পরের আলোচনা বোঝার জন্য কাজে লাগবে।

বিপ্লব তত্ত্ব

বিপ্লব নিয়ে গবেষণা চলছে শত বছরের বেশি সময়জুড়ে। আধুনিক জ্ঞানের নানান শাখার গবেষকরা বিষয়টা নেড়েচেড়ে দেখেছেন। ইতিহাসবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একে ব্যাখ্যা করেছেন নিজেদের মতো করে। তৈরি হয়েছে বিশাল এক গবেষণার জগৎ।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গবেষকরা চোখ রেখেছেন বিপ্লবের কারণ, ঐতিহাসিক গতিপথ আর বিপ্লবগুলো যেসব সমাজ কাঠামাকে ভেঙে দিয়েছে, তার দিকে। আর সেগুলোর ভিত্তিতেই তারা বিপ্লবগুলোকে নানা ভাগে ভাগ করেছেন।

ফ্রান্স, রাশিয়া আর চীনের বিপ্লবগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন সমাজবিজ্ঞানী থিডা স্কোকপোল। তার মতে, এসব বিপ্লব তৈরি হয়েছে রাষ্ট্রের কাঠামোগত দুর্বলতা, সংকট আর সামাজিক টানাপোড়েন থেকে।[১]

স্যামুয়েল হান্টিংটন বোঝার চেষ্টা করেছেন আধুনিকায়ন আর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সম্পর্কটাকে। দেখিয়েছেন, কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা সমাজে বিপ্লবের পরিবেশ তৈরি করে।[২] আবার কার্ল মার্ক্স বিপ্লবকে দেখেছেন শ্রেণিসংগ্রামের অনিবার্য ফল হিসেবে।[৩]

বেশ কিছু প্রভাবশালী স্কলার মনোযোগ দিয়েছেন বিপ্লবের চরিত্র ও প্রক্রিয়ার দিকে। তাদের মনোযোগ বিপ্লবের পেছনের সক্রিয় শক্তি, বিপ্লবের বয়ান আর সেগুলোর ফলাফলের দিকে।

---

[১] Theda Skocpol, *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China* (Cambridge: Cambridge University Press, 1979)

[২] Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968)

[৩] Karl Marx and Friedrich Engels, *The Communist Manifesto* (1848)

বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান, গৃহযুদ্ধ আর 'মহাবিপ্লব' এর মধ্যে চার্লস টিলি পার্থক্য করেছেন, প্রভাব ও পরিবর্তনের ব্যাপকতার ভিত্তিতে।[৪] কারা বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় এবং তাদের আদর্শিক লক্ষ্য কী, তার ভিত্তিতে বিপ্লবকে ছয় ভাগে ভাগ করেছেন চ্যামার্স জনসন।[৫] এরিক সেলবিন দেখিয়েছেন, সমাজের স্মৃতি আর রাজনৈতিক মিথগুলো কীভাবে বিপ্লবের গতিপথ তৈরি করে দেয়।[৬]

আবার জন ফোরানের মতো গবেষকরা নজর দিয়েছেন তৃতীয় বিশ্বের বিপ্লবগুলোর দিকে। ঘেঁটে ঘেঁটে দেখেছেন, এসব পরিবর্তনের পেছনে উন্নয়ন আর রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভূমিকা কী ছিল।[৭]

বিপ্লব কীভাবে?

এগুলো হলো বিপ্লব কী বা বিপ্লব কেন ঘটে, তা নিয়ে আলোচনা। কিন্তু বিপ্লব কীভাবে হয়, কাজ হয়েছে তা নিয়েও। যারা এ-ধরনের লেখালেখি করেছেন তাদের অনেকে শুধু তাত্ত্বিক ছিলেন না, বরং সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও জড়িত ছিলেন।

বামপন্থীদের বিশ্লেষণ

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি লেখালেখি করেছে বামপন্থীরা। বিপ্লব কীভাবে হবে, এ নিয়ে তাদের মধ্যে আছে ব্যাপক বিতর্ক।

ফরাসি বিপ্লবী অগুস্ত ব্লাঁকি বিপ্লবকে দেখেছিলেন নিছক এক কারিগরি সমস্যা হিসেবে। তার ফর্মুলা সোজাসাপ্টা: সুশৃঙ্খল বিপ্লবীদের ছোট্ট একটা গোপন দল ঝটিকা আক্রমণে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দখল করে নেবে। আমজনতার ডাক পড়বে অ্যাকশন শেষ হয়ে যাওয়ার পর।[৮]

---

[৪] Charles Tilly, *European Revolutions, 1492–1992* (Oxford: Blackwell, 1993); Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1978)

[৫] Chalmers Johnson, *Revolutionary Change* (Boston: Little, Brown, 1966)

[৬] Eric Selbin, *Revolution, Rebellion, Resistance: The Power of Story* (London: Zed Books, 2010); Eric Selbin, *Modern Latin American Revolutions*, 2nd ed. (Boulder, CO: Westview Press, 1999)

[৭] John Foran, *Taking Power: On the Origins of Third World Revolutions* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005); John Foran, ed., *Theorizing Revolutions* (London: Routledge, 1997)

[৮] Auguste Blanqui, *Instructions for an Armed Uprising* (1839), in Auguste Blanqui, *Blanqui: Selected Writings*, ed. and trans. Oliver A. Jones (London: Penguin, 1972)

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্মাতা ভ্লাদিমির লেনিনের মতে, 'কোনো গোপন "নিউক্লিয়াস" একাই বিপ্লব করে ফেলবে, এটা অবাস্তব। বিপ্লবের জন্য গণমানুষের অংশগ্রহণ আর ম্যান্ডেট অপরিহার্য। তবে জনতা নিজে নিজে সংঘবদ্ধ হতে পারবে না। কেবল স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন বিপ্লব আনবে না। এর জন্য প্রয়োজন পেশাদার বিপ্লবীদের অগ্রবর্তী দল। এদের কাজ জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংগঠিত করা। উপযুক্ত মুহূর্তে অগ্রগামী দলই গণমানুষের স্রোতকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্র দখল করবে।'[৯]

অন্যদিকে লেনিনের শক্ত বিরোধিতা করেছেন জার্মানির রোসা লুক্সেমবার্গ। তার মতে, গণজাগরণ ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো ছক মেনে চলে না; বরং সংগ্রামের উত্তাপ আর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের (improvisation) ভেতর দিয়েই জনতার স্রোত তার গতিপথ ও গন্তব্য ঠিক করে নেয়। লুক্সেমবার্গ বিপ্লবের জন্য ম্যাস স্ট্রাইক বা গণধর্মঘটকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রেখেছেন। তার মতে, এর ভেতর দিয়েই জনতার শক্তি দানা বাঁধে এবং তা প্রায়ই নেতৃত্বের হিসেবনিকেশকে ছাড়িয়ে বহু দূর এগিয়ে যায়।[১০]

রোসা লুক্সেমবার্গ গণধর্মঘটকে দেখেছেন সংগ্রামের ভেতর থেকে জন্ম নেওয়া 'জীবন্ত প্রক্রিয়া' হিসেবে, আর ফরাসি সিন্ডিক্যালিস্ট জর্জ সোরেল জোর দিয়েছেন এর প্রতীকী ও নৈতিক শক্তির ওপর। সোরেলের কাছে ধর্মঘট শুধু দাবি আদায়ের কৌশল না, এটি একটি 'জাগরণী মিথ'। এমন এক আখ্যান, যা মানুষকে চরম ঝুঁকির মুখেও বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে শেখায়, আত্মত্যাগের বৈধতা দেয় এবং প্রচণ্ড শক্তিতে নাড়িয়ে দেয় প্রচলিত ব্যবস্থার নৈতিক ভিত।[১১]

তবে বামপন্থী ধারার ভেতর বিপ্লবের মেকানিসম নিয়ে সবচেয়ে গোছালো আলোচনা পাওয়া যায় বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলের মূল মাস্টারমাইন্ড লিওন ট্রটস্কির কাছে।

ট্রটস্কির মতে অভ্যুত্থান কোনো আকস্মিক বিস্ফোরণ না, আবার গোপন ষড়যন্ত্রও না। এটা একটা শিল্প; চূড়ান্ত মুহূর্তে জনতার উত্তাল স্রোতকে বিপ্লবীদের অগ্রবর্তী দলের সুপরিকল্পিত অ্যাকশনের সাথে মিলিয়ে দেওয়ার নিপুণ কারুকাজ। গণআন্দোলনে রাষ্ট্রযন্ত্র যখন অচল হয়ে যায়, তখন বিপ্লবের কাজ হলো

---

[৯] V. I. Lenin, *What Is to Be Done? Burning Questions of Our Movement* (1902); V. I. Lenin, "Marxism and Insurrection" (September 1917), in V. I. Lenin, *Lenin's Collected Works*, vol. 26 (Moscow: Progress Publishers, 1964)

[১০] Rosa Luxemburg, *The Mass Strike, the Political Party and the Trade Unions* (1906)

[১১] Georges Sorel, *Reflections on Violence*, trans. T. E. Hulme and J. Roth (Cambridge: Cambridge University Press, 1999). (Orig. pub. 1908.)

আন্দোলনের বারুদকে ক্ষমতার শক্তিতে রূপান্তর করা। আর এ সময়ে সংগঠন, টাইমিং আর সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।[১২]

গণচীনের স্থপতি মাও সে তুং বিপ্লবের আলোচনাকে শহর থেকে সরিয়ে নিয়েছেন গ্রামে। এনেছেন গ্রাম থেকে শহর ঘেরাওয়ের তত্ত্ব। গ্রামীন ঘাঁটি থেকে শুরু করে, গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে কীভাবে বিদ্যমান কাঠামোর শক্তি ক্ষয় করে ধাপে ধাপে রাজধানী দখল করতে হয়, আলোচনা করেছেন তা নিয়ে।[১৩]

এই কৌশলকে আরও শানিত করেছেন গেরিলা যুদ্ধে অ্যামেরিকাকে নাস্তানাবুদ করা ভিয়েতনামের জেনারেল গিয়াপ।[১৪] সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের সশস্ত্র লড়াইয়ের এই ছককে উপনিবেশবিরোধী জাতীয় মুক্তির লড়াইগুলোতে প্রয়োগ করেছেন ফ্র্যানয ফ্যানো এবং আমিলকার ক্যাবরালের মতো তাত্ত্বিকরা।[১৫]

সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যাপারে কিছুটা আলাদাভাবে চিন্তা করেছেন চে গুয়েভারা। তার মতে, বিপ্লবীরা কখন পুরোপুরি সংগঠিত হবে বা গণভিত্তি গড়া কখন শেষ হবে, তার জন্য লম্বা সময় ধরে অপেক্ষা করার দরকার নেই। সঠিক পরিস্থিতিতে একটা ক্ষুদ্র বিপ্লবী কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসই মোমেন্টাম তৈরি করতে পারে, ধরিয়ে দিতে পারে বিপ্লবের আগুন।[১৬] চে এবং পরে রেজিস দেব্রের হাত ধরে এই চিন্তা পরিচিতি পায় ফোকো তত্ত্ব (Foco Theory) হিসেবে।[১৭]

অন্যদিকে, চে, লেনিন আর মাও-এর চিন্তার বিভিন্ন দিককে এক করে ব্রাজিলের কার্লোস মারিঘেলা দিয়েছেন শহরকেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধের ধারণা। লড়াইকে তিনি গ্রাম থেকে আবার টেনে এনেছেন শহরে। তার যুক্তি ছিল, শহরের বুকে সংঘাত ছড়িয়ে দিতে পারলেই *সবকিছু সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে*, এই মিথ ভেঙে চুরমার করে দেওয়া সম্ভব।[১৮]

---

[১২] Leon Trotsky, *Lessons of October* (1924), in Leon Trotsky, *The Challenge of the Left Opposition* (1923–25), ed. Naomi Allen (New York: Pathfinder Press, 1975); Leon Trotsky, *The History of the Russian Revolution*, trans. Max Eastman, vol. 3 (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1967)

[১৩] Mao Zedong, "Problems of Strategy in China's Revolutionary War" (1936), in *Selected Works of Mao Tse-tung*, vol. 1 (Beijing: Foreign Languages Press, 1965); Mao Zedong, "On Protracted War" (May 1938), in *Selected Works of Mao Tse-tung*, vol. 2 (Beijing: Foreign Languages Press, 1965)

[১৪] Võ Nguyên Giáp, *People's War, People's Army* (New York: Praeger, 1962).

[১৫] Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth*, trans. Richard Philcox (New York: Grove Press, 2004). (Orig. pub. 1961.); Amílcar Cabral, *Revolution in Guinea: Selected Texts* (New York: Monthly Review Press, 1973).

[১৬] Ernesto "Che" Guevara, *Guerrilla Warfare* (1960) (Lincoln: University of Nebraska Press, 1998).

[১৭] Régis Debray, *Revolution in the Revolution? Armed Struggle and Political Struggle in Latin America* (New York: Monthly Review Press, 1967).

[১৮] Carlos Marighella, *Minimanual of the Urban Guerrilla* (1969) (New York: International Publishers, 1971).

ডানপন্থীদের বিশ্লেষণ

বামপন্থীদের মতো অতটা বিস্তারিত না হলেও, বিপ্লবের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে আলাপ করেছে পশ্চিমের ডানপন্থীরাও। কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনকে তারা কখনো আখ্যা দিয়েছে জাতির 'পুনর্জন্ম' বা 'নবজাগরণ' হিসেবে, কখনোবা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের কৌশল হিসেবে। তবে শব্দগুলোর পেছনে প্রশ্নটা সেই একই: কীভাবে বিদ্যমান কাঠামো উপড়ে ফেলে নতুন ব্যবস্থা কায়েম করা যায়?

১৯২০-এর দশকে ইউরোপের ডানপন্থীদের মধ্যে একটা গতিপথ স্পষ্ট হয়ে ওঠে; জনপরিসরে জবরদস্তির রাজনীতি।

তাদের কৌশল ছিল সোজাসাপ্টা। আধাসামরিক বাহিনী গড়ে তুলে রাজপথে সংঘাত আর সমাজে মেরুকরণ তৈরি করা, যাতে এক পর্যায়ে স্বাভাবিক শাসন অচল হয়ে যায়। আইনের শাসন যখন ভেঙে পড়ে, আর রাষ্ট্র অকেজো হতে শুরু করে, তখন এলিটরা দলবদল করে। পুরোনো কাঠামোর প্রতি আনুগত্য ছেড়ে ঝুঁকে পড়ে নতুন শক্তির দিকে।[১৯]

রাজপথের রাজনীতির এই পদ্ধতিকে সবচেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছে ইতালির ফ্যাসিস্টরা।

স্পেনের হোসে আন্তোনিও প্রিমো ডি রিভেরা এই ফোকাসটা একটু অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। এলিটদের পক্ষবদলের জন্য অপেক্ষা করার বদলে সশস্ত্র বিদ্রোহকে তিনি চিহ্নিত করলেন চূড়ান্ত আঘাত হানার পদ্ধতি হিসেবে। আর এই লক্ষ্যকে গেঁথে দিলেন রাজপথের শক্তি আর তরুণদের নিয়ে আধাসামরিক বাহিনী গড়ার মডেলের সাথে।[২০]

ভিন্ন একটা মাত্রা যোগ করলেন রোমানিয়ার লিজিওনারি আন্দোলনের কর্নেলিউ কডরিয়ানু। তার অবস্থান ছিল, বিপ্লবী ক্যাডারদের কেবল রাজপথের পেশিশক্তি হলেই চলবে না। শৃঙ্খলা, আত্মত্যাগ আর ইস্পাতকঠিন আদর্শ দিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে হবে খোদ রাষ্ট্রের বৈধতাকেও। জনপরিসরে নিরন্তর উপস্থিতি, প্রচারণা আর কাজের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিপরীতে গড়ে তুলতে হবে এক সমান্তরাল নৈতিক কাঠামো।

---

[১৯] Robert O. Paxton, *The Anatomy of Fascism* (New York: Alfred A. Knopf, 2004); Stanley G. Payne, *A History of Fascism, 1914–1945* (Madison: University of Wisconsin Press, 1995); Lyttelton, Adrian. *The Seizure of Power: Fascism in Italy, 1919–1929.* London: Routledge, 2004. First published 1973 by Weidenfeld and Nicolson.

[২০] Stanley G. Payne, *Falange: A History of Spanish Fascism* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1961); José Antonio Primo de Rivera, *Selected Writings*, ed. Hugh Thomas (London: Jonathan Cape, 1972).

অর্থনৈতিক ধস, সরকারের দমনপীড়ন অথবা সমাজের তীব্র মেরুকরণের ফলে বিদ্যমান ব্যবস্থা যখন নড়বড়ে হয়ে পড়বে, ক্ষমতাসীনরা মানুষের আস্থা হারাবে পুরোপুরি, সেই সংকটের মুহূর্তে বিপ্লবীরা নিজেদের হাজির করবে একমাত্র কার্যকর বিকল্প হিসেবে।[২১]

রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নে ডানপন্থীদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে স্পষ্ট আলোচনা করেছেন ইটালিয়ান ফ্যাসিস্ট লেখক কুর্তযিও মালাপার্তে। ব্লাঁকির মতো তিনিও ক্ষমতা দখলকে একটা টেকনিক্যাল সমস্যা হিসেবে দেখেছেন।

আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছড়িয়ে থাকে যোগাযোগ, প্রচারণা, প্রশাসনের মতো কিছু নির্দিষ্ট বিন্দুতে। মালাপার্তের যুক্তি হলো: রাষ্ট্রের এই স্নায়ুকেন্দ্রগুলো দখলে নিতে পারলে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ছাড়াই ক্ষমতা দখল সম্ভব।

তবে ব্লাঁকির সাথে তার পার্থক্য হলো, মালাপার্তে জনতার ভূমিকাকে পুরোপুরি নাকচ করেননি। আবার লেনিনের মতো জনগণকে বৈধতা বা ম্যান্ডেটের উৎস হিসেবেও দেখেননি। মালাপার্তের সমীকরণে জনগণ একটা কৌশলগত উপাদান (strategic element), যার কাজ রাষ্ট্রযন্ত্রকে সাময়িকভাবে অচল করে দেওয়া। কিন্তু ক্ষমতার পালাবদলের চাবিকাঠি হলো ঐ সুসংগঠিত বাহিনী, যারা সঠিক মুহূর্তে নিখুঁত কারিগরি ছকে রাষ্ট্রের স্নায়ুকেন্দ্রগুলো দখল করে নেবে।[২২]

মালাপার্তের অভিনবত্ব হলো, ডানপন্থী হলেও তিনি চিরশত্রু বামপন্থীদের—বিশেষ করে ব্লাকি, লেনিন এবং ট্রটস্কির—কৌশলকে গভীরভাবে পাঠ করেছেন। তার লক্ষ্য ছিল এমন এক সর্বজনীন 'টেকনিক' বা পদ্ধতি খুঁজে বের করা, যা আদর্শ নির্বিশেষে প্রয়োগ করা যায়।

ভিন্ন এক রণকৌশল উঠে আসে গত শতাব্দীর শেষভাগে, আমেরিকার মিলিশিয়া আন্দোলনের ভেতর থেকে। এই কৌশলের তাত্ত্বিক রূপকার লুইস বিম। তিনি দেখালেন, আধুনিক রাষ্ট্রের নজরদারি আর অনুপ্রবেশের ক্ষমতার সামনে পুরোনো পিরামিড ধাঁচের সশস্ত্র সংগঠন টিকতে পারবে না। রাষ্ট্র সহজেই এর মাথা কেটে ফেলবে। আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখতে হলে যেতে হবে নতুন কাঠামোতে।

সমাধান হিসেবে বিম সামনে আনলেন লিডারলেস রেসিস্ট্যান্স বা নেতাবিহীন প্রতিরোধের ধারণা। একক আদর্শ থাকবে, কিন্তু কোনো কেন্দ্রীয় কমান্ড বা নেতা থাকবে না। আন্দোলন ছড়িয়ে থাকবে হাজারো বিচ্ছিন্ন ও বিকেন্দ্রীভূত 'সেলে';

---

[২১] Corneliu Zelea Codreanu, *For My Legionaries* (1936).

[২২] Curzio Malaparte, *Technique du coup d'État* (Paris: Éditions Grasset, 1931). English trans.: Curzio Malaparte, *Coup d'État: The Technique of Revolution*, trans. Sylvia Saunders (New York: E. P. Dutton & Co., 1932).

ফলে এক অংশ ধসে গেলেও আন্দোলন টিকে থাকবে।[২৩]

নেতাবিহীন প্রতিরোধের মূল তত্ত্বটা ছিল ইউলিয়াস লুইস আমোস নামে মার্কিন এক গোয়েন্দা কর্মকর্তার। স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে শত্রুর মাটিতে অ্যামেরিকার গোয়েন্দারা কীভাবে টিকে থাকতে পারে, তা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে এই তত্ত্ব এনেছিলেন আমোস।[২৪] লুইস বীম এই মডেলকে পুনর্জীবিত করে মার্কিন শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী সশস্ত্র আন্দোলনের টিকে থাকার অস্ত্রে পরিণত করে।[২৫]

বাম ও ডানপন্থীদের সশস্ত্রপন্থার উল্টো পথে হেঁটেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জিন শার্প। অহিংস লড়াইয়ের ক্লসউইতয বলে খ্যাত শার্প তৈরি করেছেন নাগরিক প্রতিরোধের (civil resistance) মডেল। বলেছেন, শাসক টিকে থাকে কারণ জনগণ তাকে মেনে নেয়। এই আনুগত্য যদি সুসংগঠিতভাবে সরিয়ে নেওয়া যায়, তাহলেই স্বৈরাচারের খুঁটি নড়ে যায়, তার কর্তৃত্ব ভেঙে পড়ে।[২৬]

এই মডেলকে অ্যাকারম্যান আর ক্রুগলার নিয়ে গেছেন ক্যাম্পেইন লজিক বা রণকৌশলের স্তরে। তাদের কাছে অহিংস প্রতিরোধও এক ধরনের কৌশলগত যুদ্ধ; যার মূল অস্ত্র হলো ইস্পাতকঠিন শৃঙ্খলা, ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া (sequencing) আর চাপ প্রয়োগের সক্ষমতা।[২৭]

গবেষক এরিকা চেনোওয়েথ এবং মারিয়া স্টেফান সারা বিশ্বের ৩২৩টি ঘটনার পরিসংখ্যান ঘেটে দেখিয়েছেন, কোনো দেশের জনসংখ্যার ৩.৫% যদি রাস্তায় নেমে আসে, তাহলে সরকার পড়ে যায়।[২৮]

ওপরে বলা এই তাত্ত্বিকদের চিন্তা নানা মাত্রায় বিভিন্ন দেশে প্রয়োগ করা হয়েছে।

---

[২৩] Leaderless Resistance," *The Seditionist*, no. 12 (February 1992);

[২৪] Ulius L. Amoss Papers, 1941–1963, Archives West (Orbis Cascade Alliance)

[২৫] গত ২০ বছরের অ্যামেরিকা এবং ইউরোপে ঘটা বহু সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে লিডারলেস রেসিসট্যান্সের এই মডেলকে কাজে লাগিয়ে। বাম-ডান নির্বিশেষে বিভিন্ন ঘরানার লোকেরা এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। তবে নিয়মিত হামলা চালানোর ক্ষেত্রে সফল হলেও, মূল লক্ষ্য, বিদ্যমান কাঠামোর পরিবর্তন, অর্জনে এই পদ্ধতি এখনো সফল হয়নি। দেখুন, George Michael, *Lone Wolf Terror and the Rise of Leaderless Resistance* (Nashville: Vanderbilt University Press, 2012).

[২৬] Gene Sharp, *The Politics of Nonviolent Action*, 3 vols. (Boston: Porter Sargent, 1973).

[২৭] Peter Ackerman and Christopher Kruegler, *Strategic Nonviolent Conflict: The Dynamics of People Power in the Twentieth Century* (Westport, CT: Praeger, 1994).

[২৮] Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, *Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict* (New York: Columbia University Press, 2011)

ইসলামী ইনকিলাব

আধুনিক সময়ে মুসলিম চিন্তাবিদদের অনেকেই বিপ্লব, *সাওরাহ* বা ইনকিলাব নিয়ে কথা বলেছেন। অনেকে আবার এই আলোচনাকে ফ্রেইম করেছেন *তামকীন* বা শাসনকর্তৃত্ব অর্জনের মাধ্যমে ইসলামী শাসন কায়েমের প্রকল্প হিসেবে। তবে ঠিক কোন কৌশলে বিদ্যমান কাঠামোকে ভেঙে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা হবে, এই প্রশ্নে তাদের মধ্যে আছে স্পষ্ট মতভেদ।

সাইয়্যিদ কুতুব মুসলিমদের একটি 'অগ্রগামী দল' (তালিআহ্) গঠনের কথা বলেছেন। এই দলের কাজ হবে নিজেদের আধুনিক জাহিলিয়াতের স্রোত থেকে ছিঁড়ে এনে ইসলামের প্রথম প্রজন্মের ছাঁচে গড়ে তোলা। জাহিলিয়াতে ডুবে থাকা সমাজকে ইসলামের দিকে ডাকা।[২৯]

কুতুব জাহিলিয়াতের বাস্তবতা আর অগ্রগামী দলের দিকনির্দেশনা নিয়ে বিস্তর লিখেছেন। জোর দিয়ে বলেছেন, আজকের জাহিলি ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইসলাম কায়েম করা যাবে না। কিন্তু ক্ষমতা অর্জনের *নির্দিষ্ট মেকানিসম* কী, তা নিয়ে তাঁর লেখায় সুনির্দিষ্ট কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।

তিনি বলেছেন, অগ্রগামী দল মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে বদলাবে দাওয়াহ্র মাধ্যমে, আর জাহিলি ব্যবস্থার কর্তৃত্বকে উচ্ছেদ করবে শক্তি ও জিহাদের চূড়ান্ত আঘাতে। কিন্তু দাওয়াহ থেকে সংঘাত, আর তারপর শাসনকর্তৃত্বের পালাবদলের সংযোগ কীভাবে হবে, তা স্পষ্ট না। কুতুব এ নিয়ে আলোচনা করেননি বা করার সুযোগ পাননি। ফলে পরে তাঁর অবস্থান নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড়িয়েছে।

একই রকম সংগঠিত দলের কথা বলেছেন মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদীও। তবে বিদ্যমান কাঠামোর উচ্ছেদের বদলে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন ওপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসা ধাপে ধাপে রূপান্তরের দিকে। তাঁর মতে, সাধারণ মানুষ শাসকগোষ্ঠীরই অনুসরণ করে। তাই সমাজ বদলের চাবিকাঠি হলো নেতৃত্বের ইসলামীকরণ। মওদুদী জোর দিয়েছেন দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা, দাওয়াহ এবং সংগঠনের মাধ্যমে সৎ লোক তৈরি করে এক পর্যায়ে ক্ষমতার নিয়মতান্ত্রিক পালাবদলের ওপর।[৩০]

---

[২৯] সাইয়্যিদ কুতুব, *মাআলিম ফিত তারিক* (১৯৬৪); সাইয়্যিদ কুতুব ﷀ, *সমাজ বিপ্লবের রূপরেখা* (ঢাকা: আশ-শিফা পাবলিকেশন, ২০২৩)।

[৩০] Seyyed Vali Reza Nasr, *The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama'at-i Islami of Pakistan* (Berkeley: University of California Press, 1994), esp. his discussion of Mawdudi's understanding of revolution and gradual Islamization; the primary sources cited there include *Short Proceedings of the 2nd Annual Conference, Jamaat-e-Islami, East Pakistan,* March 14–16, 1958, 2 (enclosed with U.S. Consulate, Dacca, dispatch no.

কুতুব বলেছিলেন বিদ্যমান ব্যবস্থাকে শেকড়সহ উৎখাতের কথা, মওদুদী দিলেন সিস্টেমের ইসলামীকরণের প্রস্তাবনা। ইনকিলাব শব্দ ব্যবহার করলেও তার পথ মূলত পর্যায়ক্রমিক সংস্কারের।

মওদুদীর ধাপে ধাপে সংস্কারের বিপরীতে ইসরার আহমাদ ইনকিলাবকে সংজ্ঞায়িত করলেন সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এমন এক সর্বাত্মক রূপান্তর হিসেবে, যা নিয়মতান্ত্রিক পথে আসবে না। এখানে কুতুব আর তাঁর অবস্থান এক।

তবে কুতুবের আলোচনায় পদ্ধতি নিয়ে যে অস্পষ্টতা ছিল, ইসরার আহমাদ সেখানে স্পষ্ট রোডম্যাপ হাজির করলেন। তিনি ইসলামী বিপ্লবকে দেখালেন ৬টি সুনির্দিষ্ট ধাপে সাজানো প্রক্রিয়া হিসেবে।[৩১] শাসনকর্তৃত্ব অর্জনের মেকানিসম হিসেবে গণঅভ্যুত্থানকে সামনে আনলেন। বাংলাদেশের মাওলানা আবদুর রহীমও ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি হিসেবে গণঅভ্যুত্থানের কথা বলেছেন।[৩২]

ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন জর্ডানের মুফতি তাকীউদ্দিন নাবহানী। আদর্শিক প্রচারণার সাথে তিনি জোর দিয়েছেন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুগুলোর ওপর; বিশেষ করে রাষ্ট্রের সেই শক্তিগুলোর প্রতি, যাদের বলপ্রয়োগের সক্ষমতা আছে। তাঁর প্রস্তাব ছিল এদের কাছ থেকে 'নুসরাহ' বা সক্রিয় সমর্থন আদায় করা।[৩৩] কার্যত এর অর্থ দাঁড়ায়, সামরিক বাহিনীর একটা অংশকে আদর্শিকভাবে প্রভাবিত করে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করা।

অন্যদিকে মিশরসহ আরবের অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম ও বিপ্লবী বেছে নিলেন সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ। তাঁরা বললেন জিহাদের মাধ্যমে শাসনকর্তৃত্ব অর্জনের কথা। এ ধারার প্রথম দিকের চিন্তাবিদদের মধ্যে মারওয়ান হাদীদ, সালেহ সিররিয়াহ, ইসাম আল ক্বামারী, আবদুস সালাম ফারাজ, উমার আবদুর রহমান এবং ড. আইমান আয-যাওয়াহিরি উল্লেখযোগ্য।[৩৪]

247, April 3, 1958, 790D.00/4-358, National Archives), and *Nawa'-i Waqt* (October 25, 1978): 1. For a more detailed treatment, see Seyyed Vali Reza Nasr, "The Politics of an Islamic Movement: The Jama'at-i Islami of Pakistan" (PhD diss., Massachusetts Institute of Technology, 1991).

[৩১] Israr Ahmad, *The Prophet's Strategy for Islamic Revolution* (Lahore: Tanzeem-e-Islami, 2008); ড. ইসরার আহমাদ, *দ্বীন কায়েমের নববী রূপরেখা* (ঢাকা: প্রচ্ছদ প্রকাশন, ২০২১)।

[৩২] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *গণতন্ত্র নয় পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব* (১৯৮৫); *বাংলাদেশের মুসলমানরা মজলুম ও মাহরুম* (১৯৮৫); এবং, *প্রচলিত রাজনীতি নয় জিহাদই কাম্য* (খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৬)।

[৩৩] Taqiuddin al-Nabhani, *Structuring of a Party (Attakattul al-Hizbi)*; Suhailah (A.) Taji-Farouki, *A Fundamental Quest: Hizb al-Tahrir and the Search for the Islamic Caliphate* (1996).

[৩৪] Jerome Drevon, *Institutionalizing Violence: Strategies of Jihad in Egypt* (Oxford: Oxford University Press, 2022); Johannes J. G. Jansen, *The Neglected Duty: The Creed of Sadat's Assassins and Islamic Resurgence in the Middle East* (New York: Macmillan,

কিন্তু সশস্ত্র পন্থার মনোযোগটা ভিন্ন ক্যানভাসে সরিয়ে আনলেন ড. আব্দুল্লাহ আযযাম। ৬০ ও ৭০ এর দশকে প্রস্তাবিত স্থানীয় পর্যায়ে জিহাদের ধারণাকে তিনি বৈশ্বিক লড়াইয়ে পরিণত করলেন। এমন এক বাহিনীর কথা বললেন, যারা বিভিন্ন দেশে সরকার উৎখাতের বদলে বিশ্বজুড়ে আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ মুসলিম জনপদগুলো রক্ষাকে প্রাধান্য দেবে। এভাবে যে সক্ষমতা, অভিজ্ঞতা এবং বাহিনী তৈরি হবে, তা প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে বিদ্রোহের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।[৩৫]

আযযামের পরে বৈশ্বিক লড়াইয়ের এই তত্ত্বের সাথে যুক্ত হলো 'স্থানীয় ইমারত'-এর ধারণা। পরের প্রজন্মের স্ট্র্যাটিজিস্টদের কৌশলগত সিদ্ধান্ত ছিল—সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে শাসনকর্তৃত্ব অর্জনের চেষ্টা কেবল সেখানেই হবে, যেখানে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধ চালানো সম্ভব অথবা বৈদেশিক আগ্রাসন বা অন্য কোনো কারণে যেখানে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে। আর যে ভূখণ্ডগুলো নানা কারণে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের জন্য অনুপযুক্ত, সেখানে এই ফরম্যাটে সরকার উৎখাত আর শাসনকর্তৃত্ব অর্জনের চেষ্টা করা হবে না।[৩৬]

লক্ষণীয় যে, এই সব চিন্তাবিদই তাঁদের অবস্থানের বৈধতা খুঁজেছেন কুরআন ও সুন্নাহয়। রাসূল ﷺ-এর মক্কা ও মদীনা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়কে তাঁরা নিজেদের মডেলের ভিত্তি হিসেবে দেখেছেন। রাহিমাহুমুল্লাহ।

তবে উৎস এবং গন্তব্য এক হলেও, তাঁদের প্রস্তাবিত পথগুলো আলাদা।[৩৭]

1986); Gilles Kepel, *Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and Pharaoh* (Berkeley: University of California Press, 2003); Ayman al-Zawahiri, *Fursan Tahta Rayat al-Nabi (Knights Under the Prophet's Banner)* (2001); Brynjar Lia, "The Islamist Uprising in Syria, 1976–82: The History and Legacy of a Failed Revolt," *British Journal of Middle Eastern Studies* 43, no. 4 (2016): 541–559.

[৩৫] ʿAbd Allāh ʿAzzām, *Defense of the Muslim Lands: The First Obligation after Īmān*; ʿAbd Allāh ʿAzzām, *al-Tarbiya al-Jihādiyya wa'l-Binā'*; Thomas Hegghammer, *The Caravan: Abdallah Azzam and the Rise of Global Jihad* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020).

[৩৬] Abu Bakr Naji, *The Management of Savagery*, trans. William McCants (Cambridge, MA: John M. Olin Institute for Strategic Studies, Harvard University, 2006); MS, Nasar. Daʿwat al-Muqāwamah al-Islāmiyyah al-ʿĀlamiyyah. 2004; Tore Refslund Hamming, "Global Jihadism after the Syria War," *Terrorism and Political Violence* (2019); Fawaz A. Gerges, *The Far Enemy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005); Lawrence Wright, *The Looming Tower* (New York: Alfred A. Knopf, 2006).

[৩৭] এর বাইরে বিপ্লব নিয়ে আলোচনা করেছেন আলজেরিয়ার মালেক বেননাবি এবং ইরানের আলী শারিয়াতি-ও। তবে তাদের আলোচনা পদ্ধতির বদলে বিপ্লবের সম্ভাবনার যমীন নিয়ে। তারা কাজ করেছেন সেই সভ্যতাগত, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক পূর্বশর্তগুলো নিয়ে, যার ফলে বিপ্লব সম্ভব হয়ে ওঠে। ইরানের রুহুল্লাহ খোমেনি শিয়া বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু বিপ্লব কীভাবে, এ নিয়ে তার বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না।

বিপ্লবের গতিপথ

বিপ্লব নিয়ে গবেষণার ভান্ডার বিশাল। কিন্তু অ্যাকাডেমিক গবেষকদের সিংহভাগ কাজ ঘুরপাক খায় দুটো মৌলিক প্রশ্নকে ঘিরে:

> কেন একটা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে?
>
> বিজয়ের পর বিপ্লবীরা কী করে?

অন্যদিকে ইসলামপন্থীসহ বিভিন্ন ঘরানার তাত্ত্বিক বা মতাদর্শিকরা আলোচনা করেন বিপ্লব কেন প্রয়োজন, আর এ ব্যাপারে তাদের নিজস্ব প্রস্তাবনার বিশদ বিবরণ নিয়ে। বৈপ্লবিক রূপান্তরের মেকানিসম বা গতিপথের তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিয়ে কাজ হয়েছে কম।

কিছু ব্যতিক্রম আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মার্ক এন ক্যাটয যেমন *Revolutions and Revolutionary Waves* নামের বইতে পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিপ্লবের কয়েকটি ধরন চিহ্নিত করেছেন। যেমন:

- **গ্রামীণ বিদ্রোহ:** গ্রাম থেকে শুরু হওয়া গেরিলা যুদ্ধ, যা একসময় কেন্দ্র ঘেরাও করে।
- **শহুরে অভ্যুত্থান:** শহরের শ্রমিক, শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মানুষের সশস্ত্র বা নিরস্ত্র গণআন্দোলন।
- **ক্যু'দে তা (সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান):** দেশীয় এলিট এবং সামরিক বাহিনীর এক অংশের হঠাৎ করে ক্ষমতা দখল।
- **বিদেশি হস্তক্ষেপ:** বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া পরিবর্তন।[৩৮]

ক্যাটযের এই উপসংহারের সমর্থন মেলে অন্যান্য তুলনামূলক গবেষণাতেও।

জেফ গুডউইন দেখিয়েছেন, বিপ্লবেরর ধারা একেক জায়গায় একেক রকম। কোথাও পালাবদল আসে শৃঙ্খলিত বিপ্লবী সংগঠনের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিদ্রোহে; কোথাও আসে রাজপথের গণজাগরণে।[৩৯]

এরিকা চেনোওয়েথ আর মারিয়া স্টেফান আলোচনা করেছেন অহিংস নাগরিক প্রতিরোধ আর সশস্ত্র সংগ্রামের তুলনামূলক সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে।[৪০]

---

[৩৮] Mark N. Katz, *Revolutions and Revolutionary Waves* (New York: St. Martin's Press, 1997).

[৩৯] Jeff Goodwin, *No Other Way Out: States and Revolutionary Movements, 1945–1991* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

[৪০] Erica Chenoweth and Maria J. Stephan, *Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict* (New York: Columbia University Press, 2011).

ব্যারিংটন মুর তার বিখ্যাত বই *Social Origins of Dictatorship and Democracy*-তে যেগুলোকে 'বুর্জোয়া বিপ্লব' বলেছেন (যেমন ফরাসি বিপ্লব), সেগুলো হয়েছে মূলত নগরকেন্দ্রিক গণঅভ্যুত্থান আর বিদ্রোহের মাধ্যমে। অন্যদিকে যেগুলোকে তিনি 'কৃষক বিপ্লব' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (যেমন চীন), সেগুলো এগিয়েছে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধ আর গ্রামীণ বিদ্রোহের পথ ধরে।[৪১]

পেরেয যাগোরিন প্রাক-আধুনিক ইউরোপের বিপ্লবী সংঘাতগুলো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কয়েকটি আলাদা পথ চিহ্নিত করেছেন: নগর বিদ্রোহ, গ্রামীণ/কৃষক বিদ্রোহ, প্রাদেশিক/আঞ্চলিক বিদ্রোহ, সর্বাত্মক গৃহযুদ্ধ এবং এলিটদের ষড়যন্ত্র।[৪২] সময়কাল ভিন্ন হলেও, প্রাক-আধুনিক বিপ্লব নিয়ে এই পর্যবেক্ষণ আধুনিক বিপ্লবের ব্যাপারে ক্যাটযের বিশ্লেষণের সাথেই মিলে যায়।

ইসলামী ঘরানার স্ট্র্যাটেজিক আলোচনাতেও মাঝে মাঝে বিপ্লবের বিভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। আধুনিক লেখকদের কারও মতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তামকীন অর্জনের পথ দুটো: গ্রামীণ ও নগরকেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধ, আর যেখানে গেরিলা লড়াই সম্ভব না, সেখানে বাইরে থেকে আসা সহায়তা।[৪৩]

আবার কারও মতে, ইনকিলাবি রূপান্তরের পথ চারটি: গেরিলা যুদ্ধ, সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান, নিরস্ত্র গণঅভ্যুত্থান এবং গতানুগতিক গৃহযুদ্ধ (conventional civil war)।[৪৪]

সূচনা বিন্দু আর মূল লক্ষ্য ভিন্ন হলেও এসব গবেষণার উপসংহারগুলো কাছাকাছি। মতাদর্শকে সরিয়ে রেখে গতিপথ ও পদ্ধতির দিকে তাকালে দেখা যায়, বৈপ্লবিক রূপান্তরের পথ ঘুরেফিরে এই কয়টিই।

তবে খুব কম গবেষণাই এই পথগুলোকে এক ফ্রেমে এনে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছে বা স্পষ্ট টাইপোলোজিতে সাজিয়েছে। কিন্তু আমাদের আলোচনার জন্য এটাই সবচেয়ে জরুরি।

---

[৪১] Barrington Moore, Jr., *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World* (Boston: Beacon Press, 1966).

[৪২] Perez Zagorin, *Rebels and Rulers, 1500–1660*, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1982); Mark N. Katz, *Revolutions and Revolutionary Waves* (New York: St. Martin's Press, 1999).

[৪৩] Abu Bakr Naji, *The Management of Savagery.*

[৪৪] Muḥammad Zaydān, *al-Ṣirā': Kitāb al-Thawrah*, electronic ed., al-Maktaba al-Shāmila al-Dhahabiyya

তাই বিভিন্ন বিপ্লব, বিপ্লবের চেষ্টা আর তার পেছনের কৌশলগুলোকে এক সাথে সাজিয়ে আমরা দেখতে চাই রূপান্তর কখন, কোন পথ ধরে আসে। কীভাবে ঘটে শাসনকাঠামোর প্রতিস্থাপন।

সেই আলোচনাতে যাবার আগে দুটো কথা বলে রাখি।

প্রথমত, এ আলোচনা কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ নিয়ে না, পদ্ধতি নিয়ে।

দ্বিতীয়ত, এটা কোনো শারঈ বা ফিকহি আলোচনা না, বরং ইতিহাসের পাতা থেকে প্যাটার্ন বা ছক খুঁজে বের করার নির্মোহ চেষ্টা।

বৈপ্লবিক রূপান্তরের পথপরিক্রমা

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, গত আড়াইশ বছরে বৈপ্লবিক রূপান্তর এসেছে মূলত তিন পথে:

- **বহিরাগত শক্তির হস্তক্ষেপ:** বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া পরিবর্তন।
- **দীর্ঘমেয়াদি সশস্ত্র সংগ্রাম:** গৃহযুদ্ধ (Conventional civil war), গেরিলা যুদ্ধ ইত্যাদি।
- **গণঅভ্যুত্থান:** নিরস্ত্র অথবা সশস্ত্র।

আসুন, ইতিহাসের পাতা থেকে এই পদ্ধতিগুলোর কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যাক।

বহিরাগত শক্তির হস্তক্ষেপ

ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে বাইরের কোনো শক্তির হস্তক্ষেপে একটা অঞ্চলের শাসনকাঠামো পুরোপুরি ভেঙে গেছে। তারপর সেখানে নতুন আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়েছে নতুন শাসনব্যবস্থা।

বিখ্যাত কিছু উদাহরণ দেখা যাক।

নেপোলিয়নিক যুদ্ধ

নেপোলিয়নের সামরিক অভিযানের ফলে ইউরোপের নানা অঞ্চলে পুরোনো রাজতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণে তখন নতুন কিছু রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, যেগুলোর ভিত্তি ছিল ফরাসি বিপ্লবের রিপাবলিকান আদর্শ। এই পরিবর্তনের প্রভাবেই পুরো ইউরোপে জাতীয়তাবাদ, আধুনিক আইন আর নাগরিক রাষ্ট্রের ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে সেখানকার শাসনব্যবস্থা এবং সমাজে এক ধরনের গভীর পরিবর্তন ঘটে।

ইস্টার্ন ব্লক: পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্র

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের দখল করা ভূখণ্ডগুলোতে পুরোনো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সরিয়ে দিয়ে সোভিয়েত ঘরানার একদলীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করে দেয়। এর মধ্যে পূর্ব জার্মানি, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া এবং রোমানিয়া উল্লেখযোগ্য।

এগুলো নিছক সরকার পরিবর্তন (রিজিম চেইঞ্জ) ছিল না। এখানে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী মডেল অনুসরণ করে রাষ্ট্রের আইনি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর আদর্শিক রূপান্তর ঘটেছিল।

এই পরিবর্তনগুলোর পেছনে নানা কারণ থাকলেও, এর পেছনে মূল শক্তি ছিল সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি। যা রাষ্ট্রের কাঠামো ও সমাজের মৌলিক পরিবর্তন নিশ্চিত করেছিল।

উত্তর কোরিয়া

এই প্রক্রিয়ার আরেকটা উদাহরণ হলো উত্তর কোরিয়া। জাপানের দখলদারিত্বের অবসানের পর সোভিয়েত সামরিক প্রশাসনের অধীনে সেখানে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে। জাপানবিরোধী গেরিলা লড়াইয়ের নেতা কিম ইল সাংয়ের নেতৃত্বে তৈরি হয় একনায়কতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। এখানেও পুরোনো কাঠামো ভেঙে দিয়ে বহিরাগত সহায়তায় গড়ে ওঠে নতুন আদর্শিক রাষ্ট্র।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ

নিকট অতীতে বহিরাগত শক্তির হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা এবং সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টার একটা উদাহরণ পাওয়া যায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহেলভী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর জীবনে।

আঠারো শতকে যখন হিন্দুস্তানের মুসলিম সমাজ গভীর রাজনৈতিক আর নৈতিক সংকটে পড়েছিল, তখন শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী সমাজ পরিবর্তনের জন্য ইসলামী জ্ঞানের পুনর্জাগরণের ধারা শুরু করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার সাথে জড়িয়ে আছে আজকের দেওবন্দী, আহলে হাদীস আর বালাকোটি সুন্নী ধারার শেকড়।

পাশাপাশি তিনি রাজনৈতিক বিপর্যয় মোকাবিলার জন্যও পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আফগান শাসক আহমদ শাহ আবদালিকে চিঠি লিখে তিনি মারাঠাদের জুলুমের

কথা তুলে ধরেন। ইসলাম আর মুসলমানদের রক্ষা করা যে একজন মুসলিম শাসকের দায়িত্ব, এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবদালিকে হিন্দুস্তানে সামরিক অভিযান চালানোর আহ্বান জানান।[৪৫]

রেশমি রুমাল আন্দোলন

প্রায় দেড়শো বছর পর রেশমি রুমাল আন্দোলনেও অনেকটা একই ধরনের পরিকল্পনা দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী। যোগাযোগ করেন আফগানিস্তানের আমীর, উসমানীদের প্রতিনিধি এবং জার্মান দূতদের সাথে।

পরিকল্পনা ছিল, আফগানিস্তানের আমীরকে ভারতে বাহিনী পাঠাতে রাজি করানো হবে। সমর্থন আর সহায়তা দেবে উসমানী আর জার্মানরা। একই সময়ে হিন্দুস্তানের মুসলিমরা দেশের ভেতরে জিহাদ শুরু করবে।[৪৬]

আধুনিক সময়ের আগে, বলা যায় দেড়শো বছর আগ পর্যন্ত, শাসনব্যবস্থা বদলে দেওয়ার সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি ছিল বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী শাসনের বিস্তার ঘটেছিল মূলত খিলাফত অথবা বিভিন্ন সালতানাতের সামরিক অভিযানের মাধ্যমে। এই উপমহাদেশেও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে মুহাম্মাদ বিন কাসিম, মাহমুদ গাযনভী কিংবা ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজিদের হাত ধরে।

মনে রাখা দরকার, বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপে যে রূপান্তর ঘটে, সেগুলো আভ্যন্তরীণ কোনো আন্দোলনের ফসল না। এখানে পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি আসে বাইরে থেকে।

তবে ১৯৬০ এর দশকের পর থেকে এভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলে যাওয়ার উদাহরণ অনেক কমে এসেছে।

---

[৪৫] Irfan M. Habib, "The Political Role of Shaikh Ahmad Sirhindi and Shah Waliullah," in *Proceedings of the Indian History Congress*, vol. 23, pt. 1 (1960): 209–223.

[৪৬] M. Naeem Qureshi, *Pan-Islam in British Indian Politics: A Study of the Khilafat Movement, 1918–1924* (Leiden: Brill, 1999); S. Kelly, "'Crazy in the Extreme'? The Silk Letters Conspiracy," *Modern Asian Studies* 47, no. 3 (2013).

সশস্ত্র সংগ্রাম

অনেক ক্ষেত্রেই বৈপ্লবিক রূপান্তর এসেছে দীর্ঘমেয়াদি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। অর্থাৎ, সংঘাতের মধ্য দিয়ে পুরোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা ধীরে ধীরে ধসে পড়েছে, তার জায়গায় জন্ম নিয়েছে নতুন কাঠামো। কখনো গেরিলা যুদ্ধ, কখনো গৃহযুদ্ধ, আবার কখনো বিদেশি আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমে এই ধরনের বিপ্লবের পথ তৈরি হয়েছে।

আসুন, কিছু উদাহরণ দেখা যাক।

অ্যামেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ

এই লড়াই শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ১৩টি উপনিবেশের বিদ্রোহ হিসেবে। করের বোঝা, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের অনুপস্থিতি এবং সেনাশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের মনে ক্ষোভ ছিল প্রচুর। সেই ক্ষোভ থেকেই শুরু হয় আন্দোলন। এক পর্যায়ে উপনিবেশগুলো কনটিনেন্টাল কংগ্রেস তৈরি করে। ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। শুরু হয় পুরোদমে যুদ্ধ।

লড়াইটা হয়েছিল প্রচলিত ধাঁচে। একদিকে বিপ্লবীদের কনটিনেন্টাল আর্মি, আর অন্যদিকে পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সেনাবাহিনী। ফ্রান্সসহ কিছু বিদেশি শক্তি এই যুদ্ধে বিদ্রোহীদের সহায়তা দেয়।

দীর্ঘ আট বছর যুদ্ধের পর, ১৭৮৩ সালে প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশরা হার মেনে নেয়। ভেঙে যায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন। আর সেই ভাঙনের ওপর জন্ম নেয় আধুনিক বিশ্বের প্রথম সাংবিধানিক রিপাবলিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লব

মাও সেতুংয়ের নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রায় দুই দশক ধরে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল। তাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল জাতীয়তাবাদী সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করা। এজন্য তারা ঘাঁটি হিসেবে গ্রহণ করে গ্রামীণ অঞ্চলগুলোকে।

কিন্তু লড়াই চলা অবস্থাতেই ১৯৩৭ সালে চীনকে আক্রমণ করে বসে জাপান। জাপানি আগ্রাসনের মুখে কমিউনিস্ট ও জাতীয়তাবাদীদের এক টানাপোড়েনের জোট গড়ে ওঠে। জাতীয় মুক্তির যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কমিউনিস্টরা

একদিকে নিজেদের শক্তি বাড়ায়, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের সমর্থনও আদায় করে নেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হওয়ার পর অসমাপ্ত গৃহযুদ্ধ আবার শুরু হয়। ধাপে ধাপে জাতীয়তাবাদী সরকারকে দুর্বল করে ফেলে কমিউনিস্টরা। ঘিরে ফেলে শহরগুলো। অবশেষে ১৯৪৯ সালে বেইজিং নিয়ন্ত্রণে আসার পর রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নেয় তারা। পুরোনো ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে প্রতিষ্ঠা করে 'পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না'; আজকের গণচীন।

কিউবার বিপ্লব

ফিদেল কাস্ত্রো আর চে গুয়েভারার নেতৃত্বে সিয়েরা মায়েস্ত্রা নামের পাহাড়ের দুর্গম এলাকাকে ঘাঁটি বানিয়ে মার্কিন সমর্থিত বাতিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা লড়াই শুরু করে বিপ্লবীরা।

মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর দেশজুড়ে সরকারবিরোধী রাজনীতির উত্তাল এই পটভূমিতে গেরিলারা হয়ে উঠে আন্দোলনের ভরকেন্দ্র। তারা এক ছাতার নিচে সংঘবদ্ধ করে গ্রামের কৃষক আর শহুরে বিপ্লবীদের। সরকারি বাহিনীর ওপর একের পর এক হামলা চালিয়ে রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে চূড়ান্তভাবে অস্থিতিশীল করে তোলে। অন্যদিকে ক্রমাগত সামরিক ব্যর্থতা আর জনসমর্থনের ঘাটতির কারণে বাতিস্তা শাসনের ভিত নড়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত ১৯৫৯ সালে বাতিস্তা দেশ ছেড়ে পালায়। গেরিলারা ক্ষমতা দখল করে। ১৯৬১ সালে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষণা করে কিউবাকে।

প্রথম আফগান ইমারত (১৯৯৪-২০০১)

প্রায় দশ বছরের দীর্ঘ যুদ্ধের পর ১৯৮৯-এ সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তান ছেড়ে যাবার সাথে সাথে শুরু হয়ে যায় ক্ষমতার কাড়াকাড়ি। দেশজুড়ে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা। ওয়ারলর্ডদের দৌরাত্ম্যে মানুষ তখন অতিষ্ঠ। পথে পথে ডাকাতি, অপহরণ, ধর্ষণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

এই পরিস্থিতিতে কান্দাহারের এক অখ্যাত মাদরাসা শিক্ষক, মোল্লা উমার (রাহিমাহুল্লাহ) শুরু করেন তালিবান আন্দোলন। ত্রিশ জন মাদরাসা ছাত্র, আর ১৬টি রাইফেল নিয়ে। ওয়ারলর্ডদের অরাজকতা থামাতে মাঠে নামে

তাঁরা। তারপর অবিশ্বাস্য দ্রুততায় দখল করতে থাকে একের পর এক এলাকা। গেরিলা যুদ্ধের বদলে অনেক ক্ষেত্রে তালিবানদের লড়াই চলে প্রথাগত সামরিক অভিযানের (Conventional Military Conquest) আদলে।

১৯৯৬ সালে কাবুল বিজয় হয়। বিদ্যমান কাঠামো বাতিল করে ইসলামী ইমারত ঘোষণা করে তালিবান।

দ্বিতীয় আফগান ইমারত (২০২১-চলমান)

২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্র আগ্রাসন চালালে প্রথম ইমারতের পতন ঘটে। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই সীমান্তবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে তালিবান ও তাদের আরব সহযোদ্ধারা সংগঠিত হতে শুরু করে। ঘাঁটি গাড়ে পাকিস্তানের ওয়াযিরিস্তান, কোয়েটা ও অন্যান্য পশতুন অধ্যুষিত এলাকায়।

আফগান ও পাকিস্তানের পশতুন গোত্রগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের সীমানার চেয়ে অনেক পুরোনো। গোত্রীয় অঞ্চলে মুজাহিদরা পায় নিরাপদ আশ্রয়, রসদ, যোদ্ধা ও জনভিত্তি।

২০০২ এর শেষ দিক থেকে তালিবানরা গেরিলা প্রতিরোধ শুরু করে। ক্রমাগত আক্রমণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে দুর্বল করে তোলে ন্যাটো বাহিনীকে। লড়াই চলে পরের প্রায় কুড়ি বছর। এক পর্যায়ে সেনা প্রত্যাহারে বাধ্য হয় যুক্তরাষ্ট্র। ২০২১-এর অগাস্টে বিদ্যুৎগতিতে একের পর এক প্রদেশ দখল করে নেয় তালিবান। ১৫-ই অগাস্ট কাবুল মুক্ত হয়।

মার্কিন সমর্থিত রাষ্ট্রকাঠামো বাতিল করে দ্বিতীয় দফায় ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠা হয়। শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার এই লড়াই চলে গেরিলা যুদ্ধের ধাঁচে।[৪৭]

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

অনেকটা একই ধরনের গল্প দেখা যায় ভিয়েতনাম (১৯৭৬), লাওস (১৯৭৫), এবং ক্যাম্বোডিয়াতে (খেমার রুজ, ১৯৭৫ সালে)।

---

[৪৭] Antonio Giustozzi, *The Taliban at War, 2001–2018* (London: Hurst, 2019); Dziedzic, Stephen. "Taliban's Return to Power in Afghanistan Shows Mao Zedong's Lessons Still Apply." *ABC News (Australia)*, August 19, 2021.

এসব দেশেও দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা লড়াই আর গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পুরোনো উপনিবেশ-সমর্থিত বা পশ্চিমা ঘরানার শাসনব্যবস্থাগুলো ধসে পড়ে। তারপর নতুন রাষ্ট্র গড়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে।

ভিয়েতনামের ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানকার কমিউনিস্টরা প্রথমে ফ্রান্স আর তারপর যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ১৯৭৩-এ মার্কিন সেনা প্রত্যাহার আর ১৯৭৫-এ সাইগনের পতনের পর দক্ষিণ ভিয়েতনাম উত্তরের সঙ্গে একীভূত হয়। ৭৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ভিয়েতনাম।

গেরিলা বনাম সশস্ত্র সংগ্রাম

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। সশস্ত্র সংগ্রাম মানেই গেরিলা যুদ্ধ না। গেরিলা যুদ্ধ সশস্ত্র সংঘাতের একটা বিশেষ কৌশল, একটা নির্দিষ্ট ধারা। এ-ধরনের লড়াইয়ের মূল বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যন্ত জনপদ থেকে ধীরে ধীরে শহর ঘেরাও করা।

গেরিলা যুদ্ধের লক্ষ্য হলো দীর্ঘমেয়াদি লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের ক্ষমতাকে তিলে তিলে নষ্ট করে দেওয়া। এই পদ্ধতিকে অনেকে বিপ্লবী জনযুদ্ধ বা Revolutionary People's War-ও বলে থাকেন।

তালিবানরা যখন প্রথমবার ইমারত প্রতিষ্ঠা করে, সেটা কিন্তু গেরিলা কায়দায় হয়নি। নিয়মিত সামরিক বাহিনী না হলেও তাদের যুদ্ধ করার ধরনটা ছিল প্রচলিত যুদ্ধের কাছাকাছি। গেরিলা কৌশলের চেয়ে এখানে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল দ্রুতগতির অভিযানের (mobile armed conquest) মাধ্যমে এলাকা দখল করে এগিয়ে যাওয়ার ওপর।

অন্যদিকে তারা যখন দ্বিতীয়বার ইমারত প্রতিষ্ঠা করে, তখন সেটা ছিল ধ্রুপদী গেরিলা যুদ্ধের উদাহরণ: দীর্ঘ প্রতিরোধ, সীমান্তবর্তী দুর্গম ঘাঁটি অঞ্চল থেকে ধাপে ধাপে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং ব্যাপক জনসমর্থনকে কাজে লাগিয়ে পুরো রাষ্ট্রকাঠামো ধসিয়ে দেওয়া।

সব সশস্ত্র লড়াইয়ে গেরিলা কৌশল ব্যবহার হয় না। আবার অনেক যুদ্ধে গেরিলা কৌশল ব্যবহার হলেও, সেটা লড়াইয়ের মূল ভিত্তি হিসেবে থাকে না। অন্যান্য কৌশলের সাথে সম্পূরক হিসেবে ব্যবহার হয়।

কাজেই সব গেরিলা যুদ্ধই সশস্ত্র সংগ্রাম, কিন্তু সব সশস্ত্র সংগ্রাম গেরিলা যুদ্ধ না। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে, কৌশল ও বাস্তবতার ভিত্তিতে সশস্ত্র লড়াইয়ের ধরন ভিন্ন হয়ে থাকে।[৪৮]

গণঅভ্যুত্থান

গণঅভ্যুত্থান দু' ধরনের হতে পারে—নিরস্ত্র অথবা সশস্ত্র। দুটো ক্ষেত্রেই ব্যাপক জনসমর্থন আর গণজমায়েতের প্রয়োজন হয়। দু' ক্ষেত্রেই বিপ্লবীরা প্রথমে সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতার কেন্দ্র (শহর/রাজধানী) দখলে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আনে বাকি অঞ্চলগুলো।

অনেক সময় কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বৈপ্লবিক রূপান্তরের বেশ কিছু বিখ্যাত উদাহরণ আছে।

ফরাসি বিপ্লব

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে গভীর সংকটে ভুগছিল ফ্রান্স। রাজপরিবারের বিলাসী জীবন আর যুদ্ধের খরচ মেটাতে গিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর চাপানো হয়েছিল করের পাহাড়। রুটির দাম তখন আকাশছোঁয়া, দুর্ভিক্ষের কবলে গ্রামের পর গ্রাম।

জনগণের তীব্র অসন্তোষের সাথে যুক্ত হয়েছিল এনলাইটেনমেন্টের আদর্শ। ফলে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আদর্শিক বিরোধিতাও সমাজে দানা বাঁধছিল। আশির দশকের শেষ নাগাদ প্যারিসের অবস্থা হয়ে উঠেছিল বারুদ বোঝাই ড্রামের মতো।

এই বারুদে আগুন লাগল ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই। প্যারিসের সাধারণ মানুষ হাতে যা পেল, তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গে। ক্ষমতাসীনদের

---

[৪৮] প্রথাগত সশস্ত্র সংগ্রাম বনাম গেরিলা যুদ্ধের (Guerrilla Warfare) পদ্ধতিগত ও কৌশলগত পার্থক্যের তাত্ত্বিক কাঠামোর জন্য দেখুন: Mao Zedong, *On Guerrilla Warfare* (1937; repr., Quantico, VA: Marine Corps Association, 1989); এবং Robert Taber, *The War of the Flea: A Study of Guerrilla Warfare Theory and Practice* (New York: Lyle Stuart, 1965)। ১৯৯০-এর দশকে তালিবানের প্রথম পর্যায়ের উত্থান যে গেরিলা যুদ্ধের বদলে নেটওয়ার্কভিত্তিক দ্রুতগতির সামরিক অভিযান বা 'মোবাইল কনকোয়েস্ট' ছিল এবং ২০০১ এর পর তালিবানের রণকৌশল কীভাবে ইনসার্জেন্সি বা গেরিলা যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়, তার বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন: Antonio Giustozzi, *Taliban Networks in Afghanistan* (Newport, RI: Naval War College, 2012)।

দমনপীড়নের প্রতীক বলে পরিচিত বাস্তিলের পতন রাজতন্ত্রের ভিত কাঁপিয়ে দিল। অবস্থা বেগতিক দেখে লুই ষোড়শ শেষ পর্যন্ত ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। এরপর একে একে আসলো 'ডিক্লারেশন অফ দ্য রাইটস অফ ম্যান' আর নতুন সংবিধান। গঠিত হলো সাংবিধানিক রাজতন্ত্র।

কিন্তু পরিস্থিতি শান্ত হলো না, গণবিক্ষোভ চলতে থাকল।

প্যারিসসহ বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠল 'সেকশন' নামে পরিচিত স্থানীয় গণকমিটি। মাঠপর্যায়ের বাস্তব ক্ষমতা চলে গেল সেকশনগুলোর হাতে। নাগরিকদের নিয়ে গঠিত এই কমিটিগুলো রাস্তাঘাট, বাজার, খাদ্য সরবরাহ, নিরাপত্তা ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল। ক্রমশ দুর্বল হতে থাকল সরকার।

সরকার চালাচ্ছিল তুলনামূলক মধ্যপন্থীরা, কিন্তু প্যারিসের সেকশনগুলোতে প্রভাব ছিল র‍্যাডিকাল জ্যাকোবিনদের। গণকমিটিগুলো সরাসরি রাজতন্ত্র বিলুপ্তির দাবি তুলে মাঠপর্যায়ে সংগঠিত শক্তিতে পরিণত হতে শুরু করল। এরই মধ্যে পালানোর চেষ্টা করে জনগণের কাছে ধরা পড়ে গেলেন রাজা। মানুষের ভেতরে অবিশ্বাস, উত্তেজনা আর ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা তুঙ্গে ওঠল।

১৭৯২ সালের এপ্রিলে ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে; কিছুদিনের মধ্যে প্রুশিয়াও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। রাজা তখনো সাংবিধানিকভাবে আসীন, কিন্তু তার সময় কাটছে গভীর সন্দেহ আর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। দেশ চালাচ্ছে বিপ্লবী আইনসভা। বিপ্লবীরা ভেবেছিল, এই যুদ্ধ জাতীয় সংহতি তৈরি করবে। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হতেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠল। জনমনে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল—রাজা কি দেশের পক্ষে, নাকি শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন?

এই টানটান উত্তেজনার মধ্যেই ১৭৯২ সালের ১০ই অগাস্ট তুইলারি রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেলল হাজার হাজার মানুষ। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর রাজপ্রাসাদ দখল হলো। বন্দি করা হলো রাজাকে।

১০ই অগাস্টের সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার কেন্দ্র পূর্ণ দখলে নিল বিপ্লবী শক্তি। সেপ্টেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজতন্ত্র বাতিল হলো, শুরু হলো রিপাবলিকের যাত্রা। পুরোনো সামরিক কাঠামো ভেঙে পড়ল। রাজতন্ত্রপন্থী অফিসারদের এক দল পালিয়ে গেল। বাকিদের বরখাস্ত করা হলো।

তবে কেন্দ্র দখলেই বিপ্লব নিরাপদ হয়ে যায়নি; একে টিকিয়ে রাখতে ফরাসি বিপ্লবীদের লড়তে হয়েছিল চতুর্মুখী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। একদিকে অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার মতো বিদেশি শক্তির আক্রমণ, অন্যদিকে ভন্দে (Vendée) সহ

দেশের অভ্যন্তরে রাজতন্ত্রপন্থীদের উসকে দেওয়া রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ।[৪৯] গোদের ওপর বিষফোঁড়া হিসেবে যোগ হয়েছিল বিপ্লবীদের নিজেদের ভেতরের আদর্শিক কোন্দল ও উপদলীয় বিভাজন, যা পুরো পরিস্থিতিকে করে তুলেছিল চরম সহিংস।

এইসব বহুমুখী সংঘাতের মধ্য দিয়েই পুরোনো রাজতান্ত্রিক কাঠামোর ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে উঠে প্রথম আধুনিক ইউরোপীয় রিপাবলিক।

উল্লেখ্য, ১৭৮৯ সালের বাস্তিল অভিযানের নেতৃত্বে ছিল শহরের সাধারণ মানুষ, ছোট ব্যবসায়ী আর মধ্যবিত্ত পেশাজীবীরা। সেটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও নিরস্ত্র গণঅভ্যুত্থান।

কিন্তু ৯২-এর গণঅভ্যুত্থান ছিল অনেক বেশি সংগঠিত। রাস্তার বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল 'সাঁ-কুলোত' এবং বিপ্লবী ন্যাশনাল গার্ড। তাদের সংগঠিত করতে সহায়তা করেছিল প্যারিসের মহল্লাকেন্দ্রিক সেকশন বা গণকমিটিগুলো। আদর্শিক দিকনির্দেশনা দিয়েছিল জ্যাকোবিন ক্লাব।[৫০]

ফরাসি বিপ্লব আধুনিক সময়ে বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানের সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ। পরে নেপোলিয়ন ফ্রান্সকে সাম্রাজ্যে রূপান্তর করলেও, এই বিপ্লবের আদর্শ ইউরোপ ও বিশ্বে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনে।

রুশ বলশেভিক বিপ্লব

বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানের আরেকটা উদাহরণ দেখা যায় বিংশ শতাব্দীর শুরুর রাশিয়াতে।

রাশিয়ান সাম্রাজ্য তখন বিপর্যস্ত। এক দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈনিকের মৃত্যুর ভার। অন্যদিকে দেশজুড়ে খাদ্য ও জ্বালানির তীব্র সংকট। মানুষ বিক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধ শহরের শ্রমিক, গ্রামের কৃষক আর যুদ্ধফেরত ক্লান্ত সৈনিকেরা।

অস্থির এই পটভূমিতেই ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পেট্রোগ্রাডে (তৎকালীন রাজধানী) শুরু হয় স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক ধর্মঘট। দ্রুতই তা রুটির দাবিতে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। জনতার ওপর গুলি চালাতে অস্বীকৃতি জানায় সৈন্যরা। শ্রমিক, কৃষক আর বিদ্রোহী সেনাদের সম্মিলিত তোড়ে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন জার দ্বিতীয় নিকোলাস।

---

[৪৯] ১৭৯৩ সালে বিপ্লবী সরকার 'লেভি আঁ মাস' চালু করে, যা ছিল জনগণকে সামরিক দায়িত্ব পালনে টেনে আনার প্রথম সর্বজনীন প্রচেষ্টা। এর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে এক নতুন বিপ্লবী সেনাবাহিনী।

[৫০] জ্যাকোবিন (Jacobin) ক্লাব, আধুনিক অর্থে বিনোদনমূলক কোনো ক্লাব ছিল না; এটি ছিল এক সুসংগঠিত বিপ্লবী রাজনৈতিক সমিতি। ফ্রান্সজুড়ে এর শাখা বিস্তৃত ছিল। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে এই সমিতি বিতর্ক, সমন্বয়, প্রোপাগান্ডা এবং আদর্শিক দিকনির্দেশনার এক শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছিল।

জারের পতনের পর গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। লিবারেল গণতান্ত্রিক আর মধ্যপন্থী সমাজতন্ত্রীদের এই সরকারের লক্ষ্য ছিল পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র কায়েম করা। কিন্তু সরকারের পাশাপাশি রাজপথে গড়ে ওঠতে থাকে শ্রমিক ও সৈন্যদের 'সোভিয়েত' (শাব্দিক অর্থ কাউন্সিল) বা গণকমিটি। মাঠে-ময়দানের প্রকৃত ক্ষমতা এই সোভিয়েতগুলোর হাতে।

তৈরি হয় এক অস্থিতিশীল দ্বৈত কাঠামো। একদিকে অন্তর্বর্তী সরকার, অন্যদিকে বিপ্লবী সোভিয়েত। এ দুইয়ের টানাপোড়েন নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তিকে অনিশ্চিত করে তোলে।

শুরু থেকেই অন্তর্বর্তী সরকার ছিল মতাদর্শিকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত এবং রাজনৈতিকভাবে চরম দুর্বল। তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাইছিল, অন্যদিকে জনতার বিশাল এক অংশ ছিল যুদ্ধবিরোধী। এই টানাপোড়েনের সুযোগে আগস্ট মাসে সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেন জারপন্থী সেনাপতি কর্নিলভ। সেই প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান ঠেকাতে অন্তর্বর্তী সরকার এতটাই অসহায় হয়ে পড়ে যে, শ্রমিকদের অস্ত্র দিতে বাধ্য হয়। যার সুবিধা নেয় বলশেভিকরা।

তারা বাধ্য হয়ে বলশেভিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়।

কর্নিলভের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই ঘটনা সরকারকে আরও দুর্বল করে তোলে। আর বলশেভিকদের এনে দেয় নতুন গ্রহণযোগ্যতা আর অস্ত্র। এই সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগায় বলশেভিকরা। তারা সামনে আনে দুই জনপ্রিয় স্লোগান: 'রুটি, শান্তি, জমি,' আর 'সব ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে।'

যুদ্ধবিরোধী অনড় অবস্থান, আমূল ভূমি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি আর আপসহীন বিপ্লবী বক্তব্যের কারণে খুব দ্রুত শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের মাঝে বলশেভিকদের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে।

অন্তর্বর্তী সরকার যখন অস্তিত্বের সংকটে ধুঁকছে, ঠিক তখনই লেনিন ও ট্রটস্কির নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবর রাতে পেট্রোগ্রাডের প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনা একের পর এক কবজা করে নেয় বলশেভিকরা। উৎখাত করে অন্তর্বর্তী সরকারকে।

নতুন সরকার গঠিত হয় সোভিয়েতের নামে, বলশেভিকদের নেতৃত্বে। বিপ্লবের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয় বলশেভিকরা। কিন্তু ক্ষমতা দখল করলেই কাজ শেষ হয় না। বিপ্লবকে টিকিয়ে রাখার আসল লড়াই শুরু হয় তারপরই।

শুরু হয় রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ। পুরোনো সামরিক কাঠামো তখন পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। ট্রটস্কির নেতৃত্বে বলশেভিকরা দাঁড় করায় নতুন বিপ্লবী বাহিনী—রেড আর্মি।

১৯১৮ থেকে ১৯২২, যুদ্ধ চলে। একদিকে নবগঠিত রেড আর্মি। অন্যদিকে রাজতন্ত্রপন্থী, মধ্যপন্থী ও বিদেশি শক্তি সমর্থিত শ্বেত বাহিনী। গৃহযুদ্ধের সেই উত্তাল সময়ে বলশেভিকদের একইসাথে মোকাবিলা করতে হয় বিদেশি হস্তক্ষেপ, অর্থনৈতিক অবরোধ এবং দেশের ভেতরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা একের পর এক বিদ্রোহ।[৫১]

এই দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পথ ধরেই ধাপে ধাপে পুরো রাশিয়াকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে বলশেভিকরা। রাষ্ট্রক্ষমতা সুসংহত করার পর ১৯২২ সালে আত্মপ্রকাশ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। নামে সোভিয়েত শাসন, কার্যত সবকিছুর একক নিয়ন্ত্রণ বলশেভিক পার্টির।

১৯২৩ সাল নাগাদ গৃহযুদ্ধ শেষ হয়; বলশেভিকরা সব বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করে। ভেঙে ফেলে পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো। ভূমি পুনর্বণ্টন হয়। শিল্পখাত আনে রাষ্ট্রীয় মালিকানায়।

ফেব্রুয়ারির গণঅভ্যুত্থান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, কেন্দ্রবিহীন এবং নিরস্ত্র। জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের অনিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ।

অক্টোবরের গণঅভ্যুত্থান ছিল সুসংগঠিত, সুপরিকল্পিত এবং সশস্ত্র। এটা ছিল আদর্শিক দৃঢ়তা, আপসহীন নেতৃত্ব, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা আর সঠিক সময়ে সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রায় নিঁখুত এক সমন্বয়।

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে রুশ বিপ্লব সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর একটা। এই বিপ্লবের মাধ্যমেই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়।

ইরানের শিয়া বিপ্লব

১৯৭৮ এর শুরুতেও ইরানে শাহের পতন আর বিপ্লব ছিল অচিন্তনীয়। ১৯৭৭-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত খোদ খোমেনির বিশ্লেষণ ছিল বিপ্লবের জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে।[৫২]

---

[৫১] ১৯১৮–২০ সালব্যাপী ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানসহ মিত্রবাহিনী উত্তর রাশিয়ার মুরমান্স্ক–আর্কাঞ্জেল এবং সাইবেরিয়া ও ভ্লাদিভস্তক ফ্রন্টে সরাসরি অবতরণ করে। তারা শ্বেত বাহিনীকে মদদ দেওয়ার পাশাপাশি বলশেভিকদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায়।

[৫২] Charles Kurzman, *The Unthinkable Revolution in Iran* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004), 21.

তবে '৭৭-র শেষদিকে নতুন করে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে শুরু করে খোমেনিপন্থীরা। অক্টোবর নাগাদ তারা উপসংহার টানে, ইরানের মানুষ শাহবিরোধী ইসলামী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত।

নভেম্বর ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৮ সালের আগস্ট পর্যন্ত খোমেনিপন্থীরা বিরামহীন প্রচারণা আর ধারাবাহিক কর্মসূচি চালিয়ে যায়। এর সাথে যোগ হয় রাষ্ট্রের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ। এ দুইয়ের প্রভাবে ইরানজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাদরাসাগুলোর ছাত্র ও শিক্ষক, আর বাজারকেন্দ্রিক ধার্মিক ব্যবসায়ীদের ('বাযারী') বড় অংশ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে।

১৯৭৮ সাল জুড়ে ইরানের বড় শহরগুলোতে নিয়মিত বিক্ষোভ হলেও আগস্ট পর্যন্ত জমায়েত ১০ হাজারের আশেপাশে আটকে ছিল। সাধারণ মানুষ তখনো ব্যাপকভাবে আন্দোলনে নামেনি। কিন্তু অক্টোবর নাগাদ মানুষের মনে বিশ্বাস তৈরি হলো যে, শাহের পতন আসলেই সম্ভব। তখন থেকে আমজনতা দলে দলে রাস্তায় নামতে শুরু করল।

ডিসেম্বরের ১০-১১ তারিখ; ৯ ও ১০ মুহাররাম উপলক্ষে তেহরানসহ পুরো ইরানে আছড়ে পড়ল এক বিশাল জনসমুদ্র। সেই দুই দিনে রাস্তায় নামল প্রায় ৬০ লক্ষের বেশি মানুষ; যা অনেকের মতে আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে বৃহত্তম রাজনৈতিক জমায়েত। অতিকায় এই মিছিলগুলোর মুখে তখন শাহের পতনের দাবি।

জনতার এই বিপুল চাপে খোদ সেনাবাহিনীর ভেতরেও ফাটল ধরতে শুরু করল। সাধারণ সেনাদের মধ্যে 'শৃঙ্খলাভঙ্গের প্রবণতা' নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠল জেনারেলরা। ইরান তখন কার্যত অ-শাসনযোগ্য ও অনিয়ন্ত্রণযোগ্য এক জনপদ। অবশেষে ১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারি শাহ দেশ ছেড়ে পালাল।

দেশে কার্যত কোনো সরকার নেই। এমন অবস্থায় জানুয়ারির শেষ দিক থেকে আন্দোলনকারীদের উদ্যোগে এলাকাভিত্তিক গণকমিটি গড়ে ওঠল। এসব কমিটির কাজ ছিল: স্থানীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বণ্টন, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা এবং শাহ-সমর্থক সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যক্তিদের গতিবিধি নজরে রাখা। এই গণকমিটিগুলো 'ইনকিলাবি ইসলামী কমিটি' নামে পরিচিতি পেল।

ফেব্রুয়ারির এক তারিখ চৌদ্দ বছরের নির্বাসন শেষে দেশে ফিরে আসলো শিয়া ধর্মগুরু রুহুল্লাহ খোমেনি। এর ঠিক দশ দিন পর, ১১ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী নিজেদের 'নিরপেক্ষ' ঘোষণা দিয়ে ব্যারাকে ফিরে গেল। রেডিও স্টেশন, থানা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলল আন্দোলনকারীরা।

ঐদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের পতন হলো। গঠিত হলো অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। মার্চের শেষে 'ইসলামী রিপাবলিক' প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আয়োজিত রেফারেন্ডামে ৯৮ শতাংশ মানুষ বিপ্লবের পক্ষে রায় দিল। ইসলামী রিপাবলিকের ঘোষণা আসলো এপ্রিলের এক তারিখ।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এই আন্দোলন কিন্তু শুরু থেকেই সরকার পতন কিংবা 'ইসলামী জুমহুরিয়াহ' (রিপাবলিক) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামেনি। প্রাথমিক পর্যায়ে এর চরিত্র ছিল নিছক ইস্যুভিত্তিক ও প্রতিবাদী। কখনো খোমেনির ছেলের রহস্যজনক মৃত্যুর প্রতিবাদে শোক সমাবেশ, কখনো খোমেনির বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো প্রবন্ধ প্রকাশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ—এভাবেই বিচ্ছিন্ন সব দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধেছিল এই গণজাগরণ।

ইরানের বিপ্লব শুরু হয়েছিল 'অবৈপ্লবিক' আর ইস্যুকেন্দ্রিক দাবিদাওয়ার মধ্য দিয়ে। শাহের পতন এবং ইসলামী জুমহুরিয়াহ (রিপাবলিক) এর দাবি ব্যাপকভাবে সামনে এসেছিল '৭৮-এর অগাস্টের পর থেকে।

ক্ষমতা সংহত করার পর খোমেনিপন্থীরা সবচেয়ে বড় আঘাত হানে পুরোনো সামরিক কাঠামোর ওপর। সেনাবাহিনীতে শুরু হয় ব্যাপক 'শুদ্ধি অভিযান'; শাহপন্থী জেনারেলদের অনেককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, বাকিদের করা হয় বরখাস্ত। প্রতিবিপ্লব ঠেকাতে তারা পুরো সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজিয়ে কঠোর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

পাশাপাশি, বিপ্লবকে দেশের ভেতরের ও বাইরের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে ১৯৭৯ সালের মে মাসে গঠিত হয় এক নতুন বাহিনী, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) বা সিপাহে পাসদারান। এই বাহিনী সরাসরি ইসলামী রিপাবলিকের সর্বোচ্চ নেতা, অর্থাৎ খোমেনির অধীনস্ত।

বর্তমানে ইরানে সেনাবাহিনী এবং IRGC দুটোই আছে, তবে IRGC-এর শক্তি ও প্রভাব অনেক বেশি। কাজের ক্ষেত্রও ব্যাপক।

ইরান সম্ভবত আধুনিক ইতিহাসের পাতায় নিরস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বৈপ্লবিক রূপান্তরের একমাত্র নজির। ফরাসি ও রুশ বিপ্লবেও নিরস্ত্র গণজাগরণ ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু দুটোর ক্ষেত্রেই সেই পরিবর্তনকে চূড়ান্ত রূপ দিতে একটা সুসংগঠিত সশস্ত্র পর্বের অপরিহার্য ভূমিকা ছিল। ইরানের ক্ষেত্রে শেষ পর্যায়ে এসে কিছু বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ ও অস্ত্রাগার দখলের ঘটনা ঘটলেও, তা কখনোই পূর্ণাঙ্গ সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়নি।

গণঅভ্যুত্থানের দ্বৈত বিন্যাস: নিরস্ত্র বনাম সশস্ত্র

নিরস্ত্র গণঅভ্যুত্থান মোটাদাগে অহিংস।[৫৩] ঘেরাও, লং মার্চ, অসহযোগ কিংবা তীব্র জনজোয়ারের চাপে রাষ্ট্রযন্ত্রকে অচল করে দিয়েই এখানে ক্ষমতাসীনদের পতন নিশ্চিত করা হয়।

এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর স্বতঃস্ফূর্ততা। মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বারুদের মতো জ্বলে ওঠে, হাজারো মানুষ রাস্তায় নামে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর কোনো সুসংহত সাংগঠনিক ভিত্তি থাকে না; থাকলেও তা নড়বড়ে।

সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানেও জনসমর্থন ও গণজোয়ার থাকে, তবে ক্ষমতার কেন্দ্র দখল হয় সরাসরি অস্ত্র হাতে। এ ধরনের সফল অভ্যুত্থানগুলো আকস্মিক ঘটনা না, বরং সুপরিকল্পিত নকশার ফসল। এর পেছনে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে এক সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক কেন্দ্র, যা জনতার স্বতঃস্ফূর্ত স্রোতকে সঠিক গন্তব্যে ঠেলে দেয়। প্রচার-প্রচারণা আর ধাপে ধাপে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িয়ে এই কেন্দ্রই অভ্যুত্থানের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করে আর মোক্ষম সময়ে ক্ষমতার কেন্দ্রে চূড়ান্ত আঘাত হানে।

ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে, স্বতঃস্ফূর্ত ও নিরস্ত্র গণঅভ্যুত্থানগুলো সরকার ফেলে দিতে সফল হলেও বৈপ্লবিক রূপান্তর নিশ্চিত করতে ব্যর্থ; দুর্লভ ব্যতিক্রম ছাড়া।

অন্যদিকে, সফল সশস্ত্র অভ্যুত্থানগুলো সাধারণত নিরস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের তৈরি করা শক্তি ও প্রেক্ষাপটকে ব্যবহার করেই মঞ্চে হাজির হয়। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, সুসংগঠিত শক্তি সেই ক্ষেত্রকে চূড়ান্ত বিপ্লবে রূপ দেয়। ফরাসি এবং রুশ বিপ্লবের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে সশস্ত্র পর্বের আগে নিরস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট ছিল।

---

[৫৩] মূলত কোনো গণঅভ্যুত্থানই নিরবচ্ছিন্নভাবে অহিংস থাকে না। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, গণপিটুনি কিংবা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা সংঘাতের অনিবার্য অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে আন্দোলনকারীদের হাতে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র না থাকলেও লাঠি বা দেশীয় অস্ত্রের (melee weapons) ব্যবহার দেখা যায়; ফলে এসব বিদ্রোহকে পুরোপুরি 'শান্তিপূর্ণ' বলার চেয়ে 'নিরস্ত্র' (unarmed) হিসেবে চিহ্নিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। গণঅভ্যুত্থানের এই সংঘাতময় চরিত্র এবং 'অহিংস বনাম সহিংস' বাইনারির ঊর্ধ্বে রাজপথের বাস্তবতার বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: Benjamin S. Case, *Street Rebellion: Resistance Beyond Violence and Nonviolence* (New York: Oxford University Press, 2022)।

সশস্ত্র বিপ্লব: দুই গতিপথ

সশস্ত্র বিপ্লব সাধারণত দুই ধরনের গতিপথ অনুসরণ করে—সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান আর দীর্ঘমেয়াদি সশস্ত্র সংগ্রাম। দুটো পদ্ধতিই শক্তি প্রয়োগের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও এদের রণকৌশলে আছে মৌলিক পার্থক্য।

সশস্ত্র সংগ্রামে লড়াইটা সাধারণত লম্বা হয়। এটা এক ধরনের শক্তি ক্ষয়ের লড়াই। এই পদ্ধতিতে বিপ্লবীরা শুরুতেই রাজধানী বা ক্ষমতার কেন্দ্রকে আক্রমণ না করে বরং দূরবর্তী প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে অবস্থান নেয়। সেখান থেকে শক্তি সঞ্চয় করে তারা ধীরে ধীরে দেশের মূল রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোর দিকে এগোয়।

অন্যদিকে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য থাকে সরাসরি ক্ষমতার কেন্দ্র। এখানে কৌশল হলো: শুরুতেই ক্ষমতার ক্ষমতার কেন্দ্র দখল করা, তারপর সেই নিয়ন্ত্রণের ওপর ভিত্তি করে ধাপে ধাপে পুরো রাষ্ট্রকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা।[৫৪]

হাইব্রিড মডেল

বৈপ্লবিক রূপান্তরের গতিপথ সবসময় সরলরেখায় চলে না। অনেক সময় একাধিক রণকৌশলের মিশ্রণ ঘটে। কখনো শুরুটা হয় গণঅভ্যুত্থান দিয়ে, পরে আন্দোলন গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। আবার কখনো গেরিলা যুদ্ধ দিয়ে শুরু হয়, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় আসে শহরভিত্তিক গণঅভ্যুত্থানে। এই ধরনের পরিবর্তনশীল গতিপথকে বৈপ্লবিক রূপান্তরের হাইব্রিড মডেল বা মিশ্র পন্থার উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে।

কিছু উদাহরণ দেখা যাক।

নিকারাগুয়া

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে নিকারাগুয়াতে মার্কিন হস্তক্ষেপ বাড়ে। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত দেশটি দখল করে রাখে মার্কিন সেনারা। এ সময় তারা ন্যাশনাল গার্ড নামের অনুগত সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে, আর এর

[৫৪] Jeff Goodwin, *No Other Way Out.*

প্রধান হিসেবে বেছে নেয় আনাস্তাসিও সোমোযা গার্সিয়াকে। মার্কিন সেনারা ফিরে যাবার পর ১৯৩৬ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করে সোমোযা। শুরু হয় নিকারাগুয়ায় সোমোযা পরিবারের স্বৈরাচারী শাসন।

এই স্বৈরাচারী শাসন থেকে মুক্তি পেতে ১৯৬১ সালে আত্মপ্রকাশ করে মার্ক্সবাদী গেরিলা সংগঠন FSLN; ফ্রেন্তে স্যান্দিনিস্তা দে লিবারাসিওন নাসিওনাল।[৫৫] স্যান্দিনিস্তা নামেই বেশি পরিচিত।

কিউবার বিপ্লব থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে হয়ে প্রায় দেড় দশক ধরে তারা সোমোযা সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসে না।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ স্যান্দিনিস্তারা তাদের রণকৌশল নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয়। তারা বুঝতে পারে, কেবল গ্রামকেন্দ্রিক গেরিলা যুদ্ধ দিয়ে সোমোযা শাসনের ভিত নাড়ানো সম্ভব না। এর জন্য প্রয়োজন আগে শহরকেন্দ্রিক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার সংকট তৈরি করা।

স্যান্দিনিস্তারা কৌশল বদলায়। প্রথাগত গেরিলা যুদ্ধের পাশাপাশি গণঅভ্যুত্থানকে গ্রহণ করে রণনীতির সমান গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে।[৫৬] ১৯৭৭ সালের শেষদিক থেকে স্যান্দিনিস্তাদের শহুরে এলাকায় তৎপরতা বাড়াতে থাকে।

১৯৭৮ এর জানুয়ারিতে জনপ্রিয় সাংবাদিক পেদ্রো হোয়াকিন চামোরোকে হত্যা করে সরকার। বিক্ষুব্ধ মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে শহরে শহরে। শুরু হয় গণঅভ্যুত্থান।

---

[৫৫] স্যান্দিনিস্তা শব্দটা এসেছে অগুস্তো সেসার সান্দিনো নামের এক বিপ্লবী নেতার নাম থেকে। সান্দিনো ১৯২০-এর দশকের শেষদিকে নিকারাগুয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাকে নিকারাগুয়ার স্বাধীনতার প্রতীক এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯৩৩ সালে মার্কিন সেনারা ফিরে যাবার পরের বছর ন্যাশনাল গার্ডের ক্ষমতা ব্যবহার করে সান্দিনোকে হত্যা করে সোমোজা। অগুস্তো সান্দিনোর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং নিজেদেরকে তার উত্তরসূরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে FSLN তার নামানুসারেই নিজেদের দলের নামকরণ করেছিল।

[৫৬] ১৯৭৫ নাগাদ FSLN-এর মধ্যে কৌশলগত বিতর্ক দেখা দেয়। এই বিতর্কের ফলে তারা তিনটি ধারায় (tendencies) বিভক্ত হয়ে পড়ে:

GPP (Guerra Popular Prolongada/ Prolonged Popular War): যারা দীর্ঘমেয়াদি গ্রামীণ গেরিলা যুদ্ধে বিশ্বাসী ছিল।

Proletarian Tendency (সর্বহারা ধারা): যারা শহুরে শ্রমিক শ্রেণি এবং অর্থনৈতিক সংগঠনগুলোর ওপর জোর দিয়েছিল।

Terceristas (তৃতীয় ধারা): ড্যানিয়েল ওর্তেগা ও তাঁর ভাই হুম্বার্টো ওর্তেগার নেতৃত্বে এই ধারার মত ছিল শুধুমাত্র গ্রামীণ যুদ্ধ বা শুধু শহুরে আন্দোলন দিয়ে বিপ্লব সম্ভব নয়। বিপ্লবের জন্য গেরিলা যুদ্ধ, শহরে ব্যাপক গণআন্দোলন এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের (যেমন মধ্যবিত্ত, এমনকি কিছু ব্যবসায়ী) সমর্থনকে একীভূত করতে হবে।

নতুন হাইব্রিড কৌশলের অংশ হিসেবে ব্যাপক জনরোষ ও আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন, সমন্বয় এবং নেতৃত্ব দিতে শুরু করে স্যান্দিনিস্তারা। তবে এই অভ্যুত্থানে তারা একমাত্র শক্তি ছিল না।

অভ্যুত্থানের ভরবেগকে কাজে লাগিয়ে '৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে চূড়ান্ত আঘাত শুরু করে স্যান্দিনিস্তারা। শহরের আন্দোলন আর গেরিলা লড়াই চলে সমান্তরালভাবে। দুই দিকের লাগাতার চাপে সোমোযা শাসনের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে তেতাল্লিশ বছর ধরে চলা সোমোযা পরিবারের স্বৈরশাসনের পতন হয়।

স্যান্দিনিস্তারা ক্ষমতায় আসে। শুরুতেই সোমোযার অনুগত বাহিনী ভেঙে দিয়ে গড়ে তোলে নতুন পুলিশ ও সেনাবাহিনী। জাতীয়করণ করে অর্থনীতির বড় একটা অংশ নিয়ে আসে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী আদর্শে প্রভাবিত নতুন সংবিধান তৈরি করে।

তবে এই বৈপ্লবিক রূপান্তরের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় ভূরাজনীতি। ৮০-এর দশকের শুরু থেকেই স্যান্দিনিস্তা সরকারের বিরুদ্ধে শুরু হয় মার্কিন সমর্থিত কন্ট্রা বাহিনীর হামলা। সেই সাথে যুক্ত হয় অ্যামেরিকার আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধ। দ্বিমুখী চাপের মুখে স্যান্দিনিস্তারা রূপান্তরকে স্থায়ী রূপ দিতে ব্যর্থ হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে তারা শেষ পর্যন্ত নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। আর ৯০-এর সেই নির্বাচনেই ক্ষমতা তাদের হাত থেকে ফসকে যায়।

গেরিলা যুদ্ধ আর গণঅভ্যুত্থানের মিশ্রণে স্যান্দিনিস্তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও প্রাথমিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে আংশিক সফল হয়েছিল। তবে তারা বিপ্লবকে সুসংহত করতে পারেনি।

নেপাল

১৯৯৬ সাল থেকে নেপালের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপাল (মাওবাদী)। টানা দশ বছর ধরে চলা এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে রূপ নিলেও, মাওবাদীরা তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে ব্যর্থ হয়।

এরই মধ্যে ২০০১ সালে এক রহস্যময় হত্যাকাণ্ডে প্রাণ হারান রাজা বীরেন্দ্রসহ রাজপরিবারের দশজন সদস্য। সিংহাসনে বসেন বীরেন্দ্রের ভাই জ্ঞানেন্দ্র। হত্যাকাণ্ডের রহস্য আর জ্ঞানেন্দ্রের ক্ষমতায় আসা নিয়ে জনমনে তীব্র অবিশ্বাস

দানা বাঁধতে থাকে। রাজতন্ত্রের প্রতি অবশিষ্ট আস্থাটুকুও ধুলোয় মিশে যায়। পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয় ২০০৫ সালে, যখন সংসদ ভেঙে দিয়ে সরাসরি ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন রাজা জ্ঞানেন্দ্র।

পরের বছর এপ্রিলে, বহুদলীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবিতে মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো রাজপথে নামলে শুরু হয় দেশব্যাপী গণবিক্ষোভ। মাওবাদীরা কৌশলগতভাবে এই আন্দোলনে সমর্থন জানায়। গ্রামীণ অঞ্চলে সশস্ত্র লড়াই শিথিল করে তারা গণবিক্ষোভকে পুরো দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিতে মনোযোগ দেয়। বিক্ষোভ ধীরে ধীরে পরিণত হয় বিশাল গণঅভ্যুত্থানে। প্রচণ্ড আন্দোলনের মুখে রাজা জ্ঞানেন্দ্র সংসদ পুনর্বহাল করতে এবং শাসনক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

মাওবাদীদের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার শান্তিচুক্তি করে। গৃহযুদ্ধ শেষ হয়। অস্ত্র ত্যাগ করে মাওবাদীরা ঢুকে মূলধারার সংসদীয় রাজনীতিতে। ২০০৮ সালের গণপরিষদ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসন পায় আর গণপরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে রাজতন্ত্রকে বিলুপ্ত করে নেপালকে রিপাবলিক ঘোষণা দেয়। প্রধানমন্ত্রী হয় মাওবাদীদের নেতা পুষ্পকমল দাহাল প্রচণ্ড।

তবে নেপাল বৈপ্লবিক রূপান্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। পতন-পরবর্তী পুনর্গঠনের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

রাজতন্ত্রের পতন ঘটলেও পুরো প্রক্রিয়াটি শেষমেশ একটি 'আপস রফায়' পর্যবসিত হয়। পুরোনো আমলাতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো অক্ষুণ্ণ থেকে যায়; ফলে ভূমি সংস্কার কিংবা জাতীয়করণের মতো মাওবাদীদের মৌলিক বৈপ্লবিক দাবিগুলো অধরাই থেকে যায়। সংসদীয় রাজনীতির চোরাবালি রূপান্তরের গতিবেগকে প্রথমে স্তিমিত করে, আর তারপর থামিয়ে দেয়।

সিরিয়া

নেপাল ও নিকারাগুয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে ছিল গেরিলা যুদ্ধ, তারপর গণঅভ্যুত্থান। সিরিয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনেকটা উল্টো। সেখানে শুরুটা হয়েছিল গণঅভ্যুত্থান দিয়ে, তারপর গৃহযুদ্ধ।

২০১১ সালে আরব বসন্তের উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ে সিরিয়াতে। দারা, হামা কিংবা হোমসের মতো শহরগুলোর স্কুলপড়ুয়া কিশোরেরা দেয়ালে দেয়ালে স্লোগান লিখে দেয়: 'জনগণ এই সরকারের পতন চায়'।

প্রচণ্ড বর্বর প্রতিক্রিয়া দেখায় বাশার আল আসাদের বাহিনী। শিশুকিশোরদের বাসা থেকে তুলে নিয়ে তীব্র নির্যাতনের পর হত্যা করে। হুমকি দেয় পরিবারগুলোকে।

এই নৃশংসতার প্রতিবাদে ফুঁসে ওঠে পুরো সিরিয়া। সংস্কার, দুর্নীতি দমন আর মৌলিক অধিকারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন অচিরেই রূপ নেয় এক গণঅভ্যুত্থানে। আন্দোলন দমনে ভয়াবহ নৃশংসতা চালায় বাশার আল আসাদের সরকার। নির্বিচার গুলি, গণগ্রেফতার আর পৈশাচিক নির্যাতনের পাশাপাশি চলে গণধর্ষণ ও মাসজিদে অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা। জনপদগুলোকে অবরুদ্ধ করে খাদ্য-পানির সরবরাহ বন্ধ করে দেয় সরকার; রেহাই পায় না শরণার্থী শিবিরগুলোও।

রাষ্ট্রীয় এই নজিরবিহীন আগ্রাসনের মুখে আন্দোলনকারীদের একটি অংশ আত্মরক্ষার্থে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়। তাদের সাথে যোগ দেন সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসা সৈনিক ও অফিসাররা; শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংঘাত।

নেপাল আর নিকারাগুয়াতে সশস্ত্র সংগ্রামের বিপ্লবে মূল ভিত্তি ছিল গ্রামকেন্দ্রিক দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধ। কিন্তু সিরিয়ায় সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু হওয়ার পর বিদ্রোহীরা খুব দ্রুতই সেই চোরাগোপ্তা হামলার গণ্ডি পেরিয়ে এক ধরনের 'আধা-প্রথাগত' (Semi-conventional) সমররীতি গ্রহণ করে।

স্রেফ ভ্রাম্যমাণ গেরিলা ইউনিট হিসেবে টিকে থাকার পরিবর্তে তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় সুনির্দিষ্ট অঞ্চল দখল করে সেখানে নিজেদের শাসন সুসংহত করা। তারা রীতিমতো সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়ে ফ্রন্টলাইন তৈরি করে এবং বড় বড় শহর ও জনপদগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ওপর জোর দেয়; যাতে আসাদ সরকারকে প্রধান শহরগুলো থেকে সামরিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাষ্ট্রযন্ত্রের কার্যকারিতা পুরোপুরি ধসিয়ে দেওয়া যায়।[৫৭]

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা এই অসম গৃহযুদ্ধে বাশারের পক্ষে একে একে জড়িয়ে পড়ে ইরান, লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে সরাসরি রাশিয়া। তেরো বছরের এই দীর্ঘ যুদ্ধে ঝরে পড়ে লাখো প্রাণ,

[৫৭] Adam Baczko, Gilles Dorronsoro, and Arthur Quesnay, "Building a Syrian State in a Time of Civil War," *Carnegie Endowment for International Peace*, April 16, 2013; *The Political Science of Syria's War* (POMEPS Studies 5) (Washington, DC: Project on Middle East Political Science, 2013), esp. discussion of the conflict's drift toward more "conventional" dynamics with clearer front lines; Christopher M. Blanchard et al., *Armed Conflict in Syria: U.S. and International Response* (Washington, DC: Congressional Research Service, December 20, 2012) (on rebels capturing bases/territory and the evolving military contest).

ঘরছাড়া হয় কোটি কোটি মানুষ। একটি পুরো প্রজন্ম বেড়ে উঠে চোখের জল, পেটে ক্ষুধা আর বুকের ভেতর প্রতিশোধের আগুন নিয়ে।

অবশেষে ২০২৪ এর ৮-ই ডিসেম্বর পতন ঘটে আসাদ পরিবারের অর্ধ শতাব্দীর স্বৈরাচারী শাসনের। দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় বাশার। পতন হয় বাথ প্রজাতন্ত্রের। সিরিয়ার নিয়ন্ত্রণ নেয় সরকারবিরোধী সশস্ত্র জোট।

ইসলামপন্থী হায়াতু তাহরীরুশ শামের (HTS) নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েই পুরোনো রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে দেয়। বাথপন্থী রাজনীতিবিদ ও অপরাধী কর্মকর্তাদের বিচারের মুখোমুখি করার পাশাপাশি কারাগার থেকে মুক্ত করা হয় হাজার হাজার নির্যাতিত বন্দিকে। আসে নতুন পতাকা এবং অন্তর্বর্তী সংবিধানের ঘোষণা।

সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আসে সামরিক বাহিনীতে। বাশারের ভেঙে যাওয়া সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করে বাশারবিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে একত্রিত করে গড়ে তোলা হয় নতুন সেনাবাহিনী।

ফরাসি ও রুশ বিপ্লব

এক অর্থে ফরাসি এবং রুশ বিপ্লবকেও হাইব্রিড মডেলের উদাহরণ বলা যায়। দুটো ক্ষেত্রেই প্রাথমিক বিক্ষোভ থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক রূপান্তর পর্যন্ত তিন পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটেছে:

নিরস্ত্র গণঅভ্যুত্থান → সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান → গৃহযুদ্ধ

প্রথমত, দুই ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত নিরস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে; ফ্রান্সে ১৭৮৯ এবং রাশিয়ায় ১৯১৭-এর ফেব্রুয়ারিতে। এই পর্যায়ে এক ধরনের মধ্যবর্তী রাজনৈতিক কাঠামো আসে। ফ্রান্সে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, রাশিয়ায় লিবারেল ঘরানার অন্তর্বর্তী সরকার। তবে এই পরিবর্তনগুলো ছিল উপরিভাগের, পুরোনো ব্যবস্থাকে পুরোপুরি উপড়ে ফেলা তখনো বাকি ছিল।

দুই ক্ষেত্রেই মূল বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে। ফ্রান্সে ১৭৯২ এর ১০-ই অগাস্টের সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান রাজতন্ত্রকে বিলুপ্ত করে রিপাবলিকের সূচনা করে। রাশিয়াতে ১৯১৭ এর অক্টোবরের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত হয় মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদী আদর্শের সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই ধাপে পুরোনো শাসনব্যবস্থা ভেঙে নতুন আদর্শিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন হয়।

তৃতীয়ত, বিপ্লবের পূর্ণতা নিশ্চিত করতে দুই দেশেই লড়াই করতে হয়েছে দেশের ভেতরের প্রতিবিপ্লবী শক্তি আর বিদেশি শত্রুর বিরুদ্ধে। যুদ্ধে বিজয়ের পরই বিপ্লব সফল হয়েছে। রাশিয়ায় ১৯২২ সালে গৃহযুদ্ধ শেষে গড়ে ওঠে সোভিয়েত ইউনিয়ন। অন্য দিকে ফ্রান্সে ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৪ সালের মধ্যে র‍্যাডিকাল জ্যাকোবিনদের নেতৃত্বে চলে অভ্যন্তরীণ শুদ্ধি অভিযান; একই সময়ে ভঁদে বিদ্রোহসহ গৃহযুদ্ধ তীব্র আকার নেয়। ১৭৯৬ নাগাদ বিদ্রোহ এবং বিভিন্ন প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টাকে দমন করার পর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ স্থিতিশীল হয়।

আধুনিক মুসলিম বিশ্বের উদাহরণ

এতক্ষণ আমরা গত আড়াইশো বছরে বৈপ্লবিক রূপান্তরের নানা গতিপথের আলোচনা করেছি। তার মধ্যে মুসলিম বিশ্বের অভিজ্ঞতাও প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে এসেছে। তবে স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম বিশ্বের প্রেক্ষাপট আরও নিবিড়ভাবে পরখ করা প্রয়োজন।

গত একশো বছরে বিভিন্ন ভূখণ্ডে ইসলামপন্থী আন্দোলনগুলোর তামকীন বা শাসনকর্তৃত্ব অর্জনের কিছু দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে আছে।

রীফ ইমারত

পদ্ধতি: গেরিলা যুদ্ধ।

প্রেক্ষাপট: মরক্কোর রীফ অঞ্চলে স্প্যানিশ ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এক কালজয়ী প্রতিরোধের সূচনা করেন আমীর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম আল-খাত্তাবী (রাহিমাহুল্লাহ)। ১৯২১ সালে বিভিন্ন গোত্রগুলোকে একত্রিত করে লড়াই শুরু করেন। লড়াই চালান গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে। আল-খাত্তাবীকে আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের জনক বলা হয়।

সে বছরের এপ্রিলে উলামা ও গোত্রপতিদের ঐকমত্যে তিনি আমীর মনোনীত হন। সেপ্টেম্বরে আসে ইমারতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা; রিপাবলিক অফ রীফ।

নামে রিপাবলিক হলেও এটা ছিল ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা শাসিত ইমারত। প্রায় ২০ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই ইমারত ছিল আকারে আজকের কুয়েতের চেয়ে বড়। ৮০ জন আলিম ও গোত্র প্রধানদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল

মজলিশে শূরা। ইমারতের বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হতো মালিকি ফিকহ অনুযায়ী শরীয়াহ আদালতের মাধ্যমে।

১৯২৪ নাগাদ স্প্যানিশদের সাথে যুক্ত হয় ফরাসিদের আগ্রাসন। মরক্কোর সেই সময়কার সুলতান মুসলিমদের সাথে গাদ্দারি করে ফরাসিদের পক্ষ নেয়। বিপুল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমীর আল-খাত্তাবীর বাহিনী টিকে থাকে।

শেষমেশ লড়াইয়ে পেরে না উঠে স্প্যানিশ বাহিনী নিরীহ জনগণের ওপর নির্বিচারে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার শুরু করে। ১৯২৫ থেকে ১৯২৬ এর মধ্যে বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে প্রায় দেড় লক্ষ মুসলিম শাহাদাতবরণ করেন। সাধারণ মানুষের জীবন বাঁচাতে এবং চরম মানবিক বিপর্যয় এড়াতে আমীর আল-খাত্তাবী শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন; অবসান ঘটে গৌরবোজ্জ্বল রীফ ইমারতের।[৫৮]

প্রথম আফগান ইমারত

পদ্ধতি: দীর্ঘমেয়াদি সশস্ত্র সংগ্রাম (গৃহযুদ্ধ, মোবাইল ওয়ারফেয়ার ও মিলিশিয়া অফেন্সিভ)।

প্রেক্ষাপট: ইতিপূর্বে আলোচিত।

দ্বিতীয় আফগান ইমারত

পদ্ধতি: গেরিলা যুদ্ধ।

প্রেক্ষাপট: ইতিপূর্বে আলোচিত।

ইরান

পদ্ধতি: নিরস্ত্র গণঅভ্যুত্থান।

প্রেক্ষাপট: ইতিপূর্বে আলোচিত।

---

[৫৮] C. R. Pennell, *A Country with a Government and a Flag: The Rif War in Morocco, 1921–1926* (Wisbech: Middle East & North African Studies Press, 1986); Sebastian Balfour, *Deadly Embrace: Morocco and the Road to the Spanish Civil War* (Oxford: Oxford University Press, 2002); David S. Woolman, *Rebels in the Rif: Abd el Krim and the Rif Rebellion* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1968).

দাঈশ (ISIS)

পদ্ধতি: দীর্ঘমেয়াদি সশস্ত্র সংগ্রাম (গেরিলা যুদ্ধ, ইনসার্জেন্সি ও 'ব্লিটযক্রিগ' ধাঁচের অভিযান)।

প্রেক্ষাপট: জুন ২০১৪-তে আইসিস বা দাঈশ নামের সংগঠন ইরাকের মসুল দখল করে। তারা তাদের নেতাকে মুসলিম বিশ্বের 'খলীফা' এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলকে 'ইসলামী খিলাফত' হিসেবে ঘোষণা করে। এক পর্যায়ে ইরাক ও সিরিয়ার প্রায় ৯০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা তাদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

এই ঘোষণার সাথেই সংগঠনটি জানায়, যেকোনো অঞ্চলে তাদের 'সৈন্যদের' পদার্পণ মাত্রই সেখানকার সকল ইসলামী সংগঠন, জামাআহ এবং স্থানীয় ইমারত বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রয়োজনে তাদের অস্ত্রের জোরে দমন করা হবে।[৫৯]

পরে সংগঠনটির পক্ষ থেকে আরও বলা হয় যে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে ইসলামী শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে লড়াই বলে গণ্য হবে। অতএব, যারাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, তারা কুফরে লিপ্ত।[৬০]

দাঈশ মূলত একটা ইমারত কায়েম করে সেটিকে খিলাফত বলে দাবি করছিল। এই দাবির ভিত্তিতে একদিকে তারা মুসলিম উম্মাহর কাছ থেকে বাধ্যতামূলক বাইয়াত বা আনুগত্য দাবি করে, অন্যদিকে বিরোধীদের তাকফির করে।

এই নীতির কারণে সিরিয়া, ইয়েমেন, সোমালিয়া, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন অঞ্চলে তারা অন্যান্য মুসলিম দলগুলোর বিরুদ্ধে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। সব সংগঠনকে কাফির ঘোষণা করে।

২০১৫ থেকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনী এবং অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তিগুলো দাঈশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। ঘনবসতিপূর্ণ শহরে প্রচণ্ড বোমা হামলা ও গণহত্যা চালায়। ২০১৭-এর শেষ দিকে মসুল (ইরাক) এবং রাক্কার (সিরিয়া) নিয়ন্ত্রণ হারায় দাঈশ। অবশেষে ২০১৯-এর মার্চে সিরিয়ার বাঘুজে তাদের সর্বশেষ ঘাঁটির পতন ঘটে। এভাবে তাদের দাবিকৃত 'খিলাফতের'

---

[৫৯] Abu Muhammad al-Adnani, "This Is the Promise of Allah," June 29, 2014; discussed in Cole Bunzel, "From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State," Brookings Analysis Paper No. 19 (Washington, DC: Brookings Institution, 2015).

[৬০] Abu Muhammad al-Adnani, "Oh Our People, Respond to the Caller of Allah," June 22, 2015; in Haroro J. Ingram, Craig Whiteside, and Charlie Winter, *The ISIS Reader: Milestone Texts of the Islamic State Movement* (New York: Oxford University Press, 2020).

ভৌগলিক অস্তিত্ব এক প্রকার বিলীন হয়ে যায়।[৬১]

***

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উল্লিখিত পাঁচটা উদাহরণের মধ্যে চারটাতেই শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ছিল সশস্ত্র সংগ্রাম। ব্যতিক্রম কেবল ইরান; যেখানে নিরস্ত্র গণঅভ্যুত্থানই ছিল প্রধান চালিকাশক্তি। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সশস্ত্র লড়াইয়ের এই সাফল্য এসেছে হয় সরাসরি বিদেশি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মুখে, নয়তো চরম অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের উত্তাল প্রেক্ষাপটে।

সিরিয়াতে ইসলামী শাসন কায়েম হলে তা এ তালিকায় ষষ্ঠ সংযোজন হিসেবে যুক্ত হতে পারত, গণঅভ্যুত্থান ও গৃহযুদ্ধের হাইব্রিড মডেলের ইসলামী শাসন কায়েমের উদাহরণ হিসেবে।

---

[৬১] তথ্যগত স্বচ্ছতা এবং ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণের খাতিরেই শেষোক্ত দৃষ্টান্ত দুটি (ইরান ও দাঈশ) এখানে যুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইরানি বিপ্লবের শিয়া নেতৃত্ব এবং দাঈশের উগ্র তাকফিরি অবস্থান—উভয়কেই আমরা 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'-এর মূলধারা থেকে বিচ্যুত ও বিতর্কিত মনে করি।

বিপ্লবের ব্যাকরণ: পদ্ধতি, পরিবেশ ও প্রতিস্থাপন

কেবল আকাঙ্ক্ষা থাকলেই বিপ্লব সফল হয় না।

আমরা বৈপ্লবিক রূপান্তরের তিন প্রধান গতিপথ এবং সেগুলোর মিশ্রণ নিয়ে কথা বলেছি। কিন্তু ইতিহাস বলে, যে পদ্ধতি এক দেশে সফল হয়েছে, ঠিক একই পদ্ধতি আরেক দেশে ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী ব্যর্থতায় গিয়ে শেষ হয়েছে। কারণ প্রতিটা ক্ষেত্রে সফলতার পেছনে কাজ করে কিছু সুনির্দিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক এবং ভূরাজনৈতিক শর্ত। যেখানে শর্ত অনুপস্থিত সেখানে সফলতা বিরল।

তাই সত্যিকার অর্থে পদ্ধতিগুলোর কার্যকারিতা বুঝতে হলে আগে দেখতে হবে, কোন পদ্ধতি ঠিক কোন পরিস্থিতিতে এবং কোন শর্তে সফল হয়।

বাইরের শক্তি: অতীত ও ভবিষ্যত

মানব ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় জুড়ে শাসন ও সমাজব্যবস্থার রূপান্তর এসেছে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সুবাদে ষাটের দশকের পর থেকে এ-ধরনের রূপান্তরের ঘটনা কমে এসেছে।

এখন আবার পৃথিবী বহুকেন্দ্রিক হয়ে ওঠছে। ক্রমশ ভেঙে পড়ছে চলমান বিশ্বব্যবস্থা। সামনের দিনগুলোতে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের ঘটনা ধীরে ধীরে বাড়বে। পশ্চিমা বিশ্বের একচ্ছত্র আধিপত্য যত নড়বড়ে হবে, আঞ্চলিক শক্তিগুলো তত বেশি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবে। ক্ষমতার নতুন সমীকরণে সামরিক আগ্রাসন আবারও একটি লাভজনক কৌশল হিসেবে আবির্ভূত হবে।

তবে আজকের পৃথিবী অনেক বেশি জটিল। সরাসরি বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপে কোনো দেশের সমাজ বা শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা এখন আগের চেয়ে কম। তার বদলে আগামীতে আমরা সম্ভবত প্রক্সি যুদ্ধ বা সরাসরি দখলদারিত্বের মতো ঘটনাগুলো বেশি দেখব।

সংগ্রামের সাফল্যের সমীকরণ

গত দেড়শো বছরে দীর্ঘমেয়াদি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে—যার মধ্যে গেরিলা যুদ্ধও অন্তর্ভুক্ত—অনেকগুলো ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তর এসেছে। এ পথেই রূপান্তরের মাত্রা সবচেয়ে বেশি হয়। দীর্ঘ লড়াই পুরোনো কাঠামোকে ভেঙে ফেলে, আর বিপ্লবীদের নিজস্ব প্রশাসন ও বাহিনী গড়ার সময় দেয়।

তবে সশস্ত্র সংগ্রামে সাফল্যের পেছনে কিছু সুনির্দিষ্ট সমীকরণ কাজ করে।

যেমন লড়াইটা যখন বিদেশি দখলদারের বিরুদ্ধে, তখন এ পথে সফলতার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। শত্রু যখন বহিরাগত এবং স্পষ্ট, মানুষ তখন খুব সহজে লড়াইয়ে যুক্ত হয়ে যায় এবং প্রতিরোধকে ঘিরে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে ওঠে।

কিন্তু লড়াইটা যখন হয় নিজেদের দেশের মানুষের মধ্যেই, তখন ঐক্য থাকে না। সে জায়গায় চলে আসে দ্বিধা, বিভ্রান্তি, আভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন। একারণে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতিতে সফলতা তুলনামূলকভাবে কঠিন।[৬২]

যেসব গৃহযুদ্ধ বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পেরেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো শুরু হয়েছে এমন সময়ে, যখন রাষ্ট্র আর সমাজ আগে থেকেই গভীর সংকটের মধ্যে ছিল। সশস্ত্র সংগ্রাম সেই সংকট থেকে জন্ম নিয়েছে এবং একে কাজে লাগিয়েছে।

কিন্তু সমাজ স্থিতিশীল, রাষ্ট্রযন্ত্রের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ যেখানে মজবুত, আর বিদ্রোহীদের জন্য যেখানে শক্ত কোনো বাহ্যিক আশ্রয় বা সেইফ হ্যাভেন (Safe haven) নেই, সেখানে গৃহযুদ্ধ শুরু করে বিদ্রোহীদের জেতার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল।

দুর্বলের রণকৌশল: লড়াই যখন অসম

দীর্ঘমেয়াদি সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্রে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল বহুবার সফল হয়েছে। যখন লড়াইটা হয় এমন দুই পক্ষের মধ্যে, যাদের শক্তির কোনো ভারসাম্য নেই; অর্থাৎ এক পক্ষ অনেক বেশি শক্তিশালী আর অন্য পক্ষ খুব দুর্বল, তখন দুর্বল পক্ষের জন্য গেরিলা কৌশলে লড়াই করাটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

---

[৬২] James D. Fearon and David D. Laitin, "Civil War Termination" (Stanford University, draft, September 12, 2008), 2; Karl R. DeRouen Jr. and David Sobek, "The Dynamics of Civil War Duration and Outcome," Journal of Peace Research 41, no. 3 (2004): 303–320.

তবে গেরিলা যুদ্ধ মানেই যে সফলতা, তা না।

সামরিক বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন, গেরিলা যুদ্ধ সফল হওয়ার পেছনে কিছু নির্দিষ্ট শর্ত থাকে। যেখানে এই শর্তগুলো অনুপস্থিত, সেখানে গেরিলারা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি।

গেরিলা যুদ্ধের সফলতার শর্তগুলোর মধ্যে আছে—

দুর্গম ভূপ্রকৃতি: গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রথমে দরকার নিরাপদ ঘাঁটি। এমন জায়গা, যেখানে রাষ্ট্রীয় বাহিনী সহজে পৌঁছাতে পারে না। বন, জঙ্গল, পাহাড়, সীমান্তবর্তী অঞ্চল।

কৌশলগত গভীরতা: কেবল দুর্গম ঘাঁটি অঞ্চল থাকা যথেষ্ট না। গেরিলা যুদ্ধের সফলতার জন্য দরকার কৌশলগত গভীরতা, যাকে ইংরেজিতে বলে স্ট্র্যাটেজিক ডেপথ। এর মানে, শত্রুর আক্রমণ হজম করে এমনভাবে পিছু হটতে পারা, যাতে গেরিলারা ছড়িয়ে পড়তে পারে। পুনর্গঠিত হয়ে আবার আঘাত হানতে পারে।[৬৩]

খোলা সীমান্ত এলাকা: খোলা সীমান্ত না থাকলে গেরিলাদের আসা-যাওয়া এবং অস্ত্র ও রসদের সরবরাহ খুব কঠিন হয়ে যায়।

অস্ত্রের সহজলভ্যতা: যুদ্ধ শুরুর মতো ন্যূনতম অস্ত্র সরবরাহ যদি না থাকে, তাহলে গেরিলারা শুরুতেই ধাক্কা খাবে। দীর্ঘমেয়াদি লড়াই চালিয়ে যেতেও অস্ত্রের নিয়মিত সরবরাহ জরুরি।

যোদ্ধা সংস্কৃতি: দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধ সাধারণত ওইসব এলাকাতেই সফল হয়েছে, যেখানে অস্ত্র বহনের সংস্কৃতি এবং প্রতিরোধের ইতিহাস আছে। এসব এলাকার মানুষের মধ্যে যুদ্ধের মনোভাব গড়ে ওঠে।

---

[৬৩] ধরুন, কোনো দেশে একটি পাহাড়ি অঞ্চল আছে। গেরিলারা সেখানে ঘাঁটি গেড়েছে। এলাকা দুর্গম, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নিয়মিত উপস্থিতি নেই। কিন্তু গেরিলারা হামলা শুরু করার পর রাষ্ট্রীয় বাহিনী গোটা অঞ্চল ঘিরে ফেলল। তখন গেরিলারা পিছু হটতে পারল না, ঘাঁটি থেকেও বের হতে পারল না। এমন অবস্থায় ঘাঁটিই ফাঁদে পরিণত হবে। এখানে দুর্গম ভূপ্রকৃতির শর্ত পূরণ হলেও কৌশলগত গভীরতার শর্ত পূরণ হয়নি। কারণ, ঘেরাওয়ের পর গেরিলাদের পালিয়ে যাওয়ার বা ছড়িয়ে পড়ার কোনো জায়গা নেই। কৌশলগত গভীরতা মানে শুধু পাহাড় বা জঙ্গল থাকা নয়; ঘাঁটি এলাকার সীমানার কাছাকাছি, কিন্তু শত্রুর মূল আক্রমণরেখার বাইরে এমন বিস্তৃত ও সংযুক্ত ভূখণ্ড থাকা, যা গেরিলাদের পিছু হটতে, ছড়িয়ে পড়তে এবং পুনরায় সংগঠিত হবার সুযোগ করে দেয়। তাই গেরিলা যুদ্ধের সফলতার জন্য কেবল দুর্গম পাহাড় বা ঘন জঙ্গল থাকা যথেষ্ট নয়, এর সাথে প্রয়োজন এমন এক বিস্তৃত এলাকা, যা তাদের এই সক্ষমতা দেবে।

ভিয়েতনামি কমিউনিস্টরা, হো চি মিন ট্রেইল ব্যবহার করে লাওস আর কম্বোডিয়ার ভেতর দিয়ে কৌশলগত গভীরতা অর্জন করেছিল। মার্কিন বাহিনীর ভয়ানক চাপ সত্ত্বেও গেরিলারা নিজেদের সংগঠিত রাখতে পেরেছিল। আবার টি. ই. লরেন্স তার 'টোয়েন্টি সেভেন আর্টিকলস'-এ দেখিয়েছেন, আরব বেদুইনরা কীভাবে বিশাল হিজাজ মরুভূমিকে কৌশলগত গভীরতা হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

আফগানিস্তান, চেচনিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি অঞ্চলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো নানা মাত্রায় দেখা যায়।

বিপ্লবী পরিবেশ: প্রয়োজন উপযুক্ত সামাজিক-রাজনৈতিক আবহাওয়া। জনগণের মধ্যে যদি রাষ্ট্রের প্রতি ঘৃণা আর বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি না থাকে, তাহলে গেরিলা যুদ্ধ দাঁড়াতে পারে না।

জনসমর্থন: গেরিলা যুদ্ধের টিকে থাকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর একটা হলো জনগণের সমর্থন। স্থানীয় মানুষ যদি গেরিলাদের আশ্রয় না দেয়, তথ্য না দেয় অথবা তাদের আন্দোলনকে বৈধ মনে না করে, তাহলে যুদ্ধ লম্বা সময় টেকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই জন্য বলা হয়, গেরিলারা যদি হয় মাছ, তাহলে জনগণ হলো ঐ পানি যার মধ্যে তারা বিচরণ করে।[৬৪]

আফগান দৃষ্টান্ত

একটা উদাহরণ দিয়ে শর্তগুলো মিলিয়ে নেওয়া যাক।

আমরা আগেই দেখেছি, অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে তালিবানের দুই দশকের লড়াই সফল গেরিলা যুদ্ধের উদাহরণ। আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে শর্তগুলো কেমন ছিল?

আফগানিস্তানের ভূপ্রকৃতি গেরিলা যুদ্ধের জন্য আদর্শ। দেশটাতে এমন অনেক এলাকা আছে, যেখানে আধুনিক ট্যাংক, হামভি, এপিসি কিছুই যেতে পারে না। গেরিলারা এসব অঞ্চলকে অনায়াসে নিরাপদ ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

---

[৬৪] এই শর্তগুলো বিভিন্ন গেরিলা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং গেরিলা যুদ্ধের সমরবিদদের বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। মাও সে তুং, চে গুয়েভারা, ভো নয়েন গিয়াপ, টি ই লরেন্সসহ গেরিলা যুদ্ধের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সমরবিদ দুর্গম ভূপ্রকৃতি ও কৌশলগত গভীরতাকে সফলতার মূল শর্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। গিয়াপ, রবার্ট টেইবার এবং লরেন্স আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন খোলা সীমান্ত ও বাহ্যিক নিরাপদ আশ্রয়ের ওপর। অস্ত্রের সহজলভ্যতাকে দীর্ঘমেয়াদি লড়াইয়ের জন্য অপরিহার্য বলেছেন সবাই। জনগণের সমর্থনকে মাও বলেছেন গেরিলাদের সফলতার সবচেয়ে মৌলিক উপাদান। মাছ ও পানির রূপকটি মাও সে তুং এর দেওয়া। জনগণের যুদ্ধপ্রবণ মনোভাব বা মার্শাল স্পিরিট নিয়েও বিশ্লেষণ করেছেন গিয়াপ ও লরেন্স। লরেন্স, যিনি দেখিয়েছেন কীভাবে বেদুইনদের সম্মানবোধ, প্রতিশোধের স্পৃহা এবং সাহসিকতার ঐতিহ্য তাদেরকে সহজাত গেরিলা যোদ্ধায় পরিণত করে। সবশেষে, বিপ্লবী আবহাওয়া—রাষ্ট্রের প্রতি তীব্র ঘৃণা, শাসকের বৈধতা হারানো এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা—এমন পরিবেশকে প্রয়োজনীয় ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন প্রায় সকল তাত্ত্বিক। মুসলিম সমরবিদদের মধ্যেও নাজি, নাসর এবং যাইদান এই উপাদানগুলোকে সফলতার শর্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন:

Mao Zedong, On Guerrilla Warfare; Che Guevara, Guerrilla Warfare; Vo Nguyen Giap, People's War, People's Army; Lawrence, Thomas Edward. "The 27 articles of TE lawrence." *The Arab Bulletin* 20 (1917): 175-200; Robert Taber, The War of the Flea: A Study of Guerrilla Warfare Theory and Practice (New York: Lyle Stuart, 1965); Naji, The Management of Savagery; Nasar, Da'wat al-Muqāwamah.

পাশাপাশি আফগানিস্তানের আছে কৌশলগত গভীরতাও। ভয়াবহ বিমান হামলা বা স্থল অভিযানের মুখে মুজাহিদরা পিছু হটে পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকায় চলে যেতে পারতেন, সেখানে পুনর্গঠিত হয়ে আবার আঘাত হানতেন। দীর্ঘ সীমান্ত জুড়ে অস্ত্র ও রসদ চলাচলের এই নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ তাঁদের টিকে থাকার অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

আফগানিস্তানে অস্ত্র সহজলভ্য। সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর আফগানদের হাতে বহু অস্ত্র ছিল। গেরিলা লড়াইয়ের জন্য অত উন্নত অস্ত্র জরুরি না। একে-৪৭, আরপিজি, মাইন, ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ—এগুলো দিয়েই গেরিলারা প্রতিপক্ষকে নাকানিচুবানি খাওয়াতে পারে। তাছাড়া গোত্রীয় অঞ্চলে ঘরে ঘরে রাইফেল থাকে। সেখানে রীতিমতো অস্ত্র তৈরি হয়। এটা তাদের সংস্কৃতির অংশ।

ঐতিহাসিকভাবেই আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের গোত্রীয় এলাকার মানুষ তাদের মার্শাল স্পিরিটের জন্য বিখ্যাত। এই অঞ্চলগুলোকেই সাম্রাজ্যবাদের গোরস্থান বলা হয়। এখানকার হার না মানুষ কখনোই বহিরাগতদের আগ্রাসন মেনে নেয়নি। দুর্জয় মনোভাব আর ভৌগলিক কারণে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদের তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়ার মুজাহিদরাও তাদের আন্দোলনের ঘাঁটি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এই এলাকাকেই।

সর্বোপরি এ লড়াইয়ে শত্রু ছিল স্পষ্ট। পশ্চিমা, খ্রিষ্টান পরিচয়ের একটা জাতি সামরিক আগ্রাসন চালাচ্ছে। এটা পুরো জাতির বড় একটা অংশের মধ্যে সংহতির মনোভাব তৈরি করেছিল।

আফগানিস্তানে গেরিলা যুদ্ধের সবগুলো শর্ত একসাথে মিলে গিয়েছিল। ভিয়েতনামসহ যেসব ভূখণ্ডে দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধ সফল হয়েছে, সেখানেও এই শর্তগুলোর সবগুলো বা অধিকাংশ পাওয়া যায়। আর যেসব জায়গায় এই শর্তগুলো অনুপস্থিত, সেসব জায়গায় গেরিলাদের সাফল্যের উদাহরণ বিরল।[৬৫]

---

[৬৫] James D. Fearon and David D. Laitin, "Ethnicity, Insurgency, and Civil War," *American Political Science Review* 97, no. 1 (February 2003): 75–90; Idean Salehyan, "Transnational Rebels: Neighboring States as Sanctuary for Rebel Groups," *World Politics* 59, no. 2 (January 2007): 217–242; Jason Lyall and Isaiah Wilson III, "Rage Against the Machines: Explaining Outcomes in Counterinsurgency Wars," *International Organization* 63, no. 1 (2009): 67–106; Ivan Arreguín-Toft, *How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), chap. 2–3.

প্রান্ত থেকে কেন্দ্র: বিকল্প কাঠামোর বিস্তার

গেরিলা যুদ্ধ সফল হবার জন্য কেন এই শর্তগুলো জরুরি?

গেরিলারা শক্তিশালী সরকারি বাহিনীর সাথে সামনাসামনি লড়াইয়ে যায় না। তার বদলে দুর্গম, প্রান্তিক এলাকায় ঘাঁটি গড়ে তোলে। শক্তি সঞ্চয় করে ছোট ছোট অতর্কিত হামলার মাধ্যমে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নড়বড়ে করে দেয়। সরকারি বাহিনী পিছু হটলে গেরিলারা সেখানে বিকল্প প্রশাসন গড়ে তোলে।

এই মুক্তাঞ্চলগুলো নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার ইনকিউবেটর হিসেবে কাজ করে। সাধারণ মানুষ যখন দেখে গেরিলারা তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে বা বিচার করছে, তখন তারা নতুন ব্যবস্থার ওপর আস্থা পেতে শুরু করে। গেরিলারা বিদ্যমান কাঠামোর বিকল্প হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করতে পারে।

এভাবে গেরিলারা ধীরে ধীরে কেন্দ্রের দিকে এগোয়। ধাপে ধাপে, পুরোনো রাষ্ট্রকাঠামোকে ভাঙতে ভাঙতে। শেষ পর্যন্ত তারা যখন রাজধানীতে পৌঁছায়, ততদিনে দেশে তাদের ছায়া প্রশাসন তৈরি হয়ে গেছে। অকেজো হয়ে গেছে পুরোনো রাষ্ট্রকাঠামো। ফলে ক্ষমতা দখলের পর তারা খুব দ্রুত নতুন কাঠামো দাঁড় করিয়ে ফেলে। আসল যুদ্ধটা হয় কেন্দ্র দখলের আগে।

আর এ-ধরনের কৌশল সফলভাবে লম্বা সময় ধরে কাজে লাগানোর জন্য ওপরের শর্তগুলো প্রয়োজন।

সশস্ত্র সংগ্রাম: রণকৌশল বনাম হঠকারিতা

সফল সশস্ত্র সংগ্রাম শূন্য থেকে আচমকা তৈরি হয় না। এটা তখনই দানা বাঁধে, যখন সমাজ ও রাজনীতিতে বড়সড় ফাটল ধরে। রাষ্ট্রের বৈধতা যখন ধসে পড়ে, যখন দমনপীড়ন চরমে পৌঁছায়, আর পরিবর্তনের অন্য সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তখনই মানুষের ভেতরে জমে থাকা ক্ষোভ এমন উর্বর যমীন তৈরি করে, যেখানে যোদ্ধারা টেকসই শেকড় গাড়তে পারে।

চীনে কমিউনিস্টদের জনযুদ্ধ সফল হতে পেরেছিল; কারণ এর পেছনে ছিল দীর্ঘদিন ধরে চলা রাষ্ট্রীয় ভাঙন, যুদ্ধ, নৈরাজ্য। এগুলোই গ্রামীণ মোবালাইযেইশানের প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছিল। জনযুদ্ধ সম্ভব হয়েছিল এই বুনিয়াদের কারণেই।

কিউবাতেও মানুষ গেরিলা যুদ্ধকে সফল করেছিল বাতিস্তা সরকারের নিপীড়নে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের সব পথ বন্ধ হয়ে যাবার পরই।

আফগানিস্তানের চিত্রও একই। বিদেশি আগ্রাসন, দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ আর শাসনক্ষমতার দেউলিয়াত্ব সেখানে এমন রাজনৈতিক শূন্যতা আর অরাজকতা তৈরি করেছিল, যেখানে তালিবান আন্দোলন বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। পেয়েছিল জনমানুষের সমর্থন।

সশস্ত্র সংগ্রাম টেকসই ও সফল হবার জন্য জনসমর্থন অপরিহার্য। আর মানুষ সহজাতভাবে লড়াইবিমুখ। উপযুক্ত প্রেক্ষাপট ছাড়া সশস্ত্র সংগ্রামে সাধারণত জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশের সমর্থন পাওয়া যায় না।

কাজেই, সশস্ত্র সংগ্রাম অথবা গেরিলা যুদ্ধ এমন কোনো শর্টকাট না, যা চাইলেই ছোট কোনো দল প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা করে নিজের ইচ্ছামাফিক দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারে। এর সফলতা বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল।

কিউবার বিপ্লবে অংশ নেওয়া এবং ফোকো তত্ত্বের জনক চে গুয়েভারাও এ নীতিটি স্বীকার করে বলেছেন:

> '...এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, কেবল গেরিলা তৎপরতার অভিঘাতে বিপ্লবের যাবতীয় শর্ত তৈরি হয়ে যাবে। সবসময় মনে রাখা জরুরি, বিদ্রোহের প্রথম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং তাকে সংহত করার একটা ন্যূনতম আবশ্যিক শর্ত আছে, যা ছাড়া এই কাজ সম্ভব না।
>
> নিয়মতান্ত্রিক নাগরিক বিতর্কের কাঠামোর ভেতরে থেকে সামাজিক লক্ষ্যগুলো অর্জন করার চেষ্টা কতটা অসার ও নিষ্ফল, সেটা জনগণকে অবশ্যই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে হবে। নিপীড়ক শক্তি যখন প্রচলিত আইনের তোয়াক্কা না করে গায়ের জোরে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকে, তখন ধরে নিতে হবে, শান্তি আগেই লঙ্ঘিত হয়েছে।
>
> এমন পরিস্থিতিতে গণঅসন্তোষ আরও সক্রিয় রূপ ধারণ করে। প্রতিরোধের মানসিকতা তখন প্রত্যক্ষ সংঘাতের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে, যার সূত্রপাত ঘটে কর্তৃপক্ষের আচরণের কারণেই।
>
> যেখানে একটি সরকার জনগণের ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে—তা জালিয়াতি করেই হোক বা অন্য কোনো উপায়ে—এবং সাংবিধানিক বৈধতার একটি "লেবাস" বা ভান বজায় রেখেছে, সেখানে গেরিলা যুদ্ধের সূচনা করা যায় না। কারণ, শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের সব সম্ভাবনা সেখানে এখনো ফুরিয়ে যায়নি।'[৬৬]

[৬৬] Ernesto Che Guevara, *Guerrilla Warfare.*

গণঅভ্যুত্থান: কেন্দ্র দখলের কৌশল

গেরিলা যুদ্ধ আগায় ধীরে ধীরে, কিন্তু পরিবর্তন হয় গভীর। গণঅভ্যুত্থান এর উল্টো। এটা ঝড়ের মতো সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। বেশিরভাগ সময় আন্দোলনকারীরা অল্প সময়ের মধ্যে রাজধানী দখল করে নেয়।

জনগণকে রাস্তায় এনে আন্দোলনগুলো দ্রুত সরকার ফেলে দিতে পারে। কিন্তু ঠিক তার পরপর আন্দোলনের ভরবেগ হারিয়ে যায়। পুরোনো রাষ্ট্রযন্ত্র মোটাদাগে অক্ষত রয়ে যায়। গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে দ্রুত কেন্দ্র দখলের সফলতাই একটা কৌশলগত দুর্বলতায় পরিণত হয়।

রাষ্ট্র মানে কেবল রাজধানী না। এখানে আছে শত শত স্তরের সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক নেটওয়ার্ক। সরকার পতনের পরও কেন্দ্রের বাইরে পুরোনো রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিত—অর্থাৎ গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, ওয়ার্ড, জেলা পর্যায়ের কাঠামো থেকে যায়।

শক্তিশালী ও টেকসই বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য শুধু কেন্দ্র দখল করা যথেষ্ট না, পুরোনো কাঠামোকে ভেঙে নতুন করে সাজানো আবশ্যক। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ওপরে রদবদল হলেও নিচের বাস্তবতা বদলায় না।

তাই শাসনক্ষমতা তাৎক্ষণিকভাবে হাতে নেওয়ার পর আন্দোলনকারীদের সামনে দুটো পথ খোলা থাকে: হয় বিকল্প কাঠামোর মাধ্যমে শাসন, অথবা পুরোনো প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর নির্ভর করা।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরেরটা বেছে নেওয়া হয়। কারণ আন্দোলনের হাতে বিকল্প কিছু তৈরি থাকে না। আর এটাই পুরোনো শক্তির ফিরে আসার পথ খুলে দেয়।

আন্দোলনকারীরা সেই পুরোনো ব্যবস্থাটাই চালায়, যেটাকে তারা উৎখাত করতে চেয়েছিল। আগেকার বিচারবিভাগ, পুলিশ, আমলাতন্ত্র, গোয়েন্দা সংস্থা আর সেনাবাহিনী তখন সুযোগের অপেক্ষায় সময় গোনে। এক সময় দেখা যায়, পুরোনো এলিটরাই আবার ক্ষমতার চারপাশে জেঁকে বসেছে, অথবা নতুন শাসকরা পুরোনো ব্যবস্থার সঙ্গে মিশে গেছে।

বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থান: স্বতঃস্ফূর্ততা বনাম শিল্প

সফল অভ্যুত্থানগুলো তাই আগায় ভিন্ন পথে। তারা সমান্তরাল কাঠামো তৈরি করে। এই কাঠামো তৈরি হয় বিভিন্ন গণকমিটির মাধ্যমে।

ফ্রান্সে এলাকাভিত্তিক গণকমিটি বা সেকশনগুলো কার্যত স্থানীয় সরকারে পরিণত হয়েছিল। রাশিয়ায় সংসদের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে মাঠপর্যায়ে ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সোভিয়েত নামের শ্রমিক কাউন্সিলগুলো। ইরানে সরকার যখন ধসে পড়ছে, তখন বিপ্লবীরা গড়ে তুলেছিল ইনকিলাবি কমিটি।

এই গণকমিটিগুলো একদিকে বিপ্লবের সক্রিয় শক্তি হিসেবে রাজপথ দখলে রেখেছিল। অন্যদিকে আরও বিপ্লবী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছিল কেন্দ্রকে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, পুরোনো রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙে পড়ার পর গণকমিটিগুলো শাসনের বিকল্প কাঠামো হয়ে ওঠেছিল। ফলে পুরোনো রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর নির্ভর করার বদলে বিপ্লবী শক্তি সেটার প্রতিস্থাপনে মনোযোগ দিতে পেরেছিল।

একসময় এই গণকমিটিগুলোই নতুন কাঠামোর আনুষ্ঠানিক অংশে পরিণত হয়। আর নতুন কাঠামোগুলো দাঁড়িয়ে গেলে, রাষ্ট্র আর বিপ্লব এক হয়ে যায়।

সফল গেরিলা যুদ্ধ এবং বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থান—দুটোই পুরোনো কাঠামোর বিকল্প তৈরি করে। দুই পথেই এটা সফল হবার শর্ত। কারণ পুরোনো কাঠামোকে না ভেঙে বিপ্লব সম্ভব না।

অবধারিত সংঘাত

তবে এতকিছু করেও গৃহযুদ্ধ এড়ানো যায় না।

১৯১৭ এর শেষে বলশেভিকদের নিয়ন্ত্রণ ছিল রাশিয়ার মাত্র ২৫-৩০% ভূখণ্ডের ওপর। প্রতিবিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে জেতার পরই পুরো রাশিয়ান সাম্রাজ্য বলশেভিকদের নিয়ন্ত্রণে আসে এবং তাদের কমিউনিস্ট বিপ্লব সুসংহত হয়।[৬৭]

[৬৭] ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর বলশেভিকদের নিয়ন্ত্রণ মূলত পেত্রোগ্রাদ, মস্কো এবং মধ্য রাশিয়ার শিল্পাঞ্চলগুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল, যা তৎকালীন রুশ সাম্রাজ্যের মোট ভূখণ্ডের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশের বেশি ছিল না। রাশিয়ার অবশিষ্টাংশ এবং সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: Smele, Jon. *The Russian civil wars, 1916-1926: ten years that shook the world.* Oxford University Press, 2015; Orlando Figes, *A People's Tragedy: The Russian Revolution, 1891–1924* (New York: Viking, 1996).

ফরাসি বিপ্লবেও প্যারিসের বিপ্লবীদের পশ্চিমের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ এবং দেশের নানা প্রান্তের কেন্দ্রীয় সরকারবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল।

ইরানে গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি না হলেও ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়েছিল একাধিক অঞ্চলের সশস্ত্র প্রতিপক্ষদের পরাস্ত করেই।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে লেগেছে বেশ কয়েক বছর।

এর মানে দাঁড়ায়, অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বৈপ্লবিক রূপান্তর চাইলে কেন্দ্র দখলের পর বাকি অংশের জন্য লড়াইয়ের প্রস্তুতিও থাকতে হবে।

আর এ লড়াইয়ে পুরোনো বাহিনীর ওপর নির্ভর করা যায় না। তাই বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানের আরেকটা লক্ষণীয় দিক হলো নতুন সশস্ত্র বাহিনী তৈরি করা।

ফরাসি এবং রুশ বিপ্লবে ক্ষমতা দখলের পর বিপ্লবীরা নতুন সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিল। ইরানেও আমরা একই চিত্র দেখি। সেখানে পুরোনো বাহিনীতে বড় ধরনের শুদ্ধি অভিযান তো চালানো হয়েছেই, পাশাপাশি তৈরি করা হয়েছে বিপ্লবের নেতৃবৃন্দের প্রতি অনুগত আলাদা বাহিনী। পরিবর্তন এসেছে পুলিশ এবং গোয়েন্দা সংস্থার মতো প্রতিষ্ঠানগুলোতেও।

গণঅভ্যুত্থানকে বিপ্লবে পরিণত করতে হলে পুরোনো রাষ্ট্রযন্ত্র ও বাহিনীকে ভেঙে দেওয়া ও বিকল্প কাঠামো গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এই ভাঙা এবং গড়ার অংকটা যারা মেলাতে পেরেছে, তারাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে।

ব্যর্থ অভ্যুত্থানের শিক্ষা

যেসব অভ্যুত্থান এই কাজগুলো করতে পারেনি, তারা হয় প্রতিবিপ্লবী প্রচেষ্টায় ধ্বংস হয়েছে অথবা যে ব্যবস্থাকে উৎখাত করতে চেয়েছিল, সেই ব্যবস্থার অংশেই পরিণত হয়েছে।

মিশরের গণঅভ্যুত্থানে মোবারকের পতন হয়েছে, কিন্তু দুই বছরের মাথায় সেনাবাহিনী আবার ক্ষমতা দখল করেছে। তিউনিশিয়াতে স্বৈরাচারের অবসান ঘটলেও রাষ্ট্রের মূল কাঠামো থেকেছে একই।

এই দেশে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের বিদায়ের পর ক্ষমতায় এসেছে আরেক সেনাশাসক ইয়াহিয়া খান। ৯০-এর অভ্যুত্থানে এরশাদের পতন হয়েছে,

কিন্তু তারপর ক্ষমতায় আসা রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতি করেছে এরশাদকে সাথে নিয়েই।

২০২৪-এও গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী জাহিলিয়াতের পতন হয়েছে। কিন্তু বৈপ্লবিক রূপান্তর দূরের কথা, অর্থবহ সংস্কারও আসেনি।

এই গণঅভ্যুত্থানগুলো ক্ষমতার হাতবদল ঘটিয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রের মূল রূপ বদলাতে পারেনি। শাসনব্যবস্থাও বদলায়নি।

ধ্বংস ও নির্মাণ

বিপ্লবের ক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত শিক্ষা হলো:

> ক্ষমতা দখলের পর পুরোনোকে নতুন দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে না পারলে বিপ্লব ব্যর্থ হয়।

গেরিলা যুদ্ধের মডেলে এই প্রতিস্থাপন শুরু হয় কেন্দ্র দখলের আগে।

বিপ্লবের সফলতার ঘোষণা আসার আগেই বাস্তবতা বদলাতে থাকে। প্রান্তিক এলাকাগুলোতে গেরিলারা ছায়াশাসন শুরু করে। বিপ্লবীরা আগে শাসন করে, পরে শাসক হয়।

গণঅভ্যুত্থানের মডেলে বিপ্লবের ঘোষণা আসে আগে, রাষ্ট্রকে ভেঙে গড়ার কাজটা শুরু হয় পরে। গণকমিটির মাধ্যমে বিকল্প কাঠামো তৈরি করে।

গেরিলা মডেলে মূল যুদ্ধটা হয় কেন্দ্র দখলের আগে। বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানে যুদ্ধ শুরু হয় কেন্দ্র দখলের পর।

পদ্ধতি এবং ধারাবাহিকতা ভিন্ন। কিন্তু কাজ এক।[৬৮]

প্রতিস্থাপন ছাড়া, ভেঙে গড়া ছাড়া বিপ্লব হয় না।

---

[৬৮] টেকসই বিপ্লবের জন্য কেবল শাসক পরিবর্তনের পাশাপাশি নতুন প্রশাসনিক ও প্রতিরক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অপরিহার্যতা নিয়ে আলোচনার জন্য দেখুন: Theda Skocpol, *States and Social Revolutions*। বিপ্লবকালীন দ্বৈত সার্বভৌমত্ব (dual sovereignty) এবং ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্রগুলোর উদ্ভব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন: Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*। এছাড়া, রাষ্ট্র দখলের আগে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো কীভাবে সমান্তরাল শাসন কাঠামো গড়ে তোলে, তার বিশ্লেষণের জন্য দেখুন: Zachariah Mampilly, *Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life during War* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011)।

ক্যু দেতা?

এ পর্যায়ে পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে:

সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান বা ক্যু (Coup d'état)-কে কেন বৈপ্লবিক রূপান্তরের পথ ধরা হচ্ছে না? পোস্ট-কলোনিয়াল দেশগুলোতে এভাবেই তো কতবার সরকার বদলেছে।

সামরিক অভ্যুত্থানকে হিসেবে না ধরার কারণ হলো, এভাবে বিপ্লব হয় না। এখানে ক্ষমতার হাতবদল হয়। এক দল এলিটের বদলে আরেক দল এলিট ক্ষমতার দখল নেয়। কিন্তু রাষ্ট্রকাঠামোর মূল রূপ অপরিবর্তিত থেকে যায়।

বিপ্লব জনগণ আর মজলুমের পরিবর্তনের হাতিয়ার। সামরিক অভ্যুত্থান হলো এলিট শ্রেণি আর সেনাবাহিনীর জেনারেলদের ক্ষমতা দখলের পদ্ধতি। বিপ্লব হলো বিদ্যমানতাকে উৎখাত করে পাল্টা আদর্শের প্রতিষ্ঠা। সামরিক অভ্যুত্থান পুরোনো ব্যবস্থার নতুন ইজারাদারি।

সামরিক অভ্যুত্থানে কী হয়, একটু ভেবে দেখুন।

সামরিক বাহিনীর ছোট একটা অংশ ক্ষমতা দখল করে। তারপর তারা নিজেরা শাসন করে, নয়তো নিজেদের পছন্দের কাউকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেয়। সেই সাথে বাজারে ছাড়ে 'নতুন দিন' এর আলাপ।

কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র একই থেকে যায়।

সেই একই আইন, আমলাতন্ত্র, বাহিনী এবং সেই একই আদর্শিক কাঠামো।

অন্যদিকে, বৈপ্লবিক রূপান্তর হলো বিদ্যমান রাজনৈতিক ও আইনি ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে ভিন্ন আদর্শিক, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভিত্তিতে নতুন ব্যবস্থা গড়ে ওঠা। এতে কেবল শাসক বদলায় না, বরং শাসন করার মানে কী, এর ভিত্তি কী, ধরন কী সেটাও বদলে যায়।

বিদ্যমানতার পাহারাদার

সামরিক বাহিনী সহজাতভাবেই বিপ্লববিরোধী। বেশিরভাগ দেশে, বিশেষ করে পোস্ট-কলোনিয়াল দেশগুলোতে সামরিক বাহিনী শাসনব্যবস্থার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে।

গোয়েন্দা সংস্থা, বিচারবিভাগ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এলিট, বেসামরিক আমলাতন্ত্র—রাষ্ট্রযন্ত্রের এই অংশগুলোর সাথে সামরিক বাহিনী মিলেই ডিপ স্টেইট তৈরি হয়। যার কাজই হলো বিদ্যমান কাঠামোকে টিকিয়ে রাখা।

সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের এক সুনির্দিষ্ট ও কঠোর আনুগত্যের কাঠামোতে গড়ে তোলা হয়। রাষ্ট্রীয় ও জাতীয়তাবাদী আদর্শে দীক্ষিত এই বাহিনী যেকোনো মূল্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চায়। তাদের প্রশিক্ষণ এমন এক মনস্তত্ত্ব তৈরি করে, যা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ভাঙতে চায় না। বরং বিদ্যমান কাঠামোর অধীনে স্থিতিশীলতাকে অগ্রাধিকার দেয়।

লক্ষ্য করে দেখবেন, সামরিক অভ্যুত্থানগুলো প্রায় সবসময় 'স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা', 'জননিরাপত্তা', 'দুর্নীতি দমন' কিংবা 'জাতিকে রক্ষা'-র নামে হয়। অর্থাৎ একটা ব্যবস্থার কোনো অংশ কাজ করছে না, তাই ক্যু'র লক্ষ্য হলো সেটার মেরামতি। বিদ্যমান ব্যবস্থাকে অন্য কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্য এখানে থাকে না।

এসব কারণে অ্যাকাডেমিকরা বহু আগে থেকেই বলে আসছেন সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান আর বিপ্লব এক না।[৬৯] একটা চলে বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে, আরেকটা সেই ব্যবস্থাকে ভেঙে তার জায়গায় নতুন কিছু গড়ে।

সামরিক অভ্যুত্থান বা ক্যু-কে বিপ্লব ভেবে নেওয়ার মানে হলো ক্ষমতা দখল আর আদর্শিক রূপান্তরকে গুলিয়ে ফেলা।

বেহাত বিপ্লব

যেসব ঘটনাকে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ঘটা বিপ্লবের উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয়, সেগুলোর দিকে তাকালেই ওপরের কথাগুলোর বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়। গত একশো বছরে বহু আদর্শিক আন্দোলন তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে

---

[৬৯] সামরিক অভ্যুত্থানকে এলিটদের মধ্যে ক্ষমতার হাতবদল এবং বিপ্লবকে রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আমূল রূপান্তর হিসেবে চিহ্নিত করার তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য দেখুন: Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968); Theda Skocpol, *States and Social Revolutions* (Cambridge: Cambridge University Press, 1979); Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1978); এবং Samuel E. Finer, *The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics* (London: Pall Mall Press, 1962)। বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোর সুরক্ষায় নিয়োজিত স্বতন্ত্র গোষ্ঠীস্বার্থ-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে; বিশেষ করে উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে, বিশ্লেষণের জন্য আরও দেখুন: Amos Perlmutter, *The Military and Politics in Modern Times* (New Haven: Yale University Press, 1977); এবং Alfred Stepan, *Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone* (Princeton: Princeton University Press, 1988)।

সামরিক বাহিনীর ওপর নির্ভর করার কৌশল নিয়েছিল। কিন্তু পরিণামে তাদের প্রায় প্রত্যেককেই নির্মম দমনের শিকার হতে হয়েছে।

মিশর: ১৯৫২ সালের মিশরের কথা ধরুন। জামাল আবদেল নাসেরের নেতৃত্বে 'ফ্রি অফিসার্স' রাজা ফারুককে উৎখাত করে। এতে সমর্থন দেয় মুসলিম ব্রাদারহুড। বলা হয়ে থাকে, নাসের কুরআন ছুঁয়ে শপথ করেছিল, যদি ব্রাদারহুড রাজতন্ত্র উৎখাতে সমর্থন দেয়, তাহলে সে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করবে।[৭০]

কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর নাসের গাদ্দারি করে। ব্রাদারহুডকে নিষিদ্ধ করে দেশজুড়ে গ্রেফতার করে হাজার হাজার নেতাকর্মীকে। তাদের ওপর বর্বর নির্যাতন চালায়। দমনপীড়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে সাইয়্যিদ কুতুবকে। শেষ পর্যন্ত আরব জাতীয়তাবাদ আর সমাজতন্ত্রের খামখেয়ালি মিশেলে প্রতিষ্ঠা করে স্বৈরাচারী সামরিক শাসন।

সামরিক অভ্যুত্থান মুসলিম ব্রাদারহুডের আদর্শিক প্রকল্পকে নষ্ট করে দেয়। বেহাত হয়ে যায় বিপ্লবের স্বপ্ন।

সুদান: একই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা দেখা যায় সুদানের ক্ষেত্রেও।

১৯৮৯ সালে রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে ব্রিগেডিয়ার ওমর আল-বশির। শুরুর দিকে ক্যু'র বৈধতার জন্য দেশ রক্ষা আর ইসলামী শাসন কায়েমের অজুহাত দেওয়া হয়। বশির সুকৌশলে হাসান আল-তুরাবি ও তাঁর 'ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট'-এর আদর্শিক প্রভাবকে নিজের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজে লাগায়।

কিন্তু অচিরেই সুদান গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা, লুটপাট, বশিরের অনুগত মিলিশিয়ার জুলুম, আর গোয়েন্দা নজরদারির রাষ্ট্রে পরিণত হয়। শরীয়াহর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের বদলে বশির কেবল শরীয়াহর শাস্তিমূলক আইনগুলোকেই (হুদুদ) তার শাসনের বৈধতার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। সুদান জড়িয়ে পড়ে কয়েক দশকের লুটপাট এবং অভ্যন্তরীণ সংঘাতের পাকচক্রে। এক পর্যায়ে বশির তার মিত্রদের সরিয়ে দেয়, গ্রেফতার করে তুরাবিকে।

ইথিওপিয়া: ১৯৭৪ সালে ইথিওপিয়ায় বিপ্লব বেহাত হবার ব্যাপারটা ঘটে আরও স্থূলভাবে। ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ আর শ্রমিক ধর্মঘটের জেরে রাজতন্ত্র পতনের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বিপ্লবের চেতনা।

---

[৭০] Ushama, Thameem. *Sayyid Qutb: Between Reform and Revolution*. 2009.

পুরোনো শাসনব্যবস্থা যখন ভেঙে পড়ে, তখন ক্ষমতা দখলে নেয় 'ডার্গ' নামের সামরিক কমিটি। বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা নিলেও তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে। যেসব ছাত্র আর শ্রমিকরা আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়েছিল, তাদেরকেই জেলে ভরে, নির্বাসনে পাঠায়, চালায় ব্যাপক হত্যা।

যে স্বপ্ন নিয়ে মানুষ আন্দোলনে নেমেছিল, তা আর বাস্তবায়ন হয় না। জনগণের শুরু করা বিপ্লবের প্রক্রিয়া সামরিক অভ্যুত্থান নষ্ট করে দেয়।

প্রতিটা ঘটনাতেই সামরিক অভ্যুত্থান বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ভন্ডুল করেছে, বিপ্লবের গতিপথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। ক্ষমতায় আসার পর ক্যু'র নায়কেরা বিপ্লবের স্বপ্ন আর প্রতিশ্রুতি ছুড়ে ফেলেছে, অথবা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো সামনে এনেছে সেগুলোর নানা বিকৃত রূপ। যেগুলোকে সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে ঘটা বিপ্লব বলা হয়, সেগুলো আসলে বিপ্লব বেহাত হবার গল্প।

যখনই কোনো আদর্শিক আন্দোলন সামরিক বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়েছে, বিপ্লবের স্বপ্ন ছিনতাই হয়ে গেছে।

স্বৈরাচারের খামখেয়ালি

সামরিক অভ্যুত্থানের কিছু সমর্থক হয়তো বলতে পারেন, কিছু কিছু দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের পর আসা সরকারগুলো তো বিভিন্ন পরিবর্তন এনেছিল। জামাল নাসের নতুন রাষ্ট্রীয় আদর্শ এনেছিল, গাদ্দাফীর 'জামাহিরিয়া' ঘোষণা—এগুলোকে তো পরিবর্তন বলা যায়।

হ্যাঁ, কিন্তু পরিবর্তন মানেই তো বিপ্লব না।

এগুলো শাসনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক রূপান্তর, কাঠামোগত রূপান্তর না।

সামরিক অভ্যুত্থানগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা তৈরি করে। এই একক ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা যতই বিপ্লবী বুলি আওড়াক না কেন, আদতে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো এক ধরনের কাস্টোমাইযড শাসন বানিয়ে নেয়। সত্যিকার অর্থে কোনো নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলে না। একনায়কের খেয়ালখুশির প্রয়োগকে বিপ্লব ভেবে বসাটা গুরুতর মাত্রার বুদ্ধিবৃত্তিক ভুল।

খেয়াল করে দেখবেন, দুনিয়ার প্রায় সব স্বৈরশাসকই 'দিনবদল' কিংবা 'নতুন দিনের' প্রতিশ্রুতি দেয়। নিজেদের শাসনকে নতুন ব্যবস্থা বলে। তাতে কিন্তু ওগুলো বিপ্লব হয়ে যায় না। যদি তাই হতো, তাহলে ইদি আমিন থেকে শুরু করে পিনোশে, সুহার্তো থেকে শুরু করে সিসি, সবাই বিপ্লবী বলে বিবেচিত হবে।

কাঠামোগত দুর্বলতা

সামরিক অভ্যুত্থানের একটা গুরুতর কাঠামোগত দুর্বলতাও আছে। এ-ধরনের অভ্যুত্থানের কোনো মজবুত ভিত্তি থাকে না। পুরো প্রক্রিয়া নির্ভর করে সামরিক বাহিনীর অল্প কিছু সদস্যের ওপর। কোনো সংগঠিত গণভিত্তি, তৃণমূল সংগঠন, এবং বিকল্প কাঠামো না থাকায়, নেতৃত্ব সরিয়ে দিলেই পুরো প্রকল্প ভেঙে পড়ে।

দুর্লভ কিছু ঘটনা আছে, যেখানে ক্যু করতে চাওয়া অফিসারদের কারও কারও আসলেই বিপ্লবী উদ্দেশ্য ছিল। যেমন- বুরকিনা ফাসোর থমাস সানকারা। কিন্তু এই কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে সানকারাকে হত্যা করার সাথে সাথে তার স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়। থেমে যায় প্রকল্প।

অন্যদিকে সত্যিকারের গণআন্দোলনগুলো শত প্রতিকূলতা, বন্দিত্ব ও হত্যা সত্ত্বে টিকে থাকে। কারণ তা একক নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল না, বরং তা জনগণের সংগঠিত শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে থাকে মজবুত আদর্শিক ও সামাজিক ভিত্তি।

বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান

সামরিক অভ্যুত্থান নিয়ে আমরা যা কিছু বললাম, তার প্রায় সবকিছুর বাস্তব উদাহরণ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশের বারবার সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে।

- ১৯৭৫ এর ১৫-ই অগাস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিবকে উৎখাত করা হয়। কিন্তু তারপর ক্ষমতায় বসানো হয় তারই দলের শীর্ষ নেতা খন্দকার মোশতাককে।
- ৭৫ এর ৭-ই নভেম্বর, জাসদের পরিকল্পনায় আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান হয়। উদ্দেশ্য ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। কিন্তু নানা বাঁকবদল আর নাটকীয়তার পর সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় আসেন জিয়াউর রহমান। জাসদ নেতাদের কারও ফাঁসি হয়, বাকিরা জেল খাটে।
- ৮২ সালে ক্যু করে ক্ষমতায় আসে এরশাদ। নিজেদের শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করে। আদতে কিছুই বদলায় না।

- ২০০৭ এর ১১ই জানুয়ারি জননিরাপত্তা আর স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার অজুহাতে ক্যু করে ক্ষমতা দখল করে সেই সময়কার সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ। তারপর রাজনীতিতে মাইনাস টু ফর্মুলা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। যাবার আগে দিল্লির আনুগত্য মেনে নিয়ে ক্ষমতা তুলে দেয় শেখ হাসিনার হাতে। শুরু হয় আওয়ামী জাহিলিয়াত।

এসব অভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করেছে, সশস্ত্র বাহিনীকে রাজনীতিতে জড়িয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের বৈধতার জন্য ইসলামকে ব্যবহার করেছে। কিন্তু কখনো বৈপ্লবিক রূপান্তর আনতে পারেনি।

স্বতন্ত্র পদ্ধতি নাকি প্রতিবিপ্লবের হাতিয়ার?

সামরিক অভ্যুত্থান বরাবরই বৈপ্লবিক রূপান্তরের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে। সত্যিকারের বিপ্লবের জন্য এমন তিনটি জিনিস প্রয়োজন, যা সামরিক অভ্যুত্থানগুলো প্রায় কখনোই দিতে পারে না:

- আদর্শিক ভাঙন: পুরোনো ধ্যানধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়া।
- জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ: জনগণ দর্শক না, পরিবর্তনের সক্রিয় কারিগর।
- পুনর্গঠন: নতুন শাসনব্যবস্থা, নতুন আইন, নতুন ক্ষমতা কাঠামো এবং রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে নতুন সম্পর্ক তৈরি।

সামরিক অভ্যুত্থান এর কোনোটাই দেয় না।

দুর্লভ কিছু উদাহরণ আছে, যেখানে সামরিক অভ্যুত্থানের পর গভীর পরিবর্তন এসেছে।[৭১] কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেসব ক্ষেত্রেও সামরিক বাহিনী একাই সব করেনি। সেখানেও সামরিক শক্তির পাশাপাশি ছিল গণঅভ্যুত্থান এবং একটি শক্তিশালী আদর্শিক নেতৃত্ব।

---

[৭১] পর্তুগালের কার্নেশন বিপ্লব (১৯৭৪) এমন একটি উদাহরণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। শুরুটা হয়েছিল 'এস্তাদো নভো'-র স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর একদল তরুণ অফিসারের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। তারপর সাথে সাথে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। তৈরি হয় বড় বড় গণজমায়েত। এভাবেই দেশ বড় ধরনের পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যায়। নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার নতুন করে গড়ে ওঠে। নতুন করে সংবিধান লেখা হয়, রাষ্ট্রকে দেওয়া হয় নতুন রূপ। এসব কাজের পেছনে মূল চালিকাশক্তি ছিল সমাজ। শ্রমিক ইউনিয়ন, বিভিন্ন গোষ্ঠী আর সুসংগঠিত নাগরিক শক্তিগুলো। জেনারেলরা না। সামরিক বাহিনী এই প্রক্রিয়াটাকে সহজ করে দিয়েছিল, তারপর তারা সরে দাঁড়ায়। সামরিক বাহিনী ভালোভাবে শাসন করেছিল বলে পর্তুগালে এই পরিবর্তনগুলো আসেনি। বরং পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে সামরিক বাহিনী শাসন করতে রাজি হয়নি বলেই।

সামরিক অভ্যুত্থান বিপ্লবী রূপান্তরের স্বতন্ত্র পদ্ধতি না। এটা বড়জোর কোনো হাইব্রিড মডেলের শুরুর ধাপ হতে পারে। যদিও ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিপ্লবের সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে।

সামরিক বাহিনী কখনোই বিপ্লবের অগ্রবর্তী বাহিনী ছিল না, হতেও পারবে না। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিবিপ্লবী শক্তি হিসেবে হাজির হয়।

আযাদীর আন্দোলনের সিলসিলা

বৈপ্লবিক রূপান্তরের যে পদ্ধতিগুলো আমরা চিহ্নিত করেছি, আমাদের নিকট অতীতের ইতিহাসের মাঝেও সেগুলোর প্রতিফলন পাওয়া যায়।

মুহাম্মাদ বিন কাসিম আর মাহমুদ গাযনাভী, হযরত শাহজালাল আর শাহ পরান, বাবা আদম শহীদ থেকে শুরু করে শাহ মাখদুমদের এ অঞ্চলে আসা এবং ইসলামের জন্য লড়াই করা—বাইরে থেকে আসা নুসরত তথা সাহায্যের উদাহরণ। রাহিমাহুমুল্লাহ।

পলাশীর পরাজয়ের পর ১৭৬০ থেকে এ ভূখণ্ডে ফকির বিদ্রোহ শুরু হয়। প্রায় চার দশক ধরে চলা এই বিদ্রোহকে অনেক গবেষক জনযুদ্ধ বা গেরিলা যুদ্ধের সাথে তুলনা করেছেন।

গেরিলা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় পাশতুন গোত্রীয় অঞ্চলগুলো থেকে পরিচালিত মাওলানা উইলায়াত আলী এবং মাওলানা ইনায়াত আলীর জিহাদ আন্দোলনের মধ্যেও। রাহিমাহুমুল্লাহ। ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়ার এই জিহাদের সাথে কিছু কিছু মিল পাওয়া যায় ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে তালিবানের লড়াইয়েরও। তবে তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়ার মুজাহিদরা ঘাঁটি অঞ্চল থেকে বাইরের দিকে বিস্তৃত হতে পারেননি। অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধের প্রথম পর্যায় সফলভাবে শেষ করতে পারেননি।

১৮৫৭ সালের মহাঅভ্যুত্থানকে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান এবং গণআন্দোলনের মিশ্রণ বলা যায়।[৭২] একদিকে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে, যাদের সিংহভাগ ছিল মুসলিম। অন্যদিকে নানা অঞ্চলে গণআন্দোলন শুরু হয়। বিভিন্ন জনপদের কৃষক, দরবেশ, ক্ষুদ্র জমিদার ও সাধারণ মানুষ এই প্রতিরোধে যুক্ত হয়। বিশেষ করে আওধ, মুযাফফরনগর ও শামেলির মতো অঞ্চলে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে আসে।[৭৩]

---

[৭২] ১৮৫৭-কে আজকের সামরিক বাহিনীর ক্যু-এর সাথে মেলানো যায় না, কারণ বিদ্রোহিরা ছিল সিপাহী। বাহিনী ছিল কলোনিয়াল আর্মি, যেখানে অফিসাররা ফিরিঙ্গি আর সিপাহিরা হিন্দুস্তানী। এটা ছিল সেনাবিদ্রোহ।

[৭৩] শামেলিতে কিছু সময়ের জন্য ব্রিটিশ কর্তৃত্ব ভেঙে পড়ে। স্থানীয় মুসলমানরা তখন শরীয়াহভিত্তিক শাসনব্যবস্থা চালু করে। যার সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী, যোদ্ধাদের নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা কাসিম নানুতুভী এবং প্রধান কাযী ছিলেন মাওলানা রশীদ আহমেদ গাঙ্গোহী; রাহিমাহুমুল্লাহ। এই পরিস্থিতি মাস তিনের মতো স্থায়ী হয়।

মুসলিম বাংলার উদাহরণ

মুসলিম বাংলার দুটো উল্লেখযোগ্য আন্দোলন; তিতুমীর ও ফরায়েজী বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। যদিও বিপ্লবী প্রকল্প হিসেবে দুটোর কোনোটাই পুরোপুরি সফল হয়নি, তবু এ দুটো আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে বিপ্লবের একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়।

তিতুমীর: তিতুমীরের বারাসাত বিদ্রোহ ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে সরাসরি তামকীন তথা শাসনকর্তৃত্ব অর্জনের প্রচেষ্টা।[৭৪] তিনি চব্বিশ পরগণা এলাকায় কৃষকদের নিয়ে গণবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। হিন্দু জমিদার এবং তাদের ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকরা যখন হামলা শুরু করে, তখন এই গণবাহিনীর মাধ্যমেই তিতুমীর প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দখল করে নেন বেশ কিছুটা অঞ্চল।[৭৫]

তিতুমীর নিজে বাদশাহ উপাধি ধারণ করেন। তাঁর সেনাপতি মাসুম খাঁকে সিপাহসালার ও মঈনুদ্দিনকে উজির নিয়োগ দেন। বিচারের জন্য নিয়োগ করেন কাযী। গড়ে তোলেন বাঁশেরকেল্লা। বেশ কয়েক মাস এই অঞ্চল তার নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ বাহিনী পূর্ণশক্তি নিয়ে আক্রমণ করলে বাঁশেরকেল্লার পতন হয়।

তিতুমীর দ্রুত তামকীন বা শাসনকর্তৃত্ব অর্জনের লড়াইয়ে চলে গেছেন। কিন্তু তামকীনকে দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখার মতো মজবুত ভিত্তি তাঁর ছিল না। ফলে প্রাথমিকভাবে তিনি ইসলামী শাসন কায়েমে সফল হলেও শেষ পর্যন্ত সেটাকে টিকিয়ে রাখতে পারেননি।

ফরায়েজী: গণঅভ্যুত্থানের আলোচনায় আমরা দেখেছি অভ্যুত্থানগুলো সফল হতে হলে তাদেরকে সমান্তরাল প্রশাসন তৈরি করতে হয়। গেরিলারাও বিভিন্ন অঞ্চলে ছায়াশাসনের মাধ্যমে সমান্তরাল প্রশাসন তৈরি করে। ফরায়েজীরা এই কাজটা খুব দক্ষতার সাথে করতে পেরেছিল। ফরাসি, রুশ এবং ইরানের বিপ্লবে

[৭৪] বারাসাত বিদ্রোহকে গেরিলা যুদ্ধ বলা যায় না। কারণ দুর্গম ঘাঁটি অঞ্চল, সরাসরি লড়াই এড়িয়ে যাওয়া, অঞ্চল দখল না করা, হামলা করে সরে যাওয়া, দীর্ঘমেয়াদি লড়াইয়ে ধাপে ধাপে আগানোর মতো বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রায় কোনোটিই এখানে দেখা যায় না। বরং অনেকক্ষেত্রে উল্টোটা দেখা যায়। অন্যদিকে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের যে বিবরণ ও দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি, তার সাথেও একে পুরোপুরি মেলানো কঠিন। কারণ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদাহরণগুলো শহরকেন্দ্রিক, আর তিতুমীরের বিদ্রোহ ছিল গ্রামীণ কৃষকদের নিয়ে। এটাকে সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় Fortified Rural Insurrection হিসেবে, যেখানে লক্ষ্য ছিল স্থানীয় কর্তৃত্ব ভাঙা ও বিকল্প শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হিসেবে।

[৭৫] তিতুমীর তাঁর আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে বারাসাত মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম এবং নদীয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি স্থানীয় জমিদারদের খাজনা প্রদান বন্ধ করে নারিকেলবেড়িয়াকে কেন্দ্র করে একটি সীমিত কিন্তু কার্যকর প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন।

গণকমিটিগুলো যে কাজটা করেছিল, ফরায়েজীদের অর্জন ছিল তারচেয়েও বেশি। ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের বক্তব্য অনুযায়ীই তারা কার্যত 'রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র' গড়ে তুলতে পেরেছিল।

কিন্তু ফরায়েজী আন্দোলনের দুর্বলতা হলো, তাদের তামকীন অর্জনের কোনো প্রকল্প ছিল না। নিচ থেকে গণক্ষমতার ঘাঁটি দখল করলেও কেন্দ্র দখলের কোনো পরিকল্পনার দিকে তারা আগাননি বা আগাতে পারেননি। যার কারণে অবধারিতভাবে এক সময় আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এসেছে।

বিপ্লবগুলোর অভিজ্ঞতা বলে, বুনিয়াদি পর্যায়ে ফরায়েজীদের 'রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র' গড়ার সামাজিক আন্দোলন আর ইনকিলাবি পর্যায়ের তিতুমীরের তামকীন অর্জনের লড়াই—সফলতার জন্য এ দুইয়ের মিশেল জরুরি।

আল্লাহ তাঁদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের বাসিন্দা বানান।

নুবুওয়াতের ছক

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে আমরা কী দেখি?

মক্কায় দাওয়াহ, তারবিয়াহ, হুজ্জাহ ও চূড়ান্ত মেরুকরণ।

তারপর মদীনায় হিজরত। সেখানে তামকীন, ইসলামী সমাজ এবং নতুন রাজনৈতিক সত্তা (polity) প্রতিষ্ঠা। তারপর জিহাদের মাধ্যমে সম্প্রসারণ।

> দাওয়াহ-হুজ্জাহ-মেরুকরণ; তারপর
> হিজরত-তামকীন-জিহাদ ও সম্প্রসারণ

এই পূর্ণ ছক স্বতন্ত্র। আধুনিক ইতিহাসে তো বটেই, মুসলিম ইতিহাসেও এই ধারাবাহিকতায় এবং এই রূপে এর পুনরাবৃত্তি অত্যন্ত বিরল।

উম্মাহর ইতিহাসে নুবুওয়াতের এই ছকের সবচেয়ে কাছাকাছি প্রতিফলন পাওয়া যায় আরবে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব (রাহিমাহুমুল্লাহ)-এর মুওয়াহহিদুন এবং পশ্চিম আফ্রিকায় শাইখ উসমান বিন ফুদি (রাহিমাহুমুল্লাহ)-এর ফুলানি জিহাদ আন্দোলনে। উপমহাদেশে সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদের তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া আন্দোলনেও এই ছকের অনুকরণ দেখা যায়।[৭৬] তবে মুওয়াহহিদুন এবং ফুলানি আন্দোলন তামকীন ও সম্প্রসারণে সফল হলেও,

[৭৬] সাইয়্যিদ আহমাদ শহীদ তাঁর অনুসারীদের নিয়ে পশতুন অঞ্চলে হিজরত করেছিলেন। সেখানে ইসলামী ইমারত কায়েম করে ধীরে ধীরে পুরো হিন্দুস্তানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া এক্ষেত্রে সফল হতে পারেনি।

এরপর আর এ-ধরনের নজির পাওয়া যায় না। কিছু ঘটনায় আংশিক মিল পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু ওই ক্রমধারা এবং পূর্ণ ছক অনুপস্থিত।

মক্কার মতো দীর্ঘ দাওয়াহর পর সমাজের বুকে গভীর মেরুকরণ আর তারপর হিজরত। মদীনার মতো স্পষ্ট রাজনৈতিক প্রতিস্থাপন এবং সবশেষে ধারাবাহিক সম্প্রসারণ; এমন সমন্বয় আর ঘটেনি।

তালিবান আন্দোলনকেও এই ছকে বসানো যায় না। মোল্লা উমার তাঁর আন্দোলন শুরু করেছিলেন চরম অরাজক পরিস্থিতিতে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধের দায়িত্ববোধ থেকে; এর সাথে মক্কা ও মদীনা জীবনের ধাপগুলো মেলে না।

এর কারণ কী?

মুসলিম ইতিহাসে এমন উদাহরণ কম হবার একটা কারণ সম্ভবত এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াহর সূচনা হয়েছিল মুশরিকদের সমাজে। অন্যদিকে মুসলিম ইতিহাসের বিভিন্ন তাজদীদী প্রকল্পগুলো কাজ করেছে মুসলিম সমাজের ভেতরে। সেখানে পক্ষবিপক্ষের সীমারেখা, মেরুকরণের ধরন এবং নতুন polity গঠনের প্রয়োজন ও সুযোগ, সবই ভিন্নভাবে তৈরি হয়েছে।

আরও একটি সম্ভাব্য কারণ হলো, মদীনার মতো ভূখণ্ড ইতিহাসে বিরল; যে ভূখণ্ড একটি নতুন নেতৃত্বকে রাজনৈতিক জায়গা দেবে এবং পুরোনো ভারসাম্য ভেঙে নতুন কর্তৃত্বকে দাঁড় করাতে সাহায্য করবে।

প্রেক্ষাপটের এই মৌলিক পার্থক্যগুলো স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন ধরনের কৌশল ও পথ তৈরি করেছে। মহান আল্লাহ আনসার ও মুহাজিরদের সর্বোচ্চ পুরস্কার ও সম্মান দান করুন।

আধুনিক সময়ে এই ছকের পুনরাবৃত্তি না দেখার কারণ আরও স্পষ্ট: জাতিরাষ্ট্রের কাঠামো, কঠোর সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় নজরদারি ও বলপ্রয়োগের সক্ষমতা ঐতিহাসিক এই প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে সংকুচিত করে ফেলেছে।

ব্যক্তিগতভাবে হিজরত অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু কোনো জামাআহ ব্যাপক দাওয়াহ ও মেরুকরণের পর পার্শ্ববর্তী কোনো অঞ্চলে হিজরত করবে, সেখানে তামকীন অর্জন করবে, তারপর নিজের ভূমিতে ফিরে এসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, আর অবশেষে চারপাশে সম্প্রসারণ ঘটাবে; এমন ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার সুযোগ এখন

অনেকটাই সীমিত।

তবে এই বাস্তবতা হিজরতের গুরুত্ব খাটো করে না।

হিজরত মানব ইতিহাসের এক সর্বজনীন ছক। পবিত্র কুরআনে হিজরত ও মুহাজিরদের মর্যাদা যেভাবে গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-সহ অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনে হিজরতের যে প্রেক্ষাপট আমরা দেখি, তা থেকে এ বিষয়টা স্পষ্ট।

ইতিহাসের বাঁকবদলগুলোতে হিজরত বারবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। রাষ্ট্রগঠন আর সভ্যতার উত্থানকে বারবার গতি দিয়েছে এই প্রক্রিয়া।

খেয়াল করলে দেখবেন, মানবসভ্যতার বড় বড় উত্থানগুলো ঘটেছে অভিবাসন বা হিজরতের হাত ধরেই। কেন? কারণ অভিবাসন ও স্থানান্তর সমাজের জমে যাওয়া স্থবির কাঠামোকে ভেঙে দেয়। আর তখনই সম্ভব হয় নতুন সূচনা। জন্ম নেয় নতুন ব্যবস্থার আবশ্যিক শর্তগুলো।

এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের ছকের পুনরাবৃত্তি ঘটা সম্ভব; বিশেষ করে ওইসব অঞ্চলে, যেখানে আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামো দুর্বল এবং রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ক্ষীণ। আধুনিক জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে মজবুত ঘাঁটিগুলো এমন অঞ্চলেই গড়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশি।

কিন্তু বাংলাদেশ ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের আশেপাশে এমন কোনো ভূখণ্ড নেই, যেটাকে মুসলিমরা হিজরত ও তামকীনের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। আল্লাহুল মুস্তাআন।

বাংলাদেশ - মুসলিমবঙ্গ

এ অধ্যায়ে আমরা অনেকগুলো বিপ্লব নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি—চূড়ান্ত পর্যায়ে কীভাবে ক্ষমতা দখল হয়েছে, শাসনব্যবস্থার রূপান্তর হয়েছে এবং বিপ্লবীদের নিয়ন্ত্রণ সুসংহত হয়েছে।

কিন্তু যারা বিপ্লব করেছে, তারা কি এই পর্যায় থেকেই কাজ শুরু করেছিল?

নাকি দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতি ও ভিত্তি তৈরির কারণেই তারা বিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগাতে পেরেছিল?

বিপ্লবগুলো আসলে সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈলের মতো, যার এক ভাগ পানির ওপরে থাকে, আর বাকিটুকু থাকে পানির নিচে। মানুষ কেবল ওপরের অংশটাই দেখে, নিচে কী আছে, সেটা চোখে পড়ে না। বিপ্লব নিয়ে আলোচনা হলে আমরা প্রায়ই চূড়ান্ত স্তর নিয়ে ভাবি, দীর্ঘ প্রক্রিয়ার শেষ ছবিটাকেই মূল ঘটনা ধরে নিই।

এতে চিন্তায় এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়।

চূড়ান্ত স্তরে যাবার আগে প্রাথমিক ধাপগুলো পার করতে হয়। কেউ ০ থেকে শুরু করে ১০-এ যেতে চাইলে, সারাদিন কেবল ৮ বা ৯ থেকে ১০-এ যাবার পরিকল্পনা করলে হবে না। তাকে আগে ০ থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে ৮ পর্যন্ত পৌঁছানো নিয়ে ভাবতে হবে। শুধু চূড়ান্ত পর্যায় নিয়েই চিন্তা করলে গোড়ার কাজগুলোই আর করা হয়ে ওঠে না। তখন বিপ্লব হয়ে দাঁড়াবে ফাঁকা বুলি আর রোমান্টিসিসম।

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম, প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনকে মোটাদাগে দুটো স্তর পার হতে হয়: বুনিয়াদি এবং ইনকিলাবি।

প্রথমটা দীর্ঘমেয়াদি আদর্শিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতির পর্যায়। দাওয়াহ, তারবিয়াহ, প্রস্তুতির মাধ্যমে ভিত্তি নির্মাণের স্তর।

দ্বিতীয়টি মোকাবিলা, বিদ্রোহ আর রূপান্তরের স্তর।

কোনো আন্দোলন ইনকিলাবি স্তরে পৌঁছাবে কিনা এবং ইনকিলাবি স্তরে কীভাবে অগ্রসর হবে, তার অনেকটাই নির্ভর করে বুনিয়াদি স্তরের সফলতার ওপর।

কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন জরুরি। বুনিয়াদি স্তর শুধু বিপ্লবীদের নিজস্ব নির্মাণ না। বিপ্লবের মতো প্রগাঢ় পরিবর্তন সমাজের ছোট একটা অংশ

একা তৈরি করতে পারে না। সমাজকেও প্রস্তুত হতে হয়, সমাজকেও প্রস্তুত করতে হয়।

সমাজের প্রস্তুত হয়ে ওঠা বা মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তরের (Priming) প্রক্রিয়া তখনই শুরু হয়, যখন বিদ্যমান ব্যবস্থা তার স্বতঃসিদ্ধতা হারায়। রাষ্ট্রের বৈধতা যখন জনমনে ধসে পড়ে এবং শাসনযন্ত্রের দীর্ঘদিনের সংহতিতে ফাটল ধরে, তখনই পরিবর্তনের ক্ষেত্র তৈরি হয়। এক পর্যায়ে সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের কাছে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা কেবল কাঙ্ক্ষিত না, বরং একমাত্র বাস্তবসম্মত পথ মনে হতে শুরু করে। সমাজের পরিবর্তনের জন্য সমাজের এই প্রস্তুত হয়ে ওঠার ব্যাপারটা ঘটতে পারে অভ্যন্তরীণ কারণে, বাহ্যিক কারণে অথবা দুয়ের মিশ্রণে।[৭৭]

ইনকিলাবি স্তর সাধারণত শুরু হয় যখন আন্দোলন ও সমাজ, এই দুইয়ের প্রস্তুতি এক বিন্দুতে এসে মিলে যায়। এর মিশেল ছাড়া চূড়ান্ত ধাক্কা কাজ করে না।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আমরা এ দুটোকেই উপেক্ষা করেছি এবং করে যাচ্ছি।

বৈপ্লবিক রূপান্তরের ইতিহাস ও পদ্ধতি নিয়ে বাংলাদেশে নির্মোহ বিশ্লেষণ কম; ইসলামপন্থীদের মধ্যে আরও কম। যেটুকু আলোচনা আছে, তার বড় অংশই ইনকিলাবি পর্যায়কে কেন্দ্র করে।

যেন ক্ষেত্র প্রস্তুত, ভিত্তি তৈরি, প্রস্তুতি শেষ; এখন কেবল চূড়ান্ত ধাক্কাটাই বাকি।

কিন্তু আমরা কি সত্যিই ইনকিলাবি স্তরের কাছাকাছি পৌঁছেছি?

বাস্তবতা হলো, আমরা এখনো বুনিয়াদি পর্যায়েরও এমন কোনো কাজ ঠিকভাবে শুরু করতে পারিনি, যা পরে ইনকিলাবি ধাপে রূপান্তর করা যাবে।

আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখেছি, কীভাবে জনপরিসরে ইসলামকে প্রান্তিক করা হয়েছে, কীভাবে সমাজের রাজনৈতিক চিন্তা সেক্যুলার কাঠামোয় বন্দি হয়ে আছে।

---

[৭৭] **অভ্যন্তরীণ কারণ:** দুর্নীতি, দুঃশাসন নিপীড়ন, অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক সংকট, মেরুকরণ, অরাজকতা

বাহ্যিক কারণ: যুদ্ধ, আগ্রাসন, ভূরাজনৈতিক ধাক্কা, কিংবা দুটোর মিশ্রণ।

রাশিয়ায় লম্বা সময়ের অসন্তোষ আর বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় জরাজীর্ণ ব্যবস্থার বিপরীতে বলশেভিকরা দাঁড় করিয়েছিল তাদের দীর্ঘ সাংগঠনিক প্রস্তুতি। চীনে গৃহযুদ্ধ ও জাপানি আগ্রাসনে নড়বড়ে রাষ্ট্রের ভেতরই কমিউনিস্টরা তিলে তিলে তাদের সাংগঠনিক ও সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলে। কিউবায় স্বৈরাচার যখন বৈধতা হারাচ্ছিল, ক্যাস্ট্রোরা তখন ১৯৫৩-৫৯ সালের টানা সংগ্রামে নিজেদের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইরানে শাহবিরোধী জনরোষকে পুঁজি করেই খোমেনি ১৫ বছরের নির্বাসনের জীবনে বিপ্লবের বয়ান এ মাদরাসা-নেটওয়ার্কের শক্ত বুনিয়াদ গড়ে তোলে। আফগানিস্তানে বিদেশি আগ্রাসন, গৃহযুদ্ধ ও পুতুল সরকারের ব্যর্থতার পটভূমিতেই তালিবানের উত্থান ও প্রত্যাবর্তন ঘটে। যার নেপথ্যে ছিল তাঁদের সামরিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা।

আমরা দেখেছি বিদ্যমানতাকে চ্যালেঞ্জ করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার শক্তি জনপরিসরে অনুপস্থিত। যারা জনপরিসরে আছেন, তারা হয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিদ্যমানকে বৈধতা দিচ্ছেন, নয়তো সীমিত কিছু লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন। ইসলামপন্থীরা জাতীয় আন্দোলন গড়তে বারবার ব্যর্থ হয়েছে।

অন্যদিকে যারা বৈপ্লবিক রূপান্তর চান, তারা জনপরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন। আর মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো গোষ্ঠী গণমানুষের শক্তিকে ধারণ ও সংগঠিত করতে পারে না।

আমাদের আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতাকে এক সূত্রে গাঁথার পরিকল্পনা অনুপস্থিত।

বাংলাদেশে আমরা বুনিয়াদ না গড়েই ইনকিলাবের স্বপ্ন দেখছি।

করণীয় কী?

তাই বাংলাদেশে ইসলামী ইনকিলাবের জন্য করণীয় কী? বৈপ্লবিক রূপান্তরের পদ্ধতি কী? এই প্রশ্নের উত্তর হলো:

নববী দাওয়াহর অনুকরণে ইনকিলাবের বুনিয়াদ গড়া।

আর বাংলাদেশের বাস্তবতায় বুনিয়াদি স্তরে দুটো আলাদা ধাপ পার করতে হবে।

- সামাজিক শক্তি অর্জন
- সামাজিক আন্দোলন নির্মাণ

এই দুই ধাপ সফলভাবে সম্পন্ন হলে এবং আন্দোলনের প্রস্তুতি ও সমাজের প্রস্তুত হয়ে ওঠা এক বিন্দুতে মিললে, আন্দোলন ইনকিলাবি স্তরে প্রবেশ করবে।

সামাজিক শক্তি অর্জন

বুনিয়াদি পর্যায়ের প্রথম ধাপ সামাজিক শক্তি অর্জনের। এর উদ্দেশ্য সেক্যুলার রাষ্ট্রের লোহার খাঁচাকে ভাঙা। আমাদের সামনে দাঁড়ানো বাধার পাহাড়গুলো অতিক্রম করে জনপরিসরে নিজেদের জায়গা খোদাই করে নেওয়া। গতানুগতিক

রাজনীতির বাইরে ইসলামী শক্তিকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করা, যাতে ইসলাম সমাজে কেবল দাবি না থাকে; একটা বাস্তব মেরু, একটা বাস্তব শক্তি হয়ে ওঠে।

এই ধাপে নবীদের দাওয়াহর শিক্ষার আলোকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে ইসলামের প্রতি প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট আহ্বান জানাতে হবে এবং সব মিথ্যা ইলাহ ও মিথ্যা দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

এ পর্যায়ে কেন্দ্রীয় লক্ষ্য তিনটি:

> ১। **মেরুকরণ:** বিদ্যমান ব্যবস্থা বনাম ইসলামের দ্বন্দ্বকে সমাজের প্রধান প্রশ্নে পরিণত করা। হক ও বাতিলকে স্পষ্ট করা; ঘাঁটি আলাদা করা, যেন মানুষ অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। নবী-রাসূলগণ দাওয়াহর মাধ্যমে এই মেরুকরণই এনেছেন।
>
> ২। **মনোজগতে বিপ্লব:** সেক্যুলার চিন্তার প্রশ্নাতীত আধিপত্য ভাঙা। ইসলামকে সামসময়িক সংকটের কার্যকর সমাধান এবং ভবিষ্যতের এক অনিবার্য বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করা। নিছক তাত্ত্বিক আলোচনার গণ্ডি পেরিয়ে ইসলামী শাসনকে বাস্তব সম্ভাবনা বানানো।
>
> ৩। **সামাজিক শক্তি:** বিচ্ছিন্ন মানুষকে সংগঠিত গণশক্তিতে রূপান্তরিত করা। জনপরিসরে কার্যকর উপস্থিতি নিশ্চিত করা, নিজস্ব বয়ান গড়া এবং জাতীয় বিতর্কের সীমা ও দিককে প্রভাবিত করার সক্ষমতা অর্জন করা। নিজস্ব দাবি আদায় ও সামষ্টিক স্বার্থ রক্ষায় এমন এক মজবুত গণভিত্তি গড়ে তোলা, যা ধারাবাহিকভাবে কাজে লাগানো যায়।

এ জন্য প্রয়োজন সঠিক আকীদাহ-ফিকির, ধারালো বয়ান এবং সাংগঠনিক সক্ষমতা। পাশাপাশি শৃঙ্খলা, প্রশিক্ষণ এবং নেতৃত্ব নির্মাণ।

সামাজিক আন্দোলন নির্মাণ

বুনিয়াদি স্তরের দ্বিতীয় ধাপে সামাজিক শক্তিকে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। এই পর্যায়ে তিনটি কাজ অপরিহার্য:

> ১। **জাতীয় প্রশ্ন:** ইসলাম বনাম বিদ্যমান ব্যবস্থার দ্বন্দ্বকে জাতীয় প্রশ্ন বানানো।
>
> ২। **সক্ষমতা:** জাতীয় পর্যায়ে কার্যকর আন্দোলন গড়ে তোলা এবং প্রতিকূলতার মুখেও তা টিকিয়ে রাখার মতো সাংগঠনিক সক্ষমতা অর্জন

করা। আন্দোলনকে পর্যায়ক্রমে বেগবান করার পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করার যোগ্যতা অর্জন করা।

৩। **বিকল্প কেন্দ্র:** ক্ষমতার বিকল্প কেন্দ্র গড়া। এমন সমান্তরাল কাঠামো, যা সীমিত আকারে হলেও জনগণের বিকল্প আস্থার কেন্দ্র হবে এবং আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তিকে স্থায়ী করবে।[৭৮]

এই পর্যায়ে এসে আন্দোলনকে হতে হবে অনেক বেশি পোড়খাওয়া আর সুশৃঙ্খল। শুধু মাঠে নামলেই হবে না, বরং দীর্ঘ সময় ধরে রাজপথে টিকে থাকার শক্তি থাকতে হবে।

সর্বোপরি আন্দোলনকে হতে হবে টেকসই। এর শেকড় হতে হবে গভীর আর ভিত্তি মজবুত, যেন নেতৃত্বের ওপর আঘাত এলেও কাঠামো ধসে না পড়ে।

ইনকিলাবি স্তর

এই দুই পর্যায় সফলভাবে সম্পন্ন হবার পর এবং সমাজের প্রস্তুত হয়ে ওঠার শর্তে আন্দোলন ইনকিলাবি স্তরে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ সেই পর্যায়ে, যেখানে লক্ষ্য আর সমাজকে প্রস্তুত করা না, বরং পূর্ণাঙ্গ বৈপ্লবিক রূপান্তর।

কিন্তু মনে রাখা জরুরি: ইনকিলাবি স্তরে পা রাখলেই রাতারাতি বিপ্লব আসে না। এই স্তরেও একাধিক ধাপ পার করতে হয়।

প্রতিটি পরিস্থিতি, সংকট আর সুযোগ তার নিজস্ব চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে। তাই এই পর্যায়ে আন্দোলনকে এমন সুশৃঙ্খল ও কৌশলী হয়ে ওঠতে হতে হবে, যাতে পরিস্থিতি তাকে টেনে না নেয়; বরং ইসলামী আন্দোলনই পরিস্থিতির গতি ও দিককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

আর এই নিয়ন্ত্রণের জন্য চাই সুস্পষ্ট কৌশল। ঠিক এখানেই বৈপ্লবিক রূপান্তরের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। চূড়ান্ত বিপ্লবের নকশা কী হবে, সেই প্রশ্ন সামনে আসে।

বৈপ্লবিক রূপান্তরের পদ্ধতিগুলো কীভাবে কাজ করে এবং কোন প্রেক্ষাপটে কোন শর্তে সেগুলো সফল হয়, এই অধ্যায়ে তা আমরা দেখেছি। তবে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দিয়ে লাভ নেই।

---

[৭৮] ফরায়েজী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

ইনকিলাবি স্তরের চূড়ান্ত নকশা নির্ভর করবে সেই সময়কার বাস্তবতা, আঞ্চলিক-আন্তর্জাতিক সমীকরণ, জনগণের মনস্তত্ত্ব এবং আন্দোলনের নিজস্ব সক্ষমতার ওপর। আগে থেকে কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে চূড়ান্ত হিসেবে ধরে নেওয়া অথবা বাতিল করে দেওয়া কৌশলগত ভুল হবে।

অনিশ্চয়তা ও রূপান্তর

১৯১৭ এর জানুয়ারিতে যদি বলা হতো, পাঁচ বছরের মাথায় পুরো রাশিয়ান সাম্রাজ্য একটা কমিউনিস্ট সুপারস্টেইটে পরিণত হবে, তাহলে সেটা কেউই সম্ভবত বিশ্বাস করত না। এসময় লেনিনের-ই ধারণা ছিল তার জীবদ্দশায় হয়তো বিপ্লব হবে না।

১৯৩০ এর শুরুতে যদি বলা হতো, পুরো চীন আবার একীভূত হবে, তাও আবার কমিউনিস্টদের অধীনে, অনেকে হয়তো হেসেই উড়িয়ে দিত।

১৯৭৭ সালে ইরানে আন্দোলন শুরু হবার মাত্র কয়েক মাস আগে খোদ খোমেনির ধারণা ছিল বিপ্লব হতে এখনো অনেক দেরি।

২০০১ এর ডিসেম্বরে যদি বলা হতো, অ্যামেরিকা আফগানিস্তান থেকে পিছু হটবে আর তালিবান আবারও ইসলামী ইমারত কায়েম করবে, তাহলে লোকে পাগল ভাবত।

সেই তুলনায় মুসলিমবঙ্গের সম্ভাবনা বেশ ভালো। গত ছয় দশক জুড়ে এ ভূখণ্ডে ধারাবাহিকভাবে গণরোষ, গণবিক্ষোভ আর গণঅভ্যুত্থান হয়েছে।

কিন্তু ইতিহাস অনিশ্চিত।

কখন, কোন পথে রূপান্তর আসবে, তা আগে থেকে বলা যায় না। রাশিয়ায় তা এসেছে যুদ্ধপরবর্তী সংকটে, চীনে এসেছে দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর, ইরানে এসেছে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা উবে যাবার পর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে, আফগানিস্তানে এসেছে চরম অরাজকতার প্রেক্ষাপটে কিংবা বৈদেশিক আগ্রাসন প্রতিরোধ করে।

বাংলাদেশে কোন পথে আসবে, সেটা আমরা জানি না।

এই অনিশ্চয়তা সামনে রেখেই, আমাদের সমাজ, ভূপ্রকৃতি, ইতিহাস আর মানুষের মনস্তত্ত্বের আলোকে আমাদের পরিকল্পনা সাজাতে হবে।

অনিবার্য উপসংহার

গেইম থিওরি (game theory) বা কৌশল তত্ত্বে dominant strategy নামে একটা ধারণা আছে। এর মানে হলো, এমন একটা সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ নেওয়া, যা সব বিকল্পের তুলনায় ভালো ফল দেবে, আপনার প্রতিপক্ষ যাই করুক না কেন।

যার হাতে এমন একটা চাল আছে, তাকে আর প্রতিপক্ষ কী করবে, তা নিয়ে খুব বেশি জল্পনাকল্পনা করতে হয় না। সে জানে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, সব ক্ষেত্রেই সে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে।

রাজনীতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে দুটো বড় অনিশ্চয়তা থাকে।

প্রতিপক্ষ কী করবে? আর কাল পরিস্থিতি কেমন হবে?

তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো, এমন কোনো স্ট্র্যাটেজি বেছে নেওয়া, যা ভবিষ্যত ঠিক কী হবে তার ওপর খুব একটা নির্ভর করে না। যেকোনো সম্ভাব্য পরিস্থিতিতেই যা সমানভাবে কার্যকর।

ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করুন—

একজন কৃষক জানে না যে, আগামী মৌসুমে প্রচণ্ড বৃষ্টি হবে নাকি ভয়াবহ খরা। কিন্তু সে জানে জমি চাষ করা, বীজ সংরক্ষণ করা, জমির উর্বরতা রক্ষা করা; যে অবস্থাই আসুক, এই কাজগুলো তাকে এগিয়ে রাখবে।

প্রচুর বৃষ্টি হলে সে ফসল ফলাতে পারবে। খরা হলে টিকে থাকতে পারবে। আর যদি স্বাভাবিক মৌসুম আসে, তাহলে সর্বোচ্চ ফসল তুলতে পারবে। কিন্তু যে কৃষক জমি চাষই করেনি, তার জন্য আবহাওয়া যেমনই হোক; ভালো কোনো ফল আসবে না।

কাজেই, জমি চাষ করাটাই এখানে সবচেয়ে বুদ্ধিমান চাল; এই সিদ্ধান্তটা ভুল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। গেইম থিওরির ভাষায় একে বলা যায় dominant under uncertainty।[৭৯]

---

[৭৯] ক্লাসিকাল গেইম থিওরিতে ডমিন্যান্ট স্ট্র্যাটেজি বলতে এমন কৌশলকে বোঝায়, যা আপনার সর্বোচ্চ 'পে অফ' বা সুবিধা নিশ্চিত করে, প্রতিপক্ষ যা-ই করুক না কেন। অর্থাৎ, প্রতিপক্ষের চালের ওপর আপনার লাভ-ক্ষতির সমীকরণ নির্ভর করে না। এখানে আমরা এমন একটি কনসেপ্ট ব্যবহার করছি, যা ডমিন্যান্ট স্ট্র্যাটিজির ধারণার সাথে সম্পর্কিত, তবে কিছুটা স্বতন্ত্র: Dominance under Uncertainty বা State-Dominance। আমাদের আলোচনায় সুনির্দিষ্ট প্রতিপক্ষের বদলে মূল সমস্যা হলো ভবিষ্যতের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা। অর্থাৎ ভবিষ্যত কেমন হবে, তা আমাদের অজানা। একটা Dominant under uncertainty কৌশল হলো এমন স্ট্র্যাটেজি, যা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সব পরিস্থিতিতে অন্য যেকোনো বিকল্পের চেয়ে ভালো (বা অন্তত সমান) পারফর্ম করে।

শুনতে খটমটে লাগলেও এর অর্থটা সহজ: এটা এমন সিদ্ধান্ত, যা সব পরিস্থিতিতেই লাভের পাল্লা ভারি করে আর ক্ষতির ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। জমি চাষ করা কৃষককে অন্য বিকল্পের চেয়ে ভালো অবস্থানে রাখবে। অনিশ্চয়তার মাঝেও এটাই সবচেয়ে কার্যকর চাল।

বাংলাদেশে বুনিয়াদি স্তরের কাজ—সামাজিক শক্তি অর্জন ও সামাজিক আন্দোলন গড়া—ঠিক এরকম একটা কৌশল। লক্ষ্য যদি হয় ইসলামী ইনকিলাব, তবে পরিস্থিতি যেদিকেই যাক না কেন, এই পথটা বেছে নেওয়া অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি কার্যকর।

চলুন, পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করা যাক এবং দেখা যাক এই বুনিয়াদি কাজগুলো প্রত্যেক পরিস্থিতিতে আমাদের কোথায় নিয়ে দাঁড় করায়।

পরিস্থিতি ১: বাইরে থেকে ইসলামী শক্তির সাহায্য

বাইরে থেকে এমন কোনো সাহায্য আসার সম্ভাবনা আপাতত খুবই কম। কাছাকাছি একমাত্র ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানে, মাঝখানে পাকিস্তান ও ভারতের মতো পারমাণবিক শক্তি। এমন অবস্থায় বাইরের কোনো ইসলামী শক্তি এসে রূপান্তর ঘটানোর সম্ভাবনা তৈরি করতে হলেও বিশ্বব্যবস্থা ও উপমহাদেশের মানচিত্রে ব্যাপক ভাঙন প্রয়োজন। ভাঙনের সেই প্রক্রিয়া যদি এ মুহূর্তেও শুরু হয়, তবু এতে কমসেকম কয়েক দশক লেগে যাবার কথা।

তবু ধরা যাক, কয়েক দশক পর বাংলাদেশে বাইরে থেকে কোনো ইসলামী শক্তির হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা তৈরি হলো। এমন পরিস্থিতিতে—

- **যদি বুনিয়াদ থাকে:** সেই সাহায্য এসে পড়বে উর্বর ও প্রস্তুত যমীনে। সেই সাথে থাকবে সংগঠিত ইসলামী শক্তি, আদর্শিক দৃঢ়তা, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং দক্ষতাসম্পন্ন জনবল। দাওয়াত ও তারবিয়াতের মাধ্যমে সমাজ হবে প্রস্তুত, থাকবে তীব্র মেরুকরণ।
- **যদি বুনিয়াদ না থাকে:** বাইরের সাহায্য হবে বন্ধ্যা মাটিতে পানি ঢালার মতো। সমর্থন দেওয়ার মতো কোনো স্থানীয় ভিত্তিই থাকবে না। এতে সাফল্যের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমবে।

এ-ধরনের স্ট্র্যাটেজির সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, ভবিষ্যতে ঠিক কী ঘটবে, তা আগে থেকে নির্ভুলভাবে প্রেডিক্ট করার প্রয়োজন এখানে থাকে না। পরিস্থিতি যেদিকেই মোড় নিক, এই স্ট্র্যাটেজি সবসময়ই যৌক্তিক এবং কার্যকর থাকে।

পরিস্থিতি ২: সশস্ত্র লড়াই

ধরুন, এমন কোনো বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি হলো, বৈদেশিক আগ্রাসন বা অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়ের কারণে; যা জনগণের বিরাট অংশকে লড়াইয়ে টেনে আনল।

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও সমাজ দীর্ঘমেয়াদি সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য অনুপযুক্ত। এখানকার জনসংখ্যার প্রায় ৯৮% একই জাতিগোষ্ঠীর। কাগজেকলমে জনসংখ্যার প্রায় ৯০% মুসলিম। এই ধরনের সমাজে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা কঠিন। শত্রু-মিত্র আপাতভাবে অস্পষ্ট। তাছাড়া বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধের শর্ত অনুপস্থিত।[৮০] ৭১-এ ভারতের সহায়তার কিছু শর্ত পূরণ হয়েছিল।[৮১] কিন্তু ইসলামী প্রকল্পের ক্ষেত্রে এর কিছুই থাকবে না।

তবু ধরা যাক, উপমহাদেশের সীমান্ত বদলাল বা যে শর্তগুলো এখন অপূর্ণ, সেগুলো কোনোভাবে পূর্ণ হয়ে গেল। তখন কী হবে?

- **যদি বুনিয়াদ থাকে:** ইসলামী আন্দোলন নিজ গণশক্তি, বয়ান এবং গণভিত্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের শর্তে ময়দানে নামতে পারবে। পরিস্থিতি তখন তাকে খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিতে পারবে না।
- **যদি বুনিয়াদ না থাকে:** এই ধাক্কা এসে পড়বে চরম অপ্রস্তুত অবস্থার ওপর। চাপ সামলানোর কাঠামো থাকবে না, সাধারণ মানুষকে দিশা দেওয়ার সক্ষমতাও থাকবে না। ইসলামী শক্তি নিজেই অরক্ষিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পড়বে। টিকে থাকতে হলে অন্য শক্তির লেজুড়বৃত্তি করতে হবে। নইলে নিজের মতো কোনোমতে টিকে থাকবে, কিন্তু পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করার সক্ষমতা থাকবে না।

---

[৮০] খোলা সীমান্ত এলাকা, অস্ত্রের সহজলভ্যতা, যোদ্ধা সংস্কৃতি, জনসমর্থন; মোটামুটি সবগুলো শর্ত বিপক্ষে।

[৮১] ৭১-এ ভারতের সহায়তায় নিরাপদ ঘাঁটি, স্ট্র্যাটেজিক ডেপথ এবং উন্মুক্ত সীমান্তের মতো গেরিলা যুদ্ধের আবশ্যিক শর্তগুলো পূরণ হয়েছিল। তবে ৭১ ছিল একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী/স্বাধীনতাকামী গৃহযুদ্ধ, যা সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের সমর্থনে টেনে এনেছিল। তাই একে বিশুদ্ধ গেরিলা যুদ্ধ বলা যায় না। এটা গেরিলা আর প্রথাগত গৃহযুদ্ধের (Conventional Civil War) মিশ্ররূপ, যা শেষ পর্যায়ে বৃহত্তর কনভেনশনাল যুদ্ধে রূপ নেয়।

পরিস্থিতি ৩: আবার গণঅভ্যুত্থান

বাংলাদেশে গড়ে প্রতি দুই দশকে একবার গণঅভ্যুত্থানের পরিস্থিতি হাজির হয়। ধরা যাক, আবার গণঅভ্যুত্থান হলো। তখন কী হবে?

বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান সরকার ফেলতে সফল। কিন্তু বৈপ্লবিক রূপান্তর আনতে ব্যর্থ। এর মূল কারণ হলো, কেন্দ্র দখলের পরের ধাপগুলো, অর্থাৎ সমান্তরাল প্রশাসন গঠন, পুরোনো রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে নতুন কাঠামো ও বাহিনী গঠন, প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার মতো সক্ষমতা এবং প্রস্তুতি কোনো গণঅভ্যুত্থানে ছিল না। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বৈপ্লবিক রূপান্তর তখনই সম্ভব, যখন এই ধাপগুলো সফলভাবে অতিক্রম করা যাবে। কাজেই,

- **যদি বুনিয়াদ থাকে:** এ পরিস্থিতিকে ইসলামী ইনকিলাবের দিকে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা উল্লেখ্যযোগ্যভাবে বাড়বে।
- **যদি বুনিয়াদ না থাকে:** স্রেফ '৯০ আর '২৪ এর পুনরাবৃত্তি হবে। আমরা পুরোনো চক্রে ঘুরপাক খেতে থাকব।

পরিস্থিতি ৪: তীব্র রাষ্ট্রীয় দমন

ধরুন, রাষ্ট্র আরও কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠল। ইসলামী আন্দোলনের ওপর নেমে এলো ব্যাপক দমনপীড়ন—গ্রেফতার, নিষেধাজ্ঞা, নজরদারি। যদি বুনিয়াদি কাজ ঠিক থাকে, তাহলে টিকে থাকার এবং পরবর্তীতে পুনরুত্থানের সক্ষমতা থাকবে।

- **যদি বুনিয়াদ থাকে:** দমন আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না।
- **যদি বুনিয়াদ না থাকে:** প্রথম আঘাতেই সব ভেঙে পড়বে; দমন শুধু আন্দোলনকে না, ভবিষ্যত সম্ভাবনাকেও নিঃশেষ করে দেবে।

পরিস্থিতি ৫: দীর্ঘমেয়াদি স্থবিরতা

এবার সবচেয়ে খারাপ এবং অসম্ভাব্য পরিস্থিতি কল্পনা করা যাক।

ধরুন, আগামী ৫০ বছরে বড় কোনো পরিবর্তনই হলো না। দেশ, উপমহাদেশ এবং বিশ্ব পরিস্থিতি যা আছে, মোটাদাগে তেমনই রয়ে গেল। এমন ক্ষেত্রেও বুনিয়াদি স্তরের কাজ দ্বীন ও সমাজের জন্য কল্যাণকর হবে। আমাদের অস্তিত্ব ও আদর্শকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে।

- **যদি বুনিয়াদ থাকে:** দাওয়াহ, তারবিয়াহ এবং সামাজিক শক্তির মাধ্যমে অবক্ষয় ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়া সম্ভব হয়। কওম ও দ্বীনের স্বার্থে জনপরিসরে অবস্থান নেওয়া যাবে। সীমিত পরিমাণে হলেও সেক্যুলার-প্রগতিশীলদের সামাজিক আধিপত্যের মোকাবিলা করা যাবে। প্রতিকূল সময়েও রক্ষা করা যাবে নিজ কওমের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা ও ধারাবাহিকতা।
- **যদি বুনিয়াদ না থাকে:** চলমান ভয়াবহ অবক্ষয়ে নৈতিক ধস নামবে, আদর্শিক দৃঢ়তা হারিয়ে যাবে। তীব্রতর হবে মুসলিম সমাজের ঈমানী সংকট, যা এই যমীনে ইসলাম এবং মুসলিম উপস্থিতির ধারাবাহিকতাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দেবে।

পাঁচটি ভিন্ন ভবিষ্যত। প্রতিটিতে বুনিয়াদি কাজ হয় জরুরি, নয়তো উপকারী।

সিদ্ধান্ত সরল।

বিপ্লবী আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা যায়। তারা ধরে নেয়, যেভাবে তারা ভাবছে ইতিহাস ঠিক ঐ ছক মেনেই চলবে। তারা প্রস্তুতি নেয় নির্দিষ্ট কোনো দৃশ্যপটকে মাথায় রেখে—'গণঅভ্যুত্থান হবেই', কিংবা 'ভারতের আগ্রাসন হবেই', অথবা 'বাইরে থেকে নিশ্চিত সাহায্য আসবে।'

কিন্তু বাস্তবতা হলো, ইতিহাস তার নিজের গতিতে চলে। দৃশ্যপট যেকোনো সময় বদলে যেতে পারে; এবং যায়। কখনো গভীর সংকট আসে, কখনো অভাবনীয় সুযোগ। আবার কখনো আসে চরম দমনপীড়ন কিংবা দীর্ঘমেয়াদি স্থবিরতা। এই অনিশ্চয়তাকে আমলে নিয়েই পরিকল্পনা সাজাতে হয়।

আর এই অনিশ্চয়তার মধ্যে বুনিয়াদি স্তরের কাজগুলো এমন, যা সবক্ষেত্রে কার্যকর। কারণ এই কাজগুলো কোনো একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা সিনারিও-এর জন্য তৈরি করা হয়নি। রাস্তা যেদিকেই মোড় নিক না কেন, এই প্রস্তুতিটুকু আপনার সবসময়ই কাজে লাগবে।

ইসলামের আদর্শিক জায়গা থেকে চিন্তা করি কিংবা রূঢ় বাস্তবতার নিরিখে—দুই দৃষ্টিকোণ থেকেই এই বুনিয়াদ গড়ার কাজ এখন আর ঐচ্ছিক বিষয় না। এটা আমাদের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য।

যদি আমরা এই বুনিয়াদি কাজগুলোকে এড়িয়ে যাই, তবে আমরা স্রেফ অতীতের ভুলগুলোরই পুনরাবৃত্তি করে যাব। আর এই কওম আর এই যমীন আটকে থাকবে প্রায় তিনশো বছর ধরে চলা সেই লাঞ্ছনা আর অপমানের বৃত্তে।

আমরা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছি কিনা, তার হিসাব আল্লাহ্ আমাদের কাছে চাইবেন না। কিন্তু আমরা আমাদের সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি কিনা, সঠিক নিয়্যাত ও ইখলাসের সাথে সর্বোত্তম পথটা বেছে নিয়েছি কিনা, আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি কিনা, তা নিয়ে আমরা জিজ্ঞাসিত হব।

নবীদের (আলাইহিমুস সালাম) দাওয়াহ্‌র অনুকরণে বুনিয়াদ গড়ার এই পথকে বেছে নিলে ইনশাআল্লাহ ভুলের আশঙ্কা কমে এবং দায়িত্ব পালনের সম্ভাবনা বাড়ে। এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

তাই ভবিষ্যত আমাদের জন্য যা-ই নিয়ে আসুক না কেন, ইসলামী ইনকিলাব চাইলে, মুসলিমবঙ্গের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে হলে, আমাদের দায়িত্ব এখন বুনিয়াদ গড়া।

অধ্যায় ৭

মুসলিমবঙ্গ: অস্তিত্বের নিয়তি

আমরা শুরু করেছিলাম এক ক্রান্তিকালের কথা দিয়ে।

যখন পুরোনো পৃথিবী বিদায় নিচ্ছে, আর অনাগত বিশ্ব ভূমিষ্ঠ হওয়ার যন্ত্রণায় ছটফট করছে। একসময় অজেয় মনে হওয়া পশ্চিমের আধিপত্যের যুগ শেষ হয়ে আসছে, নতুন বিশ্বব্যবস্থা জন্ম নেবে অনিশ্চয়তা, বিশৃঙ্খলা আর সহিংসতার মধ্য দিয়ে।

যারা নিজস্ব পরিচয় আর শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারবে, টিকবে তারাই। বাকিরা এই মহাপ্রলয়ে বিলীন হবে, নয়তো অন্যের নিয়ন্ত্রণের শেকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে কেবল 'কোনোমতে বেঁচে থাকার' গ্লানি বয়ে বেড়াবে।

আমরা বলেছিলাম—এই কওম ও যমীনকে টিকে থাকতে হলে, মর্যাদা নিয়ে দাঁড়াতে হলে, আমাদের নিজস্ব রাজনৈতিক সত্ত্বা গড়তে হবে। আমাদের গড়তে হবে এমন এক সমাজ ও শাসনব্যবস্থা, যার ভিত্তি হবে তাওহীদ।

আমাদের মুসলিমবঙ্গ হয়ে ওঠতে হবে।

আর তার জন্য প্রয়োজন বৈপ্লবিক রূপান্তর।

কিন্তু আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাধার পাহাড়। সেক্যুলার রাষ্ট্রের লোহার খাঁচা ইসলামকে ব্যক্তিগত বলয়ে আটকে রাখে। জনপরিসরে ইসলাম আর মুসলিম পরিচয়কে ঠেলে দেয় প্রান্তিক অবস্থানে। আমাদের রাজনৈতিক কল্পনাকেও আটকে রাখে সেক্যুলার সীমানায়।

খাঁচা না ভেঙে, এই বাধাগুলো অতিক্রম না করে, বৈপ্লবিক রূপান্তর সম্ভব না।

আমরা তাই সেই পাহাড় অতিক্রমের পথও চিনেছি। নববী দাওয়াহর অনুকরণে বুনিয়াদ গড়া—সামাজিক শক্তি থেকে সামাজিক আন্দোলন, তারপর ইনকিলাবি স্তরে উত্তরণ। বাংলার ফরায়েজী আন্দোলনে আমরা এই উত্থানের প্রমাণ পেয়েছি, আবার চিনেছি তাঁদের সীমাবদ্ধতাগুলোও।

আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝেছি গতানুগতিক রাজনীতির অন্ধগলি আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে দেবে না। সংসদীয় গণতন্ত্রের ফাঁদ ইসলামী আন্দোলনকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করবে, তাঁর রূহকে শুষে নেবে। এই পথ সীরাতুল মুস্তাকিমের না, এ পথ আত্মবিস্মৃতির ও বিচ্যুতির। ইনকিলাবের মনযিলে পৌঁছানোর পথ গণআন্দোলন।

তাই সবশেষে আমরা দেখেছি ইনকিলাবের দিকদর্শন। জেনেছি, কীভাবে ঘটে বিপ্লব; কখন, কোন শর্তে, কোন পদ্ধতিতে।

সব জানা এবং বোঝার পর, আমরা এখন এসে দাঁড়িয়েছি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সামনে।

দানবের মুখোশ ও মুক্তির মরীচিকা

এই জনপদের ট্র্যাজেডি হলো, এখানকার মানুষ বারবার উঠে দাঁড়িয়েছে, রক্ত দিয়েছে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফসল ঘরে তুলতে পারেনি।

এখানে মানুষ জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়েছে, জীবনের কুরবানি দিয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই সেই কুরবানির ওপর দাঁড়িয়ে কিছু এলিট ক্ষমতায় গেছে অথবা কিছু মানুষ এলিটদের কাতারে নতুন করে নাম লিখিয়ে নিয়েছে। কিন্তু মানুষের মুক্তি আসেনি।

প্রতিবারই একই গল্প।

আমরা ধরে নিয়েছি—ফিরিঙ্গি, আইয়ুব, ইয়াহিয়া, মুজিব, এরশাদ, হাসিনা—একেকটা নাম বা একেকটা সরকার গেলেই বুঝি সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তাৎক্ষণিক স্বস্তি খুঁজেছি, সুদূরপ্রসারী চিন্তা করিনি। ব্যক্তির দিকে তাকিয়েছি, ব্যবস্থার কথা ভাবিনি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্রের গভীরতর কাঠামোকে আমরা কখনো প্রশ্নবিদ্ধ করিনি।

আমরা কেবল দানবের মুখোশ বদলেছি, দানবটাকে মারিনি।

ফলে দানব টিকে গেছে, বারবার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সে আরও শক্তিশালী হয়েছে। আরও কলুষিত করেছে আমাদের এই জীবনযমীন।

আমরা বারবার আযাদীর ভুল সংজ্ঞা নিয়েছি। মুক্তির ব্যাখ্যা নিয়েছি পশ্চিমের অভিধান থেকে। 'মুক্তি'র সেই মরীচিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে কখনো রাওয়ালপিন্ডির সামরিক-রাজনৈতিক এলিটদের বৈষম্য আর তাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছি, কখনো ভারতের তাবেদারি করেছি, আর কখনো পশ্চিমের গোলামিকেই স্বাধীনতা ভেবে জাপটে ধরেছি।

মহান আল্লাহ বলেছেন:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

> 'আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক; তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফরি করে, তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত; তারা তাদের আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়।'[১]

সাহাবী রিবঈ ইবনু আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পারস্য সেনাপতি রুস্তমকে বলেছিলেন:

> 'আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন, মানুষকে দাসদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর গোলামির দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে, নানা ধর্মের অবিচার থেকে বের করে ইসলামের আদলের দিকে নিয়ে যাবার জন্যে।'[২]

এটাই আযাদী। এটাই মুক্তি।

কিন্তু আমরা তাগুতের অনুসরণ করেছি। আর তাগুত আমাদের অন্ধকার থেকে আরও গভীর অন্ধকারের দিকে নিয়ে গেছে। এখনো নিয়ে যাচ্ছে।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আমরা এক অন্তহীন চক্রে আটকা পড়ে আছি। এই চক্র ভাঙতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে, সমাধান কেবল শাসক পরিবর্তনে নেই; আযাদী লুকিয়ে আছে ব্যবস্থার আমূল রূপান্তরে।

---

[১] সুরা আল-বাকারাহ, ২:২৫৭

[২] আল-তাবারী, মুহাম্মদ ইবনে জারীর। তারিখ আত-তাবারী, ১৪ হিজরির ঘটনাবলি (কাদিসিয়ার যুদ্ধ অধ্যায়); ইবনু কাসীর, ইমাদউদ্দীন। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া। সপ্তম খণ্ড, কাদিসিয়ার যুদ্ধের বিবরণ অংশ।

শতাব্দীর বোঝা

আজ আমরা এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রায় তিন শতাব্দী ধরে চলতে থাকা অপমানের অধ্যায় আমাদের অস্তিত্বের ওপর দুঃসহ বোঝা হিসেবে চেপে আছে। প্রথমে মুসলিম জাতীয়তাবাদ, আর পরে বাঙালি জাতীয়তাবাদ; সমাধানের নামে যেসব প্রকল্প আমাদের গেলানো হয়েছিল, তার প্রতিটা আজ ব্যর্থ। এই ব্যর্থতা আমাদের এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে অস্তিত্বের সংকটের সামনে।

আমাদের চারপাশের আগুনের বৃত্ত ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। ধসে পড়ছে রাষ্ট্র ও সমাজের পায়ের তলার যমীন। আমাদের জন্যে এখন একমাত্র সমাধান হলো মূলে ফিরে যাওয়া।

ধেয়ে আসা নিখুঁত ঝড়ের কবল থেকে বাঁচতে হলে, বারবার লাশের ওপর দাঁড়িয়ে সরকার বদলানোর আত্মঘাতী খেলা বন্ধ করতে হবে। এবার হারাতে হবে সর্বগ্রাসী সেই দানবটাকেই।

আমাদের এমন এক ব্যবস্থা গড়তে হবে, যেখানে ব্যক্তি থেকে শাসন, প্রতিটি স্তর বিন্যস্ত হবে তাওহীদের ভিত্তিতে। ঈমান হবে সমাজের ভিত্তি, শাসন চলবে শরীয়াহর বিধানে, আর আইনের উৎস হবে ওহী।

এমন এক ব্যবস্থা, যা হবে সব মানুষ আর সমগ্র সৃষ্টির জন্য রাহমাহ। যা হবে মহান আল্লাহর ইচ্ছায়, নতুন এক সভ্যতার প্রকল্পের সূচনা।

অতীত ও আগামীর স্রোত

আমরা কি অসম্ভব কোনো স্বপ্ন দেখছি?

না, আমরা অবাস্তব কিছুর কথা বলছি না।

হাজার বছর ধরে এই জনপদের ইতিহাস হলো জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর প্রতিরোধের। এ মাটির ধমনীতে বিদ্রোহ চিরকাল বহমান। সাম্প্রতিক অতীতেও; ৪৭, ৬৯, ৭১, ৯০, ২৪; বারবার এখানের মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে।

গড়ে প্রতি দুই দশকে একবার এ যমীন গর্জে ওঠে। এক অলিখিত নিয়মে গণজাগরণ পথ খুঁজে নেয়। এবং নিশ্চিতভাবেই, তা আবারও ঘটবে।

পরিবর্তন সম্ভব—মহান আল্লাহ আমাদের চোখের সামনেই তাঁর নিদর্শন দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের বিস্মৃত হন না; তিনি অবশ্যই সুযোগ করে দেবেন, ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেবেন।

কিন্তু সেই সুযোগকে কাজে লাগানোর দায়ভার আমাদের।

তাই আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিৎ, ইতিহাসের পরবর্তী সেই ঢেউ যখন ধেয়ে আসবে, তখন তাকে ধারণ করার জন্য আমরা কি প্রস্তুত থাকব?

অবিনাশী সিলসিলা

আমরা কি নতুন কিছুর কথা বলছি?

না। আমরা নতুন কিছুর কথা বলছি না।

এই যমীনের সাথে ইসলামের প্রতিরোধের ইতিহাস মিশে আছে। শাহ জালাল থেকে শুরু করে বাবা আদম শাহ, শাহ মাখদুম থেকে শুরু করে ফকির মজনু শাহ, তিতুমীর, হাজী শরীয়তউল্লাহ—প্রত্যেকেই জাহিলি শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, মাজলুমের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তাওহীদের দিকে ডেকেছিলেন মানুষকে।

তাঁদের লড়াই কেবল একখণ্ড ভূমি, বিশেষ কোনো ভাষা, সংকীর্ণ কিছু স্বার্থ কিংবা বিশেষ কোন শ্রেণির জন্য ছিল না। তাঁরা লড়েছিলেন ইসলামের রাহে, কুফরি নিযাম উৎখাতের লক্ষ্যে। তাঁরা জানতেন আযাদীর প্রকৃত অর্থ, তাঁরা জানতেন আদল-ইনসাফ ইসলামেই নিহিত।

অবিনাশী এই চেতনা মূর্ত হয়েছিল শাহ ওয়ালিউল্লাহর তাজদীদে, তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়ার জিহাদে, তিতুমীরের বাঁশেরকেল্লা আর ফরায়েজী আন্দোলনের সামাজিক শক্তিতে। এই চেতনা মূর্ত হয়েছে ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে উলামায়ে সাদিকপুরের কুরবানিতে, ১৮৫৭-এর মহাঅভ্যুত্থানে, আকাবীরে দেওবন্দের আন্দোলনে। এই একই চেতনা মূর্ত হয়েছে শাপলার নতুন কারবালাতে।

এই চেতনা বারবার ফিরে এসেছে।

কখনো তা খণ্ডিত হয়েছে, কখনো ভুলত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত কিংবা মুমূর্ষু হয়েছে।

কিন্তু শত শত বছরের উত্থান-পতনে এই চেতনা কখনো হার মানেনি।

হাজারো প্রতিকূলতা, বন্দিত্ব আর নির্বাসনের অন্ধকার উপেক্ষা করে, লাশের পাহাড় আর রক্তের নদী পেরিয়ে এই চেতনা ঘোষণা দিয়ে গেছে:

লাব্বাইক! ইয়া আল্লাহ, লাব্বাইক!

তাই আল্লাহর যমীনে তাঁর বিধান কায়েমের এই আকাঙ্ক্ষা আর তাওহীদী বুনিয়াদে সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণের সংকল্প আমাদের পূর্বপুরুষদের অসমাপ্ত কাজেরই অনিবার্য ধারাবাহিকতা।

আমাদের আযাদীর আন্দোলনের সিলসিলা।

উপমহাদেশের মানচিত্রে বাংলায় ইসলামের বিস্তার এক বিস্ময়কর উপাখ্যান। বাকি ভারতবর্ষ থেকে যা কেবল আলাদা না, বরং একেবারেই স্বতন্ত্র। উপমহাদেশের এই বিশাল ভূখণ্ডে বাংলাই ছিল ইসলামের প্রতি সবচেয়ে সংবেদনশীল ও উর্বর জনপদ। হিন্দুস্তানের ভেতরের দিকের প্রদেশগুলোর মধ্যে কেবল এই বাংলাতেই স্থানীয় জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইসলাম গ্রহণ করেছে।[৩]

এই যমীন কেবল ইসলামকে গ্রহণই করেনি, বরং তাকে আঁকড়ে ধরে গড়ে তুলেছে এক নতুন সভ্যতা। ৬৮ হিজরি থেকে আজ পর্যন্ত, ইসলাম এখানে কেবল টিকে থাকেনি; বরং ইসলামই এই জনপদকে আবাদ করেছে। এই জনপদের মানুষের অস্তিত্ব আর মুসলিম সত্তা এখন অবিভাজ্য।

ছোট এই বদ্বীপের বুকে মহান আল্লাহ উদ্ভব ঘটিয়েছেন বিশাল এক মুসলিম জনগোষ্ঠীর। এমন এক কওম, যারা আজ উম্মাহর ভেতর দ্বিতীয় বৃহত্তম নৃগোষ্ঠী।

হিন্দুত্ববাদী ভারতের মূল ভূখণ্ডে এক গভীর ক্ষতচিহ্নের মতো, তার দুই অংশকে বিচ্ছিন্ন করে, বঙ্গোপসাগরের দ্বারপ্রান্তে, শিরক অধ্যুষিত জনপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত এই বাংলার বুকে ইসলামের এই অনন্য অবস্থান কোনো কাকতালীয় ঘটনা না।

আমি বিশ্বাস করি, এই বদ্বীপ আর এখানে ইসলামের উপস্থিতির নিগূঢ় কোনো তাৎপর্য আছে। এই কওম আর যমীনের জন্য মহান আল্লাহর বিশেষ পরিকল্পনা আছে।

তাই, যতদিন এই কওমের মধ্যে তাওহীদী চেতনা থাকবে, যতদিন ঈমানের সম্পদ এখানকার মানুষ বুকের পাঁজরে আগলে রাখবে, ততদিন এখানে আযাদীর আন্দোলন ফিরে ফিরে আসবে।

---

[৩] Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760* (Berkeley: University of California Press, 1993).

কখনো মক্তব-মাদরাসার নিভৃত প্রান্তর থেকে, কখনো স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখর আঙিনা থেকে, কখনো গ্রামের ভেজা মাটি থেকে, কখনো কংক্রিটের রুক্ষ জঙ্গলের ভেতর থেকে।

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই আন্দোলন চলবে, হাত থেকে হাতে মশাল বদলাবে, কিন্তু এই আগুন নিভে যাবে না।

আমাদের আযাদীর আন্দোলন টিকে থাকবে।

তাওহীদের নিঃশঙ্ক অনুসারীরা বারবার এই যমীনের বুকে খুঁটি গেড়ে ঘোষণা করে যাবে—

লাব্বাইক! ইয়া আল্লাহ, লাব্বাইক!

এই যমীনে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হবে, নতুবা আমাদের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাবে।

এটাই আমাদের নিয়তি।

সময়ের শপথ

সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) কোনো মজলিশ শেষ করার আগে সূরা আসর পাঠ করতেন।

ইমাম আশ-শাফিয়ি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছিলেন, মানুষ যদি কেবল সূরা আসর নিয়ে গভীরভাবে ভাবত, তবে তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট হতো।[৪]

সূরা আসরে আল্লাহ সময়ের নামে শপথ করেছেন। তিনি বলেছেন:

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝

'কালের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে ডুবে আছে।'

আমাদের জীবন আসলে সময়ের সমষ্টি। প্রতিটা দিন একটা ইটের মতো, যা আমরা দুনিয়া থেকে নিয়ে আখিরাতে রাখছি। আখিরাতের ঘরটা কেমন হবে, তা আজকের এই সময়ের ওপর নির্ভর করছে।

আর মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, নিশ্চয়ই মানুষ চরম ক্ষতির মধ্যে ডুবে আছে।

---

[৪] *তাফসীর ইবনু কাসীর*, সূরা আল-আসর-এর তাফসীর।

মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ, কারণ সে তার সময়কে কাজে লাগায় না। তার হায়াতটা সে হেলাফেলায় নষ্ট করে। নানা মরীচিকার পেছনে হন্যে হয়ে ছুটে বনী আদম তার আসল গন্তব্য ভুলে থাকে।

আর তাই ক্ষতি থেকে কীভাবে বাঁচতে হবে, কীভাবে সময়কে কাজে লাগাতে হবে, সূরা আসরে মহান আল্লাহ সেটা মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন:

إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

'তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।'

অর্থাৎ, প্রতিটা মানুষই সেই অনিবার্য ক্ষতির শিকার, কেবল তারা ছাড়া, যারা চারটা কাজ করে:

- ঈমান আনা
- আমলে সালিহ বা সৎকর্ম করা
- পরস্পরকে হকের দিকে আহ্বান করা
- সবর ও সবরের উপদেশ করা

এটাই ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায়। এই হলো সাফল্যের চাবিকাঠি।

আর এই পুরো বইয়ের আলোচনাকে এই চারের ভেতর ধারণ করা সম্ভব:

ঈমান: সমস্ত মিথ্যা দ্বীন, মিথ্যা ইলাহ, মিথ্যা মাবুদকে অস্বীকার করে তাওহীদকে আঁকড়ে ধরা। এটা আমাদের পুনর্জাগরণ, মেরুকরণ আর মনোজগতে বিপ্লবের ভিত্তি।

আমলে সালিহ: জুলুম ও মন্দের বিরোধিতা, জাহিলিয়াতকে উপড়ে ফেলে যমীনে তাওহীদের শাসন প্রতিষ্ঠার নিরন্তর চেষ্টা। এটা আমাদের সামাজিক শক্তি, সামাজিক আন্দোলন আর ইনকিলাবের প্রকল্প।

হকের প্রতি আহ্বান: মানুষকে হকের পথে ডাকা, তাগুত বর্জনের আহ্বান জানানো, এক আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কায়েমের ডাক দেওয়া। এটা আমাদের দাওয়াহ।

সবর: এ সফরে ধৈর্য ধরা, লক্ষ্যচ্যুত না হয়ে দৃঢ় থাকা, সব প্রতিকূলতা আর পরীক্ষার সামনে সবর করা। এটাই আমাদের দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রাম।

এটাই ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রকল্প, মুসলিমবঙ্গের ইশতেহার।

সন্ধিক্ষণের সিদ্ধান্ত

আল্লাহ্—যিনি আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র অধিপতি; যিনি সর্বজ্ঞ, নিখুত ও সুক্ষতম পরিকল্পনাকারী। যিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন; দৃশ্যমান আর অদৃশ্যের যে বিশাল জগত আমাদের ঘিরে আছে, তার যা কিছু আমাদের কল্পনার সীমানায় ধরা দেয়, আর যা কিছু সেই সীমানার বাইরে তার প্রতিটি অণু-পরমাণুকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, রূপ দিয়েছেন এবং সাজিয়েছেন, তাঁর এই সৃষ্টিজগতে দুর্ঘটনাবশত কিছু ঘটে না।

আমাদের এই জীবন, আমাদের বংশগতি, আমাদের চিন্তা ও উপলব্ধির নিগূঢ় জগত; সবই এক শাশ্বত প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সময় ও স্থানে আমার ও আপনার অবস্থান, এখনের মুহূর্তটাতে আমার এ শব্দগুলো লেখা, আর *এই* মুহূর্তে আপনার এই লেখাগুলো পাঠ করা—এর কোনো কিছুই কাকতালীয় না।

সবকিছুর পেছনেই কাজ করছে এক অমোঘ বিধান।

ঠিক যেভাবে আমাদের এই কওম ও যমীন এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। তেমনিভাবে আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে জীবনের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি।

এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, শেষ পর্যন্ত আমরা কোন পথ বেছে নেবো?

আমরা কি গতানুগতিকতাকে বেছে নিয়ে অভ্যস্থ তুচ্ছতা আর বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাব?

নাকি আমরা এই যমীনে মহান আল্লাহর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একেকটা জীবন্ত হাতিয়ার হয়ে ওঠব?

আর নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য:

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই তাদেরকে যমীনে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের; এবং তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন, এবং ভয়ভীতির পর তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না। আর এরপর যারা কুফরি করবে, তারাই ফাসিক।'[৫]

মহান আল্লাহ সাক্ষী, আমি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

[৫] সূরা আন-নূর, ২৪:৫৫

আসিফ আদনানের জন্ম ১৯৮৮ সালে, চট্টগ্রামে। বেড়ে ওঠা ও পড়াশোনা ঢাকায়।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে, এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সে মাস্টার্স করেছেন। বর্তমানে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী চিন্তা ও সভ্যতা অনুষদে (ISTAC) পিএইচডি গবেষক হিসেবে অধ্যয়নরত। তাঁর গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র ইসলামের আলোকে সামসময়িক পাশ্চাত্য দর্শনের মূল্যায়ন।

'মুসলিমবঙ্গ' তাঁর প্রকাশিত তৃতীয় গ্রন্থ।

[illegible]